স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প

সমরেশ বসু

মডেল পাবলিশিং হাউস ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৭০

জয়দেব ঘোষ কর্তৃক ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত

শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। কল্পনাও করতে পারি নি হঠাৎ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় সমরেশ বসু এভাবে চলে যাবেন। এই সেদিনও তিনি বলেছিলেন একদিন সময় কবে এসো। কথা হবে। একশো বছবেব ছোট গল্প সংকলন—স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প তিনি যখন সম্পাদনা করছিলেন সেই সময় ওঁার কাছে যেতে হয়েছিল ঘন ঘন এবং অনেকবার। তাঁর উপদেশ, লেখকদের [মৃতদের ক্ষেত্রে] গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা এক অত্যন্ত মূল্যবান নজির হযে বইল সাহিত্যে। সম্ভবত এটি সমবেশ বসু'ব জীবনেব একমাত্র সম্পাদনা।

তখন থেকেই তাঁর নিজেব গল্পেবও একটি স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন প্রকাশনাব কথা হয়। এই বইটি সমবেশ বসুব শেষ বেছে যাওযা পঁচিশটি গল্পের সংকলন। তিনি অনেক ভাবনা চিন্তার পব নিজেব গল্পেব বাছাই কবেন। এই গল্পগুলো সবই ওঁর অত্যন্ত প্রিয় গল্প।

সমরেশ বসু'ব স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পেব সংকলন প্রকাশ কবতে পেরে আমবা গর্বিত। কিন্তু একটা ব্যাপাবে ভীষণ দুঃখ বযে গেল। তিনি বলেছিলেন সংকলনটির ভূমিকা হিসেবে একটি নিবন্ধ লিখে দেবেন। শেষ পর্যন্ত আব লেখা হ'ল না। তাব আগেই তিনি চলে গেলেন।

প্রকাশক

সমরেশ বসুর প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ

মরশুমের একদিন
ষষ্ঠ ঋতু
দেওয়াল লিপি
ছোটোছোটো ঢেউ
অকাল বৃষ্টি
মনোমুকুর
ফুলবষিয়া
সুবর্ণা
পশারিণী
আইন নেই
উজান
পাপ পুণ্য
বনলতা
ছেঁড়া তমসুক
চেতনার অন্ধকারে
কামনা বাসনা
কীর্তিনাশিনী
মাসের প্রথম রবিবার
এখানে সেখানে
আটাত্তর দিন পরে
মানুষ
ধর্ষিতা
ও আপনার কাছে গ্যাচে
সমরেশ বসু'র শ্রেষ্ঠ গল্প (বেঙ্গল পাবলিশার্স)
হ্রেস্বা ধ্বনি
বিদুল্লতা
বজকিনী প্রেম
নাচঘর
বিপরীত রঙ্গ
কুন্তী সংবাদ
অন্ধকারের গান
ছায়াচারিণী
সমরেশ বসুর গল্পসংগ্রহ
(১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম খণ্ড)
বিবেকবান/ভীরু
কে নেবে মোরে
সমরেশ বসুর বাছাই গল্প
আমি তোমাদেরই লোক
আদি মধ্য অন্ত
সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রমা)

রামকিঙ্কর। রামকিঙ্কর।

অশান্ত বসন্তে একটি অনুমেয় ভূমিকা

স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা লেখকেরই লেখার কথা। সুতরাং এ ভূমিকাও সমরেশ লিখবেন এমনটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু সমরেশ তাতে নির্মমভাবে বাদ সাধলেন। সব ভূমিকা ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন মহাকাল নির্ধারিত উপসংহারে। এখন এ ভূমিকাটি লিখতে হবে আমাদের--যাঁদের সঙ্গে তিনি গল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, তালিকা প্রণয়নের সময় যাদের মতামত তিনি বিবেচনা করেছিলেন। সুতরাং ভূমিকাটিও হওয়া উচিত তাঁর নিজের গল্পগুলি সংক্রান্ত ভাবনার প্রতিফলন। সে কাজ প্রায় দুঃসম্ভব। কেননা একজন লেখকের নিজের লেখা সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা কাগজে কলমে বন্দী হলে, সেটা নিজেই একটা সাহিত্য কর্ম হয়ে ওঠে। সমরেশের হয়ে সে কাজ করে দেবার সাহস বা সামর্থ্য আমাদের নেই। সে ঔদ্ধত্যও আমাদের প্রশ্রয় নেই। কাজেই ভূমিকাটি লিখতে হচ্ছে তাঁর বন্ধুকে—এবং লিখতে হচ্ছে এখন, যখন বন্ধুবিয়োগে তিনি বিমর্ষ।

তাঁর স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পের নির্বাচনে তিনি একটি বিষয়ে প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন গল্পগুলির সংকলন যেন ছোটগল্পকার সমরেশের ব্যক্তিত্বের পূর্ণমান প্রতিভূ হয়। অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত ও বর্তমান ভূমিকা লেখককে, কার্যকর হতে পারে এমন একটা তালিকা তিনি তৈরি করতে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য পূর্ণদায়িত্ব বা শেষ সিদ্ধান্তের ভার তাঁর উপরেই ছিল: গল্পগুলির অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে সকল ক্ষেত্রেই যে আমরা তিনজন ঐকমত্যে পৌঁছেছিলাম -- এমন কথা বলা যাবে না। তবে আমরা দুজনেই কোনোক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচনের উপর কথা বলিনি।

তেমন গল্পের দিকেই ছিল লেখকের পক্ষপাত যে গল্পের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির সঙ্কটাপন্ন চেহারা ও স্বরূপকে ভাল করে চেনা যাবে। প্রথম পদক্ষেপেই তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, গল্পকথার জন্য তিনি ব্যস্ত নন। তিনি ব্যগ্র মানুষের বিষয়ে কিছু বলার জন্য। শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত—এই সব শ্রেণী বিভাগে তাঁর গল্পকে আমরা সাজিয়ে থাকি বটে, কিন্তু তাঁর কাছে বিষয় বা থীম কখনো এ ভাবে উদ্ভাসিত হয়নি। মানবীয় বৈচিত্রের উপাদান তাঁর গল্পে অবশ্যই মিলবে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড়ো কথা হল মানবীয় অপরাজেয়তা। বস্তুত, আধুনিক ব্যক্তির অনন্যোপায় ট্র্যাজিক প্রকৃতিকে সমরেশ তাঁর গল্পে উপন্যাসে যে মর্যাদা দিলেন, সেটাই গল্প লেখক হিসাবে তাঁকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। তারাশঙ্কর বা মানিক, যুবনাশ্ব বা প্রেমেন্দ্র মিত্র—সমরেশের গল্পে ছায়া ফেলেনি এমন নয়। গোর্কি, জ্যাক লণ্ডন, লু শুন, হেমিঙওয়ে নিশ্চয় সমরেশের গল্পের নেপথ্যে কখনো কখনো দাঁড়িয়েছে। সেটা অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। সমরেশ গোর্কি হতে চেয়েছিলেন কিনা সে প্রশ্নও অবান্তর। আমরা যদি সমরেশের ভিতরে দ্বিতীয় গোর্কি, কি দ্বিতীয় হেমিঙওয়ে, এমন কি দ্বিতীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেতাম তাহলে অদ্বিতীয় সমারেশকে হারাতাম। সে সমরেশ তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ভারতীয় সম্ভব বাস্তব অভিজ্ঞতার বন্ধুর জটিল পথ ধরে। ভারতীয় সম্ভব বাস্তব

বোধ—এই কথাটির বীজ আমি পেয়েছি প্রয়াত সমরেশ স্মরণে দূরদর্শনে আয়োজিত মৃণাল সেন মহাশয়ের একটি উক্তি থেকে। তিনি উরাতিয়া গল্পটি প্রসঙ্গে 'প্যারাবল্'-এর আভাস পেলেন। প্যারাবলই যে সরাসরি পাওয়া গেল—এমন কথা শ্রীসেন বলেননি। কিন্তু বেশ বোঝা যায় উরাতিয়ার প্রাণশক্তির মৌল রহস্য কোথায় সে সম্বন্ধে একটা প্রত্যয়ে তিনি পৌঁছেছেন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকাভাস তিনি পেয়েছেন। একথা ঠিক, প্যারাবল রূপক নয়। সমরেশের কোনো গল্পও রূপক নয়। রূপক বা প্যারাবল যাই বলিনা কেন তা কিন্তু আমাদের আবিষ্কার। লেখক যখন গল্পটি লিখেছেন তখন তা তাঁর কাছে জীবনের একটা উপলব্ধ সত্য বলেই প্রতিভাত হয়েছে। 'জোয়ার ভাঁটা' বা 'উজান' গল্পে বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। নামকরণে নদী অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও গল্পদুটি দুই ধরনের গল্প। প্রথমটা নৈষ্কর্ম্যের সঙ্গে লড়াই দ্বিতীয়টা নৈঃসঙ্গ্যের সঙ্গে। কিন্তু দুটি গল্পকেই লেখক ভাবতেন তাঁর যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। এজন্য তিনি একথা ভাবতেন যে, দুটি গল্পেই প্রধান হয়ে উঠছে মানবীয় স্বভাবের অপরাজেয় স্বরূপ। দীর্ঘদিনের প্রায় অর্ধশতাব্দীর বন্ধুত্বের কারণে জানি সমরেশের কত শ্রদ্ধার বিষয় ছিল মানবীয় স্বভাবের এই দিকটি। প্রসঙ্গত আমরা 'পাড়ি' গল্পটির কথাও ভাবতে পারি। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধরত প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার গুহাবাসী যূথবদ্ধ মানুষ নয়, কর্মচ্যুত একালের এক দম্পতিকে লেখক স্থাপন করেছেন গাঙ্গেয় প্রতিকূলতার প্রতিস্পর্ধী রূপে। মজুরীটা শেষ পর্যন্ত উপলক্ষ্য। ক্ষুধানিবৃত্তি গৌণ। আসল কথা হল লড়াইটা। সেই লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হল মানবজীবনের শাশ্বত স্বরূপ। সে স্বরূপের একটা দিক হল দায়িত্ববোধ। যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে যেটা ঠিকভাবে হাসিল করতে হবে। কাজটা হাতে নেবার পর কাজটাই আসল কথা—পয়সাটা তখনকার কথা আর নয়। শ্রমজীবীসত্তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন সে দায়িত্ববোধ। দ্বিতীয় দিক হল নরনারী যুগলের সংগ্রামী সহযোগিতা। সে সহযোগিতা এমনই নিবিড় যে ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তারা ভুলেই যায় দৈহিক পার্থক্যের কথা। তারা দুজনে মিলে একটা লড়াকু পরিপূর্ণতা। আর শেষকথা হল এতকিছুর মধ্যেও তারা হারিয়ে ফেলেনি মানবিক মমতা। অথচ ব্যক্তি হিসাবে তাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যকে ঘুলিয়ে ফেলারও কোনো উপায় নেই।

এ সংকলনে সমরেশ এবং আমরা একমত হয়েছিলাম একটি বিষয়ে। 'আদাব' বা 'স্বীকারোক্তি' বা এমন ধরনের গল্প যা প্রায় সব সংকলনেই হাজির থেকেছে, তাদের দিক থেকে দৃষ্টিকে একটু সরিয়ে আনব। আমরা এমন ধরনের গল্প বাছতে চেয়েছি যেগুলি হয়তো 'আদাব' বা স্বীকারোক্তির মতো পরিচিতি-ধন্য নয়, কিন্তু সমরেশ বসুর জীবনভাষ্যের উন্মোচনের বিচারে যাদের দাম কারো নিচে নয়। 'বিহিত' 'বনমালী' 'মরেছে প্যালগা ফরসা' 'দুলে বাড়ির ভাত' এবং এরকম অন্য গল্পের নির্বাচনের যাথার্থ্য এখানে। ঘটনা-বিস্ময় সমরেশকে কতটা টানে? কতটা টানে চরিত্রবিস্ময়—এ প্রশ্ন সমরেশ পাঠককে কখনো না কখনো উতলা করবেই। কেননা, ঘটনাবিস্ময় বা চরিত্রবিস্ময় অপেক্ষা জীবনবিস্ময়ই যে আলোচ্য লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ ধন। 'প্রত্যাবর্তন' সেজনাই গোল গল্প নয়। পিতৃপরিবারের দুর্দশার কথা ভেবে গল্পের মেয়েটি প্রেমিককে ফিরিয়ে দিল—এ গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু প্রত্যাবর্তন গল্পের আসল কথা পিতৃসংসারের জন্য বাসন্তীর করুণা নয়। তা হলে তা হত মধ্যবিত্ত ভাবাদর্শের গল্প। বাসন্তী তার নিজের জন্য খুঁজে পাওয়া ভূমিকাটিকে হারাতে চাইল না। তাই তার ফিরে আসা। পবনের ফিরে আসাটুকু ফাউ। ফাউটুকু মিষ্টি বটে। তবে ফাউ নিরপেক্ষভাবেই আসলটুকু আসল। কিন্তু তাই বলে এই সঙ্গেই আমরা যখন পড়ব 'প্রাণ পিপাসা' যা আমরা অন্য সংকলনেও হয়তো পড়েছি তার প্রতি লেখকের পক্ষপাতকে বুঝে নিতে ভুল হবে না। স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পে সে

থাকবে কেন যে বিষয়ে লেখকের মনোভাবটি স্পষ্ট। দেহজীবিনী মেয়েটা আর গল্পের 'আমি' চরিত্রটির মৃত বন্ধুর পুঁটলি, বাদুলে রাত—সব মিলিয়ে একটা টান টান নাটক এখানে আছে। এবং সে নাটকের মূল কথা হল মানুষের সেই মহাঅধিকারের অঙ্গীকার। এ সব গল্পে সমরেশ আমাদের নিয়ে যান অস্তিত্বের সব আশীর্বাদ বঞ্চিত অন্ধকার নিচে তলায়। কিন্তু কদাচ সে অন্ধকারকে তিনি অনপনেয় বলে মেনে নেন নি। প্রাণ পিপাসা এক অর্থে আলোক পিপাসা। অন্ধকারের সঙ্গে আলোকের এই আশ্চর্য বিপরীত বিন্যাসে ব্যক্ত হয় সমরেশের জীবন দর্শন।

'একটি বেদনাদায়ক প্রতিবাদ' গল্পটির কথা এখানে উল্লেখ করি। কিন্তু তার আগে একটা কথা পাঠক আমাদের কাছে জানতে চাইতে পারেন। 'আদাব' বা 'স্বীকারোক্তি'র মতোই পরিচিতি ধন্য গল্প তো 'পাড়ি'ও। কিন্তু সে গল্প তো এ সংকলনে সমরেশ রেখেছেন। হ্যাঁ, ঠিক কথাই। তবে লেখক এই সংকলন সম্বন্ধে যা ভেবেছিলেন সেটা হল জীবনের একটা বিশিষ্ট রূপ। সবকিছু সত্ত্বেও জীবনের বিস্ময় তার অদমনীয়তার মধ্যে নিহিত, তার লড়াইয়ের মধ্যে ব্যক্ত। একটি বেদনাদায়ক প্রতিবাদ গল্পে সে কথাটি অব্যর্থ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে—'সাহিত্যে জীবন যন্ত্রণা, জটিলতা ইত্যাদি থাকবেই, তবু মানুষের জয় সে চিরকালই ঘোষণা করবে। সেই জন্যেই আসলে যন্ত্রণা জটিলতা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যে কোনো ধরনের মনোবিশ্লেষণ আর তত্ত্ব ঘেঁটে তাকে অন্ধকারের পরাজয়ে টেনে নিয়ে যান, মেঘচাপা সূর্যের মতো সে তার অমরত্ব ঘোষণা করবেই।' এ গল্পটি একটি চিঠির আকারে লেখা। সমরেশ মনে করতেন এতে গল্পের বিষয়গত প্রত্যক্ষতার হানি ঘটে। তবু তিনি এই ফর্মে গল্পটি লিখেছেন। কারণ এই ফর্মটি এখানে অনিবার্য। শিল্পরূপ ও বস্তুরূপের সম্বন্ধ, ইলিউশন ও রিয়্যালিটির বাদী-সম্বাদী সংযোগ এই গল্পের রসভিত্তি। আর শেষটায় লেখক আমাদের নিয়ে গেলেন বাস্তবের সেই মহত্তর ভূমিতে, জীবন যেখানে যুযুধান শুধু নয়, জিগীষুও বটে।

কোনো একটি সাক্ষাৎকারে সমরেশ একবার বলেছিলেন মধ্যবিত্ত জীবনের অনেককিছু সম্বন্ধে তিনি খুব ক্রিটিক্যাল। নিজেকেও সে সমালোচনা থেকে তিনি রেহাই দিতে চান না। সে সমালোচনায় কাঁটা থাকেনা এমন নয়। 'বনমালী' গল্পটি তার প্রমাণ। আবার কাঁটাগাছেও ফুল ধরাতে জানেন তিনি। 'কিছু নয়' গল্পটি তারই প্রমাণ। 'কিছু নয়'গল্পটিতে গল্পের বিষয়ও কিছু নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত নীতিবোধের ভ্রুকুটিকে মৃদু পরিহাসে ও স্নিগ্ধ বেদনায় এক মুহূর্তের জন্য উপেক্ষা করার ইচ্ছা গল্পটির মূলকথা। অবশ্যই তিনি এমন নরম করে বলার মানুষ ছিলেন না। কিন্তু এখানে তার বলার কথাটি বলার ধরনের জন্য মনে দাগ কাটে। 'মেখলা ভাঙ্গা রোদ' সমরেশের একটি গল্পের নাম। গল্পটির শেষে আছে একটি আশ্চর্য চিত্রকল্প। 'পরদিন সূর্য দেখা দিল আকাশে, নোনা বিলের ওপার থেকে দুষ্টু ছেলেটি রাঙা মুখখানি তুললো। যেন এতদিন লুকিয়ে কী এক খেলা দেখছিল বিশ্বের'। মেঘ কুয়াশা ঝড় আকাশ রৌদ্রের চিত্রকল্প প্রায়ই সমরেশের গল্পে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের সঞ্চিত উত্তাপের প্রসঙ্গেই মেঘকুয়াশার উপমান। ঝড় যেন আবদ্ধতার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ: ঝড় আর রক্তের দাপাদাপি, হৃৎপিণ্ডের তোলপাড় এক হয়ে যায়। বসন্তও তাঁর গল্পের কখনো শান্ত বসন্ত নয়। অশান্ত বসন্ত। এই ঝড় শুধু রক্তের নৃত্য নয়। তা সমরেশের কাছে এমন একটা প্রাকৃতিক আলোড়ন যা, স্থিতাবস্থাকে ঘুচিয়ে দেয়। উত্তাপ এবং ঝড়, উত্তাপ এবং ভূমিকম্প একই বাস্তব পরিস্থিতি পরিবেশের উপমান হিসাবে দেখা দিয়েছে।'বিষের ঝাড়' গল্পটিতে শহরতলীর মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের অষ্টাবক্র পঙ্গুতার মধ্যে যে এক ভ্যাপসা অস্বাস্থ্যকর উত্তাপের কথা বলা হয়েছে, সেই সমালোচনাটাই শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল না। এ ছবি আঁকা হল বটে, ' একটা অন্ধকারগুহা তার মধ্যে দূরে দূরে কতকগুলি জোনাকি

জ্বলছে পিটপিট করে। আর অশরীরী ছায়ার মতো যেন কারা ঘোরাফেরা করছে সেখানে, ভিড় করে আছে কারা সারবন্দী হয়ে গুহায় গায়ে পাথরের মূর্তির মতো। নিঝুম নয়। হাসিগান, গল্প, মারধোর, কান্না, হাঁক, হল্লা কী নেই! তবু যেন হাওয়া নেই। আকাশ নেই গলিটার মাথায়। রুদ্ধশ্বাস দমবন্ধ পাথরেব দিকে ঠেসে ধরতে চাইছে।' কিন্তু সেটাই গল্পটিব শেষ কথা নয। এই শ্বাসরোধী আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠল বিষফল খেয়ে ছোট ছেলেটি মবে যাবার পর। তাব পরদিন হাব্রাধন আক্রমণ করল বিষঝাড়কে। গল্পের শেষটা সর্বার্থে প্রতীকী। মধ্যবিত্ত সুলভ অন্তঃসারশূন্য সকল রঙিন ভাবাবেগকে, তাব নির্বীর্য অবদমিত কুটিল বাসনাকে দলিত কবে শুরু হোক অস্তিত্বেব পুনরুত্থান—'সেই ঝড়ে ঘা লেগে ছরকুটে যেতে লাগল সবুজ লাল সব বিচিত্র ফল। পালাল কতগুলো ঢোঁড়া, হেলে সাপ, পোকামাকড। শিকড়ে ঘা লেগে সাবা বাড়িটাব দেওয়ালে বিস্তৃত শিরা উপশিরায় টান পড়ে যেন নড়ে উঠল বাড়িটা। ভেঙ্গে না ফেললে নতুন ভূমিকা রচনা করা যায না।

একটা ব্যাপাব সমরেশের গল্পে লক্ষ্য কবা যায়। উপন্যাসে তিনি আসন পাল্টেছেন বাবে বারে। বক্তব্য ধীরে ধীবে রূপ থেকে রূপান্তরে নিয়ে গেছে তাঁকে। স্বভাবতই তাঁব বলাব ভঙ্গি পাল্টেছে—ভাষায় এসেছে নতুন নিরীক্ষাব নিমন্ত্রণ। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁব সে পবিবর্তন যতখানি দৈগন্তিক, ততখানি আনুভূমিক নয়। ছোট গল্পে তাঁব বলাব কথাটি মোটামুটি এক বিন্দুতে স্থির থেকেছে—তা হল জীবনেব একটি মূল সত্য সম্বন্ধে সজাগ প্রত্যয। সমস্ত মাবেব মধ্যেও জীবন হারিযে ফেলেনা মানুষেব পরম অভিজ্ঞান—তাব ভালবাসা। এই ব্যাপাবটি সমরেশ উপলব্ধি কবেছিলেন তাঁব নিজেব জীবন দিয়ে। তাঁব অস্তিত্বেব মূল ভিত্তি প্রেম। আদাব থেকে শেষতম গল্প পর্যন্ত একেব পর একগল্পে সমরেশ যেন মানব জীবনের সেই একান্ত অদাহ্য অসহ্য, অশোষ্য, অলোপ্য শক্তিকেই নানা অগ্নি পরীক্ষায় ফেলেছেন। সেই পরীক্ষাব বৈচিত্র অন্তহীন। মনে করতে পাবি 'সোনাটবাবু' গল্পটি। জীবনধাবনেব প্রবল বিড়ম্বনার মধ্যেও দুটি মানুষের কাছে হাবিয়ে যাযনি বেঁচে থাকাব অবাধ্য কৌতুক। উপভোগে ও উপলব্ধিতে শেষ অবধি জয়ী হয জীবনরস। তাব জন্য যদি প্রেরণা খুঁজতে হয মানবেতব জগতে তো সেও পরম রমণীয়। বিষ্টুপদ আর ফ্যালার অতিপ্রজ সংসাবেব মধ্যে স্তবগত ভেদ রেখাটি প্রায় দুর্লক্ষ্য। মিউনিসিপ্যালিটিব হয়ে কুকুব মারা তাদেব কাজ। এদিকে দুজনেব সংসাবেই দুই ঘরণীব দেহে মনে নবীন আগন্তুকেব নোটিস। গল্পটিকে সমবেশ নিয়ে এলেন জীবন বিস্ময়েব উপকূলে। হত্যার জন্য চিহ্নিত কুকুর মাযেব পিছুপিছু ছুটে বিষ্টপদ আর ফ্যালা পৌছে গেল সেখান যেখানে কুকুব বাচ্চাদেব স্তন্যপান করাচ্ছে তাদেব মা—'ক্লান্ত কুকুরটা টেবও পাল না তাব দুশমনেরা এসে দাঁড়িয়েছে। দুধেব ভাবে তাব টনটনে স্তন হালকা হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা ঠাসা বুকে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাওয়া বইছে আব কোথা থেকে একটা বসন্ত পাখি উল্লাস ভরে ডাকছে।' থমকে গেল বিষ্টুপদ আব ফ্যালাব ঘাতক ভূমিকা। বিষ্টুপদর মুখেব কঠিন রেখাগুলি কী ম্যাজিকে মজে গলে গেল। 'বাব বার তার চোখেব সামনে ভাসছে এমনি একটি ছবি। এমনি, তবে সেটা গাছতলা নয়, ঘরের নিরালা কোণে একটি মানুষীর, দুপুরে অথবা মধ্যরাত্রে শুযে থাকার ছবি। এমনি, কিন্তু বাচ্চাগুলো মানুষের। এমনি, কিন্তু সে তার শিবি, খেপী নয়, তবু খেপী।' অনুমেয সমাপ্তিতেই এ গল্প সম্পন্ন হয়ে ওঠে মানবীয় ঐশ্বর্যে-মাধুর্যে-মমতায়।

'মরেছে প্যালগা ফরসা' গল্পটিব শুরু ও শেষ একটি হিম শীতল কঠিন ব্যঙ্গে ধৃত। যে কথা হয়তো জ্যেষ্ঠ কবি অন্য ভাষায় বলে গেছেন—বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা, এ গল্পটি যেন সে কথাই বলে গেল অরো অরুন্তুদ আকারে। মানুষেব শুভ সংকল্প আন্তর্জাতিক আকাশে বর্ণাঢ্য

ফানুস হয়ে ওড়ে। হাজার বাতি জ্বালানো শহরের উল্টোপিঠে জড়াজড়ি করে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে কতকগুলি ধুলোর ছেলে—যাদের বেঁচে থাকার কথা নয়। এদেরই একজন প্যালগা কদম সা-র দোকান থেকে মুড়ি চুরি করে খেতে গিয়ে মার খায়। ফলে সে মারা যায়। গল্প এটুকু। কিন্তু এই গল্পকথার মধ্যে লেখক নিয়ে এসেছেন প্যালগা আর তার বন্ধুদের নিবিড় সখ্যের আশ্চর্য ছবি। সে ভালবাসায় অবশ্যই মধ্যবিত্ত সৌখীনতা নেই। কিন্তু বাঁচার আবেগে উল্লাসে সে ভালবাসার শক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও বিচার পেলনা নিহত প্যালগার বন্ধুরা। কোনো বন্ধ পালিত হল না তার মৃত্যুর জন্য। শুধু আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের একটি উৎসবকে প্যালগা লজ্জায় আরক্তিম করে দিতে পারল আমাদের কাছে তার মৃত্যুর রক্তে। তবু এই কঠিন হিমেল ব্যাঙ্গের মাঝেও হারিয়ে যায় না সমরেশের মৌলিক প্রত্যয়—মানুষ ভালবাসবেই। বগ্‌গি বলে, প্যালগার মড়াটাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে নইলে কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে। থানায় কদম সা-র ঘোরা ফেরা দেখেই ওরা কি কিছু আঁচ করেছে? সেখানে ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবার কেউ ছিল না। 'বাতাসহীন গুমোটে জিজ্ঞাসাগুলো ওদেরই ঘিরে ভাসতে লাগল। কেবল দেখা গেল লুকা, চেনো, রাম আস্তে আস্তে বন্ধুদের কাছে এগিয়ে এল, আর প্যাল্‌গাকে ঘিরে সকলে একসঙ্গে দলা পাকিয়ে শুয়ে রইল।' এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের কাছে শোকাবহ, কিন্তু প্যাল্‌গার বন্ধুরা জীবনকে নিয়েছে অসামান্য কৌতুক হিসাবে। পুলিশের লোক প্যালগার লাশ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিতেই, খরচা দিতে রাজি হতেই শবযাত্রার অসীম মজা তাদের পেয়ে বসে। নিরুৎসব জীবনে এও এক উৎসব। তাদের সমস্ত শবযাত্রা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের অমূল্য উদ্যমের অসঙ্গতিকে নির্ভুল অঙ্গুলী সঙ্কেতে ধরিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে কোড়ের অশ্রু লবণাক্ত ক্রোধের কান্নাকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের দৈনিকের ক্যারিকেচার বুঝি চরমে পৌঁছল এই শবযাত্রায়।

এভাবে যদি আমরা সমরেশের প্রথম দিকের গল্প 'জলসা', আর শেষের দিকের গল্প খিচা কবলা সমাচার বা প্যালা লেগে যা বা 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' গল্পের তুলনা করি তাহলে দেখব যে লেখকের সামাজিক দায়িত্ব সমরেশ কোন সময়েই বর্জন করেননি। ব্যক্তির গহন নৈঃসঙ্গ্য, তার একান্ত স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান সঙ্কট, এসব নিয়ে তিনি অবশ্যই ভাবিত, তাড়িত ও উদ্দীপিত ছিলেন। কিন্তু সে অভিজ্ঞান সঙ্কটের আবর্তেই তিনি আটকে থাকেন নি। শেষের দিকে ঐ সব গল্পগুলি যখন তিনি লিখছেন তখন আপাতদৃষ্টিতে জীবনযাত্রার দিক থেকে তিনি সমাজের ওপরতলার মানুষ। কিন্তু তিনি যে মূলজনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হননি, জীবনের বাস্তব বেদনা ও ব্যর্থতার মাটি থেকে তাঁর শিকড় যে আলগা হয়ে যায়নি, এই গল্পগুলি তার প্রমাণ। হৃদয়বান লেখক তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুলি একথাও বলে, সে হৃদয়ে একজন বাস্তব মানুষের ক্রোধ, ব্যঙ্গ অভিমানও অভিনব উত্তাপ ছড়িয়েছে। কত ঋজু, কত প্রত্যয় এসব গল্পের বক্তব্য গড়ে তোলার কৌশল বা আঙ্গিকরীতি! কী আশ্চর্য এদের বাচন সারল্য। এবং সব থেকে আসল কথা—এসব গল্প কোথাও আবিষ্কারের অহমিকায় দাম্ভিক হয়নি।

আমার অভিজ্ঞতা কত বিস্তৃত একথা বলার জন্য তিনি কখনো ব্যস্ত হন নি। তাঁর বলার কথা ছিল—আমি কী বুঝলাম, সেটা দেখ।

এখানেই বাংলা গল্প সাহিত্যে সমরেশের নিজস্ব ভূমিকার দীপ্তি। মানুষকে—ব্যক্তিকে বারবার মার খেতে হয়। উপন্যাসে তিনি বলেছেন ব্যক্তির স্বাধীনতার যন্ত্রণার কথা। ছোট গল্পে তিনি বারে বারে জানিয়েছেন ব্যক্তির প্রেমের যন্ত্রণার কথা। একটা জায়গায় গিয়ে দুটো কথাই এক হয়ে যায়। ব্যক্তির প্রেমই তার সব চেয়ে বড় স্বাধীন অনুভূতি। এখানে সে কোনো ছকে বাঁধা নয়—না সমাজ, না পরিবার, না ধর্ম, না নীতি। 'কপালকুণ্ডলা : ১৯৬৮'-র মতো গল্পে

লেখক দেখাতে চেয়েছেন সব ছকের বাইরে গিয়ে মানুষ কীভাবে লড়ে যায়। কোনোপ্রকার নিয়তিকে সমরেশের চরিত্র পাত্রেরা চ্যালেঞ্জের অতীত বলে ভাবে না—তা সে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাই হোক, আর সামাজিক প্রতিকূলতাই হোক। বারে বারে তাঁর গল্পে যে ঝড়ের ইমেজ আসে, রূপকথার অনুষঙ্গ আসে তার মূলেও আছে ব্যক্তির আপোসহীন সংকল্পের প্রেরণা। তোরাপ সে কথাটাই মনে করিয়ে দেয়। সমরেশের ব্যক্তিজীবনের সমস্ত সংগ্রাম যেন তার গল্পের ভিতরে নানা মূর্তি ধরেছে। এ সব কথাই কতদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তিনি এ ভূমিকা লিখলে অবশ্যই তাঁর মতো করে লিখতেন । আমি শুধু বলতে পারি তিনি কী ভাবতেন। জীবনকে তিনি মধ্যবিত্ত মোহ ও ভাবাদর্শের প্রদত্ত চশমা খুলে দেখতে চেয়েছেন। সে রূপ জীবনের আদিম রূপ নয়। তা জীবনের চিরন্তন স্বরূপ। মানুষকে কিছুতেই বন্দী করা যায় না। তাঁর ছোটগল্পের অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে এ কথাটিই নানাভাবে ধ্বনিত হল।

এখন উৎসর্গপত্রের কথা। তাঁর হয়তো কিছু একটা পরিকল্পনা ছিল। প্রকাশক মহাশয় সেটা হয়তো অনুমান করেছিলেন। এই একটি ক্ষেত্রে আমি এবং অশোকরঞ্জন, লেখক এবং প্রকাশকের অস্পষ্ট ও সুস্পষ্ট ইচ্ছাকে অমান্য করলাম। লেখক পত্নী ধরিত্রী বসুর কাছে শুনেছি, গত দুবছর শয়নে স্বপনে জাগরণে—এমন কি ঘুমের ঘোরেও তিনি একটি নাম উচ্চারণ করতেন। তা শুধু আর তাঁর কাছে নামমাত্র ছিলনা। হয়ে উঠেছিল প্রতীক—তাঁর নিজেরই প্রতীক। যখন চিরনিদ্রা তাঁকে গ্রাস করতে আসছে, তখনও সমাচ্ছন্ন কণ্ঠে তিনি সেই নামটি উচ্চারণ করেছেন। আমরা চেয়েছি উৎসর্গপত্র সেই নামটিকে ধারণ করুক—রামকিঙ্কর।

সূচীপত্র

স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প

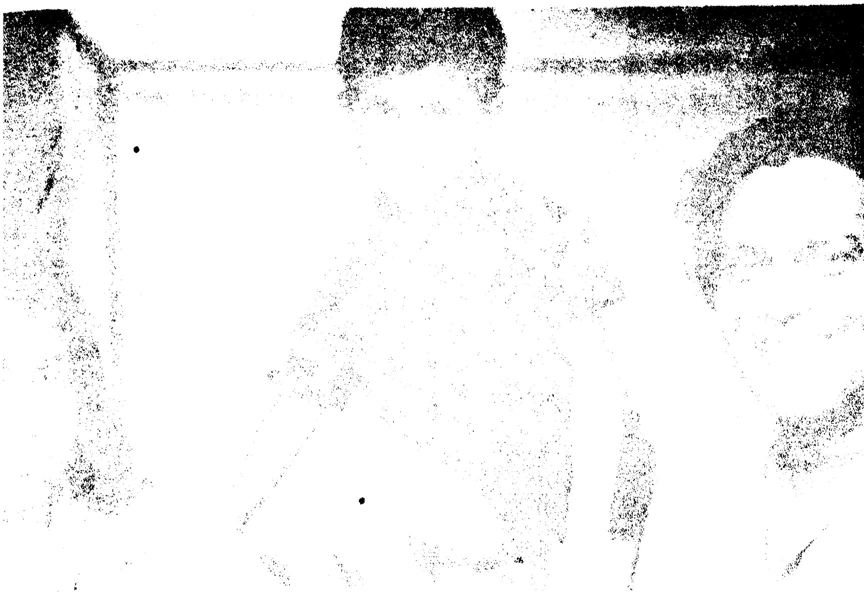


যে বাড়ীতে উনি লিখতেন '১২ সার্কাস রেঞ্জ'







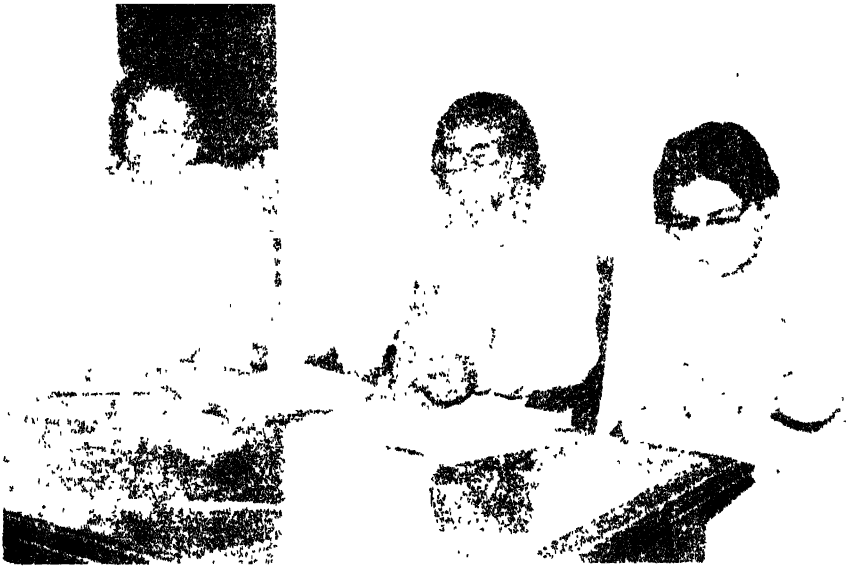


[illegible]



[illegible]

[illegible]





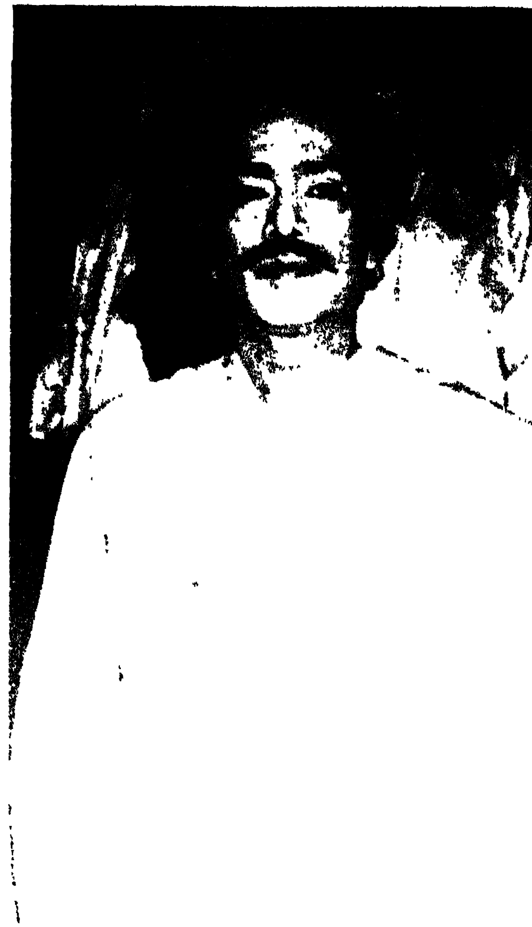




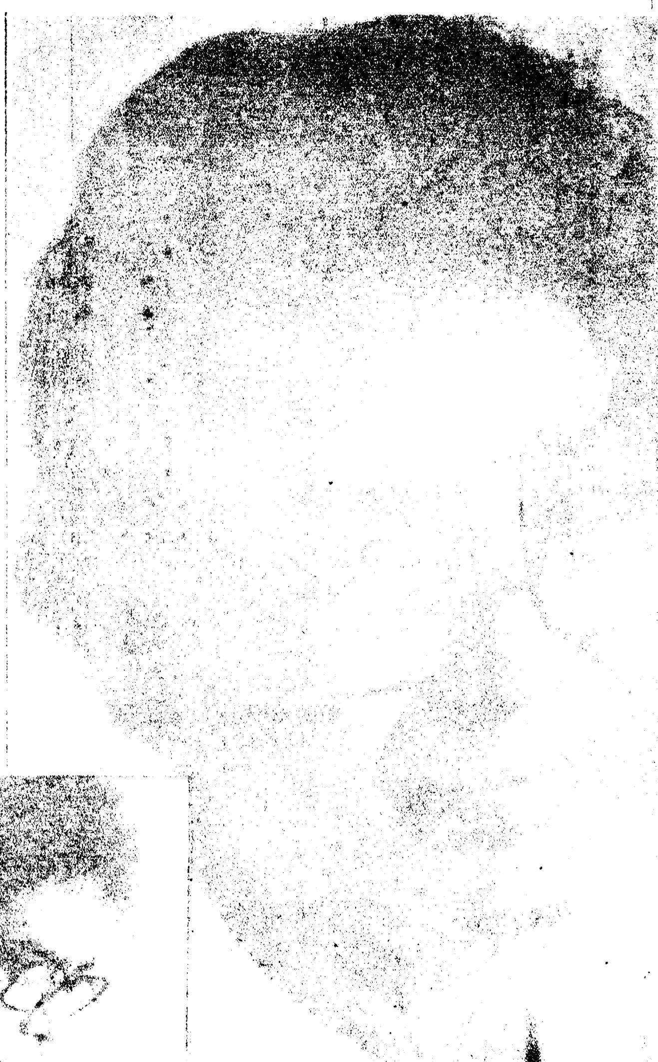


[illegible] ভাষণ দিচ্ছেন সমরেশ বসু
[illegible] ভাষণ দিচ্ছেন











বার বছর বয়সে





জলসা

সকলেই তাকিয়ে দেখছে আব নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

কোম্পানীব লাইনের সামনের ময়দানে একদিন আগে থেকেই তোডজোড় চলেছে জলসার।

বিরাট মঞ্চের ওপব গান্ধীজীর প্রতিমূর্তিওযালা নতুন 'সিন্' খাটানো হয়েছে। সুবৃহৎ সুবর্ণমণ্ডিত পটে গোলাকাব ধাঁধানো আলোর মধ্যে দু'দিকে দু'খানি মুখ। একখানি পণ্ডিত জওহরলাল, অপরটি সর্দাব বল্লভভাই প্যাটেল। একধারে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি। কোষোন্মুক্ত তরবাবি নিয়ে সামবিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। তা ছাড়া খাটানো হয়েছে বহু রকমের ছবি। গান্ধীজী থেকে শুরু কবে অরুণা আসফ আলী পর্যন্ত।

বাবু সাহাব কর্পূর্ সিং দেখা-শোনা কবছেন। লিবাব অপ্সব বোনার্জী সাহাব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছেন কোথায় কী সাজাতে হবে।

আগামী কালকের জলসার প্রস্তুতি হচ্ছে।

লাইনের লোকেরা সব নিজেদেব মধ্যে বলাবলি কবছে—আব দেখছে।

কাজ থেকে ফিরে এসে মৌজ্ করছে সব বসে, আব আগামীকালেব জলসা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

কী হবে না হবে তার না জানলেও জলসা সম্বন্ধে একটা ধারণা তাদের আছে। আর সেই ধারণাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এক একজন এক-একবকম করে বলছে।

মিস্তিবি হারু ঘোষ বুদ্ধিমানের মত সব বুঝিযে-সুঝিযে বলে দিচ্ছে। কী হবে না হবে সে নাকি সব আগে থেকেই জেনে ফেলেছে।

বনোয়ারী পথ-চলা গুটিকয়েক বিলাসপুরী মেয়েকে দেখে গোঁফ পাকাচ্ছিল। মনে মনে খানিকটা রস-সিক্ত কল্পনার আবেগে চাপা গলায় একটা দেহাতি গান গুনগুনিয়ে উঠল সে। মেয়ে ক'টা চলে যেতেই একটা প্রশ্ন হঠাৎ তার মনে এল। জিজ্ঞেস করল, এ মিস্তিরিজী, কাল একঠো নাচওয়ালী ভি আসবে?

জবাব দিল, রামাবতার শালা বুদ্ধুবক হ্যায়। এ ধরম কা জলসা। গান্ধীবাবা কী তস্‌বীর দেখা নেই? কী বোলো মিস্তির ভাই—বাঈজী হিঁয়া ক্যায়সে আসবে?

—তুই ব্যাটার বুদ্ধিই ওরকম। হারু হেসে বলে বনোয়ারীকে—তোকে বাঈজীর নাচ দেখাবার জন্য লেবারবাবু আর বাবুসাহেব খাটছে।

একটা রসালো খিস্তি করে হেসে উঠল হারু।

মুসলমান লাইনটার চা-খানাতেও কথা উঠেছে এই জলসার ব্যাপারেই।

শরীফ মাথার ঝাঁকড়া চুলের গোছা থেকে পাটের ফেঁসো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে—সব্‌হি আদমি যায়ে গা তো, হিন্দু মুসলমান দুনো? কাঁহো সোলেমন্?

সোলেমানও তাকিয়েছিল মঞ্চটার দিকেই। অন্যমনস্কের মত জবাব দিল সে, ক্যায়া মালুম! হোগা সায়েদ্। জলসা তো হ্যায়।

গোলাম মহম্মদের বিবি ঘরের সামনে চটের পর্দাটা সরিয়ে বারে বারে দেখছে মঞ্চটার দিকে—এত্‌না বড়া গান্ধীবাবার তস্‌বীর কখনো দেখেনি সে। কিন্তু লাল লাল ড্যাবা ড্যাবা মাতোয়ালের মত চোখওয়ালা লোকটা খালি তার দিকে দেখছে চা-খানা থেকে। আচ্ছা বেয়াদপ কমিনা আদমি তো!

হাফিজ খানিকটা গুম খেয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে। লেডকাটার বিমাবি আজ তিনমাস থেকে। ডাগদর হেকিম ঘাঁটাঘাঁটি করল নিয়ে অনেকদিন। সারবার নামটি নেই। কাজ থেকে ফিরে রোজানা ওই একই দৃশ্য ঘরেব মধ্যে। তবিয়ত চায় না আর এসব দুখ তখলিফ সইতে। ফের ডাগ্‌দরের কাছে যেতে হবে।—ভাবতে ভাবতে ওঠা আব হয়ে উঠছে না। দাওয়াইয়েব পয়সা নেই। বিরক্ত হয়ে জলসামঞ্চের দিকে ফিবে তাকায সে। খানিকটা গম্ভীর হয়েই ভাবতে হয় তাকে আজাদ হিন্দুস্থানেব কথা। লিবাববাবু জলসা-খাতির কাজ দেখিয়ে-শুনিযে দিচ্ছে। কোম্পানীর লউরী করে জলসার মালপত্র আসছে। খুব ভাবী জলসা হবে সন্দেহ নেই।

বিবির দিকে তাকাল সে। বিবি কটি বানাচ্ছে। তা, বাত্রের অন্ধকারে ঘবের দরজাটা খুলে বসে বিবি জলসা দেখতে পাবে। লেডকাটা খুঁত খুঁত করবে হয়তো। তবিয়ত ভাল থাকলে হাফিজ না হয় একবার গদীতে তুলে নিয়ে ঘুবেই আসবে। খুব ভারী জলসা হবে। লেড়কালোক না দেখলে মানবে কেন। ঘবের সামনে জলসা। তবিযতটা ভাল থাকলে লেডকাটা ফূর্তি করে দেখতে পারে জলসা।

দু'-একটা টাকার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল সে। দাওযাই ঐকটু না আনলে নয়।

ফুল মহম্মদ থেকে থেকে খানিকটা সন্দেহে জলসার দিকে তাকিযে বুড়ো বাপ রহমতকে জিজ্ঞেস করে, ই লোগ্‌কা মতলব ক্যায়া?

তোবা তোবা!—বুডো বহমত বিরক্ত হয লেড়কাটাব এ সন্দেহে! এখন হিন্দুস্থানে লীগ পার্টি নেই, নেই দাঙ্গা। এখন এত সংশয়েব কী আছে?

ফুল মহম্মদ তা জানে। তবে কর্পূর সিং লোকটাকে সে কোনদিনই ভাল চোখে দেখে না. দাঙ্গাব টাইমে গোয়াল-লোকদের ক্ষেপিযে ওই লোকটা দাঙ্গা বাধিয়ে ফেলেছিল আর কি।

তবে জলসা সম্বন্ধে সে বড়ি সজাগ। গাওনা বাজনা চিবকালই সে ভালবাসে। বিশেষ কবে কাওয়ালী। সে নিজেই একজন গাযক। একটা ছোটখাটো কাওযালীর দলও আছে তার।

কিন্তু তাকে কি ওখানে ডাকবে? কেতনা বড়া বডা আদমি, গানেওয়ালা বাবুসাহাবরা আসবে সব! যা-নে দেও, হৈচৈ করা যাবে খানিকটা।

মুসলমান লাইনটার পরেই বিলাসপুবী লাইন। ছুটিব পর রান্নাবান্নার আয়োজন চলেছে সেখানে। বিশেষ করে চলেছে জেনানা লোকদেব প্রসাধন। ভগৎ ওব মেহেবারুকে গদীতে বসিয়ে চুল বেঁধে দিচ্ছে। এটা ওদের বিশেষ কোন রেওয়াজ নয়। তবে চলে এরকম। একটা বিশেষ ধরনের কাপড় পরার ভঙ্গীতে ওদের শক্ত সমর্থ শরীরগুলো আদমিদের কাছে একটা লোভনীয় বস্তুই বটে। মনগুলোও তাই। মহব্বতের ব্যাপারে ওরা ভয়ানক দরাজ। বোধহয়

স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ওরা হার মানিয়েছে মর্দানা লোকদের, তাই ওদের নিয়ে টানাটানি বেশী, কাড়াকাড়ি হয় প্রায়ই।

আসলে ওরা খাটতে পারে খুব আর বেপরোয়াও তাই বেশী। ফলে ওদের মর্দানাগুলো হয় নিরীহ নির্জীব গোছের। শরীরে না হলেও মনে মনে।

ঘরের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারবার দিকে আজ ঝোঁক বেশী ওদের। কাপড়-চোপড় সাফা করতে হবে। জাঁকিয়ে বসে জলসা দেখতে হবে কাল।

চুল বাঁধার পর ভগৎ বাজারে চলল ওর মেহেরোরুর জন্য কাঁচপোকার টিপ্ আনতে। বৈজুর বউ কুন্থি একপাল ছেলে নিয়ে বসেছে খাওয়াতে। তা শয়তানের বাচ্চাগুলো কি খেতে চায়? খালি জলসাব কথাই ওরা বক্বক্ করে চলেছে। কুন্থিকে আবার নাইতে যেতে হবে। হাবামজাদাগুলো খেয়ে না উঠলে খাওয়া হবে না তার। কয়েকবার তাড়া দিয়ে যখন হল না, একটা লকড়ি নিয়ে বড় ছেলেটাকে একঘা কষিয়ে দিল সে। হাঁ, শুধু নাহালে তো হবে না, পুবোনো লাল শাড়িটায খুব হুঁশিযাব করে আবার সাবুন লাগাতে হবে। অমন ভারী জলসাটা দেখতে যেতে হবে তো!

বিধবা ছেদি লাইনের মর্দানাদেব সঙ্গে ইয়ার্কি করতে করতে খিলখিল করে হাসছে আর নিজের বাঁধানো রোয়াকে একটা নতুন শাড়িকে বাসন্তী রঙে ছোপাচ্ছে। হোলী চলে গেলেও প্রাণের উচ্ছলতা আছে। কাপড ছোপানোটা হোলী ছাড়াও চলে তার। তাকে হিংসা করে এই লাইনের আর সব কমিনামাগীগুলো—তা সে জানে। তাই হাসির ঘটা সামান্য কারণে তার ফেনার মত ছিটিযে পড়ে চাবিদিকে। আগামীকাল জলসা দেখবার জন্য শাড়িটা ছোপাচ্ছে সে। একটু বেশী সাজগোজ না কবলে তাব চলে না। সর্দার মিস্তিরিরা তাকেই আবার একটু বেশী কদর করে কিনা। পাটঘরে কাজ কবে সে। পাটঘরেব সর্দার তো ছেদিকে গিলে খাওয়ার জন্য জুলুম শুরু করেছে প্রায়। মর্দানাগুলোব আদেখ্লেপনা আর আহাম্মুকি দেখলে না হেসে পারে না সে। তাই হাসি তার কাবণে-অকারণে লেগেই আছে। আগামীকালের জলসায় লিবারবাবু থেকে শুরু কবে সর্দার মিস্তিরি কুলি কামিনেরা আগে তাকেই দেখবে। সে কথা মনে করে মনের মত করে শাড়ি ছোপায সে। সঙ্গে আবার একটা ছোট্ট হাফশার্টও ছোপায়। জাত তো খুইয়ে বসে আছে সে, একথা সবাই জানে। তাই নাম-গোত্রহীন কুড়িয়ে পাওয়া একটা কালো কুত্কুতে ছেলেকে পোষে সে। সেই ছেলেটার জামাও ছুপিয়ে নেয়। জলসা তো সেও দেখবে।

মনোহরের মেহেরাক পালিয়ে গেছে। সেই থেকে ও একলাই থাকে। বড় ক্ষীণজীবী আর খেঁকুরে সে। ডাগ্দর তাকে দাওয়াই খেতে বলেছিল। খাচ্ছিলও সে। কিন্তু এখন আর খাওয়া হয় না। তখন ওব বহু কাজ করত, পয়সা দিত দাওয়াইয়ের। কিন্তু হারামজাদীর তা সইল না। এমন মর্দানার ঘর ছেড়ে—জোয়ান একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে সে। মনোহর রোজ কাজ থেকে এসে খাটিয়ায় গা ঢেলে দেয়। আজ মাঠের দিকে মুখ করে শুয়েছে সে। জলসার সাজগোজ দেখছে। খুব ভারী জলসা হবে, আয়োজন দেখে বুঝতে পারে। অনেকদিন লোকজনের সঙ্গে মেশামেশি ছেড়ে দিয়েছে মনোহর। কিন্তু জলসার বিচিত্র রংদার সাজানো দেখে কালকে যাবে বলে এনতাম্ করতে থাকে। একটা কটূক্তি করে মনে মনে ভাবে যে সেই রেণ্ডিটাও কাল আসবে হয়তো অর্থাৎ ওর পালিয়ে যাওয়া বউ।—আসুক, কসবীটার দিকে সে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু জলসায় সে যাবে। কেন না জলসার এমন আয়োজন সেই পোন্দ্রা আগস্ট ছাড়া আর হয়নি।

ভারী ভারী আদমিদের তস্বীরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে। গান্ধীবাবা,

জওহরলাল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

সবচেয়ে বেশী খুসীয়ালি ভাবটা বিহারী লাইনে।

ধুলো-মাখা নেংটি পরা একদল ছেলে একটা পুরনো জং-ধরা টিনের ওপর লাঠি দিয়ে পিটছে আর 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গাইছে। আগে ওরা সিনেমার দু'এক কলি গাইত, অথবা রামলীলার-এক আধ কলি। আজকাল গান্ধীবাবার ওই গানটাই সকলে শিখে নিয়েছে। ও ছাড়া গান নেই এখন। কালকে জলসার ওখানে খানা মিলবে, এ আলোচনাও হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। পুরি-তরকারির একটা রসালো আয়োজনের কল্পনায় ওরা ছাগলবাচ্চার মত লাফাতে মশ্‌গুল।

বাট্‌না বাটতে বাটতে বদন জিজ্ঞেস করে শুকালুকে—কাঁ হো শুকালু, গান্ধীবাবাকি তর্পণবে জলসা হো রাহা হ্যায় ?

শুকালু একটু ধার্মিক গোছের লোক। জাতে সে মুচি, তাই ধর্মের গোঁড়ামি তার বেশী। পণ্ডিতের মত গম্ভীরভাবে বলে সে, হাঁ। রোহিতাস্‌কে গানা ভি হোগা। অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের আখ্যান ও গীত হবে। এটা হল শুকালুর পাণ্ডিত্যের আন্দাজি কথা। কারণ রোহিতাস্‌কে গানা অনেকে তার কাছে শুনতে আসে। বদন গোয়ালা হলেও মুচির কথায় তার অখণ্ড বিশ্বাস। রোহিতাশ্বের গান হবে শুনে সে খুব খুশি। ভুলেই গেল যে, এতক্ষণ সে শঙ্কিত চিত্তে সাহুজীর অপেক্ষা করছিল। সুদের টাকা যোগাড় হয়নি। জিজ্ঞেস করল, তুম্ গাওগে ?

শুকালু ঠোঁট কুঁচকে এমন ভাব করল যে তেমন বেতমিজ সে নয়।

কানের পিঠে হাত দিয়ে মহাদেও গান ধরেছে, 'কালী কেলকাত্তামে বৈঠল বারদ্বার ভারতমে।' মা কালী বার বার কলকাতাতেই আস্তানা গড়ে বসলেন, সে কথা শোনাবার জন্যে এ গান গায়নি মহাদেও। তার খুশির কারণ, কাল শুক্ হপ্তার দিন আর জলসা, পরশু শনিচার আধবেলা কাম, তারপর এতোয়ার—জংলা-ঘুমে যাওয়ার দিন। মানে, শহর ছেড়ে মাঠে ঘাটে বেড়াতে যাওয়াকে ওরা বলে জংলা-ঘুমে-যাওয়া। চিরকালের গেঁয়ো মেঠো চাষী সে। নোকরির খাতিরে এখানে এসেছে। তাই এতোয়ার এলেই জংলা ঘুমতে যাওয়াটা তারপক্ষে খানিকটা অভিসারে যাওয়ার মত।

চন্দ্রিকা লক্‌ড়ি কাটতে কাটতে এক-একবার জলসামঞ্চের দিকে দেখছে আর তার জেনানা সুভদ্রার সঙ্গে খাপছাড়া ভাবে দু'চারটে কথা বলছে। সুভদ্রার এখন ভরা পেট। অর্থাৎ অভি লেড়কাহোনেবালী। যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে দরদ উঠে বেঁকে দুমড়ে পড়লেই হল। তাই চন্দ্রিকাই এখন কাজকর্ম দেখাশোনা করে। ওর বহু এই পয়লা লেড়কাহোনেবালী। ভয়ের কারণ তো একটু আছেই, তা ছাড়া চন্দ্রিকার উদাস মনটাও আজকাল একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বেহা হওয়ার বহুদিন পরে ওকে একটা বাচ্চা দিতে তৈরি হয়েছে ওর বহু। আদর আর কৃত্রিম ক্রোধে ধম্‌কে ওঠে চন্দ্রিকা—নেহি। সুভদ্রার এখন ওসব জলসা-উল্‌সা দেখতে যাওয়া চলবে না। জাহ্নবী মাতার ভরা বর্ষার মত পেটের অবস্থা, এখন উজবুকের মত যেখানে সেখানে যাওয়া চলে ?

সুভদ্রা এইটুকুতেই দমে যায়। আসলে চন্দ্রিকা ভয়ানক গোঁয়ার বলে কৃত্রিমতাটুকু ধরা পড়ল না ওর চোখে। মুখ বুজে, আটার ভুসি চালতে থাকে সে, কিন্তু জলসাটা খুব বঢ়িয়া হবে। তার নিজেরও একটা আকর্ষণ রয়েছে সেদিকে। লক্‌ড়ি ফাঁড়তে ফাঁড়তে খুব অবহেলাভরেই আপন মনে বলে সে, অবস্থা সমঝে ব্যবস্থা হবে। নিতান্তই যদি কালকেই সুভদ্রা কাৎ না হয়ে পড়ে, তবে না হয় ভিড় গোলমাল বাঁচিয়ে একবার ঘুরে আসা যাবে।

নারদ ঘরের মধ্যে হাততালি দিয়ে নাচছে। লোকে দেখলে তাজ্জব বনবে তো বটেই, পাগলও মনে করবে নারদকে। ওর বাড়ি হল বিহারের সীমান্তে। আর সীমান্তের লোকেরা সাধারণত বেপরোয়া গুণ্ডা প্রকৃতির লোক হয়। নারদের লম্বা চওড়া চেহারাটা দেখেও সেই রকমই মনে হয়। বিহারীরাও ওকে সেই চোখেই দেখে। নারদ খানিকটা বিদ্রোহী আর রুক্ষ মেজাজের লোক। হাসতে সে জানে না, কথা বলে খুব কম আব আস্তে। ওর প্রতি লোকের ঘৃণা যত আছে, ভয় আছে তার চেয়ে বেশী। বিশেষ করে ওর ওই সর্পচক্ষুকে। চোখের পলক পড়ে না ওর।

কিন্তু নারদও হাসে নাচে গায় বোধহয় আর সকলেব চেয়ে একটু বেশীই। তবে সকলের সামনে নয়। ঘরের মধ্যে, ওর মেয়ে পাতিয়ার সামনে। আজ ষোল সাল মেয়েটাকে জন্ম দিয়ে বহু মরেছে। আর সাদী করেনি সে। একমাত্র মেয়েটার জন্যেই। পূর্বজন্মে রামজীর কাছে কী পাপ করেছিল সে কে জানে, তার লেড়কীটা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিয়েছে। কোমর থেকে মাথা অবধি অপূর্ব সুগঠিত চেহারা পাতিয়াব। ষোল বছবের উচ্ছল যৌবন সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। কিন্তু কোমবের পব থেকেই কোন পিশাচ দেবতা যেন সব চেঁছে নিয়েছে। ঠ্যাং দুটো নেমেছে ঠিক পাকানো দু'গাছি দড়িব মত। লতানো দুমড়ানো লিকলিকে। মুখ দিয়ে হববখত নাল কাটে। নড়তে চড়তে পাবে না, কথা বলতে পাবে না। সারাদিন ঘরে পড়ে থাকে। বাপ এলে তার অদ্ভুত শিশুসুলভ মুখটিতে অপূর্ব হাসি ফুটে ওঠে।

কালকে জলসায় নিযে যাবে একথাটা অনেকবার বলবাব পর একটু সমঝে পাতিয়া যখন হেসে উঠল তখন নারদও উঠল নেচে।—অর্থাৎ আমবা বাপ বেটিতে মিলে কাল খুব ফুর্তি কবব। বলে ছ'মাসের বাচ্চার মত টুক্ করে পাতিয়াকে কোলে নিয়ে একটু আদর করে তাকে রোয়াকে বসিয়ে দিয়ে বালতি নিয়ে নারদ জল আনতে যায়। পাতিয়া একমুখ গড়ানো নাল নিয়ে হাঁ কবে চেয়ে থাকে জলসা-মঞ্চটাব দিকে।

নারদের মনে পড়ে, পাতিয়াকে নিয়ে নিতে চেয়েছিল এখানকার ধনী মহাজন শয়তানের রাজা ওই সাহুজী। অত্যন্ত ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সে প্রস্তাব। কথাটা শুনে কেউ বলেছিল—সাহুজীর নাংগা ফকির দিয়ে ভিখ্ মাঙ্গা দলের ব্যবসা আছে। সেই জন্যই ও পাতিয়াকে চায়। আবার কেউ কেউ বলেছিল আসলে সাহুজীর মত বিদ্‌ঘুটে শয়তান পাতিয়াকে বস্তুব মত ঘরে নিযে রাখতে চায়। নারদের ইচ্ছা হযেছিল হাতুড়ি দিয়ে বেতমিজ কমিনাটার মাথাটা টুটাফাটা করে দেয়। তার বড় আদরের, বড় বেদনার লাল ওই পাতিয়া। তার দিল দরদ সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওই পাতিয়াকে ঘিরে। জলসার বঢ়িয়া আয়োজন দেখে ভারী খুশি সে। নাল মোছার গামছাটা এক কাঁধে আর পাতিয়াকে আব এক কাঁধে নিয়ে সে যাবে কাল জলসা দেখতে। ভারী খুশি হবে পাতিয়া।

বিহারী লাইনটার পরে মাদ্রাজি লাইন।

কাঁচাহলুদ-মাখা মুখে মেয়েদের আর মুখে চুরুট-গোঁজা পুরুষের ভিড় এখানে। লাইনের নর্দমার দশ বারোটি ছেলেমেয়ে সারি সারি বসেছে মলমূত্র ত্যাগ করতে আর আলোচনা চলছে জলসার।

জোয়ানের দল নিজেদের তেলুগু ভাষায় কালকে সীতা উদ্ধার নাটক করবে ভেবেছিল। কিন্তু জলসার আয়োজন দেখে বন্ধ করে দিয়েছে। নাটক মানে শুধু গান। মুখে রং মেখে রাম, সীতা, রাবণ ইত্যাদি সেজে যে যার ভূমিকায় খানিকটা হম্বিতম্বি করবে আর ঘুরে ঘুরে গান করবে। কিন্তু জলসার ব্যাপারেই আজ তারা মেতে উঠেছে বেশী। ওদের মধ্যে আপ্পারাওয়ের

গুল ওড়াতে ওস্তাদির খ্যাতি আছে। জলসা সম্বন্ধে নানান্‌রকম কথা শুনতে শুনতে খুব গম্ভীর হয়ে বলে ফেললে সে যে, বাবুসাহাব অর্থাৎ কর্পূর সিং কালকে তাকে জলসার রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধাখ্যানটুকু গান করতে বলেছে। আপ্পারাওয়ের বউ সরমা আবার এসব ঝুটা ইয়ার্কি বুঝতে পারে! সইতে পারে না। সে বসে বসে বাসন মাজছিল। হঠাৎ তার ঠোঁটের উপর ঝুলে পড়া নাকের প্রকাণ্ড নথ নেড়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, এঃ বাবুসাহাব আর লোক পেল না

স্বভাবতই ইয়ার-আদমিদের সামনে স্বামীত্বের অপমান বোধে রাম-রাবণের যুদ্ধের পালাটা ওদের স্বামী-স্ত্রীতেই শুরু হয়।

থামাবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অনুরূপ অবস্থা পাশের লাইনে উড়িয়াদেব মধ্যেও শুরু হয়েছে।

উড়িয়া লাইনের বিশেষত্ব এখানে মেয়েমানুষ নেই। কারণ ওরা বলে, বিদেশ মুলুকে মেয়েমানুষ আনলেই নাকি খতম।

ঝগড়া লেগেছে অর্জুনেব সঙ্গে গৌবাঙ্গেব। থামাবার চেষ্টা করছে জগন্নাথ। অর্জুন বলেছে ভুবনেশ্বরের যে জলোসা হয়েছিল, তা এব চেয়ে ভাল—কারণ অর্জুনের দেশ ভুবনেশ্বর। তাই ভুবনেশ্বরেব চেয়ে এ জলোসা অনেক ভাল। নইলে বাবুসাহেব আব লিবাববাবু সাদা টুপি মাথায় দিয়ে খাটতে আসিল কাঁই?

এদের দ্রুত কিচিরমিচির সত্ত্বেও সামনেই বসে বহুকষ্টে কেনা শখেব বস্তু হারমোনিয়ামটা কোলে কাছে নিযে মাধব তাবস্বরে গান ধরেছে—নন্দেব নন্দন বঙ্কাকোঁ বাই। মনে তার বহু দুর্ভাবনা। দেশ থেকে চিঠি এসেছে, এ-দফায় বেশী টাকা না পাঠাতে পারলে মহাজনের ধার শোধ হবে না। জমি বে-হাত হর্তে পাবে, তবু আজ জগবনাথের মন্দিরেব মত জবরজং জলসামঞ্চ দেখে হাবমোনিয়াম নিয়ে বসেছে সে। কিন্তু গান থেকে নিরস্ত হতে হল তাকে।

কারণ, গৌবাঙ্গ ঠাস কবে একটা চড় কষিযেছে অর্জুনের গালে। আর অর্জুন 'সড়া' বলে হুঙ্কার দিয়ে একটা চেলা কাঠ কুড়িযে নিযেছে।

ক্রমশ অন্ধেরা ঘনিয়ে এল, আর অমনি যাদুই-নগরীব মত লাইনের ময়দানটা দিন মাফিক আলোয় উঠল হেসে। বাতভর কাজ হবে তা হলে আজ? জলসা সম্বন্ধে এবার সবাই আবও থোড়া বহুত সজাগ হযে উঠল। কারখানার মানিজাব সাহাব এল মেঘসাহা আর বাবাকে (ছেলেকে) সঙ্গে নিয়ে।

হাত নেড়ে বুঝিযে দিতে লাগল লিবারবাবু আর সাহাব মাথা নেড়ে নেড়ে 'বুলাড়ি ডাম্ গুড' 'বহুট্ আচ্ছা' প্রভৃতি বহুৎ খুসিয়ালী বাত করতে করতে হাসতে লাগল। সাহাব আর লিবারবাবুর হাসি দেখে লাইনের খানিকটা ডর তাজ্জবে ঘাবড়ানো মুখগুলোতেও দেখা দিল হাসি। সকলে তাজ্জব মানল তখন—যখন মানিজার সাহাব বাবুসাহাব কর্পূর সিংকে দেখে চিল্লিয়ে 'জোয়হিন্দ' বলে সালাম দিল, হাঁ, সাহাবকেও জয়হিন্দ বলতে হয়।

হাঁ হাঁ আপনা কাম মে শুনা হম্। বলে এ ওর কাছে বটি একটা বাহাদুবি নেওয়ার ফিকিরে বুক ঠুকতে লাগল।

তারপর রাত্রি তার দুনিযায় ক্লান্তি নির্মে ঘুম হয়ে নেমে এল লাইনের বুকে, এখানে সেখানে মারীবীজের মত লাইনের আনাচে কানাচে খাটিয়ে আর চাটাই-ভরতি মানুষ। তবু এরই মধ্যে বহু প্রবৃত্তির খেলা। হাসি, কান্না, গান। এ দুর্বিষহ গুমোট আলো বাতাসহীন পায়রার মত খোপগুলোতেও নরনারীর আদিম প্রবৃত্তির উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে তবু। অবিকল দুনিয়ার যান্ত্রিক গতির মত।

পরদিন বিহানে কাজে যাওয়াব সময় সবাই তাজ্জব। হাঁ জলসামঞ্চ বটে! মঞ্চের চার তরফ ঘিরে সাদা আর গৈরিক টোপি শিরে চড়িয়ে ফৌজী কুচকাওয়াজের মত স্বেচ্ছাসেবকেব দল 'ডাইনে ঘুম্, সামনে চলো' করছে। বাবুসাহাব কর্পূব সিং, মজদুব লিডর বাবু রঘুনাথ রাও সব বড়ে বড়ে আদমি এসেছে।

খুব ভারী জলসা হবে—হাঁ। ন জানে ক্যায়া হো রাহে। এমনি একটা সশ্রদ্ধ মুখভাবে ছেদ তার কুড়ানো লেড়কাটাকে ছ'টা পযসা দিয়ে বলে, যা, চা-উ' পি'লে। কাঁহি যানা মৎ। বলে কারখানায ঢুকে পড়ল।

কুনথি জলসা-মঞ্চের বংদাবি আব কুচকাওযাজ দেখতে দেখতে কাবখানার গেটে দাঁড়িয়ে কোলেব বাচ্চাকে অন্যমনস্ক ভঁইসেব মত মাই খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎ একদম লাস্ট বনশী (ভোঁ) বেজে উঠতেই সামনেই বড় লেডকাটার কাছে তাকে ছেড়ে দিযে কারখানায ঢুকে পড়ল।

শালা কুত্তাকো বাচ্চা। দাঁতে দাঁত ঘষল নাবদ- -বাবুসাহেবের সঙ্গে সাহুজীকে দাঁত বের করে রঙ্গ করতে দেখে। পরমুহূর্তেই জলসাব আয়োজন দেখে চিরকালেব গোমড়া মুখে হেসে বলে পাশেব লোককে, হাঁ, ইয়ে হ্যায় জলসা।

আপ্পারাও আর সরমা তো দাঁড়িয়েই পড়ল ফৌজী-কুচকাওয়াজের রকম দেখে।

আবে বাপ্প! এর বেশী আব অর্জুনের মুখ দিয়ে বেরুল না।

খানেকা টাইমমে (টিফিনে) দেখা গেল একটা যন্ত্র মুখেব কাছে নিয়ে মঞ্চের ওপর থেকে একজন অচেনা আদমি চিল্লাচ্ছে—বান, টু, থিবি, ফোব । আব সে কথাগুলো চতুর্গুণ জোরে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

কাঁহা কাঁহাসে বহুত আদমি এসেছে। প্যাঁ পোঁ স্বেচ্ছাসেবকেব দল একটা তামাব মোটা বাঁশী বাজাচ্ছে আব ঘুবে বেড়াচ্ছে ফৌজী কাযদায়।

উৎসবের উল্লাস জমাট বেঁধে উঠেছে প্রতিমুহূর্তে।

কিন্তু বেলা তিনটের সময় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণেব মত কারখানার ভেতর সহস্র গলার একটা উত্তেজিত গর্জন ফেটে পড়ল।

আভি জল্সা শুরু হো রাহে। সেই সময় জলসা-মঞ্চ থেকে মোটা গম্ভীর গলায় এল ঘোষণা। তাবপর জলসাব প্রাথমিক কাজ শুরু হয। পাঁড়েজী ফুল বেলপাতা নিয়ে গান্ধীবাবার পায়ে দিয়ে প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণ আবম্ভ করে। ধূপ আর কর্পূরের পবিত্র গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠল চারো তরফ্। করুণ কণ্ঠে গীত ওঠে—হ্যায় বাপজী তুঁ কাঁহা চলা গ্যায়ে। ...

এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই কাবখানার ভেতর থেকে কেমন একটা আক্রমণাত্মক ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো ভেসে এল।

কী ব্যাপার—

মানিজার সাহাবকে ঘেরাও করছে কুলি-কামিনের দল!

—মগর কাঁহে?

লিখা-পড়ি নেই, বাত্-পুছ নেই, হাজারো আদমিকে বুদ্বক বানিয়ে দিয়ে হঠাৎ মালিক লোটিশ ছেড়ে দিল, এগার শো আদমি ছাটাই হল। কারণ, কয়লা নেই, মালিকের অর্ডার নেই, কাম্ নেই। বেকার আদমি রেখে নাফা কী আছে?

পয়লা ছেদিই হাতের রূপোর ভারী মোটা কঙ্কণসুদ্ধ ঠাস করে কষালে এক ঘা সাহেবের কপালে।—আরে এ কম্নিা, তোমার নাফা দেখ্তা, হাম ক্যায়া রেন্ডি বনে গা?

কার একটা খইনির ডিবা এসে পড়ল সাহাবের লাল টুকটুকে নাকের ডগায়।

বাইরে থেকে জলসার মিষ্ট বাদ্যধ্বনি ভেসে এল। তার সঙ্গে গান্ধী মহারাজ কি জয়ধ্বনি।

মানিজার সাহাব খোড়া কিছু বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেতমিজ কুলি কামিনদের হল্লায় ডুবে গেল তা। শেষটায় সাহাব বেশ খানিকটা জোরে হেঁকে উঠল, শুনো, হাম্ বোলটা হ্যায়, জোয়হিন্ড।

—তেবি জোয়হিন্ডকে—গোঁয়ার চন্দ্রিকা একটা খিস্তি করে রুখে এল। সেই মুহূর্তেই ঘটল পুলিশের আবির্ভাব। প্রাণ ফিরে পেল মানিজার সাহাব। থানার বড়বাবু এসে ম্যানেজারকে আগলে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, তুম লোক যাও, ছুটি হো গযা।

কেউ কেউ কাঁচা খেউড় করে উঠল, সাড়ে চার বাজে তাবা ছুটি চায় না, পাঁচটায তাদেব ছুটি—রোজ যেমন হয়।

আপ্পারাওয়েব বহু সরমা হঠাৎ বাঘিনীব মত ঝাঁপিযে পডল বডবাবুব ওপর।—রেন্ডিকে বাচ্চা, দালালি করনে আয়া?

অকস্মাৎ এ-বকম একটা আঘাতে বডবাবু টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতেই হীবালালেব মেহেরাবুর পায়ের মোটা বাজুসুদ্ধ ধাঁই করে কষালে তাব মুখে এক জবরদস্ত লাথ।

জলসা-মঞ্চের সেই যন্ত্রটা থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আপলোক চিল্লাইযে মৎ, আভি গান্ধীবাবাজী-কহানি শুরু হো বাহে। শান্ত রহিযে আপলোক।

—বেয়নেট চার্জ কব ব্যাটাবা। ককিযে উঠল বডবাবু।

হুকুমমাত্র সশস্ত্র সিপাহীলোক ঝাঁপিয়ে পডল খোলা কিরীচ নিযে কুলি কামিনীদেব ওপব। হট যাও, হট চলো!

হটাতে হটাতে সবাইকে নিযে এল একদম লাইনকে অন্দব। তাবপব চাবদিক থেকে ঘিবে ফেলল লাইনটাকে সশস্ত্র সিপাহীদল। লাইন ঘিরে তৈরি হল এক অচ্ছেদ্য ব্যূহ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। জলসা-মঞ্চের চার তরফে আলোকমালা হেসে উঠল। মঞ্চেব উপর দাঁড়িয়ে মজদুর লিডার বাবু রঘুনাথ বাও গান্ধীবাবার কাহিনী বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

সিপাহী-ব্যূহটাব ভেতর থেকে লাইনের মানুষগুলো কেমন বোকার মত ডব পুকে হাঁ করে চেয়ে আছে মঞ্চটার দিকে। হাঁ বহুত ভারী জলসা হচ্ছে। পুবিও ভাজা হচ্ছে, ঘিউর মিঠা বাস এসে লাগছে ওদের নাকে।

রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই নিঃশব্দে একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল লাইনের সামনে, তারপর বেছে বেছে লোক ওঠানো হতে লাগল তাব মধ্যে। চন্দ্রিকার বহু প্রসব-বেদনায় এলিয়ে পড়েছে রোয়াকে। চন্দ্রিকাকে তখন সিপাহীরা জোব করে ঠেলে তুলে দিচ্ছে গাড়িটাব মধ্যে।

গান্ধীবাবার কহানী শেষ হতেই জলসা-মঞ্চ গীত-উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। আলো ঝলমলে উৎসব।

লাইনের মানুষগুলো যেন কী এক বিভীষিকা দেখছে—এমনি বড় বড ভয়ার্ত চোখে একবার জলসা-মঞ্চ আর-একবার কালো গাড়িটাকে দেখতে থাকে।

চন্দ্রিকা, হীরালাল, ফুলমহম্মদ, বৈজু, আপ্পারাও, হাফিজ, ·· সবাইকে ঠেলে ঠেলে ওঠাতে লাগল সিপাহীরা সেই গাড়িটার মধ্যে।

নারদ টুক্ করে পাতিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে টাট্টিখানার পেছন দিয়ে মলমূত্র মাড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। এসে উঠল একেবারে সাহুজীর মোকামে। সাহুজী চশমা চোখে দিয়ে টাকা-পয়সার হিসাব কষছিল। হঠাৎ চমকে তাকাতেই দেখল পাতিয়াকে কোলে নিয়ে নারদ এসে হাজির। নারদ পাতিয়াকে সাহুজীর সামনে রেখে দিয়ে বলে উঠল, লে লেও পাতিয়াকো।

সাহুজী আর পাতিয়া সমান বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল নারদের দিকে। পরমুহূর্তেই হোহো করে হেসে উঠল সাহুজী।—হাঁ হাঁ, মালুম হো গিয়া, মালুম হো গয়া। ঠিক হ্যায়! বলে লোলুপ দৃষ্টিতে পাতিযার সুগঠিত উর্ধ্ব দেহটাকে চোখ দিয়ে গিলে খেতে লাগল সে, উগ্র লোভানিতে জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল তার শকুনের মত চোখ দুটো পাতিয়ার বুকটার দিকে চেয়ে। নারদের দম বন্ধ হযে এল, রক্ত বেরিযে আসবার উপক্রম হল চোখ ফেটে। বলল, উস্‌কো দুবেলা পেট ভরে খেতে দেও, ব্যস্ ঔর কুছ নেহি।

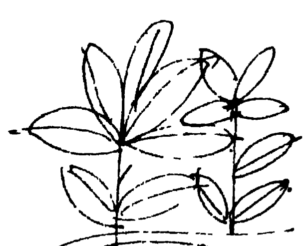
এতক্ষণে বিস্ময় কাটিয়ে সাহুজীর চোখ দেখে পাতিয়ার মনে একটা ভীষণ সন্দেহ হয। মুখ দিয়ে লাল আর চোখ দিয়ে জল একসঙ্গে গড়িযে এল তার। কথা বলতে পারে না। একটা জানোয়ারের বাচ্চার মত নারদের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে আঁউ আঁউ করে উঠল সে।

ছিনাটা ফেটে যাবার মত হল নারদের। কানে আঙুল দিয়ে ছুটে বেরিযে এল সে সেখান থেকে।

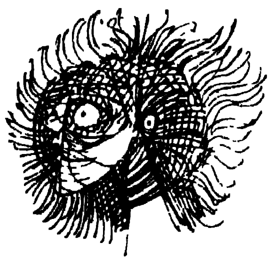
একটা আচমকা গর্জন করে আবার নিঃশব্দে মানুষ ভরতি কালো গাড়িটা লাইনের সামনে থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

জলসা-মঞ্চে তখন গীতমঞ্চে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়েছে। গায়কেরা যেন ক্ষেপে গেছে। বাবু রঘুনাথ বাও ঢোলক পিটছে, বাবুসাহাব গান করছে, আর সবাই দোয়ারিক টেনে চলেছে—'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' অচেতন খ্যাপা অবস্থায় মঞ্চ কাঁপিয়ে সবাই গেয়ে চলেছে।

ছেদিব সেই কুড়ানো কালো কুতকুতে ছেলেটা অন্ধকারে নারদকে চলতে দেখে বলে উঠল, হাঁ, বহুত ভারী জলসা হোতা হ্যায়। বড়িয়া জলসা!



আইন নেই



বাসকের ঝাড়টা যেখানে সুনিবিড় হয়ে ঘন অবণ্যেব বূপ ধরেছে, যেখানে বড়-বড় গাম্বিল আর মুচকুন্দ চাঁপাগাছ কয়েকটাব কোমর-ধরা ধুতুবাব বন বিস্তৃত, সেখানেই ঝোপের একটা ফাঁকে লক্ষ্য করলে, খুব ভাল কবে লক্ষ্য কবলে, সেই অপলক চোখ দুটি দেখা যায়। সেই রক্তাভ ছোট গো-সাপের মত পলকহীন তীব্র চোখ দুটি। আব ঠিক তার একটু নিচেই প্রায় এক ইঞ্চি গোল লোহার নলটাও দেখা যেতে পাবে। ঐ নলটার সরু গর্তের দূর অন্ধকারে যেন ভয়ংকর একটা কিছু লুকিয়ে আছে মনে হয়। যাব লোলহীন জিহ্বা কয়েকবার নলের মুখটা লেহন করে কবে পোড়া পাঁশুটে দাগ ধবিযে দিয়েছে।

আর হাল্কা হলেও বারুদের ঝাঁজালো গন্ধ যেন লেগে বযেছে বাসক ও ধুতুরার লেপটালেপটি ঝাড়ে।

জায়গাটা একটি গ্রামের প্রায় শেষ, আর মাঠেব প্রায় শুরু। পশ্চিমে আশেপাশে আম-জাম-নারকেল ছাড়াও নানান গাছের ভিড় আসসেওড়া-কালকাসুন্দি-বাসক-ধুতরার জঙ্গল। কাছেই একটা পুকুর দক্ষিণ ঘেঁষে। আব পুবদিকে দিগ্‌বিসারি শস্যের ক্ষেত।

মাঘ মাস। বেলা এগাবোটাব বোদে এখনও সোনাব আভাস। চকচকে নীল আকাশের তলায়, সুদূর দিকচক্রবালে গিয়ে ঠেকেছে রবিশস্যের সবুজ মাঠ। মুক্ত অবাধ একটি মাঠ যেন ঠিক স্বপ্নের মত দিগন্ত ছুঁয়ে পড়ে আছে। তবু কি একটা আশঙ্কায় যেন তার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, শিউরে সচকিত হয়ে উঠছে।

সূর্য ক্রমেই মাঝ-আকাশে উঠতে লাগল। ছায়া ক্রমেই ছোট হতে লাগল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড়ে সেই গো-সাপের মত অপলক চোখেব পলক পড়ল না। তীক্ষ্ণ হল আরও। আরও সতর্কভাবে চারিদিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে এল। পোড়া পাঁশুটে অন্ধকার নলটা নিঃশব্দে রইল প্রতীক্ষা কবে।

পুকুরে এসে মেয়েবা জল নিয়ে গেল। হেসে হেসে অনেক কথা বলে চান করে গেল। দুজন কিষাণ এসে দাঁড়াল বাসক-ঝাড়ের সেই নলটাব মুখ বরাবর। কি যেন বলাবলি করল, তারপর চলে গেল মাঠের দিকে। একটু পরে সেখানে এসে দাঁড়াল একটি আদিবাসী যুবতী মেয়ে, কৃষ্ণমজুবণী। তাব পিছন পিছন একটি লোক। গলায় কন্ঠি, গায়ে ফতুয়া। দোকানদার কিংবা মহাজন হবে।

মেয়েটার চোখে ভয়। ভয় চাপার হাসিটাও আছে ঠোটে। মেয়েটা সরে দাঁড়াল পথ ছেড়ে, বাসকের ঝাড়ে প্রায় নলটা ঘেঁষে। লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটার মাথা নিচু। লোকটা চোখ দিয়ে যেন চাটছে ওর পুষ্ট শরীরটা। লোকটা বলল, কি হল্য, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

মেয়েটা ভীরু চোখে গ্রামের পথের দিকে দেখল তাকিয়ে। কেউ নেই। তবু সরোষেই বলল, তু যা না।

লোকটা লাল দাঁত বের করে হেসে বলল, আমি তো যাবই। তুই যে বাজারে যাচ্ছিলি? চল?

মেয়েটা তবু বলল, তু যা না কেনে?

—আমি তোর সঙ্গেই যাব! বলে পকেট থেকে দুটি টাকা বের করল। বলল, নে, তেল কিনিস সাবান কিনিস। লাগলে আরও দেব'খনি ··

ততক্ষণে মেয়েটা হন্‌হন করে গ্রামে ঢোকার পথ ধরেছে।

লোকটাও পিছন নিতে গিয়ে থমকে গেল। চিৎকার করে ডাকল, এই এই রে, অই ছুঁড়ি, শোন্ না গো!

মেয়েটা প্রায় ছুটতে ছুটতে গ্রামে ঢুকে গেল। লোকটা দাঁতে দাঁত ঘষে টাকা দুটি পকেটে রাখল। বলল, উঁহুঁ! ছুঁড়ির দেমাক দেখ্যে বাঁচি না। বলে, তোর মত কত এল, কত গেল। বলে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড় অনড়। রক্তাভ পলকহীন চোখ দুটি, চলে-যাওয়া লোকটার দিক থেকে মাঠের ওপর গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই একটি আমগাছের পাতা নড়ে উঠতেই চোখ দুটি সেদিক গেল। দুটো ডাকপাখি উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক উড়ে এসে বসল বাসক-ঝাড়টার কাছে। বসতে না বসতেই হঠাৎ যেন কি টের পেয়ে থমকে গেল সবাই। বোধ হয় বারুদের গন্ধটা টের পেল। কিংবা আগুনের ঝাপটা-খাওয়া মারণ-নলটা পেল দেখতে। চোখের নিমিষে উড়ে গেল সব। মুচকুন্দ চাঁপার মাথায় মরশুমের অগ্রিম কোকিল একটা সবে ডাক ছেড়েছিল। সেও পালিয়ে গেল। আবার নিস্তব্ধ ঝিঁঝির ডাক।

সূর্যটা টাল খেয়েছে পশ্চিমে। হঠাৎ অনেকগুলি ছোটবয়সী ছেলের চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা গ্রামের ভিতর থেকে ছুটে আসছে এই দিকেই।

বাসকের ঝাড় এবার দুলে উঠল। সে চোখ দুটি নিয়ে একটা মুন্ডু উঠে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। আর নলের পিছনে, লোহার বাঁকা আংটায় মোটা তর্জনী বসেছে চেপে। নজর ওঠানামা করছে মাটিতে ও গাছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একটা বক্‌নার পিছনে ছুটেছে একদল ছেলে। ছুটতে ছুটতে চলে গেল বাসকের ঝাড় ঘেঁষে।

ঝোপের ভিতর থেকে অপলক রক্তাভ চোখ আর নল দুই-ই বেরিয়ে এল এতক্ষণে। একটি লোক, হাতে গাদা-বন্দুক। চেহারা দেখে লোকটির বয়সের হিসাব পাওয়া দুরূহ। সেই সঙ্গে বন্দুকটারও।

এক রকমের লোক আছে, কখনো মোটা হয় না কিন্তু সুস্থ এবং শক্ত, লোকটিও সেইরকম। রোগা, লম্বা কিন্তু শক্ত। শুধু হাড়ের উপর চামড়া মনে হলেও, সে হাড় চওড়া। এবড়ো খেবড়ো একটি লম্বা কাল রঙের পাথরের মত শরীরের গা বেয়ে মোটা মোটা স্ফীত শিরাগুলি হাত-পায়ে-কপালে যেন শিকড় ছড়িয়েছে। চেহারাটি তাতে রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর মনে হয়। মাথার চুল শক্ত খোঁচা-খোঁচা, উস্কো-খুস্কো, তেল পড়েনি বোধ হয় অনেক দিন। চোখ দুটি প্রায় গোল,

ছোট। হয়তো রাত জাগতে হয়েছে, তাই লাল। লাল আর সাপের মত অপলক শুধু নয়! একটি তীক্ষ্ণ শ্বাপদ অনুসন্ধিৎসায় যেন সব সময় চক্‌চক্ করছে। তার সঙ্গে খাপ খেযে গেছে তার চ্যাপ্টা নাক আর স্ফীত পাটা। যেন পাটা ফুসিয়ে সবসময়েই কিছু শুঁকে বেড়াচ্ছে।

এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ির সঙ্গে হাত-ছেঁড়া হাফশার্ট। সেইটি যেমন তেলচিটে,তার ওপরে মান্ধাতার আমলের বগল-কাটা সোয়েটারও তেমনি। তেলচিটে তো বটেই, রঙটা যে কিসের বোঝবাব সাধ্য নেই। ময়লা কাপড়টা হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে। কোমরে অন্ততঃ গুটি দুয়েক মাঝারী পুঁটলি ঝুলছে। তার ওপ৯ দিয়ে একখানি শুকনো গামছা জড়ানো।

বন্দুকের বাঁটের কাঠের একটি কোণ ভাঙা। ব্যাবেল অর্থাৎ নলটিতে মরচে-পড়া দাগ দেখা যায়। একটি পাটের দড়ি দিয়ে কাঁধে ঝোলাবার বেল্টের অভাব মেটানো হয়েছে।

ঝোপের বাইরে এসে প্রথমে তার লক্ষ্য পড়ল, গামছায় পিঁপড়ে ধরেছে। লাললাল বিষাক্ত পিঁপড়ে। বোধ হয় কামড়েছেও কযেকটামুখের বিরক্তি ও যন্ত্রণা দেখে তাই মনে হয়। তাড়াতাড়ি গামছা খুলে, কোমর থেকে একটি ছোট পুঁটলি বাব কবলে। বলল, উরে শালা।

ওই পুঁটলিতেই পিঁপড়ে ধরে আছে। পুঁটলি ঝাড়া দিল। একটা উৎকট পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

আবার বলল মোটা ঠোঁট কুঁচকে; বড় নোলা না?

হবারই কথা। কারণ, ওরকম গন্ধজাত কোনো দ্রব্যে পিঁপড়েদের একটা একচেটিয়া অধিকাব মানবজাতি মেনেই এসেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য অনধিকার চর্চাটাই ধরা পড়েছে, নইলে এরকম টিপে টিপে পিঁপড়েগুলিকে মারবে কেন লোকটি?

পিঁপড়েগুলি মেরে পুঁটলিটা আবাব সযত্নে কোমরে গুঁজল সে। দেখা গেল পুঁটলি দুটি নয়, তিনটি। একটি বেশ বড়। সেটি কোমরে ঝুলছে। আসলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে কাঁধে, যে কাঁধে দড়িতে ঝোলানো আছে বন্দুকটা।

আর একটি ছোট পুঁটলিতে হাত ঢুকিযে, একমুঠো চিঁড়ে বার করে মুখে ফেলল লোকটা। আবার পুঁটলি হাতড়ে হাতড়ে ছোট এক টুকরো পাটালি গুড় তুলে কামড়ে নিল একটুখানি।

তারপর চিঁড়ে চিবোতে চিবোতে চারপাশে সে বারকয়েক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল। মাঠের দিকে গিয়ে, এইভাবে চারদিক দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ চিঁড়ে চিবিয়ে নিল পাটালির টাক্‌না দিয়ে। আপন মনেই বলল, গেল কই?

তারপর এগিয়ে গেল সোজা দক্ষিণ দিকে। ওই রকম সতর্ক তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে দেখতে, লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলল।

পথে লোক প্রায় নেই। এই সময়টাই পাড়াগাঁয়ের ঠিক দুপুর। সূর্য বেশ খানিকটা হেলে পশ্চিমে। অচেনা দু' একজন যারা দেখল, তারা তাকিয়ে রইল হাঁ করে। আধাচেনারা বলল, সেই লোকটা না?

একজন চাষী গোরু নিয়ে ফেরবার পথে দাঁড়িযে জিজ্ঞেস করলে, পাওয়া গেল?

জবাব দিল বন্দুকওয়ালা, উঁহুঁ।

চাষী বলল, শুনলাম আমোদগঞ্জের দিকে বড় দল নিকি এট্‌টা দেখা গেছে।

—গেছে?

—শুনলাম।

বন্দুকধারী মাঠের উপর দিয়ে এবার ফিরে তাকাল পুবদিকে। যেন তিন ক্রোশ দূরের আমোদগঞ্জকে দেখে নিল। তারপর একটা হুঁ দিয়ে এগুলো আবার।

চাষীটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে, যেন পাগল দেখছে। দেড় মাইল পথ হেঁটে লোকটি মোটরবাসের পথের ধারে হাটের পিছনে একটা মান্ধাতার আমলের একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার সামনে অশোকস্তম্ভ আঁকা সাইনবোর্ড ঝুলছে। লেখা আছে, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিভাগ, মহকুমা অফিস।" ছোট ছোট হরফে আরও যা লেখা রয়েছে, তার মূল কথা হল, সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি-বিষয়ের সাহায্য এখানে পাওয়া যাবে।

লোকটা উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরে ঢুকল। কেউ নেই, অফিস ফাঁকা। টেবিল চেয়ার আলমারি সবই আছে। পলেস্তারা-খসা দেয়ালে নানা চারা আর বীজের ছবি টাঙানো। কৃষি-উপদেশাবলী লেখা ছাপানো পোস্টার।

বন্দুকধারী ডাকল, ছোটবাবু ?

পাশের ঘর থেকে জবাব এল, কে ?

বলতে বলতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এলেন। পরনে কোটপ্যান্ট। ময়লা হলেও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে ওতেই অনেকখানি সাহেবিয়ানা হয়েছে। এসেই মুখটা বিকৃত করলেন। বললেন, এই যে, এসেছ বাবা কুতুবলাল ?

এতক্ষণে বোঝা গেল, লোকটার গলার স্বর অসম্ভব মোটা। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নেই, কিন্তু পলক কখনোই পড়ে না! শুকনো গালে যে কয়টি ভাঁজ পড়ল আর বড় বড় কয়েকটি খোঁচা দাঁত দেখা গেল, তাকে বোধ হয় হাসিই বলা যায়। বলল, এঁজ্ঞে, কুতুবলাল নয়, কুঁচলাল। মানে, কুঁচফল আছে না ? কুঁচ ? লাল কুঁচ—

ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, আর থাক, ওই হল। কিন্তু কোন্ নিশ্চিন্দিপুরে ছিলে সারাদিন ?

তেমনি মোটা স্বরে, প্রায় যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলল কুঁচলাল, এঁজ্ঞে, নিশ্চিন্দিপুরে নয়। বন্দাগাঁয়ে শুনলাম একদল এয়েছিল কাল। তাই সাঁইপাড়ার জঙ্গলে—বুঝেছি।

ছোটবাবুর খিঁচুনি আর বন্ধ হয় না, বললেন, ওদিকে ওমরাহপুর থেকে সংবাদ এসেছে—বিশ বিঘা জমির যাবৎ ছোলা আর মটরের চিহ্নও নেই। ওখানকার লোকেরা বলে গেল, বিরাট একদল গোটা ওমরাহপুর, আমোদগঞ্জ, শেরপাড়া সুদ্ধ এদিকে উত্তরে বন্দাগাঁ, দক্ষিণে নাজ্না পর্যন্ত পাক দিয়ে ঘিরেছে। যে কোন সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সবাই লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—

ছোটবাবুর কথার মাঝেই কুঁচলালের লাল চোখ দুটি আরও গোল হয়ে উঠল। তার মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রায় ঝরে পড়ল, নাজনা ?

হ্যাঁ, নাজ্না। সব লাঠিসোটা দা কুড়ুল নিয়ে—বলতে বলতে থেমে গেলেন ছোটবাবু, আর সহসা একটা কুটিল সন্দেহে তার চোখ দুটি কুঁচকে উঠল। কুঁচলালকে একবার খুঁটিয়ে দেখে বললেন, নাজনা তোমার গ্রাম , না ?

—এঁজ্ঞে।

—সেইজন্য টনক নড়েছে, না ?

—এঁজ্ঞে ?

—তোমার মুন্ডু।

ছোটবাবু খ্যাকখ্যাক করেই বললেন,নিজের গাঁয়ের নাম শুনেছ, অমনি টনক নড়েছে। এতগুলো গাঁয়ের যে নাম করলাম, তা কিছু নয়। ভাবলাম কোথায় লোকটার যা হোক তবু একটা বন্দুক আছে, চালাতে ও জানে, তাগ-বাগও আছে। লাঠিসোটার সঙ্গে একটা বন্দুক

থাকলে জানোয়ারগুলো ভয়ও পায়, মরেও দু-চারটে। আর মারলে যা হোক কিছু পয়সাও পায়। তা নয়—যাক্ গে, আমার কি ? মরবে, নিজেরাও মরবে।

কুঁচলালের এত কথা শোনাবার অবসরই ছিল না। সে ততক্ষণে পুঁটলি খুলতে আরম্ভ করেছে। পুঁটলি খুলে সে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু ডাকাত পড়ার মত চিৎকার করে, নাকে রুমাল দিয়ে তখন পেছিয়ে গেছেন কয়েক হাত।—এই, এই ব্যাটা পিশাচ, মাটিতে রাখ্, মাটিতে রাখ্।

পুঁটলিটা খুলে মাটিতেই রাখল কুঁচলাল। আর ভীষণ পচা দুর্গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল।

ছোটবাবু উঁকি মারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ক'টি ?

—পাঁচখানা বাবু।

ছোটবাবুর মুখে তেমনি বিরক্তি। বললেন, ক'দিন ধবে সেই পাঁচটিই ? তা এই লক্ষ্মণের ফল কি অঙ্গে অঙ্গেই ছিল ক'দিন ?

কুঁচলালের অপলক রক্তাভ চোখে বিস্ময় দেখা গেল। বলল, তা বাবু, কোথাও কি রাখবার যো আছে ? বেড়ালে খাবে কি পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাবে, সেই ভয়। শত হলেও হাতের নক্সী।

ছোটবাবু প্রায় ভেঙচে বললেন, হাতের নক্সী ? দেখি, তুলে তুলে গোন্।

কুঁচলাল প্রত্যেকটি বাঁদবের কাটা-ল্যাজ তুলে তুলে দেখাল ছোটবাবুকে। এক, দুই, তিন ...

ছোটবাবু বললেন, হুঁ বেড়ালে কিংবা অন্য কোনো জানোযারের ল্যাজ-ট্যাজ মিশেল নেই তো ?

কুঁচলালের গালে ভাঁজ পড়ল, দাঁত দেখা গেল। এবার চোখের কোলেও ভাঁজ পড়ে তার চোখ দুটি বুজে এলো প্রায়। খুবই হাসল কুঁচলাল। বলল, কি যে বলেন বাবু। কিসে আর কিসে ? দেখেন না একবার ?

চেয়ে দেখলেন না ছোটবাবু। ভাউচাবেব প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন কুঁচলাল দাস, পাঁচটি বাঁদর মারার পারিশ্রমিক দশ টাকা।

এইটি কৃষিবিভাগেব ঘোষিত নিয়ম। পুবস্কার ঘোষণা ও বলা যেতে পাবে। প্রতি বাঁদর হত্যা পিছু দু'টাকা দেওয়া। চুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই জমা দিতে হবে প্রত্যেকটি ল্যাজ, প্রমাণের জন্য।

সম্প্রতি এ অঞ্চলে বানর-নিধন যজ্ঞ শুরু হযেছে। এসব অঞ্চলে বাঁদর চিবকালই শস্য নষ্ট করে। কোন কোন বছর একেবারই সর্বনাশ কবে দেয। বিশেষ করে, এই যাযাবব শাখামৃগবাহিনী যে-বছর দলবদ্ধ সৈনিকের মত রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে, সে বছর তো কথাই নেই। বন্যা কিংবা পঙ্গপালের আক্রমণের চেয়ে সর্বনাশটা কোনো অংশে কম মারাত্মক নয়। সুদূর অঞ্চল ঘিরে, কোনখান দিয়ে যে তারা সেতুবন্ধ রচনা করে অগ্রসর হচ্ছে কিংবা আলেকজান্ডারের বাহিনীর মত কোন ঝিলমের তীবে এসে ভিড়েছে, টের পাওয় যায় না। সজাগ এবং সতর্ক তাদের আক্রমণ। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে দলে দলে। শস্য খায়, খাওয়ার চেয়ে তছনছ করে, নষ্ট কবে বেশি।

এ বছর তো বটেই, কয়েক বছর ধরেই এ আক্রমণ চবমে পৌঁচেছে।

বিশেষ করে রবিশস্য। ছোলা, মটর, কলাই। তা ছাড়া বেগুন, মুলো, সীম তো আছেই। কলা আর পেঁপের চিহ্ন পর্যন্ত রাখে না। পেঁপে গাছেব মুন্ডুটি ভেঙে তাব নবম শাঁসটি খেয়ে, গোটা গাছটিকে ধ্বংস না করে রেহাই নেই।

তাই দিকচক্রবাল-ছোঁয়া সুদূর প্রান্তরে সবুজের সফল স্বপ্ন-গুঞ্জন মাঝে মাঝে এক গম্ভীর [illegible] আড়ষ্ট হয়ে যায়। শিউরে শিউরে ওঠে। কখন, কখন সেই বর্গীরা আসবে ? তাই, সবসময়

এগ্রিকালচার বিভাগের এই ঘোষণা। আর এ অঞ্চলে তার প্রধান পুরোহিত বলা হয় কুঁচলালকে। কেননা, লাঠি-সোটা, দা-কুড়ুল, আগুন নয়। তার একটি গাদা বন্দুক আছে।

ছোটবাবু বললেন, নাও, পুঁটলিটা বেঁধে বাগানের ঘরটায় রেখে এস।

কুঁচলাল যাকে ছোটবাবু বলে, তিনি হলেন আসলে এগ্রিকালচার ইনস্ট্রাক্টর। তার ওপরে আছেন, কৃষিবিভাগের এস-ডি-ও। কুঁচলালের ভাষায় যে বড়বাবু। এস-ডি-ওকে ল্যাজগুলি চাক্ষুষ দেখাবার জন্যই বাগানের ঘরে রাখতে বলেন ছোটবাবু।

কুঁচলাল সেটা হিসেব করেই বলল, বড়বাবুকে দেখাবেন তো? কিন্তু ছোটবাবু, বাগানের ঘরে ভামে টামে খেয়ে ফেলে যদি?

—খেয়ে ফেলবে। তা বলে তোমার ও হাতের লক্ষ্মী আমি অফিস ঘরে রাখতে পারব না।

যদিও খুবই অনিচ্ছা, তবু কুঁচলালকে পুঁটলিটি বেঁধে সেইখানেই রেখে আসতে হল। তারপর ছোটবাবু যখন স্ট্যাম্প প্যাডটি এগিযে দিলেন টিপসইয়ের জন্য, তখন বড় দোয়াতের মধ্যে কলমেব অর্ধেক প্রায় ডুবিয়ে তুলেছে কুঁচলাল। আব নিবের ডগা দিয়ে টপটপ করে কালি পড়তে আরম্ভ করেছে।

ছোটবাবু ভ্রূকুটি করে সবই দেখলেন চুপচাপ। কিন্তু কুঁচলালের সেদিকে খেয়াল নেই। যখন কালিভরা হাণ্ডেলে নিবের চড়চড় শব্দে কোয়ার্টার ইঞ্চি হরফে নাম সই শেষ করল, তখন গোটা হাতটি তার কালিতে ভবে গেছে। ভাউচারেও পড়েছে কয়েক ফোঁটা। মোটা হাড়সার থ্যাবড়া আঙুলগুলি সে মাথাব চুলে ঘষে নিল।

ইতিপূর্বে যতবাব সে টাকা নিযেছে, ততবারই এরকম অঢেল কালি মেখে সই করে নিয়েছে। কথাটা ছোটবাবুর মনে থাকে না। বিনা বাক্যব্যয়ে দুটি পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন ছোটবাবু।

টাকা দশটি নিল কুঁচলাল।

কিন্তু কাঁধে বন্দুক, বারুদের গন্ধ, শক্ত কালো মূর্তি আর গো-সাপের মত অপলক চোখে এতক্ষণ যে কুঁচলালকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল, সেই কুঁচলালকে হঠাৎ যেন বড় অসহায় মনে হল। কিংবা তার উদ্দীপ্ত লাল চোখে, তাগ কষা বানব হত্যাব বাসনাই দপদপ করে উঠল বা। টাকা দশটিব ওপর থেকে অনেকক্ষণ তার নজর সবল না। তারপব পাঁচ ছয় ভাঁজে নোট দুটিকে একেবারে একটুখানি করে সোয়েটাবের মধ্যে ছেঁড়া কামিজেব পকেটে রাখল।

কি ভেবে ছোটবাবু বললেন—মারো, মারো, বাঁদরের গুষ্টিকে যত পার মারো, বুঝলে হে কুচুবলাল।

কুঁচলাল বলল, এজ্ঞে। এবার ছোটবাবুকে নাম শুধরে দিল না সে। বলল, পনেরদিন আগে মেরেছিলাম ছটা, এই পাঁচটা।

ছোটবাবু বললেন, পাঁচটা-ছটাতে কি হবে। শয়ে শয়ে মারো, শয়ে শয়ে।

কুঁচলালের গলার স্বর কেমন বসে গেল, শয়ে শয়ে বাবু?

—হ্যাঁ।

মোটা কালো ঠোঁট দুটি জিভ দিয়ে চেটে বলল কুঁচলাল, একশো মারলে, দুশো টাকা হয় ছোটবাবু!

—তাই হয়। একশোতে দুশো, দুশোতে চারশো, হাজারে দু-হাজার। এক হাজার মারো না তুমি—বারণ করেছে কে?

ভাবশূন্য অপলক চোখে কুঁচলাল ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আর বন্দুকে

ভাঙা বাঁটের ওপর তার কালো মোটা থাবাটা যেন নিসপিস করতে লাগল। বলল, এক হাজা...

ঢোক গিলে বলল আবার, একশো একাশি টাকা তিন আনা পাওয়া যায় কত শুলান মারলে ছোটবাবু ?

ছোটবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, একাশি টাকা তিন আনা বাঁদর মারার হিসেব হয় না বাবা ওটাকে বিরাশি করতে হবে। করলে পঞ্চাশ আর একচল্লিশ, একানব্বইটা বাঁদর মারতে হবে।

মোটা ঠোঁট নেড়ে বোধহয় মনে মনে হিসেব করল কুঁচলাল একানব্বই কাকে বলে। তারপর বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বলল, কি কবব বাবু, গাদা বন্দুকে সুবিধে করা যায় না। বাপ রেখে গেছল।

ছোটবাবু বললেন, জানি।

কুঁচলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, পঞ্চাশ বছরের কথা, বাবা ডাকাত মেরেছিল, তা... পেয়েছিল। তখন মহকুমা হাকিম নিজে—

ছোটবাবু এবার চেঁচিয়ে বললেন, অনেকবাব শুনেছি।

কুঁচলাল বলল, অ!

তারপর গামছাখানি কোমবে জড়িয়ে কুঁচলাল বেরিয়ে গেল। গিয়ে হাটের সীমানা পেরিয়ে আগে পড়ল মাঠেব সীমানায়। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় আবার তার অপলক চোখ আবার দপদপ করে উঠল। বাতাসেব বুকে নাকের পাটা ফুঁলিয়ে শুঁকল গন্ধ।

গতি তার দক্ষিণে। কিন্তু বন্দুকের কথাটা সে ভুলতে পাবে নি। বাপ তার ডাকাত মেরে খালাস হয়েছিল। মহকুমা হাকিম তাই এই গাদা বন্দুকটি দিয়েছিল তার বাপকে। কিন্তু বন্দুব কোনদিন কাজে লাগে নি আর। অ-কাজে লেগেছিল কুঁচলালের। বয়সেব একটা গরম নাকি আছে। সেই গরমে সে ওমরাহপুরের বিলে যেত পাখি মাবতে। পাখি মেরে মেরে হাত পাকাবার পর, ডাক এসেছিল বাঘ মাবার। আমোদগঞ্জে একটা চিতাবাঘ দৌরাত্ম্য করছিল। মিছে বলবে না কুঁচলাল, বেজায় দমে গিয়েছিল প্রাণটা। মনে শুধু একটি কথাই গেঁথেছিল, বয়সটা জোয়ান বিয়েটাও হয় নি। মরে গেলে আর একদিন হবেও না। লোকে বোঝে না, পাখি মারলেই বাঘ মারা যায় না।

কিন্তু বন্দুকের একটা মান আছে। যেতে হয়েছিল কুঁচলালকে। আর সাতদিন পরে, বাঘটাকে সে সত্যি মেরেছিল। তবে পুরোপুরি বন্দুকে নয়। অর্ধেক বন্দুকের গুলিতে, অর্ধেক পিটিয়ে।

তবে, এও মিথ্যে বলবে না কুঁচলাল, বাবু-সাহেবদের মত শিকার করে বাঘ মারে নি সে। ভয়ে মেরেছিল? প্রাণের ভয়ে যেমন মানুষ সবকিছু কবতে পারে, সেইরকম। আমোদগঞ্জের বিল-ঘেঁষা জঙ্গলে, এমন নিঃসাড়ে এসে বাঘটা তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, মনে করলে এখনও থমকে যেতে হয়। তবে, কুঁচলালেব মনে হয়, তারা দুজনেই সমান ভয় পেয়েছিল। হাতে যে বন্দুক আছে, সেটাও ভুলে গিয়েছিল সে। লাঠি মনে করে, সেইটি দিয়েই প্রথম আঘাত করেছিল। একবার নয় তিনবার। বাঘটা তাব উরুতে থাবা বসিয়েছিল। তারপর গুলি মেরেছিল কুঁচলাল। সেই সময় বন্দুকের বাঁটটা ভেঙেছিল, আর মহকুমা হাসপাতালে তাকে থাকতে হয়েছিল একমাস। মহকুমা-হাকিম শুধু দেখতে আসেন নি, পঁচিশটা টাকা তাকে বখসিস্ দিয়েছিলেন।

উরুর এক খাবলা মাংস গিয়েছিল বটে, তেমনি আমোদগঞ্জের কুসুমকে পাওয়া গিয়েছিল কুসুমের বাপ এসে তার বাপকে ধরেছিল,—ওই কুঁচলাল বাঘের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই ছেলের জমিজমা তেমন নেই সত্যি, তবে বীর, হ্যাঁ বীরপুরুষ।

হ্যাঁ, বীরপুরুষ। গোটা মহকুমার লোক তখন কুঁচলালকে কুঁচবাঘ বলত।

কুসুমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কুঁচলালের। তারপর যুদ্ধ লেগেছিল। সরকার বন্দুকটি নিয়েছিল। তাদের নাজনা থানাতে নাকি ছিল।

যুদ্ধ শেষের চার বছর বাদে ফিরে পাওয়া গিয়েছিল বন্দুকটি। কিন্তু বন্দুক হাতে করার সাধ ঘুচে গিয়েছিল তখন।

লাঙল ধরার জন্যে জন্মেছিল কুঁচলাল। বলদের অভাবে জোয়াল কাঁধে করার ভাগ্য নিয়ে বাঁচবার কথা ছিল তার। সেইভাবে বাঁচছিল।

কিন্তু বাঁচা বড় দায়। দেখে শুনে কুঁচলালের মনে হয়, সব মানুষও কোন দিন বাঁদর বনে যাবে। লুটেপুটে খেয়ে তছনছ করবে।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। তা ছোটবাবু নাকি শুনেছেন সে-কথা। হবে হয়তো, কুঁচলাল বলেছে সে-কথা ছোটাবাবুকে।

সেই থেকে বন্দুক বেড়াতেই ঝুলছিল। নলের মধ্যে আরশোলায় ডিম পাড়ছিল, মাকড়সা জাল ফাঁদছিল, টিকটিকি তার গা বেয়ে বেয়ে শিকার ধরছিল।

মিছে কেন বলবে কুঁচলাল, বন্দুকটার কথা মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে। সেই যেবারে তার পশ্চিমের মাঠের সাতবিঘা জমি চরণ ঘোষ দলিলের অভাবে নিজের বগলদাবা করলে বিলধারের সাড়েতেরো বিঘা জমি নিয়ে নিলে মহাজন সাঁপুই তার বাপের হাতের টিপসই দেওয়া ঋণের মুচলেখা দেখিয়ে, আর গত সনের আগের সনে যখন সরকারী বীজধানের ঋণ পাওয়া নিয়ে সরকারীবাবু তাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল। গত সনের ভাদ্রে সরকারের খয়রাতি ধান দিলে না তাকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সেই বামুনটা, বললে, 'বউ ছেলে বেচে খেগে যা', তখন বন্দুকটার কথা তার মনে হযেছে। রক্তে তার আগুন লেগেছে, বুক জ্বলেছে,বড় ঘেন্নায় তখন বন্দুকটায় ঠেসে ঠেসে বারুদ গেদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করেছে।

কিন্তু আইন নেই। তাই পারে নি।

আইনের মারপ্যাচটা কোন দিন বুঝল না কুঁচলাল। কিন্তু সেই মারপ্যাঁচের বাঁধন তার গলা অবধি বেঁধে ঝুলিয়েছে। বাকি আছে, নিদেনের ঘাড় মটকানোটুকু।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। গত বছর এমন সময়ে যখন সরকারী চাষের দপ্তর থেকে বাঁদর পিছু দু'টাকা মজুরী ঢ্যাটরা দিলে, সে সময় সে বেড়া থেকে বন্দুকটা পেড়ে নিয়েছিল আবার। পরিষ্কার করে, ধুয়ে-মুছে তেল মাখিয়ে আবার সে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে খোরাক যোগাবার একটা প্রেরণা। পাঁচ মাসের চেয়ে বেশি খোরাকি পাবার জমি তার নেই।

কিন্তু আশ্বিন মাসে কোর্ট থেকে সমন এসেছে, জমিদারীপ্রথা নাকি উঠে গেছে, কিন্তু খাস আছে। পাঁচ বিঘার মালিক কুঁচলাল খাসের প্রজা। জমিদার নয়, 'খাসদারের' পাওনা নাকি একশো একাশি টাকা তিন আনা, আইন-করা হিসেব। হুজুরে নালিশ হয়েছে। অনাদায়ে জমি নীলাম হবে। নীলাম রদের দরখাস্ত করে প্রজা মামলা লড়তে পারে। কিংবা টাকা মিটিয়ে সুখে ঘর করতে পারে। এখন প্রজার মর্জি, কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

কেন? না, আইন তৈরি হয় প্রজার মুখ চেয়ে। এই টাকাটা শোধ হলে, কিংবা মামলা লড়ে জিততে পারলে কুঁচলাল সরাসরি সরকারের প্রজা হয়ে যাবে। জমিদারকে পাঁচ বিঘের জন্য তেরো টাকা খাজনা দিতে হত। সরকারকে দিতে হবে তেরো টাকা সাড়ে পনেরো আনা। কেন? না জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কুঁচলাল বন্দুকটা টেনে নামাল কাঁধ থেকে। ওগুলি কি দেখা যায় ক্ষেতের মধ্যে? ছোট ছোট জীবগুলি পিলপিল করে ঘুরছে মাঠের মধ্যে? বন্দুক তুলে নিয়ে অপলক চোখে সে নজর করল।

তারপর বোকা-বোকা মুখে হাঁ করে রইল! বাঁদর নয়, গাঁয়েরই কিছু কুচো ছেলেপুলে। আলে খেলে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে গুটি তিনেক হাত তুলে দৌড়ে এল কুঁচলালের দিকেই। ওই তিনটি তার নিজের। এসে ঘিরে ধরল। প্রশ্ন তাদের একটিই, অই গো বাবা, বাবাগো, কটা মারলে এবারে?

কুঁচলাল বলল, হিসেব পরে হবে, এখন বাড়ি চল্। গো-সাপ নয়, ক্ষুধার্ত বাঘের মত অপলক রক্ত-চোখে শিকার খুঁজছে কুঁচলাল। নাকের পাটা ফুলিয়ে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। কোথায়, কোথায় তারা?—যারা দেবে তাকে একশো একাশি টাকা তিন আনা? নীলাম-রদের দরখাস্ত করেছে কুঁচলাল। সময় চেয়েছে। আর মরণপণ করে, নিরুপায় হয়ে, এই পাঁচ বিঘেতেই কড়াইশুটি আর আলু করেছে। সংসারের যেমন কতগুলি অমোঘ নিয়ম আছে যে, মানুষ মরে, ফতুর হয়, ঝড় ভূমিকম্প হয়, তবু দিন যায়, রাত্রি আসে, তেমনি করেই কুঁচলাল ওই পাঁচ বিঘেতে লাঙ্গল দিয়েছে, বীজ ছড়িয়েছে। উত্তর পশ্চিম ঘেঁষা এই দেশের মাটিতে রবি-শস্যের অনেক আশা। ফসল বাঁচিয়ে তুলতে পারলে, আবার আউস ও আমনের জন্যে বেঁচে থাকা যায়।

কুঁচলালের যত কলকাটি সব মাটি। ঐ বস্তুটি থাকলে সে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তার কাচারি নেই, কর্মচারী নেই, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে আইনের সুলুক সন্ধান করে টাকা তৈরি করতে পারে না। আর খাসের মালিক তৈরি কবে উশুল চাইলে, তাকে হাতে পায়ে ধরতে হয়।

নীলাম রদ হয়েছে তার মাঘ পর্যন্ত। মাঘ মাসের আর তিনদিন বাকি। সামনে ফাল্গুন। ইতিমধ্যেই মাঠের কোথাও কোথাও পাঁশুটে ছোপ দেখা যায়।

কিন্তু একশো একাশি টাকা তিন আনা। কুঁচলালের সর্পচক্ষু দপদপিয়ে ওঠে। মাঠের আনাচে কানাচে গাছগাছালির ঝুপসিঝাড়ে ও তীক্ষ্ন চোখে দেখে। খোঁজে যেন শ্বাপদ বুভুক্ষু লালসায়। আর শক্ত করে চেপে ধরে বন্দুকটাকে।

আর একমাস সময় চাইলে পাওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে একানব্বইয়ের এগারো বাদে এখনো চার কুড়ির হিসেব-নিকেশ কবতে হবে।

খেয়াল নেই, ছেলেদের সঙ্গে কখন বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্বিত পেল কুসুমের ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত গলায়, ও কি, অমন করে কি দেখছ তাকিয়ে তাকিয়ে?

কুসুমের দিকে ফিরল কুঁচলাল। চোখের নজর যেন ঠান্ডা হল একটু। গালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল। হাসল কুঁচলাল।

কুসুম জানে, কি দেখে আর কি ভাবে অমন করে কুঁচলাল। তাই কুসুমের দুটি ডাগর চোখ ভরে ঘনিয়ে ওঠে অভিমান। বন্দুক কাঁধে কুঁচলালের এই মূর্তি দেখলে তার নাকি বুক কাঁপে, মনটা নানারকম কু গায়। কুসুম এসে ইস্তক কোন দিন পাখি মারতে দেয় নি তাকে।

কিন্তু আজ আর কুসুম আটকাতে পারে না। পাখি নয়, আজ যাকে মারে কুঁচলাল, তাতেও খুনেরই নেশা। কিন্তু খুন না করলে নাকি বাঁচা দায়। তাই কুসুমের বুকের কাঁপুনি, নীরব বকুনি, ঘরের কোণে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে। কুঁচলাল চলে যায়।

তবে কি না, মিছে বলবে না কুঁচলাল, কুসুমের মন বুঝে তারও মনটা একটু খারাপ হয়।

আমোদগঞ্জের সেই ছেউটি কুসুমের এখন বয়স হয়েছে, পাঁচটি ছেলেপুলের মা হয়েছে। শরীরে পড়েছে বয়সের ছাপ কিন্তু মুখখানি এখনও যেন টস্‌টসে। চোখ দু'টি একরকম, তার আর বয়স বাড়ে নি। ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে কুসুমের কাছে বসে এখনও কুঁচলাল গান গাইবার আপ্রাণ চেষ্টায তাই হেঁড়ে গলার চিৎকার থামাতে পারে না।

কুসুমের কথাব জবাব না দিয়ে কুঁচলাল বলল, ঠান্ডা পড়ছে, খালি গায়ে বাঁদরগুলান ও পাড়ার মাঠে—

কথা শেষ কবতে পাবল না কুঁচলাল। কুসুম শিউবে উঠে বলল, কি ? কি বললে তুমি ?

কুঁচলাল থতিযে গিয়ে বলল, কি বললাম আবার ?

কুসুমের চোখে তখন জল এসেছে। ছেলেমেয়ে কটিকে বুকের কাছে টেনে রুদ্ধ গলায় বলল, যাদের তুমি নিষ্টেপিষ্টে গুলি বিঁধে মাবো, তা-ই বলে তুমি গাল দিলে ছেলেমেযেগুলানকে ?

কুঁচলাল বলল, এই দ্যাখ —

কুসুম তেমনি কান্না-ভযার্ত স্ববেই বলল, আজও এসে ফট্‌কের মা বলে গেল, দ্যাখ অমুকে যে প্রাণীগুলানকে মারছে, শত হলেও তাঁনাবা ভগমানের বাহন বাপু। মারলে পরে ভগমানের প্রাণে দুঃখু নাগে। ছেলেপুলে নিযে ঘর, বড যে পাপ হবে।

কুঁচলাল যেন শুনতেই পায নি কোন কথা। কোমবেব পুঁটলিটা খুলে একবার দেখল। তাবপর আবার কোমবে গুঁজে, পকেট থেকে টাকা দশটি হাত বাডিয়ে দিয়ে বলল ধর।

টাকা নিল কুসুম। কুঁচলাল বলল, যত্ন কবে বাখিস। নসু খুড়িকে রাতে শুতে বলিস। বলে, হনহন করে মাঠেব পথ ধরল কুঁচলাল।

কুসুম বলল, কি হল ?

কুঁচলাল তখন অনেক দূর। বলল, কিছু না।

কুসুমও বুঝল, কি হয়েছে । কুঁচলালও বুঝল । বুঝল, মেয়েমানুষেব খালি ওই এক কথা। দিন বোঝে না, ক্ষণ বোঝে না, মন বোঝে না। সংসার বোঝে না। খালি আন্‌কথা,যে কথায় চিঁড়ে ভেজে না। এদিকে ভগবানের সুপুত্তুরেবা গোটা চাকলা ঘিবে বসে আছে। তখন আর 'ভগবানের প্রাণে দুঃখু লাগে না।'

শক্ত চোয়ালে, ছুঁচলো ঠোঁটে কালো এবড়ো থেবড়ো মুখটা কুঁচলালের ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। একশো একাশি টাকা তিন আনার কথা কুসুমের কেন মনে থাকে না ?

অনেকখানি এসে থমকে দাঁড়ায় কুঁচলাল। তীক্ষ্ম চোখে তাকায় দক্ষিণে ও পুবে। কোন দিকে যাবে। নাজ্‌নার দক্ষিণে জুড়ান গাঁ। কিন্তু ওদিকটার কোন খবর নেই। পুবে—ওমরাহ্‌পুর, আমোদগঞ্জ দিয়ে উত্তর বাঁকে শেরপুর ধরে রন্দাগাঁ—এইভাবে নাকি ছড়িয়ে আছে বড় দলটা।

দূর আকাশের কোল দিয়ে নজরটাকে ঘুরিয়ে আনতে গিয়ে কুঁচলাল যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে হয় তার চারদিক ঘিরে ছোট ছোট পিটপিটে গোল চোখ পাঁশুটে জানোয়ারগুলি ঘাপটি মেরে আছে। সতর্ক চতুর চোখে দেখছে তাকেই, আর দূরে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে—পালাচ্ছে।

দক্ষিণ-পুব ঘেঁষে এগুলো কুঁচলাল। নাজ্‌নার সীমানা দিয়ে ওমরাহ্‌পুর হয়ে এগুবে সে। এগুতে গিয়ে আর-একবার থমকাল কুঁচলাল। ছায়াটা দেখে পশ্চিমে ফিরল সে। সূর্য ডুব ডুবু। আকাশ রাঙাবরণ হয়েছে। দিন শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই।

না থাক, রাতটা ওমরাহ্‌পুরে কাটাতে হবে। খোঁজ নিতে হবে। সেখানকার লোকের কাছ

থেকে।

জমিটা নাবালের দিকে। সামনে একটা খাল আছে। সাপুইদের সর্ষে ক্ষেত অনেকখানি। মুসুরির ফাঁকে ফাঁকে সর্ষে মাথা তুলেছে অনেকটা। হলুদের গোলা ছিটিয়ে দিয়েছে যেন কেউ—এত সর্ষে ফুল। মৌমাছিগুলি এখনও চাকে ফেরবার নাম করছে না। মধু খেয়ে কূল পাচ্ছে না তাই।

খালের সাঁকোর কাছে এসে দেখা হল দুজনের সঙ্গে। নাজনার লোক।

একজন বলল, আই গো কুঁচোদাদা, চললে কোথায়?

—ওমরাহ্‌পুর।

একজন বলল, গাঁ ছেড়ে চললে? ব্যাপার যা শুনছি, গতিক বড় সুবিধার না। বন্দুকখান নিয়ে তুমি থাকলে তবু এ্যাট্‌টা বল থাকে।

বল পায়ে লোকে, কুঁচলাল বন্দুক নিয়ে থাকলে। কুঁচলালও বল পায় মনে। আশা হয়, কিন্তু দাঁড়ায় না কুঁচলাল। যেতে যেতেই বলে, ওমরাহ্‌পুর যাচ্ছি পটল। যদি দেখ সুমুন্দিরা এয়েছে, তবে ধাওয়া করবে পুব দিকে। ওদিক পানেই থাকব।

লোক দুটি যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বোকার মত চোখাচোখি করে চলে গেল। মানুষটিকে তাদের কেমন বেঢপ লাগল। যেন নিজের মধ্যে নিজে নেই।

তা নেই। ক্রমেই একটা হত্যার নেশাই যেন চড়ছে কুঁচলালের।

নাজনার সীমানা পেরিয়ে, ওমরাহ্‌পুরের মাঠে পড়ল সে। আকাশটা এখনও লাল। উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে সূর্যটা বোধ হয় এখনও দেখা যায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুঁচলাল। পায়ের কাছে একটা আধখাওয়া বেগুন। একটু দূরে আরও কয়েকটা। তারপরে আরও। আর সামনেই বেগুন ক্ষেত। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাদের আক্রমণ হয়েছিল। আর বেশিক্ষণ আগের ঘটনাও নয়। আততায়ীর ছায়া-দেখে সাপের ফণা তোলার মত মাথা তুলল কুঁচলাল; বন্দুক নিল ডান হাতে।

কিন্তু আশেপাশে সব নিথর। সামনে একটা বাঁশঝাড়। আশেপাশে অনেকগুলি বড় বড় গাছ গায়ে গায়ে জড়াজাপটি করে আছে। কিন্তু একটি পাতাও নড়ছে না। এ সময়ে পাখিই বড় ডাকে না এমনিতেও। যেন রাত্রি আসার আগে কি ভাবে চুপচাপ। পাখি ডাকছে না, দেখাও যাচ্ছে না বিশেষ।

তবু নিঃসাড়ে এগুলো কুঁচলাল, সেই চিতাবাঘটার মত। কিন্তু তাদের ছায়াও নেই কোথাও। হয়তো এ তল্লাটেই নেই।

গাছগুলি পেরিয়ে খানিকটা জঙ্গল। জঙ্গলের ওপারে রাস্তা। জঙ্গল চারপাশেই। সামনে একটা ডোবা। ডোবাটার ডানপাশে একটা উঁচু টিবি।

টিবিটাকে ডানদিকে রেখে, ডোবার পাশ দিয়ে ওমরাহ্‌পুরের গোরুর গাড়ি চলার সড়ক ধরে এগুলো কুঁচলাল। হঠাৎ ছোট একটি শব্দে কান খাড়া করে থামল সে। সামনের তেঁতুল গাছটির দিকে দেখল। ফাঁকা গাছ।

কিন্তু দৃঢ় সন্দেহে নাকের পাটা ফুলে উঠল কুঁচলালের। সূর্য ডুবছে, এইটা একটা সময়। পা টিপে টিপে তেঁতুল গাছের আড়ালে গেল সে। আর যা ভেবেছিল তাই! টিবিটার পশ্চিম-ঢালুতে ধাড়ি আর বাচ্চায় প্রায় সাত-আটজনের একটি দল। ডোবার জল খেয়ে পশ্চিম দিকেই তাকিয়ে আছে। আর চুপচাপ মাথা চুলকোচ্ছে, গায়ের উকুন খাচ্ছে।

ওদের মত অস্থির প্রাণী, কেন এ সময়ে শান্ত হয়ে যায়? কেন হয়ে যায়? কেন তাকায় সূর্যের দিকে, নাম জপ করে নাকি?

মিছে বলবে না কুঁচলাল, তার মনটা একবার যেন কেমন করে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকটা তুলে ধরে সে। আঙুলটা চেপে ধরে ট্রীগারের ওপর। পাঁচবিঘাজমিতে কুঁচলালের কড়াইশুটি আর আলু আছে। খেয়ে তছনছ করবে যেদিন, সেদিন ও জানোয়ারগুলি এমনি করেই সূর্য-ডোবা দেখবে। কিন্তু তাড়া খেয়ে কোনদিকে যাবে বাঁদরগুলি? সামনে বা অন্য দিকে? কুঁচলালকে টের না পেলে, এদিকেও আসতে পারে। আর একটা সুযোগ নিতে হবে।

কুঁচলাল দেখল, জানোয়ারগুলো হঠাৎ যেন অস্বস্তিতে কেমন করছে। মরণের গন্ধ পাওয়া যায় বোধ হয়।

কুঁচলাল তাগ কষে গুলি ছুঁড়ল। লহমায় একবার মাত্র দেখল, একটা বাঁদর প্রায় পাঁচ-ছ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে, পড়ে গেল। ততক্ষণে কুঁচলাল পুঁটলি থেকে বারুদকাঠি দিয়ে, বারুদ আর গুলি পুরতে পুরতেই ঘন গাছগুলোর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এত দ্রুত এবং ক্ষিপ্র যেন একটা কালো বেড়াল।

গাছগুলির জটলার দিকেই কয়েকটা বাঁদর দৌড়েছিল চিৎকার করতে করতে, একটু ঘুরে হঠাৎ গাছের ভিড়ের মধ্যে ঢুকতেই, আর একটা গুলি করল সে।

কাক-শালিকের দল চিৎকার জুড়ে উড়তে লাগল। কিন্তু আর একবার গুলি পুরে প্রস্তুত হতে না হতেই বাঁদরের চিহ্ন পর্যন্ত আশেপাশে আর নেই, এটা অনুভব করল কুঁচলাল। তাছাড়া গাছের কোলগুলিতে ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে, সহজে টের পাওয়া যাবে না।

পুঁটলি হাতড়ে একটা পুরানো ক্ষুর বার করল সে। তারপর গাছের ওপরের মরা বাঁদরটাকে আগে খুঁজে বার করল। পাশ ফিরে শুয়ে ছিল বাঁদরটা, হাত-পা ছড়িয়ে। আর বাঁদর মরে গেলেই কেমন যেন নরম হয়ে নেতিয়ে যায়।

গোড়ার কাছ থেকে ল্যাজটা কেটে নিয়ে, রক্তটা মাটিতে ঘষে নতুন পুঁটলি করে তাতে রাখল। টিবির মরাটার ল্যাজও কেটে নিয়ে পুরল পুঁটলিতে। হয়তো মরা বাঁদর দুটিকে রাত্রে শেয়ালে খাবে। আদিবাসীরা পেলে হয়তো নিয়ে যেত।

কুঁচলালের হাতে রক্ত লেগে গেছে। সে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকাল। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল, সূর্য ডুবে গেছে। কালচে হয়ে গেছে আকাশ।

টিবিটার ঢালুতে দাঁড়িয়ে কুঁচলালও যেন সূর্যডোবা দেখছে। পাখিগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করেছে এবার। কুঁচলাল ও মনে মনে বলল, চার কুড়ির মধ্যে মাত্র দুই হল?

জুড়নগাঁয়ের দিক থেকে একটা গোরুর গাড়ি এল। জিজ্ঞেস করল কুঁচলাল, কোথা যাবে গো?

—ওমরাহ্‌পুর।

—নিয়ে যাবে?

গাড়োয়ানটা কেমন ভয়-ভয় চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল কুঁচলালকে। যেন ডাকাত দেখছে সামনে। প্রায় নিরুপায় হয়েই বলল, চল।

গাড়িতে উঠল কুঁচলাল। খানিক পরে গাড়োয়ান বলল, কোথা যাওয়া হবে?

ওমরাহ্‌পুর।

নিবাস?

নাজনা।

গাড়োয়ান এতক্ষণে ফিরল। বলল, তাইতো, বলি, কুঁচনাল না?

হুঁ?

হাতে রক্ত কিসের?

বাঁদরের।

তাই তো বলি, ব্যাপারখানা কি?

নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটা এবার রামসেনানীর কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল। কোথায় কি কি ফসল নষ্ট হয়েছে। গাড়োয়ান নিজে একজন চাষী। কুঁচলালদেরই জাতের লোক। রাতের থাকা-খাওয়াটা আজ তার ওখানেই সারুক কুঁচলাল। কেননা শত হলেও কাজটা তো সকলেরই।

রাত্রিটা কাটিয়ে বেরুল কুঁচলাল। গ্রামের পুবে আর পশ্চিমে শস্যের মাঠ। আগে পশ্চিম দিকটা ঘুরে, পূবদিকে গেল সে। পূবদিকে বিলটা দক্ষিণে জুড়নগাঁয়েব দিকে চলে গেছে। ওদিকটায় লোকজনের চলাফেরা কম।

কিন্তু রাগে মাথায় আগুন জ্বলে গেল কুঁচলালের। একগাদা কুচো লেগে গেছে পিছনে। আর চিৎকার করছে, বাঁদরমারা, বাঁদরমাবা!

বাবণ কবলেও শোনে না। যেন পাগল পেয়েছে। বাচ্ছাদের এই দলবাঁধা চেঁচামেচিতে বাঁদর দূরের কথা, কুঁচলালকেই ভেগে পড়তে হবে যে। গাঁয়ের বড়রা বললেও ছানাগুলি শুনতে চায় না। ক্ষেপে গিযে ভাবে, দেবে নাকি একটাকে দুড়ুম করে?

কিন্তু কুঁচলালেব গালে ভাঁজ পডল। মিছে বলবে না সে, নিজেব রাগ দেখে তাব নিজেরই লজ্জা হল আর নিজের ছেলেমেয়েগুলিব কথা তাব মনে পডল। ছানাপোনাদের এটিই নিয়ম। তাদের মন মানে না!

তাই কুঁচলাল হঠাৎ দৌড়াতে আবম্ভ করল। এ-পথে সে-পথে দৌড়ে দৌড়ে পথ ভুলিয়ে দিল বাচ্চাগুলিকে। কিন্তু বিপদ হল অন্য দিক থেকে। গাঁয়ের যত কুকুব লেগে গেল তার পিছনে।

শালারা পাগল করে মারবে।

একটি বাড়িতে ঢুকে খানিকক্ষণ বসে রইল সে। কুকুরগুলি ফিরে গেলে আবার বেরলো। বেরিয়ে সোজা চলে গেল আগে পুবে, তারপব দক্ষিণে। জুড়নগাঁয়ের সীমানা থেকে আবার উত্তরে। দুপ্‌র গড়িয়ে যাবার পর আমোদগঞ্জে এসে শুনল, কিছুক্ষণ আগেও একটা দলকে দেখা গেছে।

একটি মুদি-দোকানে বসে কিছু চিঁড়ে আর জল খেয়ে নিল কুঁচলাল। আবার বেরলো। বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে, পুবের বাইবেব সড়ক ধরবে বলে এগুলো। তার আগেই দাঁড়াতে হল তাকে। বাঁদর।

বাঁদর নয়, বাঁদরী। তিনটে বাঁদরী—তিনটেই মা, তিনটেরই পেটে বাচ্চা ঝুলছে। সারাদিনের ক্ষুব্ধ হতাশা এবার রুদ্র হয়ে উঠল কুঁচলালের। গো-সাপ-চোখ যেন শিকারকে নজরবন্ধ করল গাছের ডালে।

মিছে বলবে না কুঁচলাল, ছেলেমেয়েগুলিকে বুকে আগলানো কুসুমের কথাটা তার একবার মনে পড়ল। তবুও সে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে বন্দুক তুলল আর ঠিক সেই সময়ই কয়েকটা লোকের কথাবার্তার স্বরে বাঁদরীগুলি এদিকে ফিরতেই উদ্যত শমনকে দেখতে পেল। দেখে, অন্য গাছে লাফিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল।

কেউ পড়ল কিনা, না দেখেই, গাছের দোলানি কোন দিকে সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বারুদ গেদে ছুটে গেল। একটা বাঁদরী একটি বটগাছে উঠে পড়েছে, যেখানে অন্য কোন গাছ কাছে নেই লাফিয়ে পড়ার। নামলে মাটিতেই নামতে হয়। বাঁদরীটা তাই ত্রাহি চিৎকার করে পেটে বাচ্চা নিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল ডালে ডালে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুঁচলাল। বাঁদরীটার কোথাও যাবার উপায় নেই। বাচ্চাটা তীক্ষ্মগলায় চিঁ চিঁ করছে। লোক জড়ো হয়ে গেছে কুঁচলালকে ঘিরে। সবাই হাসছে, চিৎকার করছে, কলা দেখাচ্ছে বাঁদরীটাকে।

বাঁদরীটা কাঁদছে আর আশেপাশে দেখছে। আর আগের চেয়ে স্থির হয়ে এসেছে। কিন্তু যেদিন খাবার থাকে না সেদিন কিরকম কাঁদে কুসুম ছেলেমেয়ে নিয়ে, সেটা কুঁচলালের মনে আছে। তাই বাঁদরীর কান্না সে শুনবে না।

কে একজন বলল, নীলপুরে একজন একটা ফাঁদ পেতে বারোখানি বাঁদর মেরেছে।

কুঁচলাল শুনল, নীলপুরের একটা লোক চব্বিশ টাকা পেয়েছে। সে গুলি ছুঁড়ল। বাঁদরীটার সঙ্গে বাচ্চাটাও পড়ল। সেটা মরল শুধু আঁছাড় খেয়ে। দুটো ল্যাজই খুর দিয়ে কাটল সে। ধাড়ি আর বাচ্চাব গড়পড়তা দু'টাকাই হিসেব। এর আগের বাঁদরীটাও পড়েছে। ভেগেছে বাচ্চাটা।

লোকেরা বাঁদরকে মারতে চায়। তবু যেন কুঁচলালকে তাদের নিষ্ঠুর বলে মনে হল। তাই খানিকটা যেন ভয় ও ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল সবাই তার দিকে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, আমোদগঞ্জের বাঘমারা জামাই শেষে বাঁদরমারা হল?

কুঁচলাল শুধু নির্বিকার নয়, নীরবও। কাছেই কুসুমেব বাপেব বাড়ি। সবাই তার চেনা। কিন্তু সেখানে যাবে না কুঁচলাল। কুসুমেব ভাইযেরা তাকে ভাত খাওয়াতে চাইবে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। এদেরই মত ভাববে, সে কসাই। কেন না কুঁচলালের মনটা তারা বুঝবে না।

উত্তর দিকে এগুলো সে। গুলির শব্দে ও ছটকে-যাওয়া বাঁদরীটার কাছে সংবাদ পেয়ে, এতক্ষণে জানোয়ারগুলি এ-তল্লাট ছেড়ে সরে পড়েছে।

শেরপুরে এসে যখন পৌছল তখন বিকেল হয়েছে। শুনল, আছে। তার চিহ্নও রয়েছে। প্রায় সাত আট বিঘা ছোলা-মটর-মূলো ধ্বংসেছে শেরপুরে। গোটা পঞ্চাশ নাকি দল বেঁধে আছে।

কিন্তু তিন দিন ঘুরেও দলটার সন্ধান করতে পারল না কুঁচলাল। তবু তিন দিনে পাঁচটা ছুটকো বাঁদর মারা পড়েছে।

চার দিনের দিন মনে হল, এ তল্লাটে আর একটা বাঁদরও নেই, যেন এ পৃথিবীতে নেই। চার দিনে দু'বার ভাত খেয়েছে কুঁচলাল। বাদবাকি চিঁড়ে-মুড়িতেই কেটেছে। পুকুর আর ডোবার অভাব হয় নি। জলে নেমে ডুব দেওয়া গেছে। কিন্তু তেলহীন রুক্ষ চেহারাটা আরও ভয়ংকর হয়েছে। আজ নিয়ে সে সাত দিন বাড়ির ভাত খায় নি, বাড়িতে থাকে নি।

সে যেখান দিয়ে যায়, সেখানে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তার গায়ে পচা গন্ধ, ল্যাজের মাংসগুলি পচছে তার পুঁটলির মধ্যে। এখন তাকে দেখলে একটা ভবঘুরে পাগল বলে দিব্যি মনে করা যেত। কিন্তু কাঁধের বন্দুক আর অপলক রক্তাভ চোখ দেখে, সবাই যেন সভয়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

দিনের হিসাব ভুলে গেছে বুঝি কুঁচলাল। ল্যাজের হিসেব ঠিক আছে। তবু বাতাস যেন একটা অশুভ বার্তা নিয়ে তার কানের কাছে গুঞ্জন করে ফেরে, ফাল্গুন পড়ে গেছে, ফাল্গুন পড়ে গেছে। তখন মহকুমা-হাকিমের মুখখানি মনে পড়ে তার। খাস-মালিকের আমলার মুখটা মনে পড়ে তার। খাস-মালিকের আমলার মুখটা মনে পড়ে, যে মুখটাতে কি এক মস্ত ধাঁধা যেন

ঝিকমিক করে। মনে হয় লোকটার ছায়া পড়ে না মাটিতে, আর সেই দূর নাজনাতে দাঁড়িয়েও তাকে দেখতে পাচ্ছে সব সময়।

মানুষ ভয় পেলে যেমন ভক্তিতে হঠাৎ নমস্কার করে, কুঁচলাল তেমনি হঠাৎ মনে মনে নমস্কার করে বসে সেই মুখটাকে।—হেই দেবতা, হেই দেবতা গো।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে যেন বাঁদরের দল পিলপিল করে। চটের বস্তা-বাঁধা একটা মোটা ল্যাজের গাঁটরি সে দেখতে পায় যেন ছোটবাবুর অফিসে।

তারপর আরও পুবে নীলপুর ছাড়িয়ে, গাদিগড়, কুঁদপাড়া, মেয়াপুরের দিকে যেন কোনো এক অদৃশ্য ইশারায় পা চলে তার। পর পর কয়েকদিন বন্দুকের শব্দে, মরণের বিভীষিকা দেখে, বেশ একটা ভেবেচিন্তে যোগসাজস করেই যেন জানোয়ারগুলি পালিয়েছে।

কিন্তু আদিগন্ত ফসলের ক্ষেতের এই নিশ্চিত ফাঁদ ছেড়ে যাবে কোথায়। সংসারে এই তো সবচেয়ে বড় ফাঁদ সকলের,—জীবেরা খেতে চায়, বাঁচতে চায়।

কুঁদপাড়ার এক কলাবাগানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে, দৃশ্যটা দেখতে পেল কুঁচলাল। মিছে বলবে না সে, কুসুমকে বুকে, ধারে সোহাগ করবার কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়ল, কুসুম রাত জাগে নসুখুড়ির পাশে শুয়ে শুয়ে। বাচ্চাগুলি থাকে তার পাশে, পুরুষ ধাড়িটার জন্য মন পোড়ে কুসুমের।

তবু জোড়-খাওয়া জোড়াটার দিকে গুলি ছোঁড়ে কুঁচলাল। আর মুহূর্তে গোটা কলাবাগানটা আন্দোলিত হতে থাকে। বোঝা গেল বড় একটি দল বাগানের মধ্যে ছিল। পালাচ্ছে খোলা মাঠের দিকে। কিন্তু কলাবাগান যেন একটি দুর্ভেদ্য বেড়ার মতো, আরো তিনবার বারুদ গেদে গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল। শেষ পর্যন্ত মারা গেল দুটো।

ফ্যাসাদ করল সে মায়াপুরে এসে। একটি পাকা বাড়ির ছাদের কোণে-বসা বাঁদরকে গুলি করার পরেই ভীষণ একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। দিন দুপুরে ডাকাত ধরার লাঠিসোটা নিয়ে সেই বাড়ির লোকেরা বেরিয়ে এল।

ব্যাপার এমন কিছু নয়। ছাদের নীচেই, জানালার কাছে নাকি একটি মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, গুলির শব্দে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বাঁদরটা মরেছিল ছাদেই। তার ল্যাজ তো পাওয়াই গেল না, এক গুরুতর অপরাধের দন্ড হিসেবে তাকে গ্রাম থেকেই তাড়িয়ে দিল লোকগুলি। কেননা, বাঁদর মারার অছিলা করে বেড়ানো এরকম অনেক শয়তান নাকি তারা দেখেছে। কেননা, অছিলা করলেও, চেহারাটা তো গোপন নেই।

তা বটে, মিছে বলবে না কুঁচলাল, চেহারাটি তার রাজপুত্তুরের মত নয়। মেয়াপুরের ভদ্রলোকদের চেহারাও তো রাজপুত্তুরের মত নয়! কিন্তু সে শয়তান হল কেন?

মেয়াপুরের মাঠে নেমে পিছন ফিরে সে গ্রামটাকে দেখল একবার। জিভটা তার শুকনো লাগছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়ে নি তার আজকে। কেমন একটি অসহায় বোবা জীবের মত খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মাঠে। ছাদের ওপর পড়ে থাকা বাঁদরটার কথা মনে পড়ল তার। পেলে উনিশটা হত। কিন্তু আব মেয়াপুরে ঢোকা যায় না।

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে শামলা মাথায় একটি লোককে সাইকেলে চেপে যেতে দেখে, চমকে উঠল কুঁচলালের মনটা। ইনি হযতো ডাক্তারবাবু, কিন্তু মহকুমা হাকিমের মুখখানি মনে পড়ছে তার। আর মনে পড়ছে আমলার মুখখানি—যে-লোকটি শুধু দলিল দস্তাবেজ দেখে টাকা তৈরি করতে পারে।

ফাল্গুনের কদিন আজকে! মনে নেই, একেবারেই স্মরণ হচ্ছে না কুঁচলালের। তার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল যেন। একটা ভয়ংকর দুর্যোগ যেন তার বুকে এসে ধাক্কা মারছে বন্দুকটা শক্ত হাতে ধরে তাড়াতাড়ি উঠল কুঁচলাল। একুশ মাইল পাক দিয়ে আবার দক্ষিণে-পশ্চিমে পিছতে লাগল সে। উঠবে গিয়ে জুড়নগাঁয়ের বিলের কাছে। মাঝে পড়বে আগনগাছি, নৈরা, ঝিঙেদল, মনসাতলি। রাত্রিটা কাটাতে হবে বোধ হয় নৈরাতেই। ইতিমধ্যে সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে। পা চালিয়ে যাবার যো নেই। নিঃসাড়ে পা টিপে,টিপে , ওত পাততে পাততে যেতে হবে তাকে।

আগনগাছি পার হয়ে, নৈরার কোমর-জল যমুনার উঁচু পাড়ের কাছে জঙ্গলের পথে থামতে হল কুঁচলালকে। সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল চারদিকে। কিছু নেই,তবু একটা তীক্ষ্ণ খ্যাকানি শুনতে পেয়েছে সে। মানুষের ? কিন্তু গন্ধ পাচ্ছে কিসের ?

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কুঁচলালের। আবার একটা তীব্র হুংকার শুনতে পেল সে। তাদেরই হুংকার।

গাছের আড়ালে আড়ালে খানিকটা উত্তরে যেতেই, চোখে পড়ল তার।

উঁচু পাড়ের ওপর প্রায় বারো তেরটি বাঁদরী, সারি সারি বসে আছে নির্বিকার হয়ে। আর তাদের সামনেই, দুটি বড় বড় হুলো, পরস্পরের চোখে চোখ রেখে পাক খাচ্ছে আর আক্রমণের ছল খুঁজছে।

যেন দুই বাদশা লড়ছেন, আর বেগমেরা গা চুলকে আরাম করে উকুন চিবোচ্ছেন। যিনি জিতবেন, তার হাত ধরে সব বেগমেরা হারেমে গিয়ে উঠবেন। রাজ্য নয়, বাদশারা প্রেমের লড়াই করছেন।

এইভাবেই বাঁদরের বিয়ে হয় আর খাঁটি কুলীনের মত একাধিক পত্নী নিয়েই তাদের সংসার। শক্ত হাতে বন্দুকটা ধরেও, লড়াইটা দেখতে লাগল কুঁচলাল। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বীরদের এমন লড়াই আর বীর্যশুল্কাদের এমন খাঁটি প্রেম দেখতে (মিছে বলবে না কুঁচলাল) ভালই লাগল তার।

কিন্তু কোনটাকে মারবে সে ? যে জিতবে ? না, তাকে নয়, যে হারবে।

কারণ, হেরে যাওয়াটা সবচেয়ে বেশী বদমাইশি করবে, ক্ষতি করবে। কারণ, বন্ধু আর বউ থাকবে না, ওর মেজাজ সবসময় খিচড়ে থাকবে, ক্ষেপে থাকবে।

লড়াই নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে চলেছে, কারণ দুজনেরই চোখেমুখে গায়ে রক্তের দাগ। গায়ের জায়গায় জায়গায় লোম উপ্‌ড়ে ফেলা হয়েছে।

হঠাৎ দুটিতে ঝাঁপিয়ে ঝুটোপুটি লাগল। বন্দুক তুলে ধরল কুঁচলাল। কিন্তু ওরা ফারাক হয়ে পাক দিতে লাগল।

কুঁচলাল গুনল। তেরটা বাঁদরী দুটো মদ্দা। তিরিশটা টাকা তার চোখের উপর। কিন্তু একটাকেও মারতে পারবে না হয়তো কুঁচলাল, থোক্ তিরিশ টাকা তো অনেক, অনেক দূর।

আবার ঝুটোপুটি লাগল, আর তীক্ষ্ণ চিৎকারে আকাশটা যেন ফেটে গেল। ট্রিগারে হাত দিল কুঁচলাল, আর মুহূর্তে মতের পরিবর্তন হল তাব। সে দেখল, একটা হুলোর বুকের চামড়া চিরে দিয়েছে, লাল মাংস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তখনও ছাড়ান পায় নি। ওটা মরবেই। জিতে যাওয়াটাকেই তাগ করলে সে। গুলি ছুঁড়ল।

দিশেহারা বাঁদরীগুলি পাড়ের দিকে নেমে প্রথমে নদীর দিকে গেল। ক্ষিপ্রবেগে বারুদ আর গুলি গেদে প্রায় পাগলের মত জলের দিকে ছুটে গেল কুঁচলাল। গুলি ছুঁড়ল।

জলের কাছে গিয়ে ওরা ছত্রভঙ্গ হল। কুঁচলাল পিছন ছাড়ল না। ছুটতে ছুটতে আরও তিনবার গুলি করল। তখন সে প্রায় আধ-মাইল দূরে চলে এসেছে।

পথ থেকে দুটিকে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে ছুটে এল আবার সেখানে। জলের ধারে একটা বাঁদরী আর পাড়ের ওপর দুটো মদ্দা।

ল্যাজগুলি কেটে, মাথায় পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে কোমর-জল যমুনা পার হল কুঁচলাল। নৈরাতে রাতটা কাটল একজনের বাড়িতে। দুটি ভাত পেল খেতে। কিন্তু ভাতগুলি বমি হয়ে যাবার দাখিল। ফাল্গুন মাসের ন্যাকে সাত দিন আজ? ভোর-ভোর উঠে জুড়নগাঁয়ের দিকে চলল সে। কিন্তু টিপে টিপে ঝিঙেদল আসতেই দুপুর হয়ে গেল। কিছু পাওয়া গেল না।

কিন্তু শীত লাগছে কেন কুঁচলালের? গায়ে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে না। তবে বাতাস হঠাৎ বেড়েছে। লোকে বলে, এটা 'সমুদ্দুরের বাতাস' শুকনো মিঠে বাতাস, তাপ আছে বেশ। কদিনের মধ্যেই সমস্ত মাঠগুলি যেন পাঁশুটে রঙ ধরে গেছে। কুঁচলালের পাঁচ বিঘেও পেকেছে নিশ্চয়। মন বড় আনচান্ করে। নাজ্‌নায় যাবে কুঁচলাল, নাজ্‌নায় যাবে।

কিন্তু বাতাসটা গায়ে লাগলে এমন কেন হয়? শীত নয়, কেমন যেন ভয়-ধরা কাঁটা-লাগা ভাব।

বাতাসটা যেন একটা পাগল ঠাকুরের মত, কিসেব ভয় দেখায় কুঁচলালকে।

মনসাতলিতে এসে তিনটিকে মেরে, জুড়নগাঁয়ে আসতে রাত হল তাব।

সকালে তার ঘুম ভাঙল লোকের চেঁচামেচি[illegible]। [illegible] বাড়িতে শুয়েছিল সে চেঁচিয়ে ডাকল, অই গো বন্দুকওয়ালা, এস, তাড়াতাড়ি এস, ক্ষে[illegible] পড়ছে।

পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে উঠল কুঁচলাল। জিজ্ঞাসা করল, কোন্ মাঠে?

পুবের মাঠে।

বেরিয়ে এসেই আগে মাঠেব দিকে গেল। তারপর চিৎকার করে বলল সবাইকে, গোল হয়ে ঘেরো। ঘিবে জোড়াপুকুরের দিকে তাড়া দাও।

সারা গ্রামের জোযানরাই প্রায় লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত। একদলকে নিয়ে জোড়াপুকুবের দুই ধারে ছড়িয়ে দিল কুঁচলাল। পাগলেব মত চিৎকার করে বলল, খববদার, এক শালাও যেন পালাতে না পারে। ওরা পাছ্ দিয়ে আসছে, তোমবা দুপাশে, আমি একলা এখানে।

তার চিৎকাবে সবাই যেন তটস্থ! যেন সৈনিকদের হুকুম করছে সেনাপতি।

আর ব্যাপারটা ঘটলও তাই। লুভিষ্টির দল তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়েছে! যদিও কাছেপিঠে গাছগুলিই একমাত্র পালাবার রাস্তা, তবে সেগুলি ছাড়া ছাড়া।

পিছনের তাড়া খেয়ে বাঁদরগুলি সামনে আসতেই পুকুর পড়ল, আর দুদিকে সবাই চিৎকার করতে লাগল।

পিছনের লোকগুলি পুকুরের ওপারে না এসে পড়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তে গুলি চালিয়েছে কুঁচলাল। এবার তাকে সাবধান হতে হল।

কিন্তু গুলির ভয়ে পিছনদিকেব সবাই সরে পড়তে লাগল। কুঁচলাল চিৎকার করে উঠল, খবরদার, মাঠেব পথ ছেড় না।

পিছনের লোকেরা আবার ফিরল, কিন্তু প্রত্যেকটি গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ হতে লাগল তারা। সেই ফাঁকেই জানোয়ারগুলি মরিয়া হয়ে পালাতে লাগল।

শেষে সব স্তব্ধ হল। তখন গোটা গ্রামটা ভেঙে পড়েছে জোড়াপুকুরের ধারে। শত্রুর মরণোৎসব দেখছে সবাই।

কুঁচলাল ক্ষিপ্র হাতে ল্যাজ কাটতে লাগল। এক দুই, তিন ···· বারো। বারোটা। দুই হাত তার রক্তাক্ত। পুঁটলি তার ভরতি, কিন্তু এখনও অনেক বাকি।

তবু আগে যেতে হবে ছোটবাবুর কাছে! জমা দিতে হবে । উনচল্লিশটা ল্যাজ! টাকা নিতে হবে, আমলার কাছে যেতে হবে। টাকা দিয়ে, বাকী টাকার সময় নিতে হবে, হাতে-পায়ে ধরতে হবে।

কিন্তু মিছে বলবে না কুঁচলাল, মানুষ দেখে তার বড় অবাক লাগে।

খুনী। যেন সে একটা সর্বনেশে ভয়ংকর।

তাড়াতাড়ি পথ ধরল সে উত্তর-পশ্চিম কোণ নিয়ে। বন্দাগাঁয়ের হাটের ধারে, ছোটবাবুর দপ্তরে যাবে সে। কিন্তু সবাই হেসে, চিৎকার করে, বিদ্রূপ করতে লাগল তাকে।

করুক। মুখ খুলবে না কুঁচলাল। সে একটা পাখি, ঠোঁটে তার খাবার। মুখ খুললেই যেন পড়ে যাবে।

দূর থেকে নাজ্‌নাকে দেখতে পেল সে। নাজ্‌নার মাঠের ওপর দিয়েই তার পথ। নাজ্‌নার দিক থেকে কারা যেন আসছে এদিকে। হাত তুলছে, ডাকছ বোধ হয় কাউকে!

কুঁচলালকেই! ছুটতে ছুটতে যে তার কাছে এল, সে গাঁয়ের বুড়ো ভবখুড়ো।

ভবখুড়োর গলায় ত্রাস, কিন্তু বড় রাগ, বলল, এই আরে এই বদ, শোন।

কুঁচলাল দাঁড়াল না। মিছে বলবে না, এসময় ভবখুড়োর গাল তার ভাল লাগছে না। মন্দ কিছু করে থাকলে পরে বলতে পারে। কুঁচলাল বলল, সময় নাই ভবখুড়ো, পরে শুনবখনি।

ভবখুড়ো এবার চেঁচিয়ে উঠল, থামরে ম্যাড়া থাম, থাম্ কোর্টের লুটিশ এয়েছে, প্যায়দা এয়েছে, আমলা এয়েছে।

থতিয়ে গিয়ে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল কুঁচলাল, কিন্তু গুন্‌তি পোরে নাই যে?

পরমুহূর্তেই চমকে উঠে বলল, তারা এসে পড়েছে? কি বলছে তারা?

ভবখুড়ো ঢোক গিলে বলল, সেটা গিয়ে দেখবি চল।

ভবখুড়োর মুখ থেকে, বাতাসটা যেন জোর ধাক্কা দিল তার গায়ে। কাঁটা দিল যেন। চোখে তার পলক পড়ল একবারের জন্য। ভবখুড়োর পিছন ধরল সে।

তার পাঁচ বিঘার কাছে এসে, আর একবার পলক পড়ল তার। তারপরে, অপলক চোখ দুটিতে, ভয়ংকর আক্রোশের আগুন উঠল দপদপিয়ে! বন্দুকের উপর থাবাটা শক্ত হয়ে উঠল। দেখল, তার জমিতে নীলামী নিশান উড়ছে, ঢ্যাং ঢ্যাং করে ঢাক বাজছে, আমলা আর কোর্টের পেয়াদা খাড়া। চারটে অচেনা লোক তার কড়াইশুঁটি উপড়াচ্ছে, আলু তুলছে।

ছেলেমেয়েগুলি কোত্থেকে এসে কোমর জড়িয়ে ধরল তার। এই দুঃসময়ে বাপের জন্যে হাহাকার করছিল ওদের প্রাণগুলি। ঘোমটা টেনে তার কুসুম এসেছে, পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কুঁচলালকে দেখতে পেল না। সে যেন বন্দুক-ধরা হাতটাকে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, পারছে না। একটা পচা দুর্গন্ধ তার গা থেকে সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়েছে।

কুসুম পায়ে হাত দিয়ে বলল, অগো এই, অমন করে কি দেখছ?

কুঁচলাল বলল, 'বাঁদর'।

কুসুম চমকে বলল, অ্যাঁ?

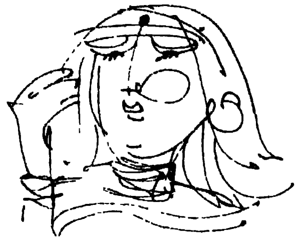
হ্যাঁ, মিছে বলবে না কুঁচলাল, সে দেখছে, বাঁদরে তার ফসল খাচ্ছে, তছনছ করছে। কিন্তু বাঁদরগুলির লুটিশ আছে, ঢ্যাট্‌রা আছে, আইন আছে।

কুসুম দুহাত দিয়ে কুঁচলালের হাত ধরে টান দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডাকল, অই গো, অমন কবছ্ কেন?

কুঁচলালের গলার শিরাগুলি যে, ছিড়ে গেল। আর গো-সাপের মতো অপলক চোখ দুটিতে অকূলের বান। ভাঙা ভাঙা দাঁত-পেষা গলায় বলল, বাঁদর দেখলো বউ। কিন্তু বাঁদরগুলানরে মারবার আইন নাই।

কঠিনপ্রাণ কুঁচলালের চোখে জল দেখে কুসুমের 'হায়া' গেল। লোকজনের সামনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, হেই গো ভগমান, তুমি কেমন কর?

কিছু না বউ, ছোটবাবুর কাছে যাই। কামটা পাকা করতে হবে।



উত্তাপ

ট্রেনখানা বৃষ্টিতে নেয়ে এসে দাঁড়াল। আব ঠিক সেই সময় মেয়েটা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। আবাব ধকধক করে উঠল হবেনের বুকের মধ্যে। তার লিকলিকে শরীরের বক্তে-রক্তে অসহ্য জ্বালা ধরে গেল। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে আরও তোলপাড় করে উঠল। দেখল. মেয়েটাও ওর লোকজনের সঙ্গে সেখানেই নামছে। কোথায় যাবে এরা?

ছোট স্টেশন। যাত্রীও খুব অল্প কযেকজন। কিছু খেত-মজুর মেয়ে-পুরুষ। ভিজতে-ভিজতে এসেছে। যাবেও ভিজতে-ভিজতেই। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, টুকি-টাকি জিনিস হাতে, কাঁধে ঝুলছে। কেমন ছন্নছাড়া ভেজা-ভেজা ভাব।

এখানেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নয, এখন হচ্ছে। তেমন জোরে নয়। যেন হাওয়ার ঝাপটায় নেমে আসছে ইল্‌শেগুঁড়ি ছাঁট। এব আগের বাস্তায় জল আরও তেড়ে নেমেছে। ট্রেনের ছাদ দিযে জল পড়ে কামবাগুলো পর্যন্ত ভেসে গেছে। মনে হচ্ছিল গাড়িটাই লাইন থেকে হড়কে পড়ে যাবে!

আষাঢ মাস, কিন্তু যেন শ্রাবণেব ধারা লেগেছে। মাঝে-মাঝে থমকায়। একটু আশা দেয়। আকাশ দাঁত খিচোয দূরে-দূরে। ভাবখানা যাবি যা, নইলে এলুম বলে।

এসেই আছি। গড়িয়ে-গড়িয়ে আকাশটা অষ্টপ্রহর নামছে। মেঘ দলা পাকাচ্ছে উঁচু চড়াইয়ের মাথায়। মনে হয়, চড়াই পেরিযে উৎরাইযের ঢালু প্রান্তর দলা-দলা মেঘে অন্ধকাব হয়ে আছে। কোথাও চাষ-আবাদের লক্ষণ বিশেষ দেখা যায না। যা আছে, খুবই সামান্য। সবটাই লাল কাঁকর-পাথরে ভরা। মাঝে-মাঝে কাজল চোখের চকিত চাউনির মত সবুজের ছিটে লেগেছে। কোথাও হঠাৎ এক-সার ভূতেব মত মাথা তুলেছে সোজা-বাঁকা তালগাছ। তার ঘন বেষ্টনীতে খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে মেঘ অন্ধকাব। তাবপর দম আটকেই চড়াই উঠেছে ঠেলে-ঠেলে, হামাগুড়ি দিয়ে। অন্য দিকে চোখ ফেরাতেই হয়তো দেখা যাবে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটা টলছে বাতাসে। কয়েকটা পলাশগাছ জলের ফোঁটা পড়া পাতায়-পাতায় চেয়ে আছে বিষণ্ণ চোখে। তারপর কিছুই নেই, যত দূর চোখ যায়। কেবল কালো কিম্ভূত আকাশটার তলায় এই বিশাল প্রান্তর যেন গেরুযা আলখাল্লা-পরা রুদ্র সন্ন্যাসী, পড়ে-পড়ে প্রতি লোমকূপ দিয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে আষাঢ়ের ঢলে।

স্টেশনটা উত্তর বীরভূমের পশ্চিম ঘেঁষে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে সাঁওতাল পরগণার সীমানা। পশ্চিমে, দূরে মেঘের কোলে মেঘের মত জেগে রয়েছে রাজমহল পাহাড়ের ইশারা। ইশারাটা দূর দিয়ে বেঁকে, অনেকখানি দক্ষিণে এসে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পূবে।

ট্রেন চলে গেল। হরেন সব ভুলে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। নিজের যাওয়ার কথা ভুলে, লক্ষ্য করছে ওদের গতিবিধি। যাদের সঙ্গে মেয়েটা আছে, একটা বুড়ো একটা বুড়ি,

একটি মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষ। আর ওই মেয়েটা। টোকা, হুঁকো, বোঁচাকা, এমনি সামান্য কিছু জিনিস ওদের হাতে, কাঁধে ঝুলছে। চাষের কাজে মজুরি খাটতে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল সাঁওতাল। কথা শুনে বুঝল, সাঁওতাল নয়। বাউরী কিংবা বাগদী হবে। গাড়িতে উঠেছে ওরা নলহাটি থেকে।

মরদ নেই সঙ্গে। মনে হচ্ছে মেয়েটাই ওদের নিয়ে চলেছে। কালো রং মেয়ের। যেন ঝুঁটিওয়ালি একটি কালো মেযে-পায়রা। মদ্দা এসে ঠুকরে খুনসুটি করবে। সেই আশায়, বুক উঁচিয়ে, মাথা হেলিয়ে দুলে-দুলে চলেছে। চোখে দীপ্তি, গলায় বকম্-বকম্। কিন্তু যাচ্ছে তো খাটতে, বোঝাই যাচ্ছে। আব সঙ্গেও কয়েকটা বুড়ো-বুড়ি। তবে এত হাসির ঢুলুনি ঢলানি কিসের।

গাড়িতে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। হরেন তার জীবনে অনেক মদ খাওযা মেয়েমানুষের চোখ দেখেছে, সঙ্গও করেছে। ওই মেয়েটার টানা-টানা চোখ দুটিও যেন মদ-খাওয়া, চোখে একদিকে যেমন শান দেওযা, আর একদিকে তেমনি ঢুলুঢুলু! নেশা ধরিয়ে দেয়। নেশা ধরেও গেছে হরেনের। হেসে-হেসে গাড়ির অনেকেব প্রাণেই নেশা ধরিযে দিয়েছে। বোধ হয় বিধবা। আসল বয়সে রং ফুটে বেরুচ্ছে হাতে-পায়ে, কথায়, হাসিতে। রং করাব ইচ্ছে আছে প্রাণে। কিন্তু যাবে কোথায় এবা?

সে ওই দলটার পিছনে-পিছনে এসে দাঁড়াল, স্টেশনের বাইরে। তার ফিন্ ফিনে মিলের ধুতি, পপলিনের চকচকে শার্ট। পায়ে কালো বং-এর বুট জুতো। রংটা ফর্সা কিন্তু যতখানি বেঁটে, ততখানি রোগা। বয়স তিরিশ না হলেও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে চল্লিশেরও বেশি। শরীরের ক্ষয়টা জামার ভাঁজেও ফুটে উঠেছে। যেন বাঁশ-বাখারীর কাঠামোর উপরে ঝুলছে জামাটি। শালিকের মত সরু বুক। তাব ওপবে বোতাম খুলে দিয়েছে বুকের। গায়ে এসেন্সেব গন্ধ।

বাপের আছে ভাল জমি-জমা—ঘর—পুকুর। ছেলে মাত্র হরেন। কুল কুনুটি বংশ কুলিন রায়ের ছেলে। আট বছর ধরে শহব শিউড়িতে ছেলে পড়ছে কলেজে এক ক্লাসে। বাপ টাকা পাঠায় নিয়মিত। হরেন টাকাটা সরস্বতীর পায়েই দেয়। তিনি হলেন দুষ্টু সরস্বতী। বিদ্যেব প্রকৃতিটা একটু অন্য রসের। আজকে যে নেশা ধরিয়ে দিযেছে মেয়েটা, এ নেশা আট বছর ধবে রপ্ত করেছে সে। এখন দর্শনেই নেশা হয়. আর নেশার মত বস্তুও বটে।

সামনে এসে মেয়েটিকে ভাল কবে দেখল সে। গায়ে জামা নেই। নিভাঁজ গ্রীবার নিচে দিযে রুপোর বিছে-হার বুকের টান-টান কাপড়ের ঢাকায হারিয়ে গেছে। কানের ফুটোয় গোঁজা দুটি পেতলের মাকড়ি। সিঁথেয় সিঁদুরের আভাস দেখা গেল এবাব। জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মেয়েটা তাকাল হরেনের দিকে। তাকিয়ে হঠাৎ একটু ঠোঁট টিপে হেসে সরে গেল মাঝ-বয়সী মেযেমানুষটির কাছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে কি যেন বলল ফিসফিস করে। মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটি ফিরে তাকাল। তারপর তাকাল বুড়ো-বুড়ি। কেমন যেন ছেলেমানুষের মত চাউনি বুড়ো-বুড়ির।

বুড়ো বলল হরেনকে, 'কোথাকে যাবেন্ গো, বাবু?'

যাক, মুখ খোলা গেল। এবারে জানা যাবে গতিবিধি। হরেন বলল, 'কে, আমি? যাব তো রলাটি, কিন্তু—'

রলাটি? ওরা সবাই ফিরে তাকাল ওর দিকে। বলল, 'অলাটি যাবেন আপনি। আরে বাপ! গাড়ি নাই, দুস্তর রাস্তা, ম্যাঘ-বিষ্টি, কি করে যাবেন গো?'

সেইটেই এতক্ষণ হুঁশ হল হরেনের। তাইতো! চিঠি দিয়েছিল বাড়িতে গরুরগাড়ি পাঠাবার জন্যে। কিন্তু কাকপক্ষীও তো নেই। সে ফিরে জিগ্যেস করল, 'তোমরা কোথায় যাবে?'

অলাটি।'

'রলাটি?'

'হঁ। ফি বছরে মজুরি খাটতে যাই গো। ইবারে এট্টুস আগে-আগে বেরোলম। দেখেন ক্যানে, আকাশের ভাব। সব ভাসায়ে লিবে মনে হচ্ছে।'

হরেনের প্রাণে রস নামল আরও। রলাটি যাবে তাহলে? একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইল সে। বলল, 'কার ঘরে কাজ করতে যাচ্ছিস?' কথা বলে এদিকে। নজর থাকে মেয়েটার দিকে। জবাব বুড়োই দিল, 'ইন্দির চাটুজ্যেমশায়ের ঘরে। অলাটির কুন্ ঘর আপনাকাদের?'

'গদাই রায়, মানে গদাধর—'

'হঁ হঁ, বুঝলাম গো। তা, আপুনি—'

কথার মাঝেই সেই মেয়েটি কপট রোষে ফুঁসে উঠল, 'আ, কি যন্তনা গো,গপ্প করছ, ইদিকে যে দিন যায়।'

সবাই নড়েচড়ে উঠল। খুড়ো বলল হরেনকে, 'চলি গো, বাবু। সাত কোশ রাস্তা যেতে-যেতে বাতি জ্বলবে ঘরে।'

হরেনকে এই সময়ে হঠাৎ কেমন বোকা-বোকা মনে হতে লাগল। সে কিছু স্থির করতে পারছে না। এতটা রাস্তা হাঁটবার সাহস নেই তার। তার ওপরে জল। ফিটফিট করে পড়ছেই। একটা ছাতাও নেই সঙ্গে। সে অসহায়ের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

চোখাচুখি হতেই মেয়েটা আবাব হেসে উঠল খিলখিল করে। সারা শরীরের সঙ্গে রুপোর বিছে হারটিও কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত চমকে উঠল। হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে গেল পিছনে। খোঁপার উপর দিয়ে ঘোমটা তুলে, মাথায় বসিয়ে দিল টোকা। বুকে কেটে-কেটে-বসা হাসিটা নিয়ে হৃৎপিণ্ডহীনের মত দাঁড়িয়ে রইল হরেন। ভাবল, হুঁ! রং চায় মেয়েটা।

সামনের চড়াইয়ের গা বেয়ে-বেয়ে মেঘ নামছে। লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিয়েছে রক্তের। বিদ্যুৎ ঝিলিকে টাটকা রক্ত ক্ষতের মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে লাল পাঁক। ক্রুদ্ধ খ্যাপা কুকুরেব মত দূর আকাশ গরগব করছে থেকে-থেকে। থেকে-থেকে দূরের রাজমহলের ইশারাটুকু হারিয়ে যাচ্ছে একেবাবে। আবার যেন কেউ পেন্সিল টেনে দাগ বসিয়ে দিচ্ছে।

ওদের চারজনকে ছাড়া লোক দেখা যায় না একটিও। সামনের রাস্তাটা গরু আর মানুষের পায়ের দাগে এবড়ো খেবড়ো কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে বীরভূমের সীমানা পাব হয়ে সাঁওতাল পবগণা পড়বে। তারপর একটু দক্ষিণে এসে আবার খাড়া পশ্চিমে, সাঁওতাল পবগণার মধ্যে পাঁচ ক্রোশ রলাটি। দূরে দূরে কিছু সাঁওতাল গ্রাম, মাঝখানে হঠাৎ বাঙালী গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস। সেই পাঠান যুগ থেকে এমনি আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে রইল হরেন। আবার ফিবে তাকাল দলটিব দিকে। সেই মেয়েটা সবচেয়ে পিছনে। তাকিয়েও বুকটা রনরন করে উঠল। মেয়েটার বলিষ্ঠ ঋজু পিছনটা যেন সমস্ত দলটিকে সাপটে হস্তিনীর মত দুলে-দুলে চলেছে। দেখতে দেখতে আবার কানে এসে পৌঁছাল অস্ফুট নিক্কণ।

আর দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়াল হরেন। সঙ্গে সঙ্গে পূবে-পশ্চিমে আকাশটা চিড় খেয়ে গেল বিদ্যুৎ-কশায়। মাটি যেন রক্তাক্ত মুখ হাঁ করে হেসে

উঠল। বাজ হানল আকাশে। হঠাৎ বাতাসে মরকুটে বাবলা ঝাড় নুয়ে-নুয়ে পড়ল। সামনের নেড়া তালগাছে সভয়ে কা-কা করে ডেকে উঠল একটা কাক।

হরেন চিৎকার করে ডাকল 'ওহে, ও বুঁড়ো শুনো ক্যানে।'

ওরা দাঁড়াল চারজন। মাটিতে পা দিয়েই বুঝল হরেন, বুট জুতো কামড়ে কামড়ে ধরছে কাদা। ওইটুকুনি যেতে হাঁফ ধরে গেল। কাছে গিয়েই আগে মেয়েটির দিকে তাকাল সে।

মেয়েটি তার দিকেই নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে। চোখে তার সেই মাতাল হাসি, একটু যেন ধারালো। ঠোঁটের কোণ তেমনি বেঁকে। বিদ্রূপ না মস্করা, বোঝা যায় না। কালো পাথর-চড়াই বুকের বাস কিছু শিথিল হয়েছে।

বুড়োর দিকে ফিরে বলল হরেন, 'গাড়ি আসে নি, আসবে কিনা কে জানে। চ' তোদের সঙ্গেই হাঁটা দিই।'

বুড়ো বলল, 'আরে বাপ! ই হয় না। আমরা জন-মজুর মানুষ, তাতেই আলামরা হয়ে যাই। আপুনি ক্যানে পারবে।'

বুড়ি সস্নেহ গলায় বলল 'হঁ। না, না ই হয় না।'

মেয়েটি হঠাৎ ধারালো ছুরির মত চকিতে হেসে বলল, 'প্রাণ চেয়েছে হাঁটতে।' বলেই আবার চড়াইয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে উঠল।

বুড়ি বলল, 'আঃ, ই কি হাসি। বড় বেহায়া তু, বউ।'

মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটি মুখে আঁচল চেপে একেবারে চুপচাপ। বুড়ো আবার বলল, 'আকাশের গতিক ভাল না। আপুনি থাকেন গো। অলাটি কি এখানে? আমবা যেছি গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বুলব।'

হরেন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'না,যাব। এই তোরা ক'জনা রইছিস। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে-বলতে চলে যাব।'

আবার চিকচিক বিদ্যুৎ হানল। মেয়েটাও হাসল বিদ্যুতের মত। আবার এক ঝলক বাতাস নামল হুস করে। মেয়েটা দ্রুতগতি মেঘের মত চকিত বাঁকে চড়াইয়ে পা বাড়াল।

বুড়ো বুড়ি খানিকটা অসহায়ের মত চুপচাপ রইল। তারপর হাঁটা ধরল। এবার মেয়েটা সকলের আগে। চড়াইয়ের পরে মেঘ। যেন মেঘে-মেঘে হারিয়ে যাবে, সেই দিকে নিশানা। বাতাস এলে ছাট বেশি আসে। নইলে মন্থর ফিসফিসে। আর এই জলে পিছল মাটি পায়ের ধাবে হ্যাঁচকা দেয়। দশ পা হাঁটলে পাঁচ পা এগুনো যায়। পা নেমে আসে হড়কে।

হরেন একদিক ঘেঁষে চলল। যেখান থেকে মেয়েটাকে পুরো দেখা যায়। দেখতে গান মনে পড়ল। মনে পড়তেই গুনগুন করে গেয়ে উঠল, 'সখি, আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও....' ওদিকে চোখাচোখি হল মাঝ-বয়সীর সঙ্গে মেয়েটির। আবার হাসি। বুড়ো-বুড়ি নির্বিকারভাবে উঠছে ঠেলে-ঠেলে।

ওরা যত ওঠে,আকাশ তত ওঠে। উপরের বাতাসের জোর বেশি। বড় চড়াই। সময় নিচ্ছে উঠতে। তারপর উৎরাই। সেখানে দশ পা নামতে, বিশ পা ঠেলে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় মুখ গুঁজড়ে ফেলতে। উৎরাইয়ে এসে, ঘাসের পর দিয়ে চলল সবাই। ঘাসে পেছলায় কম। কিন্তু ঘাসের তলে-তলে পাঁক। টেনে-টেনে ধরে। যত না ধরে খালি পা, তার চেয়ে বেশি জুতো। উৎরাইয়ের ধাপে-ধাপে হঠাৎ মাথা তুলছে কয়েকটা তালগাছ। কোথাও কিছু নয়, যেন হঠাৎ কতকগুলো দত্যি মাথা নেড়ে-নেড়ে কানাকানি করছে। খসখস শব্দে হাসছে মানুষ দেখে। আর কিছু নেই। শুধু উঁচু নিচু উঁচু। মেঘ বসেছে চেপে-চেপে।

মেয়েটাকে শুনিয়ে হরেন জিগ্যেস করল বুড়োকে, 'বউ দুটো কে হয়, বটে ?'

বুড়ো টোকার তলা থেকে বলল, 'বিটার বউ। দুটো বিটার বউ। বিটারা গেলছে সক্কালবেলা, আগে-আগে। ইয়াদের লিয়ে এখন আমি চলছি।'

সাবধানে নামছে হরেন। নজর আছে আগে-আগে। যেখানে জলের মত তরতর করে গড়িয়ে চলেছে মেয়েটা। ওর কালো পায়ের শক্ত গোছা দেখে মনে হয়, মাটিতে বসলে আর উঠবে না। কিন্তু অমন পা দু'খানি যেন পাঁকে বসছে কি না বসছে। ছিটকে যাচ্ছে রক্ত পঙ্ক। লালে লাল হয়ে গেছে সকলের পা। হরেনের কালো জুতো লাল হয়ে এসেছে। কাপড়ে লেগেছে চাপ-চাপ রক্তের মত।

হরেন ভাবছে, বুড়োর সঙ্গে ভাব করা যাক আগে। রলাটির ছোকরা-বাবুদের মন চেনে ওরা। কথার ভাবে বোঝে, কি চায় বাবুরা। বলল, 'তবে ই বয়সে তুমার দুটা বুড়ো-বুড়ির তো বড় কষ্ট, হে ?'

বুড়ো হাসল টোকার তলায়। বৈরাগীর আত্মভোলা হাসির মত। বলল, 'কস্‌ট ? কস্‌ট কি গো বাবু। ই কি রোগ ব্যামো যে, কস্‌ট হচ্ছে ? সম্‌সারে যাবৎ মানুষ খাটে, খাটতে হয়। সি কুনো কস্‌ট লয়। ইটা খাটুনি। যখন লারবো, তখন মনে কস্‌ট হবেক।'

হরেনের মন বিগড়ে উঠল বুড়োর কথা শুনে। এর মধ্যেই তার বুকে হাঁফ লাগছে, গলায় উঠছে সাঁই-সাঁই শব্দ। কোমরে গাঁটে-গাঁটে কনকনানি। আর ওর বুড়ো হাড়ে কোন কষ্ট নেই। ব্যাটা বজ্জাত, বেশি দুর হরেনকে এগুতে দিতে চায় না। হরেন আবার বলল, 'তা, বউ-বেটা সব চলেছে, লাতিলাত্‌কুর নাই ?'

বুড়ো খালি বলল, 'নাঃ।'

বলতে গিয়ে বুড়োর বুকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে রইল। আটকে রইল যেন সকলের বুকেই। বুড়ো-বুড়ি, মাঝ-বয়সী আর···না, মেয়েটার ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। ঝুঁটি-পাযরার মত বুক এগিয়ে নেমেই চলেছে। তবু কেমন একটা স্তব্ধতা !

কেবল পাঁকে-পাঁকে থপ-থপ চপ-চপ। কালো-কালো কতকগুলো থ্যাবড়া পা, আর লাল কাদা। আকাশের ডাক বাড়ছে। ডাকছে ওই সামনের চড়াইয়ের মাথায়। চড়াইয়ের গা দিয়ে নামছে হিলিবিলি বিদ্যুৎ, চিকচিক করছে তালবনের মাথায়। দগদগিয়ে উঠছে লাল পাঁক। তরল পাঁক গরুর গাড়ির লিক বেয়ে-বেয়ে গড়াচ্ছে আঁকাবাঁকা সাপের মত। তরল কিন্তু আঁটালো। অন্ধকার নামছে। কে বলবে, এখন ভবদুপুর, যেন সাঁঝের শাঁক বাজানোর সময় হল।

আস্তে-আস্তে ওদের চারজনের গতি বাড়ছে। বাড়াতে হচ্ছে হরেনকেও।

তারপর অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বুড়ো হুস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। যেন এতক্ষণ ধরে চেপে ছিল দম। আর সেই মুহূর্তেই আকাশটা জলের তোড় নিয়ে গলে-গলে পড়তে লাগল। পট্‌পট্‌ ফুটতে লাগল ওদের তালপাতার টোকাগুলোতে।

তার মধ্যে গোঙানির সুরে বুড়ো বলল, 'হঁ, ছোট বিটার এট্টা ছেল্যা হয়েছিল। তা, পরে মরে গেল গো, বাবু। এই সিদিনে, ছ'মাসের ছেল্যা··'

বুড়ির গলা দিয়ে শব্দ বেরুল, 'হঁ হ হ ···।'

ও ! ওই মেয়েটারই ছ'মাসের ছেলে মরে গেছে। কিন্তু····

'দুর ! বিরক্ত হয়ে উঠল হরেন। বৃষ্টিটা বেড়েছে। জুতো ভিজে ঢোল। কাপড়ের কোঁচা দিয়েছে মাথায়। কিন্তু সব সপসপে হয়ে উঠেছে। বুড়োও যেন বৃষ্টির মত ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করল।

সে লাফিয়ে-লাফিয়ে আগে গেল। আগে, মাঝ-বয়সীটিকে পার হয়ে তার আসলটির কাছে। হুঁ। গালের পাশে এখন সেই হাসিটি লেগে রয়েছে। আড়চোখে দেখছে হরেনকে। দেখছে, আব কেঁপে কেঁপে উঠছে ভ্রূ দু'টি। মদ্দাব খুনসুটি চায়। পাশাপাশি দু'হাত ফারাকে এসে পড়ল হবেন। হাঁপিয়ে পড়েছে আসতে। বলল।কেয়া বউ, তু যে ঘোড়ায় জিন দিইছিস!'

মেয়েটি চকিত চোখে তাকিয়ে দেখল হরেনের আপাদমস্তক। দেখে আরও হাসি পেল। পাওয়ার মত চেহারাই দেখাচ্ছে হরেনের। ভেজা জামা লেপটে, একটুখানি শরীরটি দুমড়ে গেছে যেন। কিন্তু চোখ জ্বলছে দপদপ।

জ্বলছে রক্তের মধ্যে। পথচলা আর দুর্যোগকে কাবু কবে দিচ্ছে। তবু নিজের রক্তে-বক্তে মেয়েটার হাসির কাঁপুনিটা অনুভব করছে। পশ্চিমে ছাট জলেব। টোকার তলা দিয়ে জলেব ছাটে বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিজে-ভিজে যেন আবও তীব্রভাবে সব খুলে দিয়েছে রেখায়-রেখায়। বেখাব বাঁকে-বাঁকে অস্পষ্ট বিদ্যুতের মত রুপোর বিছে-হাবটিব শেষ দেখা যাচ্ছে। খেয়াল নেই, টানাগোছার সময়ও নেই। শুধু টেপা ঠোঁটেব কোণে-কোণে, টানা চোখেব আঙিনায় কি যেন খেলে বেডাচ্ছে: রং খেলছে। রং চায় কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে পাল্লা দেওযা শক্ত। দু'হাত ফাবাক। দেড়-হাত ফারাক কবল হবেন। ওই আকাশেব মেঘের মত মেয়েটার নিটোল পেশী দুলে দুলে যেন নেমে আসছে হবেনের চোখের সামনে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে শরীরের উঁচু-নিচু বাঁকে।

দারুণ বাতাস এল পলাশবনের মাথা দুলিয়ে। আকাশে আচমকা বিদ্যুতের কাটাকাটি ধাঁধিযে দিল চোখ। যেন অনেকগুলো খ্যাপা কুকুর তীব্র চিৎকারে মাতামাতি শুরু করল। চোখের নজব হারিয়ে গেল হবেনেব। সামনে শুধু জলেব ধাবা। সেই সঙ্গে অস্ফুট হাসির শব্দ।

বুড়োব গলা শোনা গেল 'সামলে গো। সামলে চল। আবাব জোব লেমেছে। সামনে কিন্তুক লদী।'

নদী আছে। হবেন দেখল, সে সকলের পিছনে। ছাযার মত চাবজনের দলটা তাব আগে-আগে। সে মনে-মনে বলল, 'এঃ শালা, মবতে হবে নাকি ? বৃষ্টির ঝাপটা তাকে যেন বুকে চেপে ঠেলে দিচ্ছে পিছনে।

পরনেব কাপড়টি সে হাঁটুর চেয়েও এক বিঘৎ ওপবে তুলে ফেলল। তার সরু পাযে জুতো-জোড়া যেমন বড়, তেমনি ভাবি দেখাচ্ছে।

রাস্তা বদলে গেছে। পাথর ছড়ানো রাস্তা। বড-বড় চাংডা, খোঁচা-খোঁচা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তারই আশপাশ দিয়ে যেতে হবে। হবেনের চেয়েও বড-বড় পাথর। যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে থমকে আছে। মাথা ঠুকলে রক্তপাত নিশ্চিত। আর এবই তলে-তলে পাঁক।

সামনে নদী। ছ'হাত চওড়া নদী। এখন কোমর জল। অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না। কিন্তু কোমর-জলেই যা টান। ব্যাং ছানার মত টেনে নিয়ে যেতে চায়। তোড়ের মুখে হাসছে খলখল করে।

মেয়েটাও হাসছে। জলের নিচে পাথরে হোঁচট খেয়ে একেবারে ডুব দিয়ে উঠেছে, তাই হাসছে। সে হাসিতে নদীর হাসিও চাপা পড়ে যায়।

হরেন পার হল। বুড়ি তখন ছোবড়া পাকাচ্ছে। বুড়ো টোকাব তলায় কলকে সাজাচ্ছে।

হরেনের চোখ তখন আধ-ঘোলা। দেখল মেয়েটার গায়ে কাপড় নেই। রক্তের জ্বালায় ন জলের ঝাঁপটায়, কে জানে, তার কাঁপন ধরল। কাপড় নেই নয়, আছে। না থেকে আছে। জলে ডুবে উঠেছে। কালো শরীর ছাপিয়ে উঠে ঝিলিক হানছে। কাপড় উঠেছে হাঁটু অবধি, পিঠ গেছে

খুলে কাছে যাবার জন্যে ব্যাঙের মত লাফাতে লাগল হরেন। মাঝ-বয়সীকে কি যেন বলছে মেয়েটি। ফিরে-ফিরে দেখছে হরেনকে আর বৃষ্টিধারার মত মরছে হেসে।

আবাব, আবার আসছে মুষলধারে। হরেন তবু কাছে গেল, মাঝ-বয়সীকে জিগ্যেস করল, 'তোরা হাসছিস যে?'

মাঝ-বযসী এতক্ষণে বলল, 'ক্যানে? তুমাকে দেখে। ক্ষ্যামতা নেই, আসতে ক্যাম্নে গেলে।'

হরেন হাঁপিয়ে-হাঁপিযে জবাব দিল, 'ক্যানে, এই তো চলছি।'

তার হাঁপ-ধরা দেখে ওরা দুজনেই হেসে উঠল। মেয়েটা আবার কাছাকাছি। চোখে বিদ্যুৎ হেনে হেসে বলল, 'সামনে লিদেন আসছে যে।'

নিদেন! বুকেব মধ্যে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল হবেনের। মবণ আ৽,ছে তার সামনে! পিঠেব শিবদাঁড়ার কাছে কি যেন নামছে হিলহিল কবে।

মেযেটা আবও কাছে। ওর বৃষ্টি-ধোয়া গায়ের গন্ধ লাগছে তাব নাকে। ওর নিচে ওপুবে, বিশাল শ৽বীবের প্রতিটি পেশীর পেষণ-শব্দও যেন কানে আসছে হবেনেব। যেন রং চায় ওর প্রতি অঙ্গ।

কিন্তু রংটা ঘোলা হযে উঠছে হবেনের চোখে। নিশিরাইয়েব কাছে আসা গেল। বুড়োও চেঁচিযে বলল, 'নিশিআই আসলো, গো। আব একটু পা চালাও।'

নিশিবাই। হবেনেব দাঁতে দাঁতে লাগছে ঠকঠক করে। শীত ধরেছে হৃৎপিণ্ডে। বিদ্যুৎ-কষায় লাল তেপান্তব দগদগে ঘাযেব মত লাগছে চোখে। তালের পাতায় চাপা তীব্র সুরে গোঙাচ্ছে বাতাস। যেন পেতনী কাঁদছে।

ওরা মুখ বুজে চলেছে এবাব। এদেরও নিশ্বাস হয়েছে ঘনঘন। থ্যাবড়া পাযে মাটি থ্যাতলাচ্ছে

মেযেটা কোথায উধাও হযে গেল। ওই, ওই যাচ্ছে। পাযবা নয, নাগিনীব মত লকলক করে চলেছে। আব মনে হচ্ছে, তাব হৃৎপিন্ড উঠে আসছে গলা দিযে, আর নিচে থেকে অবশ হয়ে যাচ্ছে শবীর। অবশ, অবশ একেবারে।

আবার বাজ হানলে কব্বড শব্দে। একেবাব অন্ধকার হযে গেল হরেনেব চোখ। শালিকের প্রাণ খাবি খাচ্ছে। পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

'আ হা হা ....' বুড়োটা সস্নেহে সভয়ে চিৎকাব করে উঠল। বুড়ো-বুড়ি ছুটে এল। তাবপর মাঝ-বযসী। তার পিছনে সংশয়ান্বিত পায়ে-পায়ে এল মেয়েটা।

বুড়ো বসে ডাক দিল, 'আ-হা-হা! উঠো, উঠো গো বাবু। বলছিলাম তখন।'

ওঠে না হবেন। জলে ভিজে ভিজে, হাড কেঁপে অচৈতন্য হয়েছে। বুড়ো বলে উঠল, 'হে ভগবান। ইয়ার জ্ঞান লাই যে গো।'

জ্ঞান নেই। কে টেনে তোলে? বুড়ো-বুড়ি কাহিল। মাঝ-বযসী রুগ্ন। মেয়েটাই টেনে তুলল। তুলে নিয়ে গেল একটা মহুয়াব তলায়। বুড়ো অসহায়ের মত তাকাল পশ্চিমে। এখনও দেড় ক্রোশ। উই দূরে, পাহাড়টা গেছে আরও সবে। তাব নিচে একটি কাল্‌চে রেখা। ওইটে অলাটি। অর্থাৎ রলাটি।

হরেন কাঁপছে থরথর করে। কাঁপছে আর লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কষ দিয়ে।

বুড়ি বলল, 'বউ নোকটার কাঁপন নেগেছে যে? বাঁচবে তো?'

মেয়েটির চোখেও অসহায়তা। তার টানা চোখে ভয় ও ব্যথা। বলল, 'তা—ই জেনো! আগে শুখ্‌না কাপড় একখানা দেও এখন।'

বুড়ি তাই দিল বোঁচকা খুলে। মেয়েটি তার কোলে টেনে নিয়ে বসেছে হরেনকে। ভেজা জামা ছাড়িয়ে, মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড় জড়াল তাকে। নিজের টোকাটি দিল হরেনের মাথায় ঢেকে। মাঝ-বয়সী তার টোকাটি দিল হরেনের পায়ে। বৃষ্টি তো বন্ধ নেই।

তারপর কোলের ছেলেকে যেমন করে বলে তেমনি সস্নেহ গলায় বলল, 'ইয়ার বড় বাড়াবাড়ি। আমরা যেছি অলাটি, তো খবর দিতুমনি? তা ই নোকের বড় বাড়াবাড়ি।'

বলতে বলতে হেসে ফেলল মেয়েটি। স্নেহ করুণ হয়ে উঠল চোখ। সেই চোখে সে দেখল হরেনের আপাদমস্তক। চোখাচোখি করল মাঝ-বয়সীর সঙ্গে।

বুড়ো বলে উঠল, 'হঁ। নোকটাকে তু বাঁচা গো, বউ। ই বুড়ো হাড়ে তো ক্ষ্যামতা লাই।

মেয়েটা বলল, 'অ মা! তবে কি মেরে ফেলছি নাকি গো। বাপ-মায়ের ছেল্যা তো এট্টা'

'হ্। বাপ মায়েব ছেল্যা!'

হঠাৎ এই বর্ষণ মুখরিত রক্ত তেপান্তরেব খাড়াই-উৎরাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তালপাতার বাতাসে গুমরে-গুমরে উঠল কান্না। বাবলা ঝাড বাতাসে মাটিব বুক ভরে নুয়ে-নুয়ে পডতে লাগল।

ছোট বিটার ছ'মাসেব ছেল্যাটাব শোক চারটে বুকে পাথর হয়ে জমে আছে। সে তো বাপ মায়ের ছেল্যা ছিল।

মেয়েটা দু হাত দিযে সাপটে ধবল হরেনের অচৈতন্য মুখ, 'ই কি বাডাবাড়ি বাপু তোমাব, অ্যাঁ? মানুযেব জীবন, সে কি ছেলেখেলার জিনিস। ছেলেখেলা করতে এসে মানুষ এমনি করে মরণ ডাকে!'

হঠাৎ আবাব কেঁপে উঠল হরেন। হাত-পা খিচিযে থবথরিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ। 'এ্যাই, এ্যাই দেখ ক্যানে, কাণ্ড' সভয়ে বলতে-বলতে মেযেটি বুকেব কাছে আরও আঁকড়ে নিল হরেনকে।

বুড়োও কাঁপছে। যত না জলে, তাব চেযে বেশি ভযে। বলল, 'তোবা থাক ইখেনে। আমি যেছি। যেযে গাডি পাঠাযে দিই।'

মেয়ে বলে উঠল, 'হঁ, তুমি যাও গো, বাবা, ই তো ভাল বুঝি না।'

বুড়ো চলে গেল।

মাঝ-বযসী বলল মেয়েটিকে, গরম কবতে হবে। শবীবে কিছু নাই।'

মেয়েটি আরও বুকে চেপে ধরল। মাঝ-বয়সী বলল, 'আ, মরণ! বুকের ভিজা কাপড়টা ক্যানে চাপছিস। আরও জল নাগছে যে মুখে। কাপড সরা। নজ্জা কিসের? বাপ-মায়ের ছেল্যাটা। বুকের ওম্ পেলে গবম হবে।'

মেয়েটি কাপড় সরিয়ে দিল। কড়-কড় করে বাজ হানল। সাপিনীর মত বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে নেমে এল মাটিতে। কিন্তু আকাশের সব ভয় সমারোহ এখানে কেমন শান্ত ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাকে আড়াল করে মানুষ মানুষের মৃত্যু-শীতকে তপ্ত করছে। মেয়েটার বুকে ওর ছেলেটার দাগ রয়েছে এখনও। হরেনকে ওর উত্তাপের চাপে-চাপে গরম করতে লাগল। একটু-একটু করে, অনেকক্ষণ ধরে।

যেন একটুখানি ছেলে, সবটুকু কোলে ধরা যায়।

এবার সত্যিকারের অন্ধকার নামছে। মেঘ তাকে গাঢ় করছে। এখনও গরাইয়ের সেই মানুষ -ডোবা রক্ত-পাঁক পার হতে হবে।

হঠাৎ মেয়েটা চমকে উঠল। বিছের মত সুড়সুড় করে কি যেন উঠে এসেছে তার বুকে, কোমরের আশপাশে। দেখল চোখ চেয়ে হরেন। যেন স্বপ্ন দেখছে, এমনি বিস্ময়! যেন সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই আর একবার কেঁপে উঠল সে। বিস্ফারিত চোখে আব একবার দেখে হিংস্র চোখে হেসে উঠল সে। মুহূর্তে সরু সরু দুটো হাত দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরল মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রথমে হরেনের জ্ঞান দেখে হেসে উঠল। হাত দুটো সরিয়ে দিল গায়ের ওপর থেকে। পরমুহূর্তেই হরেনের রুগ্ন মুখটার হিংস্রতা দেখে থমকে গেল। রক্তের মধ্যে সেই আগের দর্প পেয়ে হরেন প্রাণপণে হাত প্রবেশ করিয়ে দিল মেয়েটার দু'হাতের তলা দিয়ে। মুখ তুলে আনতে চেষ্টা কবল ওপরে।

দপদপ করে জ্বলে উঠল মেয়েটার টানা চোখ। তার বলিষ্ঠ নিটোল হাতের এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিল হরেনকে। বলল, 'আ মরণ, কেম্নোর মরণ গো!' বলে, সেই ক্রুদ্ধ মুখেও হেসে উঠল মেয়েটি, 'ই আব বাঁচবেনি দেখছি, গো।'

বিদ্যুৎ চমকে, দিকে-দিকে, উঁচু-নিচু তেপান্তর যেন হাসছে বক্তাক্ত মুখে। আর তালের সারি যেন অশরীরী ছায়াব মত পায়ে-পায়ে আসছে এগিয়ে।

হরেনের গায়ে এমনিতেই কাদা মাখামাখি। আবার কাদা লাগল। পাঁক থেকে মুখ তুলে কিছু বলার উদ্যোগ করল। চোখ তার তখনও মেয়ে-বুকের উত্তাপে চকচক করছে।

এমন সময় উপরের চড়াই থেকে হাঁক শোনা গেল বুড়োব। বলদেব ঘন্টা শোনা গেল। গাড়ি আসছে।

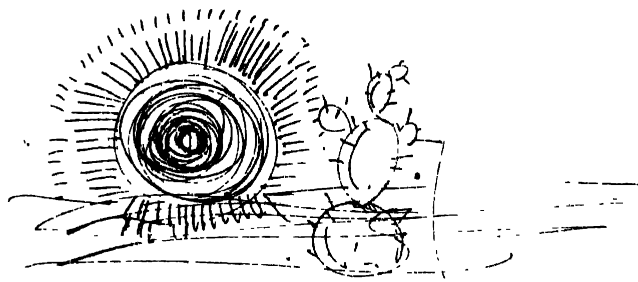
গাড়ি এল, গদাই রায়ের ছেলেটাকে তুলল। তুলে চলল।

এতক্ষণে শরীরের যন্ত্রণায় হরেনের চোখে একটি নোনা-ধবা চোঁয়াচ্ছে।

বৃষ্টি তখনও তেমনি। ওরা চারজন গাড়ির আগে চলল। মেয়েটির চোখ যেন হঠাৎ রুদ্ধ অভিমানে দুরন্ত হয়ে উঠল। বুকের কাপড়টা কষে টেনে দিল সে। ওদের পিছনে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে গাড়ির চাকা দুটো কঁকাচ্ছে। কঁকিয়ে কাঁদছে।



জোয়ার ভাঁটা



'ক'টা লাও আসবে বাবু?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কৈলাস?

'দশটা।' জবাব এল আড়তের চালাঘর থেকে।

সবুজ শাড়ি-পরা কামিনটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কী?'

আবার জবাব এল বিরক্তিভরে—'বললাম তো, সাত নৌকো বালি আর তিন নৌকো টালি।'

অমনি সবুজ আর লাল শাড়ি-পরা দুটি কামিন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে সরু গলায় গেয়ে উঠল

ওই আসে গো ওই আসে লা'যে ভরা টালি
ঘরে আমার ছা ঘুমোয়
মিন্‌সে পড়ে শুঁড়িখানায়
বেলা না যেতে আমি লাও করব খালি॥

মেয়ে ছিল জনা-পাঁচেক, পুরুষ ছিল পনের জন। পুরুষদের ভেতর থেকে কয়েকজন হাততালি দিয়ে উঠল বাহবা বলে। মেয়েরা হেসে উঠল সব খিলখিল করে।

হঠাৎ প্রৌঢ় ভোলা দাঁড়িয়ে উঠে, এক হাত কোমরে আর এক হাত কানে দিয়ে জোর গলায় উঠল গেয়ে ·

মিছে কথা ক'স্‌নি লো বউ, মিছে কথা ক'সনি।
কাল সন্‌ঝের এ পোড়া চোখে শুঁড়িখানা দেখিনি॥
দিন খেটে, ছা' লিয়ে তুই মোর পাশে রাত কাটালি!
কুড়ে বউ ও কুড়ে বউ, তুই মিছে দোষে দুষলি॥

মেয়ে-পুরুষের মিলিত গলায় একখানা হাসি হুল্লোড়ের ঢেউ বয়ে যায়। মুহূর্তে যেন জমকে ওঠে সকালবেলার গঙ্গার ধার।

সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে। ভাঁটা-পড়া গলাও লাল জলে লেগেছে বৈশাখী রোদের ধার। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথা চকচক করে রোদে। ভাঁটায় জল নেমে পলি পড়েছে ধারে ধারে। কাঁকড়ার বাচ্চা কুড়োচ্ছে খাবার জন্য কতকগুলো হা-ভাতে ছেলে।

ওপারে চটকল দেখা যায় একটা। এপারেও চটকল উত্তরে-দক্ষিণে। মাঝখানে আড়ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বালি ও টালির ভাঙা টুকরো ছড়ানো উঁচু পাড়। দু-তিনটে ছোট-বড় ন্যাড়া ন্যাড়া গাছ। গাছের গা ও অবশিষ্ট পাতাগুলো ধুলোর ভরা। জায়গাটা উঁচু-নিচু, তাই লরি দুটো খানিকটা দূরে পিছনের মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। লরি দুটো এসেছে মাল

তুলে নিয়ে যেতে।

আর নৌকো থেকে মাল খালাস করার জন্য এসেছে এই মানুষগুলো। এরা দিনমজুর কিন্তু অনিশ্চিত এদেব দিনের দিন মজুরি পাওয়া, কেন না, এসব আড়তে কখনো একসঙ্গে দু'তিন দিনেব কাজ থাকে না। মাল আনা আর দেওয়ার একটি কেন্দ্র মাত্র। তাই এরা ফেরে রোজ কাজেব সন্ধানে, আডতে, ইঁট পোডানো কলে, বাডি ঘর তৈরি কন্ট্রাকটরের ফার্মে, কাঠ-সুরকির গোলায়। কাছে কখনো, কখনো দূরে! ওদেব রোজ মজুরের নির্দিষ্ট মহল্লায় কোন কোন সময় আপনা থেকে ডাক আসে।

কিন্তু যেদিনটা ওরা কাজ পায না সেদিনটা ওদেব অভিশপ্ত। এ ছন্নছাড়া আয়ের মতো জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক, বেশী হোক কোন বাঁধা আয় নেই অথচ বাঁধা আছে পেট। তবে এ জীবনে পেটটাকেও গোঁজামিল দিতে শিখেছে ওবা। ঘরও নেই, বাবও নেই, জীবনের রঙ্গ অঙ্গ সবটাই এখানে। এখানটায ফাঁক গেলে সব আঁধাব। আঁধাবেব সব কুরূপ না ওৎ পেতে আছে ওদেব চাবধাবে। তাই হাতে যেদিন কাজ থাকে. সেদিন মূর্তিমান আনন্দ। বন্ধনহীন মন, তোলপাড হৃদয, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ নয, যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ আশ।

হৈ হৈ হৈ, ঐ আসে গো ঐ।

কী কী কী ? গোবা সায়েবের ঝি।

আগেব গানেব প্রসঙ্গ পাল্টে জোয়ান মদন গেযে উঠল চেঁচিযে কানে আঙুল দিযে।

গোবাব বেটিব মেজাজ চড়া, কাজের হদিস বড কড়া

বউ লো বউ, কাজে হাত লাগা —

সুবের শেষে টান দিয়ে সে একটু বিরক্তিভবে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মেযেদেব দিকে। এবপব মেযেদের সুব ধবতা কথা।

কিন্তু দেখা গেল মেযেবা নারাজ। টিপে টিপে হেসে তাবা মাথা নাডল। মুখ ফিরিযে বসল কেউ নিরুৎসাহে গা এলিযে। পথে আসতে কুডিযে পাওযা, খোঁপায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়া ঢেকে দিল ঘোমটা তুলে। যেন গানের তালে ফাঁক দিতে গিযে সুব থেমে গেছে। সেই ফাঁকে ভাঁটা ঠেলে জোযাব এসে পডল গঙ্গাব বুকে। এল নিঃশব্দে চোরা বাপেব তলে তলে। শুধু হাওয়া আসে যেন কোত্থেকে ধেযে। আসে চটকলের জেটির গাযে ধাক্কা খেযে, ক্রেইনের মাথায় লাল ন্যাকডায় ফালি উডিযে এপাবে ওপাবে আগুনেব মত কৃষ্ণচূড়াব মাথা দুলিযে।

হা-ভাতে ছেলেগুলো মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পডল জোয়াবের জলে। স্টীমলঞ্চ একটা টেনে নিযে চলেছে বিবাট গাধাবোট দক্ষিণ থেকে উত্তবে।

লবির ড্রাইভাব এসে দাঁড়াল জলটার সামনে।—সে এদের পরিচিত গুণী বন্ধু। অতবড় একটা গাড়িকে সে খুটকুট মেশিন মেডে বোঁ বোঁ ক'বে চালিযে নিযে যায়, গাযে পরে সাহেবী কুর্তা, ফোঁকে সিগারেট, তাকে নিজেদের মধ্যে পেযে তারা গৌববান্বিত।

বুড়ো গোবর তার ঝুলে পড়া গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল, 'বোসে পড় ওস্তাদ'।

মেয়েদেব দিকে একবার চোরাচোখে কটাক্ষ করে কানাই বলল, 'গানই থেমে গেল তো, আর বসব কি সর্দাব।'

গোবর সর্দার নয়, কিন্তু সামনে প্রায় তাই। অনেক বযস ও বহু ঝড়ে ঝাপটায় তার ভাঙাচোরা মুখটায় মোটা গোঁফের মধ্যে লুকানো তিক্ত অথচ উদার হাসির ধারে একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে আছে। বয়সের চেয়েও শক্ত মোটা গলায় বলল সে, 'ওস্তাদ, দুনিয়াতে কিছুর থেমে থাকবার যো নেই।'

'যো নেই তো থামলে কেন?' কানাই আবার কটাক্ষ করল মেয়েদেব দিকে।

'মুখে থেমেছে, মনে থামেনি। শুধোও ওদের।' বলে সে নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কিবে শ্যামা গান থেমে গেছে?'

সবুজ শাড়ি-পরা শ্যামা তেমনি মুখ টিপে ঘাড নাড়ল। অর্থাৎ, না।

কিন্তু মদন না মানবে কেন। সে নিজের পাছায চাপড মেরে বলল, 'আমি বলছি থেমে গেছে নইলে গলা কেন দিচ্ছে না।'

'আরে জানলে তো।' ভোলা বলল মুখ বেঁকিযে, 'মাগীরা আবাব গাইতে জানে কবে?'

আব একজন বলল, 'আয শালা আমরাই গাই, ওদের বাদ দে।'

গাইযে মবদের দলটা বসল এক জোট হয়ে।

অমনি কামিনী বুড়ি দাঁড়িয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, 'মাগীরা গাইতে জানে না, জানিস তোবা মরদঁরা। য্যাতো মদগাঁজাখেকো হেঁড়ে গলায়, আহা কি বাহার!'

বলে কোমরে হাত দিয়ে মাজা দুলিয়ে ভেংচে উঠল,

হে হৈ হে তোদের মরণ আসে ঐ।

একটা বোল পড়ে গেল দমফাটা হাসির। মেয়েদেব ঢলে পড়া হাসি যেন জ্বালিযে দিল গাইয়েদের। মনে হয, আধা ল্যাংটো খালি-গা মানুষগুলো যেন এক মহাখুশীব মজলিশ বসিয়েছে গঙ্গাব ধারে।

আড়তেব বাবু গঙ্গামুখো হয়ে গদীতে বসে হবিনামের মালা জপছিলেন। জপের মাঝে গণ্ডগোল হওযায়, দাঁতহীন মাড়ি খিঁচিযে উঠলেন, 'জানোযারের দল।'—

আড়তেব বাঁধা কুলিটা বসেছিল দরজার কাছে, বেগড়ানো মুখে। সে কুলি বটে, কিন্তু বাঁধা কাজেব মানুষ। সেই আভিজাত্য বোধেই দিনমজুরগুলোর কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে বসেছে। বাবুব গালাগালটা শুনে সেও ঠোঁট উল্টে বলল, 'শালা লুচ্চা লাফাঙ্গাব দল।'

কামিনী তখনো বসেনি। সে গাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলল, 'এত জানিস তো, আগের গীতটা ছেড়ে কেন দিলিরে?'

ও। তাও তো বটে। আগের গানটা যে থেমে গেছে মেয়েদের জবাবেব মুখে এসে! আসলে ভোলা বা মদন আগেব গানটার সব জানে না!

গোবর চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে সেইটেই শুরু করে দেও, নেতিয়ে গেল।'

মুহূর্তে শ্যামার সঙ্গে লাল শাড়ির গলা মিশে সুরের ঢেউ তুলল,

মিছে কথা ক য়োনি, মিছে ভয় করিনি,
তেমন বাপেব ঝি আমি লই হে
চোখে বালি, মাথায় টালি, সারাদিন হাড় কালি
তুমি যে নেশায় ভোম্ গাছতলায় শুয়ে হে।

হঠাৎ এক মুহূর্তের বিরতিতে সবাই স্থির হয়ে গেল, থেমে গেল তালে তালে ঝাঁকানো ও হাততালি।

শ্যামা একটা বিলম্বিত লযে দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, হায়! · · হায়। · · ·আর লাল শাড়ি সরু গলায় টেনে টেনে যেন বহু দূর থেকে গেয়ে উঠল,

খেটে-খুটে শরীল অবশ, তবু তোমায় তুলি ঘাড়ে,
বলগো সব জনে জনে, একলা মেয়ে, কেমনে যাই ঘরে।

বিবাদ ভুলে গেছে গাইয়ে দল। মনে হয় এখানে সকলের বুকই বুঝি দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠেছে

অভাগী কামিনা বউয়েব বিলাপে।

কাব গোঙানো গলাব স্বব ভেসে এল, 'আমরা বেইমান।'

এবাব উঠল সেরা গাইয়ে কৈলাস। তাকে সবাই বলে শুধু। আসলে সে বাউল-বৈরাগী। তার নেই ঘবে বউ৹ ছেলে। তাব ডেবা ঘরে ঘরে। দিন-মজুবেব জীবনের আড়ালে তার মনের অনেকখানিই গেরুয়া বং-এ ছোপানো।

আব এ গেরুয়া বং-এবই ছোপ খানিক খানিক দাগ ধরিয়ে দিয়েছে এই চোখ-ধাঁধানো লাল শাড়িতে ঢাকা মনের মধ্যে। লাল শাড়ির ঘব খালি। ভরা বয়সে এ জীবনের ভারেব ভয়ে পলাতক তার সোযামী। আছে শুধু শ্বাশুড়ী ওই কামিনী বুড়ি। কিন্তু তার শ্বাশুড়ী, 'সবার বেলায় সড়োগড়ো, বউযেব বেলায় বড দড়ো।' তাই বজ্র আঁটুনিব ফস্কা গেরোর মত গেরুয়াব ছোপ তাব মনেব অতলে। কি যেন খোঁজে তাব বিবাগী মন। কৈলাসকে দাঁড়াতে দেখে হাসির ঝিলিক ফোটে তাব কাজল চোখে, হাজাব কথা ঠোঁটেব কোণে। এইটুকু কামিনী বুড়ি। টের পেলে আর বক্ষে নেই। তবু কৈলাস এক অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িযে নিজেকে দেখিযে গেযে উঠল,

মোবে ধিক ধিক ধিক, মন যে আমাব বশ মানে না,
আমাব ভাঙা ঘব, খালি পেট, তবু যে যাই শুঁড়িখানা।
আমাব ছাইযেব শুকনো মুখ, বউয়ের আমাব শুকনো বুক,
আমি দেশ হ'তে দেশান্তরে, আড়ত গোলায খুঁজি সুখ,
আব যাবনি, আর যাবনি, মোবে দে বাঁধা কাজের ঠিকানা।

কৈলাসের গানের রেশ শেষ হবার আগেই, ফুঁপিয়ে কান্নাব ভঙ্গীতে দ্রুত তালে আবার গেয়ে উঠল, শ্যামা ও লাল শাড়ি,

বাবু সাহেব, সাহেব গো, পেট ভবেনি,
কাজ করিয়ে প'সা দেও, ক্ষুধা মরেনি।
দেখ আমার শুকনো বুক, ছাযের তোষ মেটেনি,
বয়স কালের শবীলে মোর রং লাগেনি।

বৈশাখের খর হাওয়ায় সে গানের সুর ভেসে যায় মাঠ ভেঙে শহরে গাঁযে গঙ্গার ছল্‌ছল্ তালে ঢেউযের পর ঢেউয়ে ঢেউয়ে এপাব ওপার। এ-গানেবই সুবে তালে দোলে আড়তের ন্যাড়া আর দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দোলে মাথা আকাশের।

গাইয়ে-দলের আর আফসোস নেই। নেংটি-পরা খালি গা রং-বেরং-এব মানুষগুলো শূন্যদৃষ্টিতে বসে থাকে চুপচাপ। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন স্তূপাকার করা রয়েছে কতকগুলো বেচপ মাল। গানের গুঞ্জন এখন তাদের হৃদয়েব ঠিক ঠিক তালে। এ তো শুধু গান নয় ; ঘরে বাইরে তাদেব মাথা ফোটার কাহিনী।

কামিনী বুড়ি কী যেন বিড়বিড় করে গঙ্গার দূর বুকে তাকিয়ে। বুড়ি দীর্ঘদিনের ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি তোলপাড় করে মনে। তার সদাসতর্ক চোখে দেখতে ভুলে যায়, কেমন করে তার বউ ঘাম মোছার আড়ে এক নজরে তাকিয়ে থাকে কৈলাসের দিকে।

কৈলাসও তাকিয়ে থাকে, কিন্তু সে চোখে সেই প্রেমেব বিহ্বলতা, আছে কিসের অনুসন্ধিৎসা। কেননা, সে যে বলে, ভিত নেই, নেই তাব ঘর, নোনা ইঁটে আবার পলেস্তারী। ধু-র শালা। অমন ঘর চায় না কৈলাস যত ছ্যাচড়া জীবনের পাপ। ওটা ভেঙে ফেল্।

বুঝি সেই ভেঙে ফেলারই হদিস খোঁজে সে লাল শাড়ির চোখে। খেদ কেমন করে কাটবে শরীলে রং না লাগার।

গোবরের ভাঙাচোরা মুখটা কালো, মাটির ড্যালার মত ধসধসে হয়ে ওঠে। বলে কানাই ড্রাইভারকে,'ওস্তাদ,এখন যেন জীবনটা হয়েছে পোকাখেগো ছিটেবেড়া৷ জীবনভর হাতের চাকার মতো আমরা গড়িয়ে চলি, যেন তোমার মেশিন। চালালে চলি, তেল না দিলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করি।'

কানাই তার নিজের অভিজ্ঞতায় চ্যাপ্টা মুখে হেসে বলে, 'বিগড়ে যাও।'

'বিগড়ে যাব ?'

'হ্যাঁ। দেখ না মেশিন বেগড়ালে তার পায়ের তলায় শু'য়ে তেল মাখি। তেমনি বিগড়ে যাও।'

একমুহূর্ত কানাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে গোবর, 'ঠিক শালা বিগড়ে যাব, আমরা বিগড়ে যাব।'

আড়তের বাবু জপের মালাটি কপালে ছুঁইয়ে ভরে রাখেন ক্যাশ বাক্সে। বলেন 'হারামজাদাদের চেঁচানিতে একটু ঠাকুরের নাম করার জো নেই।'

বাঁধা কুলিটা বলে আত্মসন্তুষ্ট গলায়, 'শালারা ঈশ্বরের জঞ্জাল।'

ইতিমধ্যে আবার কে গান শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু করল না। তালে যেন তাগুন ধরে গেছে। এর মধ্যেই সূর্য কখন লাটিমের মত পাক খেয়ে উঠে এসেছে মাথার উপর। তেতে উঠেছে ছড়ানো বালি আর টালিভাঙা টুকরো।

সকলেই তারা ভ্রূ কুঁচকে তাকায় গঙ্গার উত্তর বাঁকে: না এখনো দেখা দেয়নি দশ মল্লাই নৌকার চ্যাটালো গলুই, কানে আসেনি দশ বৈঠার ছপছপ শব্দ, দেহাতি মাঝির দাঁড় টানার গান।

সকলেই তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। বলে না মুখে, কখন? এখানে তারা কেউই একক নয়। সকলের একই ভাবনা, একই দুশ্চিন্তা, একই কথা।

সে যেন তাদের মন-পবনের নাও। না এলে যে সব ফাঁকি। পেট ফাঁকি, গান ফাঁকি, ফাঁকি এ দিনটাই তাদের জীবনের গুনতিতে।

কখন বেজে গেছে চটকলগুলোর দুপুরের ভোঁ। এখন আর কোথাও পাওয়া যাবে না রোজের সন্ধান। আর আড়তের নৌকো না এলে, মাল খালাস না করলে কেউ তাদের হাত তুলে দেবে না একটি পয়সা।

কৈলাস হাঁকে, 'হেই বাবু, মাল আসবে কখন ?'

জবাব আসে খিচনো সুরে, 'আমি কি মালের সঙ্গে আছি'?

বাঁধা কুলিটা বলে গম্ভীর গলায়, 'যখন আসবে, তখন দেখতেই পাবে।'

শ্যামা ব'ল তিক্ত হেসে, 'মাইরী ?'

বাঁধা কুলিটা খ্যাঁক ক'রে উঠতে গিয়ে চুপ মেরে যায়। আর সবাই হেসে ওঠে, কিন্তু খাপছাড়া হাসি। আর হাসি আসে না। কাজ নেই, হাত খালি, শুধু মাথা গুজে বসে থাকা। এ জীবনেরই একটা মস্ত বিরোধ, যেন আগুনকে চাপা দিয়ে রাখা।

কিন্তু দিনমজুরির এই দস্তুর। কাজ নেই তো, নেই পয়সা। না মুখ চেয়ে বসে থাক তো ভাগো। কোথায় যাবে ? সেখানেই তো কেবলি ভাগো ভাগো ভাগো।—

আড়তের বাবু মুড়ির বস্তা খুলে কিছু মুড়ি ঢেলে দেন বাঁধা কুলিটার কোঁচড়ে। এ সময়ে বসে-থাকা মানুষগুলোরও কথা দেওয়ার কথা দু' আনা হিসেবে। পয়সাটা কাটান যাবে ওদের মজুরি থেকে। কিন্তু কাজ নেই মজুরিও নেই, উশুল হবে কোত্থেকে ?

মুড়ির বস্তা বন্ধ করে, চালাঘরে তালা মেরে আড়তদার পথ ধরেন ঘরের।

কুলিটা আড়চোখে এদের দিকে দেখে আর মুড়ি চিবোয়।

এ মানুষগুলো চুপচাপ দেখে, আব ঢোক গেলে। সকলেই পরস্পরকে ফাঁকি দিয়ে ওই মুড়ি খাওযাব দিকেই দেখতে চায়।

কৈলাসেব চোখ পড়ে লাল শাড়ির চোখে। চট কবে মুখ ফিরিয়ে নেয উভয়ে। কামিনী বক্‌বক্ কবে শ্যামার সঙ্গে, 'তিন বছব আগে এট্টা বাঁধা কাজ পেযোছলাম জানলি, মিনসে ত্যাখন বেঁচে। সোহাগ ক'রে বললে, যাসনি। পুরুষ-মানুষের সোহাগ'।

হাবিযে যায কামিনীর গলা জোযারের শব্দে।

হঠাৎ দেখা যায, তাবা সকলেই এ জীবনটার উপর বিরাগে নিজেদেব মধ্যে গুলতানি শুরু কবে দিয়েছে।

কেউ বলে, 'একবাব আমি এট্টা কাজ পেযেছিলাম, একনাগাডি তিন মাসের।'

কেউ বলে, 'আমাব একবছবও হযেছে। কলকাতায় এট্টা বিড়্লিন বানিযেছেন।'

আর একজন বলে, 'আরে আমাবে তো শালা এখনো অপবেশবাবু এট্টা বাঁধা কাজের জন্য ডাকে।'

'আব তুই খালি যাস্ না!' অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলে কৈলাস।

কেউ কেউ নীবরে হাসে।

কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে সুব, কেটে যাচ্ছে তাল, কথাও আব ভাল লাগে না।

বুড়ো গোবব তাব মোটা গলায় বলে আফসোসেব সুরে, 'ওস্তাদ তোমার মতো কাজ জানলে· '

বলতে বলতে হঠাৎ তাব গলা হাবিয়ে যায। গোঁফ ধবে টানে আর ভাবে। আবার বলে, 'অনেক চেষ্টা কবেছি কিন্তু ফুসবত পেলাম না এখনো।'

ড্রাইভাব কানাই বলে, 'জানলেই বা কী হত? লাইসেনটা পকেটে ফেলে মোটরওযালাদের দোবে দোবে ঘুরতে। কাজ কোথায, কাজ নেই।'

'কাজ নেই!' যেন বাঘাকুত্তাব মত গর্‌গব্ কবে ওঠে গোবব, অস্থিব হযে ওঠে হঠাৎ। 'ওস্তাদ এ পেটে উপোসেব মেলা দাগ আছে, কিন্তু হাতে একদিনেবও একটা আবামেব দাগ পাবে না। কাজ না থাকলেই মানুষ পাগল হয়ে যায়।

কাজ নেই। ·বাতাস তাব পালে ঢিল দেয। বৈশাখী সূর্য জ্বলে গন্‌গন্ ক'বে মাথাব উপর। আগুন গলে গলে পড়ে গায়ে, মুখে। গা জ্বলে, ঘাম ঝবে ঝল্‌সে যাওয়া বসালিব মত।

আশেপাশে ছাযা নেই কোথাও। মানুষগুলো গণ্ডূষভবে পান কবে জোযাবের ঘোলা জল, ছিটা দেয চোখে মুখে। কিন্তু প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। কেউ কেউ মাথায গামছা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ন্যাড়া গাছগুলো যেন মরাকাঠেব খুঁটিব মতো দাঁড়িয়ে আছে। দূবের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে চাওয়া যায় না। যেন ঝলসানো আগুন। ঘোমটা-টানা খোঁপার কৃষ্ণচূড়া শুকিযে বিবর্ণ। যেন কামিনদেব মুখ :

টাবুটুবু গঙ্গার তীব্র জোয়ারের স্রোত নিঃশব্দ ভরাট। উত্তরের বাঁকে যেন ঝিলিমিলি করে মরীচিকা, বাঁকেব পাক খাওয়া জলে উজান ঠেলে আসে না কোন নৌকো।

লাল শাড়ি রোদে জ্বলে দপ্‌দপ্, জ্বলে পেট। বুঝি প্রাণটাও।

মনে মনে বলে কৈলাস, চাস্‌নি···এদিকে চাস্‌নি। তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে ঠোঁট বেঁকিয়ে। 'ভিত্ নেই···ভিত্ নেই।···'

মদন বলে, 'কী বকছ?'

'বলছি, সারাদিন বসে গেলাম, তো, প'সা কেন দেবে না ?'

'তাই দস্তুর।'

'কেন দস্তুর ?'

মদন আবার বলে, 'ওটা আইন।'

হঠাৎ কেমন ক্ষেপে উঠতে থাকে কৈলাস।—'শালার আইনেব আমি ই'য়ে করি।'

'যতই কর, হবে না কিছু।'

'কবলেই হয়।'

মদনও কেমন খচে যায়। বলে, 'আইনটা তোর বাপেব কি না ?'

'বাপ তুললি তো বলি, তবে বাপেই আইন হবে। তোরাই তো—'

'ফের ? মেলা ফ্যাচফ্যাচ্ করবি তো'—প্রায় ঘুষি পাকায় মদন।

ঠিক এসময়েই আড়তদারের ছোট ভাই অর্থাৎ ছোটবাবু আসেন রিক্শা থেকে নেমে ছাতা মাথায় দিয়ে। এসে বলেন, 'তিন মাইল দূরে বাঁকাতলায় মালেব নৌকো আটকে রয়েছে, জোযাব কিনা তাই ঠেলে আসতে পাবছে না।'

যাক্ তা হ'লে আসছে! সবাই অমনি আবাব উঠে বসে।

কয়েকজন বলে, 'তবে আমরাই কেন না গুণ টেনে লাও লিয়ে আসি।'

ছোটবাবু বলেন, 'সে তোদের ইচ্ছে।' অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে আপত্তি কি।

অমনি তারা সবাই ছোটে মেয়েরা বাদে।

মাইলখানেক গিযে দেখা গেল আড়তদারবাবু আসছেন রিক্শায ক'বে। জিজ্ঞেস করেন, 'যাচ্ছিস কোথা সব ?'

'বাঁকাতলায় নাকি মাল লিয়ে লাও দেঁড়িয়ে আছে ? বললে ছোটবাবু ?'

বাবু মাড়ি বের করে ফোঁস করে হেসে উঠলেন।—'আরে ধু-স্, ভায়া বুঝি তাই বলল ? আমি ওকে বললুম যে, বাঁকাতলার আড়তে কোন খবর আসে নি। · · ·সে কখন আসবে তার ঠিক কি · · ·'

মুহূর্তে মুখগুলি যেন পুড়ে ছাই হযে গেল। আবার তারা বোদ মাথায করে ফিরে আসে গঙ্গার ধারে।

এসে ব'সে পড়ে তপ্ত বালুর উপর। হাঁপায়। এখন আর মানুষগুলো রং-বেরং নয়, গঙ্গার পাড়ে যেন কতকগুলো কালো কালো শকুন বসে আছে।

কাজ নেই! · · ·গরমজলের কেটলি ঢাকার মতো যেন ফুটতে থাকে কথাটা সবার মাথার মধ্যে। কাজ নেই! · · ·তাদের জীবনের দিন-গুনতিতে একটা বিরাট শূন্য, ফাঁকা।

সূর্য চলে গেছে, ছুটির ভোঁ বেজে গেছে চটকলগুলোতে। কলরব ক'বে ফিরে চলেছে খেয়া নৌকোয় ছুটি-পাওয়া মানুষেরা। ফিরে চলেছে স্টীমলঞ্চ গাধাবোটকে খালাস দিয়ে। লঞ্চেব ছাদে, পশ্চিম মুখে বসে নামাজ পড়ে সারেঙ্গ সাহেব।

ভাঁটা পড়েছে, জল নেমেছে, আবার পড়েছে পলি।

'হেই বাবু, লাও আসবেনি ?' বারবার জিজ্ঞেস করে সবাই।

'জানিনে।' একই জবাব।

সন্ধ্যা নামে প্রায়।

হঠাৎ মদন খেঁকিয়ে ওঠে, 'এই কৈলেস শালার জন্যেই তো এতখানি ছোটা ?'

কৈলাসও চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার বাবার জন্যে।'

ওদিকে চেঁচিয়ে ওঠে কামিনী বুড়ি, হঠাৎ গালাগাল পাড়তে আরম্ভ করে বউকে। গলা শোনা যায় লাল শাড়িরও। শ্যামার ঝগড়া লেগেছে তার মরদ গণেশের সঙ্গে।

আস্তে আস্তে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। তাদেব মহল্লাব দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রেই তা বেড়ে উঠতে থাকে।

কোথায় তাদের সেই সকাল, সেই গান ও গল্প।

বুড়ো গোবর অ্যাসিডের গন্ধ পাওয়া সাপের মত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'এই গোঁয়ারগুলান্, চুপো চুপো তাড়াতাড়ি।'

কে চুপ করে। চকিতে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পব মারামারি শুরু করে দিযেছে। কে কাকে মাবছে, তার ঠিক নেই। সবগুলোতে মিলে একটা দলা পাকিয়ে গিয়েছে মানুষের। শোনা যাচ্ছে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন, চীৎকাব, কান্না।

একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে ধসিযে ফেলছে দুনিয়াটাকে। মাটি কাঁপছে থব্থর্ করে। ক্রুদ্ধ হুঙ্কাবে ফেঁডে ফেলবে আকাশটাকে। কেউ উলঙ্গ হয়ে গেছে, কযেকজনের পায়ের তলায় পড়ে গেছে কেউ। ·কেন এই মারামারি, তাবা নিজেরাই যেন জানে না।

আড়তদার বাবুরা দুই ভাই কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি ক্যাশবাক্সে চাবি বন্ধ কবে প্রায় কান্নাভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বামদাস, লাঠি পাকড়ো।'

রামদাস অর্থাৎ সেই বাঁধা কুলি। সে তখন ঘবের পেছন দিযে নেমে গেছে গঙ্গার নাবিতে, কালো আঁধাবে, আর মনে মনে বলছে, 'আরে বাপ্‌রে, শালারা আমার জান নিকেশ ক'রে দিতে পাবে।'

হঠাৎ সমস্ত গোলমালকে ছাপিযে তীব্র মোটা গলায় গোবর হাঁক দিল, 'লাও আসছে, লাও। জোযান, তৈযাব হো! · ,'

মুহূর্তে যেন জাদুমন্ত্রে থেমে গেল সমস্ত গোলমাল, মারামাবি, হাতাহাতি। সকলে ফিরে তাকাল উত্তরের বাঁকের দিকে, নিঃশব্দে।

পুবে উঠেছে, আধখানা চাঁদ, ভাঁটাব জলে তাব ঝিলিমিলিতে দেখা যায় অদূবেই কতকগুলো বিবাট বড় বড় নৌকো, গঙ্গার বুকে ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে। মোটা মাস্তুল উঠেছে আকাশে। · ·

সেই নৌকো থেকে ভেসে এল একটা স্বব, হো-ই-ই

আসছে আসছে তাদেব মন-পবনের নাও। সাঁঝবেলায এসেছে সকলে। কারুব দাঁত ভাঙা, ঠোঁট কাটা, চোখ ফোলা, নখেব ক্ষত। কারুর হাতে কার ছিঁড়ে নেওযা এক মুঠো চুল কিংবা পবিধেয় কাপড়ের টুকরো।

অকস্মাৎ ভাটার ছল্‌ছল্ তালে তাল দিযে কে গেয়ে উঠল সরু গলায,

ওই আসে গো, ওই আসে লা'য়ে ভরা টালি,
মাঝি এস তাড়াতাড়ি,
আর যে ভাই রইতে নারি
আঁধার নামে গাঁয়ে ঘরে, লাও করব খালি।

গান গাইছে লালশাড়ি। সুব তুলেছে আবার, তাল লেগেছে আবার, শরীরের পেশীতে পেশীতে।

এগিয়ে আসে গোবর, 'কামিনী বুড়ি, তুই এখন চোখে দেখতে পাবিনে, ঘরে যা। শ্যামা তুই পালা, ঘরে তোর ছেলে রয়েছে। ভোলা তুইও যা, তোর চোট বেশী।'

তারা বলল, 'আমবা খাব কী?'

'তোদেব মজুবিটা আমরা গায়ে খেটে তুলে দেব।'

সবাই বলে উঠল, 'বাজী আছি।'

যেন এ মানুষগুলো কিছুক্ষণ আগেব সেই হিংস্র প্রাণীগুলো নয়।

কামিনী বুড়ি বলে গেল, 'বউ, হুঁশিয়ার।...'

তারপব এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে যায় কাজেব। নৌকো লাগে পাড়ে। শুরু হয় মাল তোলা। গানে, কাজের উন্মাদনায়, হাঁকে-ডাকে মুখরিত গঙ্গার ধার। পাঁচ নৌকো খালাস হলেই একদিনেব বোজ পাবে কুড়িজন।

কোনখান দিয়ে সময় কেটে যায়, কেউ টেরও পায় না। জুড়ি বেছে নিয়ে সব মাল তুলে দেয় লবীতে। একটা যায়, আব একটা আসে।

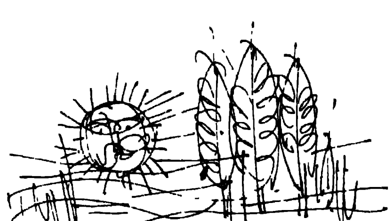
ঝুড়ি কোদাল জমা দিয়ে, রোজেব পয়সা নেওয়া হলে লালশাড়ি সকলেব চোখের আড়ালে আড়ালে কৈলাসের হাত ধবে টেনে নেমে গেল গঙ্গাব ঢালু পাড়েব নিচে। বলে রুদ্ধ গলায়, 'সাবা মুখ বক্তাবক্তি। এস, ধুয়ে দি।'

কৈলাস বলে অদ্ভুত হেসে, 'বক্ত তো তোব মুখেও, ধুয়ে আব তা কত তুলবি।'

'কিন্তু, কেন... কেন?' ফুঁপিয়ে উঠল লালশাড়ি।

আবার জোযাব আসায দক্ষিণ হাওযাব ঝাপটায ভেসে গেল তাব গলা।

তখন অনেকেই নেমে এসেছে গঙ্গাব কিনাবে।





উরাতীয়া

যখন বেলা পড়ে আসত, সাবাদিনেব বোদজ্বলা আকাশটায ছড়াত রং-এর তীব্র ছটা, জনহীন হযে আসত মাঠ ও বন, তখন মনে হ'ত বেল লাইনেব উঁচু জমিটা আবও উঁচু হয়ে উঠেছে। যেন সাবাদিন পবে নুযে পড়া মাথাটা আড়মোড়া ভেঙে তুলে ধবেছে আকাশের দিকে। আব গাঢ় বর্ণেব আকাশটা যেন নেমে আসত একটু একটু কবে। আকাশটাই ঘিবে থাকতো উঁচু জমিটাকে।

তখন, দূব থেকে মনে হ'ত দুটো অতিকায দানব নেমে এসে মুখোমুখি দাঁডিযেছে ঐ উঁচু জমিতে। বিশ্ব সংসারেব এ নির্জনতা ও ,সুযোগে তাবা নেমে এসেছে ধবাতলে। আকাশের অনেকখানি জুড়ে থাকতো তাদেব বিশাল দেহ। তাদেব স্ফিত সুগঠিত মাংসপেশীব প্রতিটি সুস্পষ্ট বেখা ঢেউ দিয়ে উঠত আকাশেব বুকে। তারপব, যখন তাবা হঠাৎ খানিকটা সরে গিয়ে, ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াত মুখোমুখি, এবং পবস্পরকে আচমকা আক্রমণ করে উঠত পড়ত। তখন শক্তি প্রযোগে মাংসপেশীগুলি আরও উদ্দাম হয়ে উঠত। আকাশেব বুকে ছিটকে যেত ধুলো মাটি। উঁচু জমিটা যেন থবথব কবে কাঁপত তাদের দেহ ও পাযের চাপে। তখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ভয়ঙ্কব দৃশ্যেব অবতাবণা হত সন্ধ্যাকালেব এ জমিটাব উপরে।

তারপর এ লড়াই চলতে চলতে রং-এ রং-এ আকাশটা যখন কালো হয়ে আসে, জমি আর আকাশ হয়ে যায় একাকাব তখন তারা দুজনেই আকাশ মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হাবিয়ে যায়।

এমনি ঘটে বোজই। লড়িয়ে দু'জন দুই মস্ত মল্লবীব। লাখপতি আব ঘামারি। তারা দুজনেই রেলওয়ে গেটম্যান।

মফঃস্বল শহর থেকে মাইল সাত আটেক দূরে, স্থানীয় স্টেশন থেকেও প্রায় দু'মাইল দূবে,

মাঠের মাঝে এ ক্রসিং গেট। লাইনের পূব দিকে গ্রামটা কিছুটা কাছে। পশ্চিমের গ্রামটা একটা ঝাপসা কালো৷ রেখায় মিশে থাকে আকাশের গায়ে। গেটের দু'দিকে দু'টো ঢালু সড়ক নেমে গেছে এঁকে বেঁকে, হারিয়ে গেছে মাঠ ও গ্রামের মধ্যে। চওড়া সড়ক। গরুর গাড়ির চাকার দাগে দুপাশে গভীর রেখা পড়েছে। আর চারপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত।

ক্রসিং-এর দু'পাশে ঢালু জমিতেই গেটম্যানদের ঘর। এমনভাবে ঘর দুটো তৈরী হয়েছে, রেল লাইনের উপর থেকেই লাফিয়ে ঘরের ছাদে চলে যাওয়া যায়। এপার থেকে ওপারের ঘর দেখা যায় না, ওপার থেকে এ পারের না।

কাছাকাছি কোন বড় গাছপালা নেই। পাখির জটলা বড় একটা শোনা যায় না। এখানে সারাদিন প্রজাপতি,ফড়িং রঙিন পাখা মেলে অবাধে উড়ে বেড়ায়। ঝিঁঝির গলা ফাটানো ডাক আরও ভারি করে তোলে নৈঃশব্দকে।

সারাদিনে লোকেরও যাতায়াত কম এই পথে। সকালে আর বিকালে দেখা যায় কিছু লোককে যেতে। হয়তো যায় কয়েকটা গরুর গাড়ি সারাদিনে। তাও গরুর গাড়িগুলোকে অধিকাংশ দিনই বেশ খানিকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কেননা, এই সীমান্তের যারা প্রহরী লাখপতি আর ঘামারি, তাদের যতক্ষণ দয়া না হবে, ততক্ষণ সীমান্তদ্বার খোলার কোন উপায় নেই।

তারা অবশ্য লোক খারাপ নয়। কিন্তু এই নির্জন গ্রামের সীমানায়, চাকরি ছাড়া জীবন ধারণের যে আর মাত্র একটি দিক তাদের আছে, তা' হল মল্লযুদ্ধ। সেজন্য দেহ তৈরী কাজটি তাদের সর্বাগ্রে। যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের তৈল মর্দনের সময় কিংবা সকালের বুকডন বৈঠকের উত্তেজনায় চোখ লাল, মাথাটা অবসাদগ্রস্ত আর দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ পাগলা গতিতে থাকে লাফাতে, তখন পাচনবাড়ি-হাতে কোন গাড়োয়ানের 'খোলেন গো পবন-পো' শব্দ তাদের কানেই ঢোকে না।

পবন-পো কথাটি খুব শ্রদ্ধা ও ভয়ের সঙ্গেই গাঁয়ের লোকে তাদের বলে। তারাও সাগ্রহে ও আত্ম সন্তোষের সঙ্গে এই সম্মান গ্রহণ করে। কেননা পবন পুত্র বলতে ভীম এবং হনুমানকেই নাকি বুঝিয়ে থাকে। লাখপতি আর ঘামারি, পরস্পরকে তারা ঐ শক্তিমান বীর দুজনেরই অংশ বিশেষ বলে মনে করে। আর দুই বীরেরই পূজারী তারা। বজরংবলী তাদের দেবতা। অর্থাৎ বীর শ্রেষ্ঠ হনুমান।

কথাটা মিথ্যে নয়।

এই নির্জন পরিবেশে, লোকালয়ের বাইরে, দূর প্রান্তরে তারা দুই বন্ধু যেন গহন অরণ্যের দুটি জীব। এখানে এই পরিবেশে তারা একাত্ম ও মুক্ত।

লাখপতি এখানে এসেছিল তার বিশ বছর বয়সে। ঘামারি তার চেয়ে বড় বছর দুয়েকের। আজ দশ বছর ধরে তারা একত্র রয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে তারা কখনও ফারাক হয়নি। এই দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে হয়েছে অনেক ওলটপালট। অনেক রাজ্য ভেঙেছে গড়েছে।

অনেক মানুষ বেঁচেছে মরেছে। নদী ভিন্ন পথ ধরেছে, নতুন স্থলভূমি দেখা দিয়েছে, ঘটে গেছে ভৌগোলিক পরিবর্তন। এমন কি ঐ দূরের গ্রামগুলিতেও পরিবর্তন হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু

এখানে কোন পরিবর্তন নেই। উদার আকাশের তলায় এই নির্জন লেবেল ক্রসিং-এর দু-পাশে যেন পৃথিবীর কোন দুর্গম অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিকতা বিরাজিত।

পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে, সেটুকু লাখপতি আর ঘামারির দেহে ও রক্তে। দিনে দিনে তাদের দেহের রূপ বদলেছে। সঞ্চিত হয়েছে রক্ত, স্ফিত হয়েছে মাংসপেশী। এখন ক্রমে বাধাহীন হয়ে উঠেছে যেন তাদেব রক্তপ্রবাহ। দেহের মধ্যে সে অস্থির, প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর বন্যতা ফেটে পড়তে চাইছে। ক্রমশঃ অধ্যবসায়ে একদিন যা ছিল কোমল সুন্দর ও সুগঠিত, আজ তা বন্য পাহাড়ের মত খোঁচা খোঁচা পাথর। তাদেব প্রেম, ভালবাসা, তাদের হাসিখুশী, আলাপ আলোচনা সব এই দেহকে ঘিবে। এই দেহও পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধই বন্ধুত্ব। আর দিনে দিনে পরিবর্তন হযেছে রেললাইনের তারের বেড়ার বাইবে তাদের মল্লভুমির প্রশস্ত স্থানটুকু। সেই মাটিটুকুকেও তারা দেহের মত ভালবাসে, দেহের মতই তাব সেবা করে, তার প্রতিটি কণাকে তৈরী করে। এই মাটিতে তাদেরই গায়ের গন্ধ, তাদেরই ঘামে তাদেরই উত্তাপে শুকনো ও ঝুরঝুরে।

এবেলা ওবেলা দিনে ও রাত্রে কয়েকবার করে নিশান দেখানো, দেখানো নীল আলো, তাদের কাছে কোন কাজই নয়। মাসে তাবা একবাব কবে সাত আট মাইল দূরের জংশন স্টেশনে যায় মাইনে আনতে। খোবাকি ও দরকারী বস্তু কিনে নিয়ে আসে তখনই। বাদবাকী দরকার দিনে একবার ক'রে গাঁয়ে গেলেই মিটে যায়। তাদেব দুজনের দুটো গরু আছে। কিনতে হয়নি, দিয়েছে পুষতে না পাবা হা-ভাতে গাঁয়ের লোকেরা। গরু পুষতেও তাদেব ভাবতে হয় না। লাইনের ধারে বেঁধে দিলেই জীব দুটির পেট ভরে। বাত্রে কিছু জাব আব জল। তাইতেই দুধটা তাদের লাভ। সকালেব দুধটা একজন এসে নিযে যায়। বিকালেব দুধ তারা তাদের কুস্তির পর, জলের মত কাঁচা-ই পান কবে। রাঁধে খায় একসঙ্গে, বাত্রে শোয আলাদা।

সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত, এই কাজগুলি সামান্য। কিন্তু, এই নির্জন পরিবেশে যা একদিন প্রয়োজনের জন্য তারা আবম্ভ কবেছিল আজ তা দারুণ নেশাব মত জড়িয়ে ধরেছে রক্তের মধ্যে। অসামান্য হ'ল দেহচর্চা। বাত পোহালেই বক্তপ্রবাহে জাগে কলরোল। দেহের মধ্যে আছে তাদেবই অপরিচিত আর একটা খ্যাপা জীব। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে, প্রতিটি ধমনীতে সে পাগলেব মত খোঁচাতে থাকে, ছুটোছুটি কবে।

তখন আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। তখনি ল্যাঙট এঁটে তুলসী, মঞ্চের গর্তে সযত্নে রক্ষিত হনুমানেব ছোট্ট মূর্তিটিকে নমস্কাব কবে বুকডন বৈঠকে মেতে যায় তারা। বিকাল না হতেই আবাব সেই বজরংবলীর পূজা, তৈল মর্দন, ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ। মল্লযুদ্ধের শেষে দুধের মধ্যে বাটা সিদ্ধি মিশিযে খায়। খেযে গরিলাব মত রক্তবর্ণ দুটো চোখে স্নেহ ও সোহাগ ভরে দেখে শুধু নিজেদেব দেহ। যেন তাদেবই পোষা দ'টি অতি স্নেহের জীব এই দেহ দুটি।

এই সময়ে তাদের অতি ভয়ঙ্কব দেখায়। মাথা আব ঘাড় তাদের সমান হয়ে উঠেছে কোথাও যেন উঁচু নীচু নেই। কান দুটোও আঘাতে আঘাতে দুমড়ে চেপ্টে যেন অনেকখানি মিশে গেছে। মল্লবীরদের নিয়ম তাই। কান পিটিযে পিটিয়ে একটা ড্যালা ডুমড়ি গোছেব করে ফেলতে হয়। সেই কানে আবার অতি যত্নে পবানো আছে সোনাব মাকড়ি। নাকগুলো চেপটে এঁকে বেঁকে গেছে। চোখের কোল ও গালের মাংসও শক্ত ফোলা, চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গিয়েছে কোটরে। ঘাড়ের মাংসপেশী যেন নিয়ত আক্রমণোদ্যত ভল্লুকের মত ঠেলে গুমড়ি

খেয়ে পড়েছে সামনে দিকে।

তারা বসে থাকে মুখোমুখি। আর তাদের মুখোমুখি হাঁ করে চেয়ে থাকে মাঠ, বন, সর্পিল সড়ক আর আকাশ। তাদেরই ক্লান্তি ও অক্লান্তিতে বিরতি দিয়ে দিয়ে ডাকে ঝিঁঝিঁ।

তখন ঘামারি হয়তো বলে, 'আচ্ছা লাখুয়া, ভীমের চেহারাটা কিরকম ছিল বলতে পারিস?'

কথাটার মধ্যে কোন ঠাট্টার-আভাস নেই। লাখপতি একটু ভেবে বলে, 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে শুনেছি দৈত্যের মত। তা নইলে আর হিড়িম্বা রাক্ষসীকে মেরে ফেলেছিল?'

ঘামারি বলে, 'হুঁ, ঠিক।'

ভীম হনুমান, এদের নিয়ে প্রায়ই তারা এরকম আলোচনা করে। ইচ্ছে করে নয়। আপনি ওসব কথা তাদের মনে আসে।

কোন সময় হয়তো লাখপতি বলে, 'জানিস ঘামারি, আমার মনে হয় মহাবীর হনুমান আমাদের জরুর দেখ্‌ভাল্ করে, আসে এখানে।'

অমনি ঘামারির ভাং নেশাচ্ছন্ন লাল চোখ দুটো ওঠে চকচকিয়ে, বলে, 'হ্যাঁরে, আমারও শালা ওরকম মনে হয়।'

বলতে বলতেই আপনি আপনিই তাদের বিশাল দেহের মাংসপেশীগুলি নাচতে থাকে।

তখন ঘামারি বলে, 'আমার কি মনে হয় জানিস। এ রেল-লাইনের জমিটা আমি একলাই সিরিফ গর্দানের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি। কেন বল তো?'

লাখপতি বলে, 'কি জানি মাইবী। আমারো শালা ওরকম মনে হয়। মনে হয়, দুনিয়াটা বেমালুম হালকা। ঘাড়ে করে নিতে পারি।'

সত্যি, দেহে তাদের এত শক্তির প্রাচুর্য যে, শুধু নেশা নয়, এমান একটা অপরিসীম ক্ষমতা অনুভব করে তারা। এই প্রচণ্ড শক্তিটা একসঙ্গে জমাট হয়ে যেন আগুনের মত ঠিকরে পড়ে তাদের চোখে। দেহ তাদের গৌরব, তাদের সব।

তখন হয়তো ঘামারি বলে, 'আয়, আর একবার লাড়ি।'

লাখপতি বলে, 'সেই ভাল।'

কিন্তু আবেগবশত যেদিন লড়ে, সেদিন সময়ের কোন স্থিরতা থাকে না। অন্ধকারে শুধু দুপদাপ হঠাৎ চাপা হুঙ্কারের তীক্ষ্ণ শব্দ, জন্তুর নিঃশ্বাসের ফোঁস-ফোঁসানি রাত্রিটাকে চমকে দেয়। বিমূঢ় অন্ধকার ও নক্ষত্রখচিত আকাশ চেয়ে থাকে হাঁ করে। আর অন্ধকারেও তাদের ঘর্মাক্ত শরীরে এমন একটা চমকানি দেখা যায় যেন, পাথরের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে আগুনের ঝিলিক। কখনো শুধু মাথা ঠোকাঠুকি করে পরস্পর। তখন মনে হয়, লেঠেলদের লাঠি ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

এই দৈহিক শক্তির খেলাই তাদের নেশা। তাদের মাতামাতিতে রাত্রিচর বাদুড়গুলিও দূর দিয়ে উড়ে যায়, জানোয়ারগুলি ফারাক দিয়ে পাশ কাটায়। কারণ প্রকৃতির গড়া ভয়ঙ্করের মতই তাদের তখন দেখতে হয়।

এই দশ বছর কেউ তাদের কোথাও যেতে দেখেনি। গাঁয়ের লোক জানত তাদের কেউ নেই। তারাও সেই রকমই জানত বোধহয়। কেননা তাদের মুখে কেউ কখনো অন্য কথা শোনেনি। গাঁয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও কম। কেবল মাঝে মাঝে গাঁয়ের ছেলেরা আসে তাদের কুস্তি দেখতে। তাও ভয়ে ভয়ে। তাদের এই নীরস দেহ সাধনা মানুষের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। নীল পুজোর দিন, গাঁয়ের মেয়েরাও আসে। আর সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার কিছু ভিড় হয়। ওইদিন হাটবার ক্রসিং পেরিয়ে যেতে হয় হাটে, সেই জন্যই ভিড়।

লোকে যেমন জানত, তাদের কেউ নেই, তারাও সেই রকম বিশ্বাস করত। কেননা, ঘামারির বউ মরে গেছে দেশে থাকতেই। তার আর কেউ নেই। তারপর থেকে সে এখানে আছে।

লাখপতিও পিতৃমাতৃহীন। ভাইবোনও নেই। ভগবান জানে, তার বাপ মাকি ভরসায় তার নাম রেখেছিল, লাখপতি। পাঁচ বছর বয়সে তার বিয়ে দিয়ে দশ বছর বয়সে বাপ মা তাকে সংসারে একাকী করে রেখে গেছে। না ঘর, না ক্ষেতি জমি। ভাগ্যি ভাল, খুড়ো ছিল শিয়ালদহ লোকোর কুলি। সে বেঁচে থাকতেই জুটিয়ে দিয়েছিল কাজটা। পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে বর কনে বড় হলে, জোয়ান হলে গাওনা হয়। ওইটিই আসল বিয়ে। তখন থেকে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ঘর করে। কিন্তু লাখপতির ভাগ্যে তাও ঘটে ওঠেনি। কি দিয়ে গাওনা হবে, বউ আসবে কোথায়।

তারপরে কাজ জুটেছে এই বাংলাদেশে। কেউ তাকে দেশে আজ অবধি ডাকেনি, সে-ও যায়নি। বউটাকে হয়তো আর কেউ ঘরে তুলেছে, কিংবা বাপ-মা বিক্রি করে দিয়েছে কাউকে। কিন্তু সেকথা দশবছরে দশবারও তার মনে পড়েছে কি না সন্দেহ। এমন কি পাঁচ বছরের সেই স্মৃতির কণাও নেই তার মনে।

নারী সংক্রান্ত কথাবার্তা তাদের আলোচনায় খুব কম। ওদিক থেকে তারা নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। গাঁয়ের কোন মেয়েব সঙ্গে দেখা হওয়া ও মেশার অবসর নেই তাদের।

তাবা আছে তাদেব কাজ, দেহচর্চা ও মল্লযুদ্ধ নিয়ে। তারা শোনে শহরের মল্লযোদ্ধাদের কথা। তারা শহবে গেলে শহবের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

তবু তাদের এই অসীম শক্তি ও বিশাল দেহটার মধ্যে কি যেন আটকা পড়ে আছে। যেন একটা খাঁচায় পোরা পাখি ছট্‌ফট্‌ করছে সব সময়েই মুক্তির জন্য। কিন্তু এই পরিবেশ ও দেহ ভেদ করে সে কখনোই বাইরে আসতে পারে না। এ যে কিসের বন্ধন তারা জানে না। তবু একটা দুর্বোধ্য আবেগ আসে তাদের মনে। তা-ও এতই ক্ষণস্থায়ী যে, আবার তারা মল্লভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লান্ত হলে পড়ে ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙেই গর্ব ও আনন্দভরে তাকায় পাহাড়ের বুকের দিকে, নাড়া দেয় মাংসপেশী। যেন পাথর কাঁপছে। তাবপব আধঘুমন্ত, আড় মাতালের মত কাজে হাত দেয়।

দেহ প্রধান। মস্তিষ্ক যেন কোন কুলুপ কাঠি দিয়ে আটকানো, অবসাদগ্রস্ত, নিষ্ক্রিয। হৃদযটাও কেমন যেন আবদ্ধ অন্ধকাব। এই তাদের জীবন।

এমনি অবস্থায় একদিন, হেমন্তেব মাঝামাঝি এক দুপুরে গাঁয়েব ডাকঘরের পিয়ন এসে ডাকল, 'কই গো পবন-পো দাদারা।'

জবাব এল, 'এখুন দরজা নাই খোলা যাবে গো।'

পিয়নটাও অবাক হয়েছিল। চিঠি দেখে হাঁক দিল আবাব, 'লাখপতি চামারিয়া কে আছেন গো আপনাদেব মধ্যে?'

লাখপতি চামারিয়া? দুই মল্লবীরই উঠে এল দিবানিদ্রা ছেড়ে। তারাও ভারি অবাক।

লাখপতি বলল, 'কি হয়েছে?'

'আপনাব নাম লাখপতি চামারিয়া?' এ গ্রাম্য বাঙালী পিয়ন চামারিয়া পদবীটা একটা বর্ণহিন্দুর পদবী ঠাউবেছে বোধহয়।

লাখপতি ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

—'আপনার একটা চিঠি আছে।'

—'ইংলিশ চিঠি?'

—'না। হিন্দি।'

বোঝা গেল অফিসের নয়। লাখপতি আর ঘামারি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, মাটি কাঁপিয়ে গিয়ে চিঠিটা নিল। পড়বে কে? ঘামারি সামান্য পড়তে জানে। তবে দেহাতী অক্ষর। সৌভাগ্যের বিষয় চিঠিটা ধুলোকাদামাখা দোমড়ানো হলেও দেহাতী ভাষায় লেখা।

পিয়ন বলল, 'ছ'মাস আগে চিঠিটা আপনাদের হেডঅফিসে এসেছে, এখানকার ঠিকানা নাই কি না? তা কি বিভ্রান্ত?'

দুজনেই তাড়াতাড়ি খাটিয়া পেতে বসল পড়তে। প্রথম অক্ষরটি পড়তে প্রায় পাঁচমিনিট লাগল। পিয়ন বিদায় হল হতাশ হয়ে।

বিকালের দিকে চিঠি পড়া শেষ হলে তাবা অবগত হল, চিঠিটা দিচ্ছে লাখপতিব বিধবা খুড়ি। বক্তব্য, সে এবার মরবে। আশা করছে, এতদিনে লাখপতি গুছিয়ে নিয়েছে। সে যেন তার বউকে এবার নিয়ে যায়। বউ খুড়ির কাছেই আছে। তাই উপদেশ হচ্ছে, জোয়ান আওরৎ, খর নদীর নৌকা। মাঝি হাল না ধরলে এবার তরী যাবে। অতএব আর দেরি নয়।

দুজনেই তারা তাদের এবড়ো-খেবড়ো মুখ দুটো আরও ভয়ঙ্কর কবে বসে রইল। জীবনে একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। নিতান্ত আচমকা। হোক দেহেব মধ্যে সীমিত তবু জীবন তাদের ওখানেই পরিপূর্ণ। দেহের নানাস্থানে কতগুলি মাংসপেশী ফুলে উঠে অস্বস্তিতে থমকে রইল।

ঘামারি বলল, 'অওরৎ?'

লাখপতি বলল, 'এখানে?'

একটা ধিক্কার দেখা দিল তাদের চোখে, কিন্তু এদিকে বিকালের অস্থিবতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাদের রক্তধারায়। কথা অসমাপ্ত বেখে নেশার ডাকে সাড়া দিতে চলল তারা। দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম মল্লক্ষেত্রে।

তারপর রাত্রে যখন দুধ সিদ্ধি খেয়ে বসল দুজনে, তখন এই ভাবনা ঘিবে এল আবাব তাদেব মনে। দেহকে ঘিরে তাদের ঘোব স্বার্থপবতা, পৃথিবীর আর সবদিক থেকে এমনই ভাবে বিমুখ করে রেখেছে চোখ ও মন। তাদের দেহ সাধনাব যে পরম আনন্দ, তাতে নিরানন্দের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। এই দেহ থাকলে তার সুখ, পবমায়ু ও ভগবান। আওরৎ তো তাতে শুধু ক্ষয় ধরিয়ে দেবে।

অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে একবাব দেখল। তারপব স্থিব হল, এটা নিশ্চযই মহাবীরের ইচ্ছা। সুতরাং আনতেই হবে। তবে লাখপতি তার এই দেহেব ভাগ তাকে দেবে না। দুই বন্ধু এই স্থির করল। বউ থাকবে নিজেব কাজ নিয়ে।

তারপর ছুটি নিয়ে লাখপতি দেশে গেল। নিয়ে এল বউ।

ছাব্বিশ বছরের এক মেয়ে, নাম তাব উরাতীযা। খুডি শাশুড়ীর ঘরে ক্রীতদাসী মত খেটে যাওয়া মেয়ে। স্বাস্থ্য ও যৌবনে পূর্ণ তার সুগঠিত দেহ। বেশ আঁটো, সামান্য খাটো, রংটা আধা ফরসা। রূপসী বলা যায় কিনা জানিনে। তার নিরাভরণ শবীবের পুষ্ট হাতপায়েব গোছায় একটা বিহ্বলী রুক্ষতা, কিন্তু চোখ দুটি ভবা কালো দীঘির মত ভাসা ভাসা অথচ গভীব। আব হয়তো প্রথম স্বামী সাক্ষাতের গোপনলীলায় একটা দুর্বোধ্য হাসি তার গালেব টোলে।

একটা হলদে শাড়িব ঘোমটা টেনে সে এল লাখপতির সঙ্গে, হাতে পুটলি ঝুলিয়ে। এল নির্জন মাঠের বুকে, লেবেল ক্রসিং-এর ঢালু জমির কোলে গেটম্যানদের ঘরে। একদিন যাদেব পদক্ষেপে ঘরটা কাঁপত, আজ আর একজনের পদসঞ্চারে সেই ঘব নিঃশব্দ, কিন্তু বিচিত্র

শিহরণে, পুলকে ভরে উঠল। মল্লবীবের সাজানো গোছানো গুমটি ঘরে আলো এল, হাওয়া বইল।

ঘামারি এসে দাঁড়াল। লাখপতি দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। বুকে বুক ঠেকল। কয়েকদিনের যন্ত্রণাকাতর চাপাপড়া রক্ত ধারায় জোয়ার এল আবার। তারপর দুই মল্লবীর চোখ দিয়ে চেটে চেটে দেখল দু'জনকে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু'জোড়া চোখ।

লাখপতি বলল, 'চল, একবার দেখা যাক্' ঘামারি বলল, 'তুই দেখিস নি ?'

লাখপতি বলল, 'ধু-স্ শালা, মনেই হয়নি। চল্ একসঙ্গে দেখিগে।'

ঘামারি ঃ 'কি আর দেখব ? আওরৎ আওরৎ।'

লাখপতি ঃ তবু একবার—

দু'জনে হাত ধরে ঘরে ঢুকল। উরাতীয়া বসে রয়েছে ঘোমটা টেনে। তারা দুজনে বসল অদূরের খাঁটিয়ায়। উরাতীয়াকে দেখে আর চোখাচোখি করে।

একটু পরে উরাতীয়া ঘোমটা তুলে খুব ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার কাল চোখে। দুজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হ'তেই শান্ত অথচ মিঠে হাসি চমকে উঠল তার চোখে ও গালের টোলে। মাথাটি গেল নেমে রুক্ষ খোঁপাটা ভেঙে পড়ল ঘাড়ের পাশ দিয়ে।

হাসি দেখে অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল মল্লবীরেরা। আবার উরাতীয়ার চোখ উঠল, দূরে মেঘে যেন হালকা বিদ্যুৎ চমকালো মিঠে হাসির। বিশাল দেহে-বন্ধু আবার মুখ চাইল পরস্পরের।

তারপর হেসে উঠল। হাসতেই লাগল উচ্চ রোলে। যেন এক রুদ্ধধারা হঠাৎ মুক্ত হয়ে অনর্গল বয়ে চলল অট্টরবে।

আর সেই অট্টরবের সঙ্গে এক বিচিত্র সুব যোজনা করল নূপুর নিক্কণের মত চাপা গলার খিলখিল হাসি, থরথর করে কেঁপে উঠল উবাতীয়ার শরীব ও ভাঙা খোঁপা।

এমনই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় এই বিচিত্র হাসির রোল যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ক্রসিং গেটের এই চারপাশের সীমা, তার বনপালা সড়ক ও আকাশ থমকে রইল এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তেই হেমন্তের অপরাহ্ণ নেচে উঠল হাওয়ায়। ইতিহাসের যুগ ফিরে এল যেন, সমস্ত পরিবেশটায়।

আজ এল মাঠের পাকা আমনের গন্ধ, গাভীর হাম্বা রব, মাঠের মানুষের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। আব আশ্চর্য ! এই কান পেটানো, নাক থ্যাবড়ানো, চাঁছা মাথা, এবড়ো খেবড়ো মুখ এই পাহাড়ে মানুষ দুটোকে দেখে একটু ভয় পেলে না গেঁয়ো উরাতীয়া। সে সমান তালে হেসে হাসিয়ে এক নতুন রং ছড়িয়ে দিল এখানে। তারপর খুলে ফেলল তার পুঁটুলি।

কণ্ঠরোল থামল। কিন্তু যেন যুগ যুগান্তরের চাপা পড়া হাসি কাঁপতে লাগল মল্লবীদের পেশীতে পেশীতে, হাসতে লাগল গর্তে ঢোকানো চোখ। নিজেদের হাসিতে তারা নিজেরাই বিস্মিত। কৌতূহলিত হয়ে তারা দেখল আবার উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া পুঁটলি খুলে বার করেছে বাঁকমল। পরেছে পায়ে। এইটুকু তার বাপের বাড়ির সম্বল। লুকিয়ে রেখেছিল খুড়িশাশুড়ীব ঘরে এসে। আসল লোকের ঘবে এসে একদিন সে পরবে, এই ছিল সাধ। আজ তা পূর্ণ হল।

মল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে। অসঙ্কোচে ঘুরল সারাটি ঘর। আপন মনে হেসে হেসে দেখল চারদিক। রাবণের লঙ্কা পোড়ানো, গন্ধমাদন বহন, বুক চিরে দেখানো রামসীতা, এমনি ছ'সাত রকমের শুধু মহাবীর হনুমানের ছবি টাঙানো আছে ঘরটায়।

তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল উরাতীয়া। দুই মল্লবীর বন্ধুও উাক মেরে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত ব্যাপার। উরাতীয়া গিয়ে দাঁড়াল তুলসীমঞ্চের কাছে। নীচু হয়ে দেখল মহাবীর হনুমানের মূর্তি। সেখানে গড় কবল। মল্লক্ষেত্রের চারপাশে দুই বন্ধু লাগিয়েছে বেল ও গাঁদার চারা। সৌন্দর্যের জন্য নয়। মল্লক্ষেত্রের পবিত্রতার জন্য। হনুমানজীর পুজোর জন্য। কযেকটা গাঁদা ফুল ফুটেছে এর মধ্যেই।

উরাতীয়া টপাস কবে ছিঁড়ল একটি ফুল। আড় চোখে দেখল দুই পুরুষকে। তারপর লাইন পেবিয়ে নেমে গেল ওপারে। গিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিল ফুলটি।

দুই বন্ধু এগিযে উঁকি দিল। দেখল, উরাতীয়া ঘামারির ঘবটিও দেখছে ঘুরে ঘুরে। তার ঘোমটা গেছে খসে। বাইবে এসে দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জার বিচিত্র রাগে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আর একটা হাসির উচ্চবোল পড়ল ফেটে। কেন, তাবা নিজেবাই জানে না। কেবলই হাসি আসছে, হাসি পাচ্ছে। প্রাণ চাইছে, ভাল লাগছে।

তারপর দেখা গেল তাদেব গায়ে আঁচলের হাওয়া দিযে উরাতীয়া দুলে দুলে চলে গেল পুবেব সড়কেব পাশে ছোট্ট পুকুরটিতে। স্নান করে এসে কাপড পবে খুঁজে পেতে বার কবল দুধের বালতি। গাইয়ের বাঁট দেখে সে টের পেযেছে সময় হয়েছে দুইবার। মবদ গুলোর সে খেয়াল নেই। কোনদিন ছিল নাকি।

একটা নয, ঘামাবিব গরুরও দুধ দুইল সে। দুযে অবাক-মুগ্ধ মল্লবীর পুরুষদেব সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিবিযে জিজ্ঞেস করল, 'উনুন কোথায ? আগুন দেব।'

দুই বন্ধু বিস্মযে চোখচোখি করল। চোখে চোখেই তাদের কথা। পরস্পবেব চোখেব দিকে তাকালেই তারা মনের ভাব বুঝতে পাবে। মল্লক্ষেত্রে ঐ শিক্ষাটি তারা আয়ত্ত কবেছে। তাদের চোখ বোবা জানোয়ারের মত বলাবলি করছিল, 'এসব কি হচ্ছে ? সত্যিই কি আমাদের জীবনে একটা নতুন কিছু ঘটতে বসেছে ? একটা কোন সর্বনাশ কিংবা সুখের ব্যাপাব ঘটতে যাচ্ছে ?' তবু তাদের মস্ত বুক দুটিতে একটা খুশির বন্যা পাক দিযে উঠছে।

ঘামারি বলল, 'তোব উনুনটা বার করে দে।'

লাখপতি, 'কেন ? তোরটা কি হল ? তোরটাই দে' বলেই আবার কি হল তাদের, তারা হেসে উঠল। এক নাম না জানা মদিব রসে আকণ্ঠ ভবে উঠেছে তাদের। একটা মাতলামির ঘোব লেগেছে মনে।

শুধু তাদের মাঝে হাসি উচ্ছল উবাতীযার গা বেয়ে যেন একটা মানুযিক মোহের ঝরণা পড়তে লাগল গড়িয়ে গড়িযে।

উনুন ধরল। ঘামারিব ঘবে রান্না হত এতদিন দুজনের। এবার তিনজনের রান্না চাপল লাখপতির উঠোনে।

ঘামারি তেল আর ল্যাঙট নিযে এল। লাখপতির চাপা বক্তে লাগল ঢেউ। দুজনে ঝাঁপিযে পড়ল মল্লক্ষেত্রে। এতদিন শুধু মল্লযুদ্ধের জন্য মল্লযুদ্ধ হয়েছে। এতদিন শুধু নানান কায়দা ও চাপা হুঙ্কার উঠেছে ভয়ঙ্কব শক্তির ঘোরে। আর থমকে থেকেছে চারিদিকের পরিবেশ।

আজকের লড়াই উল্লসিত। আজ প্রাণখোলা উল্লাসেব বান ডেকেছে মল্লক্ষেত্রে। রান্না চাপিয়ে থেকে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে উরাতীয়া। কখনো বাঁকা হয়ে, সোজা দাঁড়িয়ে, ঘোমটা তুলে ও খুলে, চোখ বড় বড় করে নয়তো খিলখিল হাসির বাজনা বাজিয়ে দেখছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসঙ্কোচে দিয়ে উঠেছিল হাততালি।

মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করছে কার ক্ষমতা বেশী। আশ্চর্য। কেউ কাউকে আঁটতে পারছে না। ঘামারিকে ফেলে লাখপতি তার ঘাড়ে মাটি ফেলছে আর হাঁকাচ্ছে রদ্দা। তারপর বগলেব তলায়,হাত দিয়ে চেষ্টা করছে উল্টে ফেলতে। পারছে না। আবার পাল্টা লাখপতিকে নিয়ে চলল চেষ্টা। হল না।

তখন আবার হাসি। তিনজনের হাসি। এতদিন এই সন্ধ্যা বেলার উঁচু জমিটার উপরে, আকাশের কোলে দেখা যেত দুটি দানবের মূর্তি। আজ আর একটি বিচিত্র রূপের দ্যুতি মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে। আজ তাবাও যেন ধরেছে মানুষের মূর্তি। মানুসিক স্বপ্নের ঘোর লেগেছে আজ এখানে।

তারপব দিন চলে গেল। একটা নতুন যুগেব নবরূপায়ণেব সূচনা ঘটল এখানে।

উরাতীয়ার ছোট ঘরেব মেয়ে ও বউ। ক্রীতদাসী ছিল খুড়িশাশুড়ীর ঘবে। নিষিদ্ধ যৌবন বাসব থেকে নিযত হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে। যেমন ডাকত আরও অনেককে। যেতেও অনেকে। সে প্রতীক্ষা করেছিল একজনের জন্য।

এখানে এসে তার ছাব্বিশ বছরেব পিপাসিত যৌবন প্লাবিত হল। সেই প্লাবনেব ধারায পলি পড়ল এখানকাব মাটিতে, দুটি মল্লবীর মানুষের হৃদয়ে। সে একজনকে দিয়ে খুশী, পেযে খুশী আর একজনকে। লাখপতি তার ষোল আনা জীবন ও যৌবনের দেবতা। ষোল আনার হিসেবের পর যেটুকু মানুষকে কবে নিঃশঙ্ক, বুকে আনে বল, তার সেটুকু হল ঘামারি। ঘামারি তাব সহচব। তারা তাব প্রেম ও প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য, সুখ ও দুঃখ।

দেবতা ও সহচর, দুই মল্লবীবের মনে সে বোধ ছিল না। অবোধ খুশীতে রচিত হয়েছে তাদের নতুন জীবন। তারা এতদিন শক্তি অনুভব কবেছে মাংসপেশীতে। এবার হৃদযে হৃদযে। তাদের বিশাল শক্তিশালী শরীরের মধ্যে যে বন্দী বিহঙ্গটা এতদিন ছটফট করেছে, সে অকস্মাৎ মুক্ত হয়ে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করে নিল এক মুক্ত ফল্গুধাবায। জানত না, বন্দীব এই মুক্ত ফল্গুধারা হল উরাতীয়া।

এখন কুস্তিব শেষে, যখন তারা দুজন দুধ সিদ্ধি খেযে হাওযায বসে দোলে, তখন তাদের মাঝখানে এসে বসে উবাতীয়া। আগে তাদের মস্তিষ্ক থাকত অবসাদগ্রস্ত আর শরীরে বইত রক্ত। এখন মস্তিষ্কের একটা নতুন টঙ্কাব অনুভূতি হয়।

উরাতীযা বলে ঘামারিকে, 'তাবপব সেকথাটা বল। তোমাব বউ কেমন করে মরল?'

মহাবীর,-ভীম নয়, কুস্তি কায়দা নয়, বউয়ের কথা। ঘামারি বলল, 'কি আর বলব।'

লাখপতি বলে, 'বল না। আমি তো কোনদিন শুনিনি?'

উরাতীয়া ব্যথা পায়, অবাক হয়। বলে, 'সচ্! ওমা এত বন্ধুত্ব আর একথাটা কোন দিন বলা কওয়া হযনি?'

অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান ভরে বলে উরাতীয়া, 'যাও! তোমবা যেন কি?'

বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে তার। আর ওই কথা, ওই জলটুকু তাদের গলায় একটা বিস্মিত ব্যথা ও আনন্দের গোঙানি এনে দেয়। সত্যি তারা অনেক কথা এতদিন বলেছে, হেসেছে। কিন্তু এমন বিচিত্র হাসি ব্যথা ও আনন্দ, এত অজানিত সুখ দুঃখ হৃদয়ের ছোটখাটো অসামান্য বিষয়ের আদানপ্রদান হয়নি।

অনেক কথা, অনেক হাসি, এমন কি কোন কোন রাতে মোটা ও হেঁড়ে গলায় বেসুরো গান পর্যন্ত শোনা যায়।

ধোকে কে নিউ 'পর

ইমারৎ নহি বনতে ॥

অর্থাৎ মিথ্যাব ভিতে সত্য দাঁড়ায় না। এ গানটা লাখপতি শুনেছিল কোন কালে মাইনে আনতে গিয়ে জংশন স্টেশনে। হনুমানের কীর্তি গাঁথা নয়, হিড়িম্বা বধের কাহিনী নয়, একেবারে সত্য কথা। তাও এতদিন পরে।

বেসুর ও হেঁড়ে গলার জন্যও তাদের তিনজনের হাসির অন্ত ছিল না। কখনো ঘামারি সব উদ্ভট হাসির গল্প করে। ছেলে মানুষের মত উৎকট অঙ্গ ভঙ্গি করে নাচে। কোনকালে দেখা এক সিনেমার নায়কনায়িকার অভিনয় ক'রে দুজনে দেখায় উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া হেসে বাঁচে না। বলে, ছি ছি। দূর দূব। তারপর আদুরে মেয়ের মত বলে, 'আবার দেখাও না?'

তার দুই মল্লবীর তাই করে। পবন-পোয়েরা যে এত সরল ও হাসিউচ্ছল তা জানত না গাঁয়ের মানুষেবা। রাক্ষসের মূর্তিব মধ্যে মানুষেব দেখা পেয়ে, তারাও যাওয়া আসা কবতে থাকে।

কিন্তু তাদের দশবছরের ঘুণধবা রক্তে লুকিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর বিষধর। লুকিয়েছিল নিতান্ত দেহসাধক, সংসার ও ভালবাসা বিমুখ মল্লযোদ্ধাদের মনের অগোচরে। সুযোগ বুঝে সে কুণ্ডলীর পাক খুলতে লাগল।

এত সুখ কথা ও হাসি। এত বন্ধুত্ব। তবুও মল্লযোদ্ধাদেব কোথায় চাপা ছিল আগুন, সে এবার থেকে থেকে জ্বলে জ্বলে উঠল আড় কটাক্ষে, শুধু চোখে চোখে। চোখে চোখে ভাব বিনিময়ে ছিল তারা দুরস্ত ও অভ্যস্ত। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

যে মুক্ত ফল্গুধারায় স্নান করে তাবা দুদিন হেসেছিল অনর্গলি, সে হাসি আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওই মুক্ত ফল্গুধাবাটা তাদেব কাছে শুধু ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যৌবন ঝলকিত দেহ। মুক্ত আনন্দ, পাশব কামনার একটি যন্ত্র। দশ বছর ধবে তারা শুধু দেহের সেবা করেছে, দেহকে ভাল বেসেছে। দেহাশ্রিত প্রবৃত্তি বার বাব তাদেব ওই দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করল। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কবে ছিড়ে গেছে টেবও পায়নি। যে ভয়ঙ্কর দৈহিক শক্তি তাদেব মিলনের সূত্র ছিল, আজ তা পরস্পরকে আক্রমণে উদ্যত করল।

তারা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু একজনের চোখে, 'খববদাব! এদিকে নয়।' আর একজনের 'নয় কেন?'

কিন্তু তাবা লড়ে রোজ। খায় একসঙ্গে, গল্প করে। তবু যেন জমে না। হাসিটা যেন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বেরোয় গলা দিযে।

অবাক হয় উরাতীয়া। সব না বুঝলেও এটা বোঝে অদৃশ্যে কী যেন ঘটছে। ওবা হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন? জিজ্ঞেস করলেই ওরা দুজনেই বোকার মত হেসে ফেলে। আসব জমে উঠতে চায়। উঠতে পাবে না।

সেই প্রাগৈতিহাসিকতা আরও নিষ্ঠুর বাপে যেন ফুটে উঠছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে উরাতীয়া। বোঝে না, কেবল আড়ালে নিঃশব্দে কেঁদে মরে। ওরা আমার দেবতা ও সহচর। ওরা দুদিন হাসল। কিন্তু আমি আসার আগেও কি ওরা এমনিই ছিল? মনে হয়নি তো? তবে?

ঘরের মধ্যে রাত্রে লাখপতিব চেহারাটা বদলে যেতে লাগল। তার সোহাগ হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। আদর হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। অসহ্য অদূরে সোহাগে উরাতীয়ার দেহটার উপরে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা যেন তার।

আর ঘামারি সেই সময়, অনেক রাত্রে ঢালু সড়কের পাশ থেকে উঠে আসে একটা ক্ষিপ্ত

ভল্লুকের মত। দাঁড়িয়ে দেখে লাখপতির বন্ধ ঘরটার দিকে। যন্ত্রণা-কাতর জানোয়ারের মত বুক থেকে ফেটে পড়া শব্দটাকে চেপে ধরে কণ্ঠ নালিতে। কান পাতে দেয়ালে।

কোন শব্দ নেই। মাঘের উত্তরে হাওয়া তার গায়ে ও দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে যায়।

শুকিয়ে উঠল উরাতীয়া। লাখপতিকে তার কিছু অদেয় ছিল না। ঘামারির একাকী জীবনের বেদনাই ছিল তার প্রীতি ও সৌহার্দের গৌরব।

আড়ালে যদি সে জিজ্ঞেস করে লাখপতিকে, 'কি হয়েছে তোমাদের?' লাখপতি শুধু চেয়ে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উরাতীয়ার সর্বাঙ্গ, তারপর হঠাৎ খপ্ করে উরাতীয়াকে ধরে ভয়ঙ্কর আদরে দলা পাকিয়ে ফেলে। সে আদরে শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় রক্তের মধ্যে।

ঘামারিও যেন তেমনি। জিজ্ঞেস করলে তেমনি করে চেয়ে থাকে।

কিন্তু গায়ে হাত দেয় না। দিতে চায় যেন। উরাতীয়া ভয় পায়।

একই রকম দুজন। একই চাউনি ও চেহারা। কাছাকাছি থাকলেও এক সময় আলাদা করা যায় না ওদের। একই চালে ওরা দুজন চলেছে।

তবু ওরা লড়ে। শুধু লড়ে। তবে মহাবীরকে প্রণাম করে হাত মেলায়, তারপর লড়ে। তবু ওদের চোখে চোখ মিললেই, পাথরেব ঘর্ষণে যেন আগুন ঠিকরোয়। লড়তে লড়তে ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়, মুহুর্মুহু নতুন নতুন আক্রমণ চালিয়ে যায়।

উরাতীয়া যেন কেমন করে বুঝতে পারে, লড়াইটা অন্যপথ ধরছে। এই কয়েক মাসের মধ্যে বুঝেছে। সে বাধা দেয়, থামতে বলে।

ওরা থামে। ছেড়ে আসে মল্লক্ষেত্র। কিন্তু ওদের ভেতরে দুটো জানোয়ার ফুঁসতে থাকে। উরাতীয়াকে মাঝখানে রেখে অনেকক্ষণ ধরে তারা শান্ত হতে থাকে।

কিন্তু এই অবস্থাও আর রইল না। হঠাৎ লাখপতি একদিন ঘামারির উনুনটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলল।

ঘামারি বলল, 'ভাঙলি যে?'

লাখপতি জবাব দিল, 'ওটা পুরোনো হয়ে গেছে।'

ঘামারি খেতে এল না। লাখপতি বলল, 'খাবিনে?'

ঘামারি জবাব দিল, 'না। তোদের রান্না আর ভাল লাগে না। নিজে রাঁধবো।'

আশ্চর্য শান্ত তাদের কথাবার্তা। বিকেলবেলা দুধ দুইতে গিয়ে উবাতীয়া দেখল ঘামারির গরু নেই। জিজ্ঞেস করল, 'গাই কোথায়?'

—'মাঠে।'

—'দুইতে হবে না?'

'না।' বলেই হঠাৎ ঘামারি দু'হাত বাড়িয়ে দিল উরাতীয়ার দিকে। এই প্রথম। উবাতীয়া দেখল, রাত্রেব বন্ধ ঘরের ক্ষিপ্ত স্বামী লাখপতি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন ছিল চাপা বেদনা ও অপমান। আজ তার চোখে দেখা দিল রাগ ও ঘৃণা। নিঃশব্দে পালিয়ে এল সে। নইলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

তারপর এপার ওপার হল। দুটো সংসার হল। কেবল দেখা হয় মল্লক্ষেত্রে। এসে দেখে উরাতীয়া। বসে হাসে, কথা বলে কিন্তু একটা রুদ্ধশ্বাস গুমসোনি নিয়ে নেমে আসে আকাশটা।

লড়াইয়ের শেষে উরাতীয়া দেয় দুধ আর সিদ্ধি। ওবা খায়।

হয়তো লাখপতি বলে, 'হিড়িম্বাকে কিভাবে মেরেছিল ভীম?'

ঘামারি ঃ 'টুটি ছিড়ে।'

উরাতীয়া কেঁপে উঠে বলে, 'ওসব কথা থাক।' শঙ্কিত অথচ আদুরে গলায় বলে, 'গান গাও তোমরা একটু,আমি শুনি।'

'গান!' বিদ্রুপেব মত শোনায় যেন কথাটা। আর উরাতীয়ার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে।

কিন্তু জগৎবিমুখ, দেহাশ্রিত এই মল্লযোদ্ধাদের বুকে জেগেছে যে অজগর, সে ফুঁসছে দিবানিশি।

মুক্ত ফল্গুধারা স্নান কবেই শেষ হয়েছে। মুক্তিটাকে দেহের মত লুফে নিতে চাইছে তারা।

শীত গেছে। বসন্ত এসেছে। রাত এসেছে। ঢালু সড়কে ধুলো উড়ছে। গাছগুলি পাগল হয়েছে।

সেদিন শেষ গাড়িটা যায়নি তখনো। লড়াই শেষ করে বসেছে দুইজন। পরস্পরকে বাব বার আক্রমণ কবেছে তারা। এমন কি, আইনভঙ্গ করে আঘাত করেছে। সে জন্য ঘামারির কপালটা উঠেছে ফুলে আব লাখপতির ঠোঁটেব কষে রক্ত।

উবাতীয়া নিয়ে এল দুধ সিদ্ধি। বুক ফেটে যাচ্ছে এই দুই বন্ধুর লড়াই দেখে। তাব জন্য ওবা আজ পরস্পরকে ঘৃণা কবছে, লড়ছে। কিন্তু কেন, কেন? সে ওদেব বুক ভবে নিয়েছে, ওবা কেন পাবছে না। তবু হাসতে চাইল, আর চোখ ফেটে জল এল। 'ভগবান। ওরা মানুষ চেনে না। ভালো বাসে না, হাসে না। আমি হাসতে হাসতে এলাম ওরাও দুদিন হাসল। তারপবে এই যন্ত্রণা। সেকি শুধু আমি? তবে ক্রীতদাসী আমি ছিলাম ভাল।'

দুধের পাত্র এগিযে দিল লাখপতিব দিকে। কিন্তু চকিতে কি ঘটে গেল, গেলাসটা নিয়ে লাইনের উপব ছুঁড়ে ফেলে দিল লাখপতি। মুহূর্তে কিসের এক সংকেত, দুই মল্লযোদ্ধাই চকিতে উঠে দাঁড়াল। পবস্পরকে দেখল কযেক মুহূর্ত। তারপর দুজনেই দু'কি থেকে গিয়ে দাঁড়াল মল্লক্ষেত্রে।

উরাতীযা ব্যাকুল গলায বলল, 'আর না, আর লড়ো না।'

কিন্তু ততক্ষণে একটা আচমকা বদ্দা মেরে ঘামাবিকে ছিটকে ফেলেছে লাখপতি। কিন্তু চকিতে ঘামাবি লাফ দিয়ে উঠেছে। তারপব পবস্পর ঝুঁকে দুজন কয়েকবাব নিঃশব্দে পাক খেল চারপাশে। অন্ধকাবেও তাদেব জ্বলন্ত চোখ দেখছিল পরস্পরকে।

উরাতীয়া ছুটে এল মল্লক্ষেত্রের মাঝখানে, 'পায়ে পড়ি, ওগো পায়ে পড়ি, থামো।'

কিন্তু তাকে এড়িয়ে বন বেড়ালের মত নিঃশব্দ উল্লম্ফনে ঘামারি লাখপতির পা দুটো ধবে, তাকে নিয়ে সশব্দে পডল মাটিতে। আর তাদের দেহের ধাক্কায় লাইনের তারের কাছে ছিটকে গেল উরাতীয়া। চিৎকার কবে উঠল, 'থামো!'

থামবে না। প্রাগৈতিহাসিক সেই জানোয়ার দুটো আজ ইতিহাসেব যুগকে তরান্বিত করার জন্য নিজেদের বোধহয় শেষ করবে। দেখা গেল, লাখপতির পা ধরে পাক দিচ্ছে ঘামারি, শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু লাখপতি আঁকড়ে ধরে আছে মাটি। পরমুহূর্তেই আবার দেখা গেল, দুজনেই জাপটা জাপটি করেগড়াগড়ি দিচ্ছে, হুঙ্কার ছাড়ছে, পরস্পরের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। তাবপর দেখা গেল, একজনকে চিৎ করে ফেলে গলা টিপে ধরেছে একজন। আর একজন দুপায়ের মাঝখানে চেপে ধরেছে গর্দান। আর একটা ভয়ঙ্কর গোঙানি।

দূর থেকে একটা আলো এসে পড়েছে মল্লক্ষেত্রে। কিন্তু আমৃত্যু এই হিংস্র লড়াই। সেই আলোয় উরাতীয়া দেখল, পাথরে পাথরে ঘর্ষণ হচ্ছে। রক্ত ঝরছে পাথরের গায়ে।

আলোটা ক্রমে তীব্র হচ্ছে। শেষ গাড়িটা আসছে। উরাতীয়া মরিয়া হয়ে ওদের দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার নরম হাতে আঘাত করল, চিৎকার করে উঠল। 'থামো, থামো

বলছি।'

কিন্তু তাদের পরস্পরের পেষণে শুধু তীব্র গোঙানি। ছিটকে যাচ্ছে মাটি। খাদ হয়ে যাচ্ছে মল্লক্ষেত্র।

উরাতীয়া অস্থির অসহায়ভাবে উঠে দাঁড়াল। মরবে, হয়তো দুজনেই মববে তাব চোখেব সামনে। শুনবে না, কিছুতেই শুনবে না।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে সে অপলক দীপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল দ্রুত এগিয়ে আসা আলোর দিকে। অসহ্য ঘৃণায় অপমানে, বেদনায় ও অভিমানে অভিশাপ দিতে চাইল সে। দিতে গিয়ে আরও জোবে কেঁদে উঠল। আর একবার ওদেব দিকে দেখে চোখে হাত দিল। গাড়ির শব্দটা কানের কাছে বেজে উঠে মাটি কাঁপিয়ে তুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লাইনেব উপর।

তারপব একটা তীব্র চিৎকার, এঞ্জিনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ মাথাটা নিয়ে সে আবার ছিটকে পড়ল মল্লক্ষেত্রের সামনে। গাড়িটার শব্দেব সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল পেছনের রক্ত ক্রুদ্ধ চোখের মত লাল আলোটা।

হয়তো উবাতীয়াব মৃত্যু চিৎকারটা তাদের পাশবিক মল্লযুদ্ধের চেয়েও তীব্র ও ভীষণ জোরে বেজে উঠেছিল। হঠাৎ মল্লযোদ্ধাদেব দুজনেরই হাত শিথিল হয়ে এল। দুজনেই তারা ছেড়ে দিল পরস্পরকে। দুজনেই উঠল, দুজনেই ফিবে তাকাল উরাতীয়াব শরীরের দিকে। মুহূর্তে চমকে, দুজনেই টলতে টলতে এসে বসল উরাতীযার দুপাশে। তাদেব মত ভযঙ্কর মানুষরাও দারুণ আতঙ্কে যেন শিউরে ডুকরে উঠল।

কে লাখপতি, কে ঘামারি, আর তাদের চেনা যায় না। তারা একরকম দেখতে, একই তাদের কণ্ঠস্বর। একজনেই দুজন।

একজন যেন দূর থেকে চাপা গলায় ডাকল, 'উরাতীয়া।'

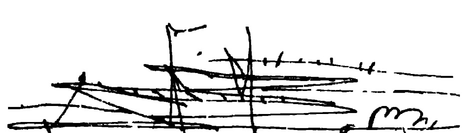
অন্ধকারে চকচক করছে উবাতীযার সর্বাঙ্গেব বক্ত। সে নিঃশব্দ, নীরব। সে মারা গেছে।

আর একজন ডাকল, 'উরাতীয়া।'

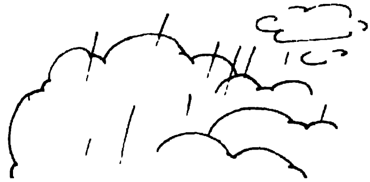
কোন শব্দ নেই। তারা আবার দেখল পরস্পবকে, আবাব উরাতীয়াকে। তাবপর ভূমিকম্পের পাথরের মত কেঁপে উঠল তাদের বিশাল শরীর দুটো। বোবা করুণ অসহায় জীবের মত কাঁপতে লাগল। আর রক্তের ও চোখের জলের নোনা স্বাদে ভবে উঠতে লাগল মুখ। তারা আবার ডাকতে চাইল, 'উরাতীয়া!' কিন্তু পারল না। শুধু বুকে বাজতে লাগল, উবাতীযা। উরাতীয়া!

একদিন তারা দেহাশ্রিত বদ্ধ জীবন বোধে আশ্রয় নিযেছিল এখানে। তাবপর মুক্তি এসেছিল, তারা হেসেছিল, গান করেছিল। তাদের ঘাম ঝবেছিল একদিন। আজ রক্ত পড়ল, চোখের জলে ভিজল মাটি।

শুধু নিথর পড়ে রইল সেই মেয়ে উরাতীয়া। বুকে বাজল তার নাম। বাজতে লাগল, বাজতে থাকবে হয়তো চিরদিন যতদিন না সে আবার এসে হাসবে, কথা বলবে। তেমনি বাজতে লাগল, আর দূর দক্ষিণের পাগলা হাওয়া হা হা কবে ছুটে এল।



নটপুত্ত



আমি ক্রীতদাস। ··

নটপুত্ত বললেন ফিস্‌ফিস্‌ কবে। তাঁব নগ্ন পরিব্রাজক শিষ্যবা চলেছে সঙ্গে। আব জনতা।

—আমি অনুভব কবেছি, আমি ক্রীতদাস।

নটপুত্ত আপন মনে বলছেন, আর নিবন্তর পথ চলছেন। সূর্য পরিক্রমার দক্ষিণায়নের শেষ কাল সমাগত। অসহ্য শীত। তুষাবলেহী উত্তবে বাতাস ঝড়ের মতো বেগে বইছে। ধূলো উড়ছে। নীল আকাশকে ধূসর কবছে। আবছায়াব অস্পষ্টতা দিকে দিকে গাছেরা নিস্পত্র,যেন রুগ্ন নগ্ন অচেলকদেব মতো। ফুল সম্ভার নেই। পাখিবা চলে গেছে সমুদ্রসৈকতে, বঙ্গে, কলিঙ্গে, সিন্ধুতটে আর সৌরাষ্ট্রে

প্রবল বাতাস, শুকনো পাতা উডছে। বাতাসও শুকনো, নহলাদেব চামড়াব লিকলিকে কশা-র মতো। সহস্র কশা-ব চাপা তর্জনের শব্দ। ধূলোয় আর পোকায প্রান্তরগুলি আচ্ছন্ন। জনপদগুলি অস্পষ্ট। মানুষেরা ছায়া ছাযা। কাবণ, সকলেই আগুন জ্বালছে, তাই ধোঁয়া হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় বাজপথেব ওপবেই অগ্নিকুন্ড তৈরী কবেছে গ্রামবাসীরা।

কিন্তু নটপুত্ত নির্বিকার। তাঁর বিশাল সুদীর্ঘ মূর্তি ধ্বজার মতো উন্নত। শক্ত কঠিন, আকাশস্পর্শী।তাঁব আজানুলম্বিত জটা যদিও তিনি গাছের গুড়িতে রেখে তীক্ষ্ণ পাথব খন্ড দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন, তবু এখনো কাঁধ এবং গ্রীবায় জড়িযে আছে। ধূলোয় রং বিবর্ণ সেই জটার, আর পাথরের মতো হযে গেছে। গুম্ফ শ্মশ্রু যেন ঝড-ভীরু সাপের মতো তাঁর গাল চিবুক গলা আঁকড়ে কুঁকড়ে রয়েছে। সেগুলি ধূলোয় আচ্ছাদিত। সন্ধ্যাব ধূসব মেঘের মতো তার রং। তাঁর কাঁধ থেকে মাটিতে লুটিযে পড়া, ভেড়ার লোমেব গোণক। বিস্রস্ত আলখাল্লার মতো তার দীর্ঘলোম মোটা গোণকটা শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী নিজেব গায়ের থেকে খুলে পবিয়ে দিয়েছিলেন। চামড়ার বন্ধনী দিযে বেঁধে দিয়েছিলেন গলাব সঙ্গে। তাই পড়ে যায় নি কোথাও। সেটাব রং ও তাঁর জটা শ্মশ্রু গুম্ফের মতোই হযেছে। কারণ তাঁব চলা দশটি পূর্ণিমা অতিক্রম করে গেছে। শ্রাবস্তীর ধূলো রক্তিম। কপিলাবস্তু ঘুবে এসেছেন। শাক্যরাজ্যের ধূলোও রক্তিম। বৈশালী এবং কৌশাম্বী আর ঋষিপাত্তন মৃগদাব-কাশীগ্রামেব ধূলো ধূসর। তারই মিশ্রিত রং তাঁর সর্বাঙ্গে। তাঁর বিশাল সিংহের মতো লোমশ বুকে। বলিষ্ঠ হাতে পাযে।

এখন তিনি চলেছেন দক্ষিণ-পূর্বে, রাজবর্ত্মের উপর দিয়ে। শ্রেণিক তাঁর জামাতা-যৌতুক হিসেবে কোশলের কাছ থেকে কাশীগ্রাম লাভ করে এই পথ তৈরি কবেছিলেন রাজপুত্র [illegible]। তাঁর উজ্জ্বল বর্ণ আর সুন্দর দেহ, লোকে তাঁকে তাই বিম্বিসার বলত।

—আঃ। হে শ্রেণিক, আমি তোমাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। হে শ্রেণিক, আমার কথা কি তোমার মনে পড়েছিল? সেই শেষ মুহূর্তে? সেই অন্ধকাব ঘোর কুটিল রাত্রে, যে মুহূর্তে তোমার পুত্রের অস্ত্র তোমাকে প্রথম আঘাত করল। আব তারপরে ভিক্ষু দেবদত্তের অনুচরদের কুঠার?

বিড়বিড় করতে করতে নটপুত্তআর্তগলায় চীৎকার করে উঠলেন, ওহো, প্রিয় শ্রেণিক!...

অনুসবণকারী নগ্ন পরিব্রাজকেরা মুখ চাওয়াচায়ি করল। জনতার মধ্যে থেকে কলরব উঠল, সেনিয় নেই। ...... সেনিয মরে এতদিনে ভূত হয়ে গেছে।... সেনিয়কে ওরা ...

গলাটা যেন কেউ টিপে ধরল। বাতাস থাবাড়ি দিল মুখে। একটা ফিস্ফিস্ শব্দ ছড়িয়ে পড়ল জনতাব মধ্যে। চুপ! চুপ! ...এব মধ্যে যেকেউ গুপ্তচর হতে পাবে। তার কাছে এক্ষুনি খবর চলে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাগচমিয়া। ... কিংবা জ্যোৎমাল্। আই বাবা ভগবান্। হে বুদ্ধুবাবা! হে নিগন্থবাবা! সে এখন হয়তো পাটলিব গড়ে আছে। রাজগীরেও থাকতে পারে।

নটপুত্ত জানেন, ওবা অজাতশত্রুব কথা বলছে। হ্যাঁ পাটলিপুত্রে নতুন দুর্গ তৈবি করেছে সে। আর গুপ্তচর থাকলে ছাগচর্মিকি শাস্তি হতে পারে। কানের কাছ থেকে গলা অবধি চামড়া ছিঁড়ে, দড়ি দিযে বেঁধে নিয়ে যাবে। নইলে জ্যোতিমাল। সাবা গায়ে তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া।

একটা স্তব্ধতা নেমে এল। কেবল শীতার্ত নগ্ন পরিব্রাজকদের উর্ধ্বাঙ্গের রুক্ষ লোমশ পটিকা কাপড়ের খস্খস্ ভিক্ষাপাত্র ও জলপাত্রেব ঠক্ঠক্ শব্দ। আর ধার্মিক জনতার হাতে খাদ্যভাণ্ডেব ও জলন্ত কাঠেব পট্পট্ শব্দ। তাবা সিদ্ধপুরুষ নটপুত্তকে নিজেদেব গ্রামের শেষ পর্যন্ত সেবা করতে কবতে এগিযে চলেছে। একটা গ্রাম শেষ হয়, আবাব এক গ্রামের নরনাবীবা ছুটে আসে।

কিন্তু নটপুত্ত অবিচলিত, বিকাবহীন এগিযে চলেছেন। তিনি সেবা গ্রহণে বিরত। আশীর্বাদ উচ্চাবণে নিরস্ত। তিনি ফিস্ফিস্ কবে বললেন, হে শ্রেণিক, আমি ক্রীতদাস, আমি জানি। কিন্তু ভগবানেরা তোমাব কাছে ছিলেন! আমি দেখলাম তোমাব প্রতি উদ্যত কৃপাণেব কাছে, তাঁরাও ক্রীতদাসেব মতো নীরব, নতশির, অসহায়।

নটপুত্তেব আকর্ণবিস্তৃত দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ শুকনো। এক ফোঁটা জল নেই। তাঁর চোখেব পাতা ধূলায় বিবর্ণ। তাঁব দৃষ্টি সামনে, দূব আকাশে নিবদ্ধ। সেখানে কোনো ব্যথাব ছায়া নেই। রাগেব বহ্নি নেই। আনন্দের উজ্জ্বলতা নেই। আছে আবিষ্কারেব দূব অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণতা, আর বিস্ময়।

আকাশেব ধূসর দিকচক্রবালে মধ্য আকাশস্পর্শী বিশাল মেঘখণ্ডের মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। মানুষের কল্পিত রুদ্রদেবতা তাঁকে বলা যাবে না। কারণ ভেরী ও ঝাঁজবেব তীব্র শব্দ নেই। দৈত্যও বলা যাবে না। গর্জন নেই। সারা আকাশের বুকে যেন খোঁচা খোঁচা এক অতিকায় মেঘখণ্ড। স্থির বিদ্যুৎ দুই চোখ। সঙ্গে ধ্বজ ও পতাকা তুলতে যিনি নিষেধ করেছেন পবিব্রাজকদেব। নটপুত্ত নিজেই যেন ধ্বজ ও পতাকার মতো চলেছেন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে।

নিযমানুযায়ী অচেলকদেব মতো তিনি বিলেপন কবেন নি, বিভু মাখেন নি। ধূলায তিনি বিভূষিত। রক্তেব বিলেপন তাঁব দেহে। বৈশালীব হুতাশ বাতাসে, আব এই মাগধীয় রাজবর্ত্মের হিমসাপের ছোবলে, তাঁব চোখের চারপাশে রেখাগুলি ফেটে ফেটে রক্ত পড়ছে। তাঁর উন্নত নাসা ফেটে গেছে। নাকেব পাশে, গভীর রেখায় আর ঠোঁটেব কষ ফেটে রক্ত পড়ছে। গুম্ফ শ্মশ্রুতে লেগেছে। স্তম্ভ সদৃশ জঙ্ঘা জীর্ণ প্রাসাদের পাথরের মতো ফাটা। অনাবৃষ্টিতে চৌচির

মাটির মতো পায়ের পাতায় রক্ত জমে গেছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের দাগ। রক্তের দাগ মাটিতে লাগছে না। রুক্ষ শুকনো বাতাসে রক্ত মুহূর্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তিনি নির্বিকার। তাঁর গন্তব্য,বেভার, পাণ্ডব,বেপল্লু, গিঞ্জকূট আর ইসিগিলি, পাঁচ পর্বত বেষ্টিত রাজগৃহ। বহু বছর পরে তিনি সেখানে প্রত্যাবর্তন করছেন। নির্গন্থ দলীয়, অর্থাৎ নটপুত্ত মহাবীরের সহধর্মী, সিদ্ধপুরুষ নগ্ন অচেলক, প্রাজ্ঞ নটপুত্ত বলে তাঁকে সারা দেশ জানে। কিন্তু শ্রাবস্তী থেকে তিনি প্রায় মৌন। শিষ্য পরিব্রাজকদের উপদেশ দেন নি। ধর্ম আলোচনায একবারও রত হন নি। সাত্ত্বিক রীতিনীতি নিয়ম রক্ষা করেন নি। পরিব্রাজকেরা তাঁকে ঈশ্বরেব চোখে দেখে। তাদের নীরব বিস্মিত জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দেন নি। তারা দুঃখিত হয়েছে। তিনি সান্ত্বনা দেন নি। কাউকে সঙ্গে থাকতে বলেন নি। চলে যেতে বলেন নি।

বসন্তকালে কোশলে একবার তিনি কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আমি ক্রীতদাস। ...

বৈশালীর অগ্নিবৃষ্টি ঝরা রৌদ্রে দাঁড়িযে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আহ! আমি ক্রীতদাস। আমার সংশয় দূর হয়ে যাচ্ছে।

এবং এখনো বলছেন আপন মনে রক্তাক্ত ঠোঁট নেড়ে, আমি জানতে পেরেছি, আমি ক্রীতদাস। ...

আর এইভাবে চলেছেন। এইভাবেই সারা পথ তাঁর পিছুপিছু দলে দলে নরনারী এসেছে। এক দল থেমেছে, আর এক দল এসেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গৃহপতি ধনী, শ্রেষ্ঠী আর সাধাবণ জীবিকাশ্রযী জনতা। ধনী আর শ্রেষ্ঠী পুরুষ এবং মহিলারা সোনার বলয় আর কঙ্কণ, চন্দ্র আব মুদ্রা মস্তক ও কণ্ঠহাব তাঁর দেহলগ্ন গোণকে এঁটে দিয়েছে। এবং এখনো দিচ্ছে। তিনি তাকিযে দেখছেন না।

নটপুত্ত যেন ব্রাহ্মণ পুবোহিতদের কল্পিত স্বর্গের এক বিশাল দেবতা। আর তাঁর পশ্চাদ্‌গামী পরিব্রাজক ও জনতা যেন মর্কটাকার ছায়া ছাযা দেবদূত।

তাঁকে দেখে সবাই চীৎকার করে উঠছে, ইনি গণোচাবিযা !

—আমি ক্রীতদাস !

মনে মনে বলছেন নটপুত্ত।

—ইনি মহাপরিব্রাজক নটপুত্ত।

—আমি ক্রীতদাস। ··তিনি নিজেকে বলছেন।

—ইনি রক্ষিতেন্দ্রিয় ! শীলসম্পন্ন !

নটপুত্ত জানেন, মানুষ অভ্যাসে বলছে। প্রতিধ্বনি করছে। যেমন, ইনি মহারাজ। হ্যাঁ ইনি মহারাজ। উনি প্রজাপালক। উনি প্রজাপালক। ইনি-ই রক্ষাকর্তা ! হ্যাঁ, ইনি রক্ষাকর্তা।

গ্রামে এই সব পুরুষ ও নারীরা, কাজে ও খেলায় রত । কোথাও গ্রামের পথে, কোথাও রাজবর্ত্মের ওপরে। কিংবা ঘরেব মধ্যে। আর নগরে ! অগ্নিকুণ্ডের পাশে কোথাও মেঘ কিংবা কুক্কুট যুদ্ধ লাগিয়ে মজা দেখছে। কাঠেব ফলকে পঙ্‌ক্তি খেলছে। কাঠের ফলক যাদের নেই, তাঁবা আকাশে আঙুল দেখিয়ে দেখিযে ঘর কেটে কল্পনায় খেলছে। মাটিতে ঘর কেটে দৌড়ে দৌড়ে খেলছে। বঙ্কক খেলছে ছোট ছোট লাঙল দিযে। বাজিকরের কৌশল দেখছে। এমনি কি দামামা বাজাচ্ছে। নৃত্য গীত বাদ্য প্রেক্ষা আখ্যান গান করছে।

ওরা অন্ধ খঞ্জদের অঙ্গবিকৃতি অনুকরণ করে খেলছে। আর বাজি ধরছে অপরের মনের ভাব বিষয় অনুমানেব ওপব। কিংবা খেলুড়িব পিঠে কিছু এঁকে বা লিখে বাজি ধরছে।

নগরগুলিতে বাড়াবাড়ি সব থেকে বেশী। সেখানে অশ্ব-বৃষ-অজ লড়াইযের খেলা চলেছে।

অক্ষক্রীড়া আর তালপাতার বড় বড় চক্র ঘোরাচ্ছে। নয় তো বাঁশী বানিয়ে বাজাচ্ছে। অপরাধীর কপালের হাড় তুলে গরম সাঁড়াশি দিয়ে মস্তিষ্ক টেনে বের করা দেখতে যাচ্ছে ভিড় করে। আর সেই অবস্থাতে ছুটে আসছে নটপুত্তের পিছনে পিছনে। শীতার্ত সবাই মৌরিয় আর মদ্যপান করছে। কামাসক্ত নরনারী নির্লজ্জ ব্যবহার করছে। কপি দম্পতিদের মৈথুনাসনের মতো বারবনিতারা নাগরদের কোললগ্না। অশ্লীল চিত্রপ্রদর্শন দেখছে অনেকে দল বেঁধে।

যাঁরা অভিজাত আর ধার্মিক তাঁরা চলেছেন নিজেদের শৃঙ্খলায়। কিন্তু যে সব মহিলারা নটপুত্তকে দর্শনের জন্যে ছুটে আসছে, সেই সব যুবতীবা, ধনী যুবকেবা, কেউ কেউ মত্ততা প্রকাশ কবছে। তাদের মুখের কাছে মৌমাছিরা গুন্‌গুন্ করছে। তারা কেউ কেউ মদ্যপান করছে। এবং নগ্নপরিব্রাজকদের দেখে যুবতীবা কামাসক্ত হচ্ছে। আর ভাবছে, 'আমাদের পাপ হচ্ছে।' আব আর্তস্বরে চীৎকার কবে উঠছে, হে অর্হৎ! হে অন্তর্জ্ঞানী! আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাদেব মঙ্গল করুন। হীনতা মার্জনা করুন।

আর কৃষককেরা, ক্ষৌরকারেরা, স্নাপকেবা, মোদক-মালাকার-রজক-নলকারেরা, গণক-মুদ্রিক, কুম্ভকাবেবা, আর পশুপালকেবা, চেলক-চলক-পিণ্ডদাযকেরা, সকলেই কাজ ফেলে ছুটে আসছে। কাবণ তাদের বুকের ভিতবের একটা অন্ধকার অপবিচিত জায়গা দুলে উঠছে। তাবা প্রণত হচ্ছে। তারা চীৎকাব করছে, ইনি তীর্থঙ্কর নটপুত্ত।

আমি ক্রীতদাস। আর সন্দেহ থাকছে না। নটপুত্ত বলছেন, আব, মানুষের বিভিন্ন সত্তার যুগপৎ প্রকাশগুলি তাঁর অবচেতন অনুভূতিতে অনুভূত হচ্ছে।

আব যখন শববাহকেবা তাঁর সামনে পড়ছে, আত্মীযস্বজনেবা যখন মিছিল করে প্রচলিত শোককথা বলে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে, 'তুমি এমন শত্রুতা কবলে··' তখন নটপুত্তকে দেখে তাবা স্তব্ধ হযে যাচ্ছে; তারপবে হঠাৎ চীৎকার করে উঠছে, হে ত্রিকালজ্ঞ! আপনার দর্শন পেয়ে এ মৃতের আত্মা স্বর্গলাভ করুক।

—স্বর্গ নাই! আমি ক্রীতদাস।

নটপুত্ত বলছেন মনে মনে। শবেব দিকে দৃকপাত করছেন না। দূব-নিবদ্ধ দৃষ্টি তাঁর অপলক। আব শববাহকেবা, আত্মীয়-স্বজনেরা নিবিষ্ট অনুসন্ধিৎসায দেখছে। চুপিচুপি বলাবলি করছে নিজেরা, 'আই বাবা! দেখ উনি কী রকম দেখছেন। নরকেব প্রহরীকে উনি চলে যাবাব হুকুম দিচ্ছেন। আব স্বর্গের দূতকে ডাকছেন। আমি স্পষ্ট দেখেছি, ওঁব ঠোঁট নড়ছিল'।

—নবক নাই। আমি ক্রীতদাস।

নটপুত্ত নিজেকে বলছেন। কিন্তু জনতা কিংবা পবিব্রাজকেরা শুনতে পাচ্ছে না। তিনি এখনো নিজেকে বলছেন। আব তাঁর সমগ্র ধ্যান পরিব্রজন কৃচ্ছ্রতাসাধন সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা অবচেতনে ক্রিযা করছে।

ভবিষ্যৎ বাণী ব্যতিবেকেই বোধহয হিমপ্রবাহ নেমেছে। সমগ্র ভূমি এবং আকাশ মেঘ ও কুজ্ঝটিকায় ছেয়ে যাচ্ছে। শিষ্য পরিব্রাজকেবা কেউ কেউ কাতবধ্বনি করছে; আব ভাবছে, 'আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাব মধ্যে পাপ আছে।' তখন তাবা তীর্থঙ্কর নটপুত্তেব ধ্যান কবছে। কারণ তীর্থঙ্করই ঈশ্বব। আব কোনো কোনো পরিব্রাজক, যাবা একটু বযস্ক, সঙ্ঘ যাদের সিদ্ধিলাভ স্বীকার করেছে, তাবা নিজেদের ইচ্ছায, সেবাব্রতী মানুষদেব অনুরোধে থেমে পড়ছে। আর ভাবছে, 'আমি পাপ করছি।' তবু সেবা গ্রহণ কবছে, কাবণ সে নিজেকে স্খলিত ভাবছে। আব তাই ধনী গৃহপতি যুবতী বিধবাব বাড়িতে নানান প্রকার অদৃশ্যজীবী উপদ্রবকাবীদের শান্তিবিধানের জন্যে কপট নিগ্রন্থীয় উপাসনায় রত হচ্ছে। ভাবছে, 'আমি পাপ করছি।' আর

তাই কামাসক্ত হযে পড়ছে এবং ভযজনিত কামনা অশক্ত। তাই যুদ্ধে পরাস্ত হচ্ছে, আর উপহাসের পাত্র হচ্ছে যুবতীব কাছে। 'এও পাপেব ফল' ভাবছে, আর বিকারগ্রস্থ হয়ে অবণ্যে চলে যাচ্ছে।

নটপুত্ত অবিচলিত চলেছেন। এখন প্রাচীন পাথরের গায়ে শ্যাওলাব মতো রক্ত জমাট হযে উঠেছে তাঁব পায়ের ফাটলে। তাঁর সুগৌব গণ্ড আগুনে পোড়া তামার পাত্রের মতো হয়েছিল। এখন সেখানে রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। আব কালো আকাশেব পটে তাঁকে কুটিল হিংস্র থাবা নিযে যেন ভয়ে আবো উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে। অবাক হযে যেন সেই বিশাল মূর্তিকে দেখছে।

সকলের হাতে জ্বলন্ত পিপ্পলেব ডাল। যেন একটা আগুনের মিছিল।

ব্রাহ্মণ পুবোহিতেবা বিদ্রূপ কবছে নটপুত্তকে, ইনি দিগম্বব তাই ঈশ্ববকে দর্শন কবছেন।

আর চীৎকার কবে হাসছে।

নটপুত্ত বলছেন, ঈশ্বর নাই। আমি ক্রীতদাস।

—ইনি নাকি ঔপপাতিক।

আবাব হাসি।

—এঁর বাবা ছিল না। মাও ছিল না। ইনি নাকি ঔপপাতিক।

—মানে অযোনিজ! হাঃ হাঃ হাঃ।

নটপুত্ত নির্বিকাব। তিনি মনে মনে বলছেন, আমি যোনিজ, কামজ। ঔপপাতিক সত্তা কিছু নাই। আমি ক্রীতদাস ..

—তবে ইন্দ্র বরুণের দিব্যি গেলে বলছি, লোকটা খুব কষ্টসহিষ্ণু।

—আর তাই অজাতশত্রুব মন গলে যাবে।

—তাবপব দেবদত্ত ভিক্ষু যেমন কবে বিম্বিসাবকে হত্যা কবিযেছিল এও হযতো উদীযকে দিযে তার বাপকে ·

—চুপ! চুপ! গূঢ়পুরুষ সেইসব ছিনাবেব বাচ্চাবা হয তো আশেপাশে আছে।

—ওরে বাবা! চুপ! চুপ! শ্রাবস্তীবাজ পর্যন্ত হাব মেনে গেছে। নিজেব ভাগ্নে অজাতশত্রুর সঙ্গে, নিজেরই বোনেব বিযে পর্যন্ত দিতে হযেছে।

—হাঁ বাবা, সব চুপ। নইলে পলালপীঠ।

একটা চাপা আর্তধ্বনি করলপুবোহিতেরা। পলালপীঠ! আই বাবা! হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সাবা শরীর মাংস বাশিতে পবিণত কবা। দোহাইবাবা নটপুত্ত, তোমার জয হোক!

নটপুত্ত জানেন, উদীয অজাতশত্রুর ছেলে। আব অজাতশত্রুব একমাত্র ভয, তাব ছেলে কোনদিন তাকে গুপ্তহত্যা কববে। কাবণ পিতাকে সে হত্যা কবেছিল। আহা, হে শ্রেণিক, আবাব তোমাব কথা মনে পড়ছে। যেদিন ঘোষিত হল, আমি তীর্থংকর হযেছি, তাবপরে আমি রাজগৃহে গিযেছিলাম। তুমি আমাব কাছে ধর্মেব উপদেশ শুনতে এসেছিলে। আমি তখন মহাবীরেব সহধর্মী। হে শ্রেণিক! আমি তোমাকে অবাস্তব উপদেশ প্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ কবেছিলাম! তাবপর তুমি গৌতমেব শরণাপন্ন হযেছিলে। হে শ্রেণিক. সেই ঘোর রাত্রে, যে মুহূর্তে তোমাব দেহে প্রিয়তম পুত্রেব অস্ত্র আঘাত কবল, সেই মুহূর্তে জানলে. সংসাবে ত্রাণকর্তা কেউ নাই

আর একবার সশব্দে ফুকরে উঠলেন নটপুত্ত, ওহো, শ্রেণিক, আমরা সবাই ক্রীতদাস। ...

কথা বোঝা গেল না। সবাই ভাবল, উনি কষ্টে আর্তনাদ করছেন। আগুন নিয়ে অনেকে তাঁর কাছে দৌড়ে এল। উনি একইভাবে চললেন। আর, ছদ্মবেশী তস্করেরা তাঁব দেহের কাছে ঘন হয়ে চলতে লাগল। তাঁকে স্পর্শ করে পুণ্য করাব ভান করছে ওরা। গোণক থেকে সোনাব

অলঙ্কার আর মুদ্রাগুলি তুলে নিতে চাইছে। কিন্তু ওদের ভয় করছে। কারণ ওদের পাপের সংস্কার আছে। হয়তো হাতটা এখুনি খসে পড়বে। জ্বলে যাবে। জনতা এবং পাপের ভয়ের ঘাম-দরিয়ার স্রোতে ওরা ভেসে চলেছে।

নটপুত্তের অবচেতনে এগুলি অনুভূত হচ্ছে। আর তিনি বলছেন, ক্রীতদাস! আমি ক্রীতদাস! ...

আর নালন্দার রাজবর্ত্মে হিম-প্রবাহের পর, নতুন রৌদ্র তখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। আর রাজবর্ত্মের উচ্চ চড়াইয়ের শীর্ষে, নটপুত্তকে মনে হল, তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। পিপ্পল আর দেবদারু আর কোশাম্বী গাছের ঊর্ধ্ব আকাশে যেন তিনি ঠেকে আছেন। তিনি দাঁড়ালেন, আর সহসা চীৎকার করে বলে উঠলেন, আমি ভুজিষ্য নই!

পরিব্রাজকেরা থমকে গেল। জনতা স্তব্ধ। আর নালন্দার গ্রাম থেকে নরনারী ছুটে আসছে।

নটপুত্ত আবাব চীৎকার করে উঠলেন, আমি ভুজিষ্য নই। আমি মুক্তদাস নই।

পরিব্রাজকেরা সমবেত গলায় বলে উঠল, আপনি তীর্থংকর, আপনি দেবতা।

বৈশালীর পরে এই প্রথম তিনি হাসলেন। বললেন, আমি ক্রীতদাস! ....

নগ্ন পরিব্রাজকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। রৌদ্রে তাদের আরাম লাগছিল। তারা মনে করল, তীর্থংকর গণাচার্য নটপুত্ত নিশ্চয় ভিন্ন জগতের সঙ্গে কথা বলছেন। হয়তো স্বয়ং পার্শ্বনাথ এসেছেন তাঁর কাছে। এবং তাঁর এই ধ্যানী দশা দেখে জনতা মাটিতে শুয়ে পড়ল।

নটপুত্ত রাজগৃহের দিকে এগিয়ে চললেন। আর মনে মনে বলতে লাগলেন, এই গ্রামেরই এক বৈশ্যের ঘরে আমি ক্রীতদাস ছিলাম। বাবা মাকে আমি অস্পষ্ট চিনি । বৈশ্যকর্তা বলতেন, তাঁবা ছিলেন পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকা। গৃহিণী বলতেন, আমার বাবা ছিলেন নট। মা নটী। তাঁবা এই গ্রামে নাচ ও পট দেখিয়ে চলে যাবার সময়, আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কারণ, তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন আমার চার বছব বয়স। নালন্দার বণিকের গরু চরাতাম আমি, তাদের পরিচর্যা করতাম। বাব মার কথা ভাবতে আমার ভাল লাগত। আমার কান্না পেত। আমাকে সবাই নটপুত্ত বলে ডাকতেন। বাড়ির সকলেই স্নেহ কবতেন। আমি কখনো জলে ছায়া দেখতাম না। সকলেব মুখে শুনতাম, আমি সুন্দর। আমার মাথায় ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, আর স্নিগ্ধ জলাশযের মতো আযত চোখ। .. আমার যখন সাত বছব বয়স, তখন গোশালের জ্যেষ্ঠ দাস, গোচারণ মাঠে কামুকের মতো ব্যবহার করেছিল আমার সঙ্গে। আমি গৃহকর্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম। তাতে গোশালের জ্যেষ্ঠ দাসের ভীষণ শাস্তি হয়েছিল। গবম লৌহদন্ড দিযে তার প্রত্যঙ্গে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছিল। সে চীৎকার করে কেঁদেছিল। আমাবও কান্না পেযেছিল। ..

গৃহিণী শুধু আমাকে ছেলের মতো বক্ষা করতেন। তারপর ষোল বছর বয়সে আমি অন্তঃপুরের বাইরে, বাড়ির কাজে বহাল হই। আমি শুনতে পেতাম, আমার যদি ভালো কুল এবং শীল হত, তবে গৃহপতির কন্যা, সুগন্ধার সঙ্গে আমাব বিয়ে হত। গৃহিণীই বিশেষভাবে একথা বলতেন তাঁর কন্যার সম্পর্কে। সুগন্ধা ছিল আমার বান্ধবী তুল্যা। সে ছিল কুসুমের মতো সুন্দর আর সুগন্ধযুক্তা। কিন্তু আয়েশ এবং আরাম আর মন্দ দাসীদের সঙ্গে থেকে থেকে, অল্প বয়সেই সে বিকারগ্রস্ত কামাতুবা হয়ে উঠেছিল। সে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেবতা মনে করত, আর তাদের কাছ থেকে মন্ত্রপড়া ফুল নিয়ে দাসীদের সঙ্গে বাজি খেলত। তার পিতার সঙ্গে গূঢ়ভাবে ক্রীড়াবতা দাসীর কাছে পিতার কাহিনী শুনত। অশ্লীল পট দেখত। মৌরিয় পান করত। তখন তার চোখ ঠোঁট গাল রক্তবর্ণ হত আর দাপাদাপি করত। তখন দাসীরা আমাকে ডেকে নিয়ে

যেত গৃহের নিম্নতল কুঠরিতে। প্রভুকন্যা আমাকে আদেশ করত তার সঙ্গে লিপ্ত হতে। আমি আদেশ পালন করতে পারতাম না। আমাব ঘৃণা হত না, একটা আবেগ আসত। কিন্তু একটা প্রতিরোধ আপনি গড়ে উঠত। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকত। দাসীরা এবং অপরাপর মহিলাবা হাসাহাসি করত। সুগন্ধা আমাকে চুম্বন করত·আব রাগে সাবা গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিত। বিকারের যন্ত্রণায় তার কষ্ট হত। আর আমার কান্না পেত। সুগন্ধা আমাকে বিষ্ঠাভোজী বলে গালাগাল দিত। আমার কান্না পেত। কিন্তু বহির্বাটীতে এসেও শান্তি পেলাম না। কাম এবং দ্বেষ আর হিংসা এবং স্বার্থ আমাকে জড়ীভূত করে ফেলেছিল। কঠিন পরিশ্রমী এবং অনাহারী গ্রামবাসী, অসহায় গৃহপালিত পশু, যজ্ঞের বলি এবং শক্তিমানদের উল্লাসেব মধ্যে আমি দেখছিলাম, কেবল দুঃখ। কেন এসব আমি দেখেছিলাম, জানি না। আমার কান্না পেত। ...আব তখন গো-বৎসের মতো কেবলি মুখ তুলে তুলে আকাশের দিকে তাকাতাম। বাবা মাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করত। আমাব কান্না পেত। গৃহপতির অনুমতি নিয়ে আমি আবাব গোশালার কাজে ফিরে গিয়েছিলাম। এই দুঃখের কাবণ জানবাব জন্যে, আমি উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। আমি আব সব ভুলে গিয়েছিলাম। আহাবে,শয়নে, সর্বক্ষণ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নীতি-জ্ঞানহীন অনাচার অত্যাচার ও বাজশক্তি ও জনশক্তিব ভীরুতা আমাকে নির্বাক করেছিল। আমি হাসতেও ভুলে গিয়েছিলাম। আমাব জড়ীভূত অবস্থায় সকলে বিদ্রূপ কবত এবং করুণা করত।

সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা গোচাবণ মাঠ থেকে ফিবে আমি বসেছিলাম গোশালেব কাছেই। জানতাম না, আমাব চোখে জল পড়ছিল। সহসা গৃহপতি কর্তা আমার সামনে এসে পড়লেন। কিন্তু আমি তাঁকে সম্মান কবতে ভুলে গেলাম। আমি বসে রইলাম। গৃহপতি কর্তা দাঁড়ালেন আমার সামনে। জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন হে নটপুত্ত।

উনি কে, কে কথা বলছেন, দেখলাম না। আমি বললাম, বড় দুঃখ।

—কিসের ?

—অসুন্দবেব, অন্যাযের, অসহাযতাব, অনাহাবেব, অবিবেক আব অবিচারেব :

—কোথায ?

—এই বিশ্বময।

গৃহপতি কর্তা একমুহূর্ত চুপ করে থেকে চলে গেলেন সহসা। গোশালার দাসেবা এসে আমাকে সজাগ কবল। শাস্তিব ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু একটু পবেই গৃহপতি বাড়িব সকল নবনাবী এসে আমাব সামনে দাঁড়ালেন। এবং গৃহপতি কর্তা স্বযং। আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। গৃহপতি কর্তা আবার প্রশ্ন কবলেন, নটপুত্তেব কান্নাব কাবণ কী আমি শুনতে চাই।

আমি আবাব আমার কথার পুনরুক্তি কবলাম। বললাম, প্রভু, আপনাব কাছে শুনেছি, আপনি বাণিজ্য কবতে গিয়ে দেখেছেন, সমুদ্র অশেষ। এবং আকাশও অশেষ। দুঃখ সেইরকম দেখছি। এর হাত থেকে কি পবিত্রাণ নেই ?

সহসা গৃহপতিকর্তা হাত জোড় কবে বললেন, হে নটপুত্ত, আমি সামান্য মানুষ, আমি জানি না। হে নটপুত্ত, আপনি ভুজিষ্য। আপনি মুক্ত। আমি আপনাব চোখে এক অপূর্ব আলো দেখছি। আমি দেখছি আপনি সামান্য নন। আমবা দেখছি, আপনি পূজ্য।

আমি বললাম, প্রভু, আমি আপনাব দাস। আমাকে অমন কথা বলবেন না।

কিন্তু গৃহপতি কর্তা আমাব কথাকে বিনয় মনে করলেন। বললেন, হে নটপুত্ত, আমি ভুল করি নাই। আমবা অনেকদিন লক্ষ্য করছি। আজ সব সন্দেহেব নিরসন হল। আপনাকে দাস

হিসাবে পালন করার সাহস আমার আর নাই। আপনি ভুজিষ্য। আমরা দেখছি, আপনি পূজ্য।

আমি তাঁদের নিবারণ করতে পারলাম না। মনে হল, আমি দুঃখ মুক্তি করব। এ বিশ্বে আমার কাজ আছে। আর সে-কাজ দুঃখ মুক্তির অনুসন্ধান।

মুহূর্তে এ কথা নালন্দার গ্রামে রটে গেল। আর আমাকে গ্রামবাসীরা দেখবার জন্যে ছুটে এল! আমি লজ্জা পেলাম। সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। সেই সময়ে সেই গ্রামে এসেছিল একজন পার্শ্বনাথের পরিব্রাজক শিষ্য। আমি তাঁর সঙ্গে প্রভুগৃহ ত্যাগ করেছিলাম। তারপর ...

জনতা চীৎকার করে উঠল, তীর্থংকর নটপুত্ত রাজগৃহে ফিরে এসেছেন।

—আমি ক্রীতদাস।

নটপুত্ত চীৎকার করে উঠলেন। সকলে চুপ হয়ে গেল। এর মানে কী? সকলেই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। তাঁর শিষ্য নগ্ন পবিব্রাজকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। সন্তোষজনক জবাব কেউ দিতে পারল না।

রাজগৃহে পাঁচ পর্বতের পাঁচটি চূড়া ভেসে উঠল আকাশে। রাজবর্ত্মের ওপর দিয়ে আর একটি সুউচ্চ চূড়ার মতো চলমান নটপুত্ত এগিয়ে আসছেন। তাঁর গোণক এখন বসন্ত বাতাসে উড়ছে। এখন তাঁর জমাট রক্ত গলছে আর স্বেদ বইছে শরীরে। পথের ওপরে পায়ের দাগ পড়ছে।

পাখিরা ফিরে আসছে। গাছে গাছে ফুলেরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। অপ্রতিহতভাবে জাগছে কিশলয়। নগরে আর উপকণ্ঠে নরনারীরা বেশভূষা করে বেরিয়েছে। বসন্তের আমেজে এমনিতেই সকলে বেশী ক্রীড়াসক্ত। নটপুত্তকে ঘিরে তাদের ভিড় বাড়তে লাগল।

অনেকে বলাবলি করতে লাগল, ইনি মণ্ডিত এবং বিভূষিত নন কেন? দণ্ড, নাড়িক, খড়্গ ছত্র কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কেন? এঁর শাস্তা তীর্থংকরের চিত্রিত পাদুকাই বা কোথায়?

—আমি ত্যাগ করেছি।

নটপুত্ত দাঁড়ালেন। বেনুবন পার হয়ে, ইসিগিলি পর্বতের পাদদেশে, এক বৃহৎ কালো শিলাখণ্ডে হেলান দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। পিঙ্গল পাষাণের মতো বুক খুললেন। আর গোণক খুলে, কোমরে বেঁধে নগ্নতাকে আবরিত করলেন। আর চীৎকার করে বললেন, বন্ধুগণ আমি সব ত্যাগ করেছি। একদা আমি দাস ছিলাম। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার দাসত্ব ঘোচে নাই। আমি ক্রীতদাস।

কে যেন বলে উঠল, গিজ্ঝকূটে নির্গ্রন্থকে সংবাদ দাও।

আর একজন বলল, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিশ্চয় মস্তিষ্ক বিকারের বিষ খাইয়ে দিয়েছে। নইলে —

হঠাৎ একজন একটি ছোট পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বলল, হে তীর্থংকর, আমি কৃষক সুদেব। আমি রাজগৃহেরই বাসিন্দা। আপনি আমাকে চেনেন। গভীর জঙ্গলে একদিন আপনি আমাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ক্ষুধার্ত বাঘ আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল। তীর ধনুক বর্শা তরবারি কিছুই আপনার হাতে ছিল না। আপনি সিদ্ধপুরুষ। হে প্রভু! আপনি কিসের ক্রীতদাস?

নটপুত্ত বললেন, জন্মের হে সুদেব।

একটা স্তব্ধতা। জন্মের ক্রীতদাস? একটা গুঞ্জন চলতে লাগল। নটপুত্ত এক ধাপ উঠে দাঁড়ালেন। কালো শিলাখণ্ডের ওপরে তাঁর ছিন্নজট মাথা জেগে উঠল। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন, হাঁ, জন্মের। বন্ধুগণ, জন্ম, জরা, শোক, দুঃখ, আর শেষতম মৃত্যুর ক্রীতদাস আমরা। সমগ্র মানুষেরা। এর কোন নিবারণ নাই।

নটপুত্তের দৃঢ় গলায় কথাগুলি যেন নিষ্ঠুর দৈববাণীর মতো শোনাল। একজন চীৎকার করে

জিজ্ঞেস করল, ভগবান বুদ্ধের কি মৃত্যু হবে?

নটপুত্ত বললেন, আমোঘ মৃত্যু তাঁকেও গ্রাস করবে।

—আর মহাবীর নির্গ্রন্থ?

—মৃত্যু তাঁকেও গ্রাস করবে।

—তারপর?

—তারপর কিছুই নাই।

—স্বর্গ?

—নাই।

—নরক?

—নাই। স্বর্গ নাই, নরক নাই, মহানির্বাণ নাই।

আবার স্তব্ধতা। কে একজন কেঁদে উঠে চীৎকার কবেন উঠল, আমার ভয় লাগছে নটপুত্তকে। চল আমরা সবে পড়ি।

একজন ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, হে নটপুত্ত, তবে নিশ্চয় জন্মান্তর আছে?

নটপুত্ত হাত তুলে বললেন, নাই, জন্মান্তর নাই।

নগ্ন পরিব্রাজকেবা আর্তনাদ কবে উঠল। কারা যেন হেসে উঠল। তাবা বলে উঠল, ওঁর মতে কিছুই নাই।

—মিথ্যা কথা।

নটপুত্ত চীৎকার কবে বললেন, ওবা মিথ্যা কথা বলছে। জন্ম জবা শোক দুঃখ মৃত্যু আছে। আর আছে মানুষ আর এই জগৎ। চাবিভূত বিশিষ্ট মানুষেব এই দেহ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কাযা পৃথিবীব কাযায় প্রবেশ কবে। কায়াব জল, পৃথিবীর জলে মিশে যায। কায়ার তেজ পৃথিবীর তেজে প্রবেশ কবে। কায়ার বায়ু, এই পৃথিবীর বায়ুতেই মেশে। ইন্দ্রিযগুলি শূন্যে মিলিযে যায। অস্থি ছাই হয় এবং সকল শ্রেণী, সকল বিভাগের মানুষ মৃত্যুব পর একই অবস্থা প্রাপ্ত হয। মৃত্যুর পর কৃতকর্মেব অবশিষ্ট থাকে, ভিন্ন কোন জগতের অস্তিত্ব নাই।

যেন একটা অসহ্য শূন্যতা সবাইকে গ্রাস কবল। কেউ কেউ দৌড়ে পালাতে লাগল। কেউ কেউ গিজ্ঝকূটে মহাবীবেব কাছে গেল। কিন্তু কৌতূহলবশত 'আবো অনেক লোক ভিড় কবে আসতে লাগল। নগর অভ্যন্তর থেকে নবনারী আসতে লাগল। সেখানেও খবব পৌঁছেছে।

একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উঠে দাঁড়ালেন একটি পাথবের ওপবে। বললেন, হে তীর্থংকর নটপুত্ত, আমার কযে ২টি কথার জবাব দিন।

নটপুত্ত বললেন, হে কাষায়বস্ত্র পবিহিত মানুষ, আমি উদ্ধত নই! আপনি প্রশ্ন করুন।

এই প্রথম শ্রমণকে এমনি সম্বোধন শোনা গেল। কাষায়বস্তর পরিহিত মানুষ! শ্রমণ জিজ্ঞেস করলেন, যে ধ্যানের দ্বাবা ভগবান বুদ্ধ কিংবা আপনার সহধর্মী মহাবীর সত্য প্রকাশ করেছেন, তা কি মিথ্যা?

নটপুত্ত দু হাত শিলাখন্ডে বিস্তৃত কবে দাঁড়ালেন। বললেন, তার আগে হে বিচিত্রবেশী নব, আপনাকে জানাই, ঋষিপত্তনমৃগদাবে আমি যৌবনে ধ্যানস্থ ছিলাম। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি নগ্ন, সত্য ও ধর্ম সন্ধানে অবিচলিত রয়েছি। ব্রহ্মচর্য ইন্দ্রিযজয় ইত্যাদি যা বলা হয়, আমি সেসব পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছি, আর তাই আজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

সকলে দেখল, নটপুত্তেব চোখে জল। সবাই বলাবলি করতে লাগল উনি কাঁদছেন।

সকলেই স্তব্ধ। আরো ঘন হয়ে আসতে লাগল।

নটপুত্ত বললেন, বন্ধুগণ সত্য নির্মম এবং মহৎ। আমি যখন তীর্থংকর, সঙ্ঘাচার্য, ত্রিভুবন ভ্রমণকারী বলে পূজ্য প্রশংসিত, তখন আমি জানলাম, ধ্যান নাই। উপাসনা নাই। তাই শ্রমণ নাই, ব্রাহ্মণ নাই, নির্গ্রন্থ নাই, তীর্থংকর নাই। দেব নাই, দেবী নাই, মারভুবনও নাই। পরলোকও নাই। এ সকলই কল্পনা।

কল্পনা? চারদিকে গুঞ্জন উঠতে লাগল। এ সবই কল্পনা? শ্রমণ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলেন। তাঁর এসব কথা শোনা ভিক্ষু-নিয়ম বিরুদ্ধ।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, হাঁ, কল্পনা। ভয়জনিত কল্পনা। দেশ এবং কালের সমস্যায় কল্পিত এর কোনোটাই অমোঘ নয়। ধর্মার্থে দান নাই, গ্রহণ নাই। দান ভয়জনিত। গ্রহণ মিথ্যা অহংকার। যে ধ্যানী এবং তীর্থংকর বলেন, তিনি মাসকাল অন্ন গ্রহণ করেন নাই, শীতে ও গ্রীষ্মে নগ্ন ছিলেন, তাই তিনি অর্হত্ত লাভ করেছেন, তবে গত বৎসরে বৃজিবাজ্যের দুর্ভিক্ষের সময় সকল প্রজাই অর্হত্ত লাভ করেছিল। তারা মাসের পর মাস খায় নাই। গাছের ছালও লজ্জা নিবারণের জন্য জোটে নাই। আমি বলি, জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যুর মতোই ক্ষুধা অমোঘ। তার নিবারণ নাই।

এমন সময়ে একখণ্ড পাথর এসে নটপুত্তের কাঁধের কাছে কালো শিলাখণ্ডে আঘাত করল। ভেঙে চৌচির হল। অনেকে চীৎকার করে উঠল কে? কে ছুঁড়লে?

নটপুত্তের ব্যাঘ্র-দমন চক্ষু শান্ত ও দূরগামী হল তিনি বললেন, বন্ধুগণ! ওদের মারতে দাও। আমি জানি শ্রমণব্রাহ্মণ নির্গ্রন্থ, কেউ আজ আমাকে এখানে রক্ষা করতে আসবেন না। জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যু ক্ষুধার মতোই সত্য আছে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করেই আমি তা বলব।

আরো কয়েকটা পাথর এসে পড়ল। নটপুত্তের দেহ রক্তাক্ত হল। অগ্নিময় হল তাঁর পিঙ্গলদেহ। চারদিকে গোলমাল, ধস্তাধস্তি, ছুটোছুটি লেগে গেল। আর, নগ্ন পরিব্রাজকেরা সমবেত গলায় শাস্তার ধ্যান করতে লাগলেন।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, বন্ধুগণ, স্থির হও। আমি আরো বলছি।

—উনি আরো বলছেন।

—কী বলছেন ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু পাথর ছুঁড়ছে কারা?

—হে নটপুত্ত, আপনি পরিষ্কার করে বলুন, কী বলতে চান?

নটপুত্ত কালো শিলাখণ্ডের আরো এক ধাপ ওপরে উঠলেন।

—উঠবেন না, ওরা পাথর ছুঁড়বে। আপনাকে হত্যা করবে।

নটপুত্ত বললেন, বেদনার নিরোধ নাই। মৃত্যুই অমোঘ। ওদের মারতে দাও। বন্ধুগণ, সংসার ত্যাগের মধ্যে মহত্ত্ব নাই, ওর আর এক নাম পলায়নপরতা। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা দর্শন যারা চিরতরে দমন করে নাই, এবং জানে দমন করে এই বস্তু জগতে বাঁচা সম্ভব নয়, শুধু কামদমনকেই তারা ইন্দ্রিয়-জয় নাম দিয়েছে। যদি কেউ বলে, এই ভূমিখন্ডে অলগর্দ (সাপ) নাই, কারণ তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না, ইন্দ্রিয়জয় সেইরূপই মিথ্যা। ইন্দ্রিয় জয় হয় না, দমন হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয়।

একজন হিহি করে হেসে উঠে বলল, এই আমাদেরই মতো তা হলে?

কে একজন বজ্রকঠিন গলায় চীৎকার করে উঠল, চুপ! ওঁকে বলতে দাও।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, ইনি মহারাজ বিম্বিসারের কালের অপরাজেয় যোদ্ধা, মাগধ ক্ষত্রিয় বিম্বাধর। বর্তমানে যুদ্ধ-ব্যবসা ত্যাগী।

নটপুত্ত বললেন, হাঁ, মানুষের মতো।

বিম্বাধর পাথরের ওপরে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নায়ক নটপুত্ত, তবে কি কোনো ধর্ম নাই।

—আছে।

নটপুত্তের কপাল বেয়ে রক্ত পডছিল। আব পিঙ্গল বুক ভেদ করে বক্ত পডছিল। হাত দিযে রক্ত নির্ঝর মুছে বললেন তিনি, আছে হে ক্ষাত্রবীর বিম্বাধর। এক ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম।

—কিন্তু হে নটপুত্ত, আপনি বলছেন, আমরা ক্রীতদাস।

—হাঁ, আমবা ক্রীতদাস জন্মের, জরার, শোকেব, দুঃখের, বেদনার, মৃত্যর। এব নিবোধ নাই, নিবৃত্তি নাই, জয় নাই। তাই এগুলিব কাছে আমবা বিশ্বস্ত থাকব, মানব।

এমন সময়ে অশ্বসওয়ার উগ্রপুরুষ (বাজপুরুষ) কযেকজন জনতার মধ্যে প্রবেশ কবলেন। এবং দুইটি হাতী, উগ্রপুরুষদেব নিযে দুদিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। জনতা ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। চীৎকাব কবতে লাগল, ছুটোছুটি করতে লাগল।

আব সেই মুহূর্তেই বসন্তের অকালবর্ষা চুপিচুপি উঠে এল আকাশে। মেঘ ডেকে উঠল চিকুরহানা বাজ গর্জন কবল। পঞ্চপর্বতে মহীরুহকুল সঘন স্বননে বিলুলিত হল।

বিম্বাধর চীৎকাব করে বললেন, কী উপায়ে?

নটপুত্ত বললেন, মনুষ্যধর্মের দ্বারা।

—তাব স্বরূপ কী?

নটপুত্তের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ চীৎকাবে চাপা পড়ে যেতে লাগল। তিনি চীৎকাব করে বললেন, সাহস এবং সততা, প্রত্যক্ষ কর্ম, প্রেম, মৈত্রেয ও ঐক্য।

একটা সমবেত চীৎকার শোনা গেল, আবাব বলুন। আবার বলুন। আমরা কিছু বুঝতে পাবছি না।

—তাব আগেই উগ্রপুরুষের কণ্ঠ ধ্বনিত হল, হে তীর্থংকব নটপুত্ত, আপনি যা নাই বলেছেন. তা কল্পিত, এবং যা আছে বলেছেন, তা অমোঘ। কিন্তু আপনি রাজার বিষয় কিছুই বলেন নাই।

নটপুত্ত তাঁর রক্তাক্ত হাত তুলে বললেন, আমি তাও বলব, হে উগ্রপুরুষ, আমি বলব। যিনি জ্ঞানী, তিনি সকল কিছুই দর্শন করেন। তিনি যাকে নাই বলেন, তা পৃথিবীব বাবংবার পরিবর্তনশীল রূপ দেখেই বলেন। তা আছে বলেন, যা অমোঘ প্রত্যক্ষেই বলেন। আমি বলি হে উগ্রপুরুষ, বৃজি, লিচ্ছবী, শাক্য গণতন্ত্রেব প্রধানগণ যেমন অমোঘ নন, রূপান্তর আছে, রাজা তেমনি অমোঘ নন। ...

—নন?

—না। তাঁব রূপান্তর আছে। এই বস্তুজগতেব নিবন্তব পরিবর্তনশীলতা রাজা-প্রজা সকলের নিয়তির মতো।

উগ্রপুরুষগণ একযোগে চীৎকাব কবে বললেন, এবার আপনি স্তব্ধ হোন। বেদ এবং সঙ্ঘ এবং জিন আর বাজার নির্দেশে আমরা বলছি, আপনি দেশত্যাগ করুন। ...

নটপুত্ত চলেছেন। আর সেই নগ্ন পরিব্রাজকেরা তাঁর সঙ্গে চলেছে। তাদের তিনি বারণ করেছিলেন সঙ্গে আসতে। তারা শোনে নি। তারা নটপুত্তকে ছাড়বে না।

নটপুত্ত দক্ষিণে. চোল রাজ্যের দিকে নেমে চলেছেন। ক্ষতদেহে তাঁকে শান্ত প্রশান্ত দেখাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী যেন বর্ষা বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাত হচ্ছে।

পরিব্রাজকেরা মাঝে মাঝে ধর্মালোচনার মতোই জিজ্ঞাসা কবছে, আমরা কী করব?

—লোহারের কাছে গিয়ে বংকক গ্রহণ কর, কৃষি ক্ষেত্রে যাও। কিংবা যে কোনো

জীবিকাশ্রয়ী হও।

— আমরা কী করব ?

—তোমরা স্ত্রী গ্রহণ কর, সঙ্গীত কর, নৃত্য কর, উৎপাদন কর।

—আমরা কী করব ?

—তোমরা সাহসের দ্বারা, সততার দ্বারা, প্রত্যক্ষ কর্মের দ্বারা, মানুষের সঙ্গে প্রেম-মৈত্রেয় ও ঐক্যের দ্বারা, জন্ম জরা শোক দুঃখ বেদনা মৃত্যুর সঙ্গে বিশ্বস্ততা স্থাপন কর। এগুলিকে স্বীকার কর, মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।

এই অবস্থায় অজাতশত্রুর রাজ্য ছেড়ে, চলে যেতে যেতে, এক সায়াহ্নে জঙ্গলের পাশে নটপুত্ত দেখলেন, একটি অচৈতন্য দেহ পড়ে আছে। দেহটি নারীর এবং তিনি ভিক্ষুণী। মুণ্ডিতকেশিনী, কিন্তু নির্যাতিতা, অনাবরিতা। চীর ধূলাবলুণ্ঠিত, ভিক্ষাপাত্র কাছে নেই। তিনি অটুট দেহ, সুগৌরী।

নটপুত্ত তাঁকে চীবর পরালেন। দীর্ঘ সময় শুশ্রূষা করে, তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। ভিক্ষুণী জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমে ভীতা হলেন। পরে বিস্মিত হলেন। তারপরে অধোবদনে রইলেন। একটু পরে সহসা মুখ তুলে বললেন, আপনি তীর্থঙ্কর নটপুত্ত, আমি চিনেছি।

নটপুত্ত বললেন, আপনার পরিচয় আমার অজানা।

ভিক্ষুণী বললেন, আমি ছিলাম উক্কাচেলা বিদেহের শ্রেষ্ঠীকন্যা। এখন ভিক্ষুণী সুবিনীতা। আমি এই নির্জন বনে ধ্যানস্থা ছিলাম। এমন সময়ে একজন দুর্বৃত্ত—

সুবিনীতা চুপ করে গেলেন নটপুত্ত বললেন, আপনি ধর্ষিতা। আপনি দুঃখিত নারী।

নারী ? সুবিনীতা ভিক্ষুণী। স্রোতাপত্তিফল থেকে, তিনি আলয়বিহীনা। অর্হত্ত লাভে ধ্যানস্থা। কিন্তু নটপুত্তকে তিনি সে কথা বললেন না। বললেন, হাঁ আমি ধর্ষিতা।

নটপুত্ত বললেন, আপনি গৌতমের কাছে যান।

—যেতে পারছি না।

—কেন ? আপনার তো কোনো অপরাধ নাই।

—জানি। কিন্তু—

সুবিনীতা লজ্জায় এবং ব্যথায় পাংশু হলেন। বললেন, আপনাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই, আপনি আমার সেবা করেছেন। সেই দুর্বৃত্তকে আমি ঘৃণা করেছি, কিন্তু আমার ইন্দ্রিয় আমার অনিচ্ছায় সুখপ্রাপ্ত হয়ে, আমাকে কলঙ্কিত করেছে। হে ধার্মিক নটপুত্ত, দুর্বৃত্তের আক্রমণে আমার জ্ঞান লোপ পায় নাই, তজ্জনিত ইন্দ্রিয়ের অপ্রতিরোধ্য হর্ষোৎপাদনের লজ্জায় ও আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

বলে সুবিনীতা কাঁদতে লাগলেন। নটপুত্ত বললেন, আপনি বৃথা লজ্জিত এবং আতঙ্কিত। মানুষ সে যেই হোক, সকলের পক্ষেই তা অপ্রতিরোধ্য।

সুবিনীতা অবাক হয়ে তাকালেন। নটপুত্ত তাঁর সমগ্র কথা সুবিনীতার কাছে পুনরুক্তি করলেন।

বৃষ্টি বিদ্যুৎ মেঘগর্জনের মধ্যে নটপুত্ত কথা বললেন। কথা শেষ করে, তিনি উঠলেন। বিদায় চাইলেন।

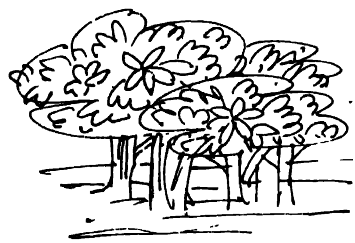
সুবিনীতা বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যাব ?

—আপনার অভিরুচি।

— তবে আপনি দয়া করে আমাকে আপনার বিশাল বুকে নিন। আমি ক্লান্ত অসুস্থ।

নটপুত্ত সুবিনীতাকে বুকে তুলে বৃষ্টি বিদ্যুৎ এবং বজ্র মাথায় করে এগিয়ে চললেন।

খাঁচাকল



মফস্বল শহরের ঘিঞ্জি দোকানপাট এলাকায, বেমানান ভাবে, ঝকঝকে প্রকান্ড গাড়িটা ঢুকল। রাত্রি সাড়ে ন'টা বেজে গিযেছে। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হযে গিয়েছে, কেবল খাবারের দোকান বা যেগুলোকে বেস্টুবেন্ট বলে, সেগুলো এখনো খোলা। এব ফাঁকে, এখনো দু একটা অন্য দোকানও, দোকান-আইনকে কলা দেখিয়ে, খুলে বেখেছে।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল বাস্তার ধারে, একটা দবজা বন্ধ দোকানেব কাছে। বাস্তাব ওপাবে, বাজারের যত ওঁচলা ছড়ানো। রাস্তাব ষাঁড আব কুকুব, একসঙ্গে সেগুলো ঘাঁটছে। গাড়িবা আরোহী, দরজা বন্ধ দোকানেব দিকে তাকিযে একটু ভুরু কোঁচকালেন। ড্রাইভারেব দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে, গলা খাঁকারি দিলেন। ড্রাইভাব সামনেব দিকে ফিরে, পাথরেব মতো চুপচাপ বসে আছে।

আশেপাশে লোকেরা গাড়ির আরোহীকে একবাব দেখল। সকলেবই চেনা লোক। উনি ঘোষ অ্যান্ড সন্স এঞ্জিনীযাবিং ফ্যাক্টরীর মালিক গঙ্গাবাম ঘোষ। বয়স বছর ষাট। ফরসা দোহাবা চেহারা। মাথার চুল সবই প্রায় সাদা। নাক চোখ মুখ বেশ ভাল। যৌবনে হয়তো খুবই সুন্দর ছিলেন। এই বয়সকালে, এখন সবই একটু ভাবী, ভাঁজ পড়া, শিথিল। গিলে করা আদ্দিব পাঞ্জাবি, দামী পাথরের বোতাম, মোটা ফবসা আঙুলে মোগলাই দুটো আংটি, কবজিতে মূল্যবান ঘড়ি। চুনোট করা কোঁচানো ধুতির নিচে, নাগরা নাক উঁচিয়ে আছে। আতরেব গন্ধে মৌ মৌ। সব মিলিয়ে, বোঝা যায়, গঙ্গারাম ঘোষ বেশ শৌখীন এবং বিলাসী।

গঙ্গারাম আবাব দরজা বন্ধ দোকনটার দিকে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তালা বন্ধ নেই। ভিতর থেকে বন্ধ, এবং দরজার ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে। যেন নিশ্চিন্ত হলেন। ছড়ি ভর দিযে ওঠবার, উদ্যোগ করতেই, ড্রাইভার ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে নামতে গেল, ওঁর নামবার জন্য দরজা খুলে দেবে বলে। উনি বললেন, 'থাক, তোমাকে আব নামতে হবে না।'

গঙ্গারাম দোহারা মোটা শরীরটা নিয়ে বেশ কসরত করে নামলেন। বললেন, 'ব্যাগটা দাও।'

ড্রাইভার সামনের সীট থেকে, চামড়ার একটা বড় ব্যাগ ওঁর হাতে তুলে দিল। উনি বললেন, 'তুমি বাড়ি চলে যাও।'

ড্রাইভার হুকুম পেয়ে চলে গেল। গঙ্গারাম ছড়ি দিযে বন্ধ দরজায় ঠুক ঠুক কবে ঠোকা দিয়ে নিচু স্বরে ডাকলেন, 'কই গ, খুলবে নাকি?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। গঙ্গারাম দরজার আরো কাছে গিয়ে ঠোকা দিলেন, ডাকলেন, 'কই, দরজা খোল। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

ভিতরে ঘটাং করে শব্দ হল, তারপবেই দরজা খুলে গেল। দেখলেই বোঝা যায়, একটি ছোট লোহার দোকান। স্ক্রু নাট বোল্টু, ইত্যাদি নানা জিনিসেব বাকস থাকেথাকে সাজানো।সামনেব চৌকাটের কাছে একটা ড্রয়ারওয়ালা সরু টেবিল, অর্থাৎ কাউন্টাব। বসবার জন্য একটি ছোট টুল। এত ছোট জায়গা, ভিতরে একটি লোকের পক্ষে নডাচডা করাও যেন মুশকিল। কিন্তু তার মধ্যেই, এক কোণে একটা মিনি টেবিল ফ্যান।

দরজা খুলে যিনি সামনে দাঁড়ালেন, তাঁব বযসও গঙ্গাবামের মতোই প্রায়। তবে চেহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। রোগা বেঁটেখাটোব ওপবে, বেশ শক্ত মানুষ বলেই মনে হয়। বঙ মযলা। মাথায় সুবিস্তৃত টাক। ঘাড় আর কানেব কাছে অল্প পাঁশুটে বর্ণেব চুল। চোখে চশমা। গায়ে মোটা কাপড়েব হাফশার্ট। কোঁচাটা পেটের কাছে তুলে গোঁজা, তাই সেখানটা ফুলে আছে। ইনি এই 'অমৃত আযবণ শপ'-এর মালিক হরলাল গোস্বামী।

হবলাল দবজা খুলে দাঁড়ালেন। বাগে আব বিবক্তিতে, তাঁর ঠোঁট ওল্টানো, নাকের পাটা ফোলা, চোখেব কোণ কোঁচকানো। প্রথমেই খেঁকিযে ওঠাব মতো কবে বললেন, 'কেন ঘুমোব কেন? এটা কি ঘুমোবাব জাযগা? আমার কি বাডিঘবদোব নেই?'

গঙ্গাবাম নিবীহ ভঙ্গিতে বললেন, 'না তা না, তোমাব সাডশব্দ পাচ্ছিলাম না, তা-ই। নাও, এটা ধব।'

বলে ব্যাগটা বাডিযে ধরলেন। হবলাল রুষ্ট ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'না। দোকান আমি অনেকক্ষণ বন্ধ করেছি, এখন আমি বাড়ি যাব।'

এই বলে হবলাল ঠোঁট কুঁচকে, ওপরের দাঁত দিয়ে, নিচেব নকল দাঁত চেপে দেবার চেষ্টা করলেন।

গঙ্গারাম কবজিতে ঘডি দেখে বললেন, 'রাত্রিব তো মাত্তর সাড়ে ন'টা হলো, এর মধ্যে বাড়ি যাবে কোথায়? দেখি, সব ঢুকি।'

উনি ছড়ি নিয়ে চৌকাঠে ভব দিলেন। হবলাল একইভাবে বললেন, 'না, রোজ রোজ এত রাত আমার পোষাবে না। এত বাত্রে, ধিনি কার্ত্তিকটি সেজে, উনি যেন এখন ইয়ের বাড়িতে এলেন, ন্যাকামো।'

গঙ্গারাম ইতিমধ্যে চৌকাঠে উঠেছেন। কাউন্টাবের টেবিলের পাশ দিয়ে ঢোকবার জন্য ঠেলাঠেলি করছেন। ফাঁক এত অল্প, ওঁর পক্ষে গলে যাওযা প্রায় অসম্ভব। বললেন, 'টেবিলটা একটু টানো না, দেখছ তো ঢুকতে পারছি না।'

হরলাল টেবিলটা ঠেলে দিতে দিতে বললেন, 'পাবতে বলেছে কে তোমাকে? তার চেয়ে তোমাদের সেই কেলাব টেলাবে কী সব আছে, সেখানে গেলেই পার।'

গঙ্গারাম ভিতরে ঢুকে তখন হাঁফ ছাড়লেন। টুলের ওপর বসতে বসতে বললেন, 'ক্লাবের কথা বলছ তো? কেলাব আবার কিসের?'

'থাক, তুমি আর এখন আমায় শিক্ষে দিতে এস না।'

হরলাল ধমকে উঠলেন, আরো রেগে গেলেন। মুখটা বিকৃত করে বললেন, 'যারা চাঁছাছোলা

কথা বলতে পারে, তাদের কাছে গেলেই পার। আমাদের মতো গরীব মুক্‌খুদের কাছে আসার জন্য কেউ মাথাব দিব্যি দেয নি।'

গঙ্গাবাম প্রায গোটা ঘবটা জুড়ে বসেছেন। পাখাব দিকে ঘাড়টা হেলিযে বললেন, 'আহা, তাই বলেছি নাকি। তোমাব আবাব—।'

'না, না, তোমাকে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আজই শেষ। বোজ রোজ কারোব মুখ চেয়ে, দরজা আগলে থাকতে পাবব না। তোমাব সঙ্গে আব কোনোদিন বসব না।'

হবলাল দড়াম করে দবজাটা টেনে, ভিতব থেকে বন্ধ কবে দিলেন। টেবিলেব তলা থেকে একটি বেতের মোড়া বেব করে তাতে বসলেন। দুজনেব হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকে যাচ্ছে। হবলাল মুখ ফিবিয়ে বইলেন অন্যদিকে। গঙ্গাবাম তখন তাঁব পাঞ্জাবি খুলতে ব্যস্ত। ভিতবে গেঞ্জি নেই। ঘর্মাক্ত থলথলে ফরসা শরীরটা যেন জুড়লো। পাঞ্জাবিটা টেবিলেব ওপব রেখে বললেন, 'যেন বাঘেব গুহা। বড্ড গবম।'

চুনোট করা কোঁচা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। হবলাল অভিবড়ে দাঁত বেব করে বিকৃত মুখে গঙ্গারামেব দিকে তাকালেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'বাঘেব গুহা না হলেও তো চলে না।'

গঙ্গারাম হেসে এক চোখ টিপলেন, বললেন, 'সেই সঙ্গে বাঘটিকেও।'

হরলাল চোযাল শক্ত করে, আওযাজ কবলেন 'ন্যাকামি। বুড়ো হযে মবতে চলল, এখনো ইয়ে গেল না।'

গঙ্গাবাম টেবিলেব ওপব থেকে ব্যাগ নিয়ে খুলতে খুলতে বললেন, 'আব হরো গোঁসাই বুড়ো হয়ে বাঁচতে চলেছে, গঙ্গাবামেব সঙ্গে ওইখেনেই তফাত।'

বলে ব্যাগের ভিতর থেকে একটি বোতল বেব করলেন। চকচকে কালো বোতল, গায়ে কুকুবের ছবিওয়ালা লেবেল আঁটা। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোযাইট, স্কচ হুইস্কিব বোতল। দস্তার মোড়ক ছিঁড়ে ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকলেন। ভুরু কাঁপিয়ে বললেন, 'বেশ সুপক্কবস্তু।'

হবলাল অত্যন্ত বিবক্তিতে অন্যদিকে তাকিযেছিল। কোনো কথা বললেন না। গঙ্গাবাম বললেন, 'আজ তুমি এটা টেষ্ট কব।'

হরলাল বললেন, 'হবো গোসাই কোনোদিন বিলিতি চোনা খায না। যে এনেছে, সেই খাক।'

গঙ্গারাম ঘাড় দুলিযে বললেন, 'উটি হবে না বাবা, এ হল দিশি চোনাব শবীর।'

'তবে ন্যাকামো কবে রোজ বোজ একটা বোতল আনবাব দবকাব কী?'

'জিনিসটা তো খাবাপ না। এত নাম দাম, কোনোদিন যদি তোমাব ইচ্ছে টিচ্ছে হয—।'

কথাব মাঝেই হবলাল লোহার মালপত্রের ফাঁক থেকে একটি মদেব বোতল টেনে বেব করলেন। এই মুহূর্তে তাঁকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন দেখাল। 'বেঁচে থাক আমার কালীমার্কা এক নম্বর। এব তুল্য জিনিস হয়?'

গঙ্গারাম হুইস্কিব বোতল সরিযে রেখে বললেন, 'সত্যি। কী স্বাদে যে লোকে বিলিতি মদ খায়!'

হরলাল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলমাবিব তলায হাত গলিয়ে দুটো পবিষ্কার কাঁচেব গেলাস বের কবলেন। বোতলেব গালা ভেঙে ছিপি খুললেন। গঙ্গারাম ততক্ষণে ব্যাগ থেকে একটি প্যাকেট টেনে বেব করছেন। প্যাকেট থেকে মাংসের গন্ধ বেবোচ্ছে। বললেন, 'এখনো বেশ গবম আছে। তোমাব বন্ধুপত্নী নিজেই প্যাকেট করে দিল, মুরগীব শুকনো দোপেঁয়াজি।'

হরলাল টান দিযে টেবিলেব ড্রয়ার খুললো। বললো, 'গিন্নীকে বলো কর্তাকে কোলে বসিয়ে যেন ওসব খাওয়ায, কর্তার বেশ পেঁয়াজি হবে। ওসব দিয়ে মুখের রস কাটানো যায় না।'

বলে, ড্রয়ার থেকে একটি বের করলেন বড় পাটনাই পেঁয়াজ, বেশ খানিকটা আদা, একটি পাতিলেবু আর একটা ধারালো ছুরি।

গঙ্গারাম নাক ফুলিয়ে বললেন, 'বিলিতি মদ খেতে শেখোনি, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এটার মানে কী'?'

'মানে আবার কী। আমি বুঝি, যার সঙ্গে যা।'

বলে, ঝোল টানার শব্দ করে, হরলাল ছুরি দিয়ে কচকচ করে আদা পেঁয়াজ কুচোতে লাগলেন।

গঙ্গারাম বললেন, 'তুমি আর চিকেন দোপেঁয়াজির কী বুঝবে। রাস্তার ধারে শুঁড়িখানায় বসে খাওয়া শিখেছ, ওসবই তোমার সইবে।'

হরলাল ছুরি সুদ্ধ হাতটা তুলে, খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আর তুমি সগগে বসে অপ্সরার নাচ দেখতে দেখতে খেতে শিখেছ। তবু যদি না সব জানতাম।'

গঙ্গারাম বললেন, 'আমার কথা ছাড়, আমি কোনোদিনই এসব চিকেন মটন খেয়ে মদ খেতে পারি না। গরম চানা চটপটিতে দু ফোঁটা লেবুর রস থাকবে, এক চিমটি করে মুখে দেব, এক ঢোক মদ খাব। তোমার তো তা না। শুঁটকো শরীর, এদিকে গিলতে তো পার খুব।'

হরলাল ভীষণ রেগে উঠলেন, 'সে যখন গিলি তখন গিলি, ইয়েদের সঙ্গে বড়লোকি ঠাট আমার ভাল লাগে না।'

গঙ্গারাম বললেন, 'ডাঁটা চচ্চড়ির লোক যে।'

হরলাল আদা পেঁয়াজ কুচনো থামিয়ে, প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'দ্যাখ, খাবার খোঁটা দিও না। যা খাই, তা নিজের রোজগারে খাই, কোনো ফ্যাকটরিওয়ালার পয়সায় খাই না।'

গঙ্গারাম বললেন, 'যাকগে বাবা, চেঁচিও না। আমি একটু গলা খুলে গান ধরলে তোমার আশেপাশে সবাই শুনতে পায়, নিজে চেঁচালে কিছু না।'

হরলাল তখন দাঁতে দাঁত পিষে, আদা কুচোতে কুচোতে আপন মনে বলছেন, 'কী রকম ঝামেলা বল দিকিনি। আমার যদি ভাল না লাগে, তাতে তোমার কী। সবতাতে বড়লোকি। বড়লোক আছ, নিজের জায়গায় গিয়ে দেখাও, হরো গোসাইয়ের কাছে কেন।'

গঙ্গারাম তখন দেশী বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলেছেন। বললেন, 'যাক বাবা, থাম। সারাদিন খাটাখাটনির পর, একটা মজুরও শান্তিতে থাকতে চায়।'

'থাক, তুমি আর মজুরের নাম করো না। মজুরদের রক্ত শুষেই তো তোমার যত ওস্তাদি।'

গঙ্গারামের মুখের কথাও টোল খেল না। ঢক করে পাত্র উপুড় করে গলায় ঢাললেন। বললেন, 'তোমার যেমন খদ্দেরের পকেট কেটে। চানা চটপটি কোথায়?'

হরলাল ড্রায়ার টেনে চানা চটপটির ঠোঙা বের করে দিলেন। লেবু কেটে কুচনো আদা পেঁয়াজের রস দিয়ে, ছুরি দিয়ে ঘেঁটে দিলেন। গঙ্গারাম হরলালকে গেলাসে মদ ঢেলে দিয়ে, আদা পেঁয়াজের কুচো মুখে দিলেন। জিভ দিয়ে টকাস করে শব্দ করলেন, 'মাইরি হরো, এ জিনিসে তোমার জুড়ি নেই। হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবার মতো।'

হরলাল সে কথায় কান না দিয়ে মদ্যপানে মন দিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পানীয়ের বোতল, সুস্বাদু গরম শুষ্ক কুক্কুটের মাংস একপাশে পড়ে রইল। চারদিকে ঠাসা মালপত্র, এই ঘুপচি ঘরের মধ্যে ছোট পাখার হাওয়া ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে। ভেন্টিলেশন বলতে একমাত্র দরজার তক্তার ফাটল। কিন্তু গঙ্গারাম আর হরলাল বেশ বহাল তবিয়তেই, দেশীয় মদ এবং আদা

পেঁয়াজ কুচোর সঙ্গে চানা চটপটি চিবিয়ে চলেছেন। খানিকক্ষণ কোনো কথা না বলে, পর পর দুটি পাত্র দুজনে শেষ করলেন। গঙ্গারাম অবিশ্যি কুলকুল করে ঘামছেন। ব্যাগের মধ্যে হাতড়ে তিনি বর্মী চুরুট আর সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনটা খাবে ?'

হরলাল বিড়ি বের করে বললেন 'কোনোটাই না।'

কানের কাছে বিড়ি টিপে টিপে, তামাকের করকর শব্দ শুনলেন। আবার বললেন, 'ওতে আমার জমে না।'

গঙ্গারাম মুখের মধ্যে জিভটা নাড়াচড়া করে বললেন, 'দাঁতগুলো কিছুতেই সেট হচ্ছে না। তোমারগুলো ঠিক আছে ?'

হরলাল মুখ বিকৃত করে বললেন, 'কোথায় ? এই দ্যাখো না।'

বলে নিচের দাঁত জিভ দিয়ে ঠেলে, নাড়িয়ে দেখালেন। গঙ্গারাম দেখে, ঘাড় নাড়লেন। আবার মদের পাত্র ভরলেন। তারপরে বললেন, 'সংসারটা বুঝলে, বড় অশান্তির জায়গা। এক তো ছেলেদের কারোর সঙ্গে মতে মেলে না। তার ওপরে আজ এই নাতিটার অসুখ, ওই মেয়েটার ব্যামো কোথাও যে যাব, তারও উপায় নেই।'

হরলাল বললেন, 'ওসব কাকে বলছ। আমাকে এই বুড়ো বয়সেও দোকানে বসতে হচ্ছে। বাবুরা সব চাকরি করবেন, দোকানে বসবেন না। শুয়োর ব্যাটারা ব্যবসা বুঝল না কোনোদিন। আর অসুখ বিসুখ ? তা যদি বল—।'

গঙ্গারাম হাত জোড় করে বললেন, 'বাবা, তুমি অমন ফলাও করে শুরু করো না। মাল খাওয়াটি একেবারে বরবাদ করে ছাড়বে।'

হরলাল রাগে গরগর করে উঠলেন, 'তার মানে ?'

গঙ্গারাম মুখের কাছে গেলাস তুলে বললেন, 'অসুখের ফিরিস্তি শুনতে ভাল লাগে না।'

হরলাল খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'নিজের বেলা আঁটিশুটি, পরের বেলা দাঁত কপাটি ? নিজে যে সাত কাহন ফিরিস্তি দিচ্ছিলে ?'

'ফিরিস্তি তো দিই নি। তুমি যেরকম কোমর বেঁধে শুরু করতে যাচ্ছিলে—।'

'থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না ! বুড়ো হয়ে মরতে চলল, এখনো ইয়ে গেল না।'

গঙ্গারাম সে কথার জবাব না দিয়ে, গেলাসে চুমুক দিলেন। হরলাল যেন রাগবশতঃ হাঁ করে গেলাসের সবটুকু গলায় ঢেলে দিলেন। তারপরে গোঁজ হয়ে বসে রইলেন।

গঙ্গারাম গুনগুন করে একটু টপ্পার সুর ভাঁজলেন। হরলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হল, রাগ করলে ?'

হরলাল কোনো জবাব দিলেন না। গঙ্গারাম ঝুঁকে পড়ে, হরলালের পেটে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলেন। হরলাল তড়াক করে সোজা হয়ে বসে, গঙ্গারামের হাত চেপে ধরলেন, 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

গঙ্গারাম সে কথা না শুনে, পেটে খোঁচাবার জন্য হাত টানাটানি করতে লাগলেন। হরলালও ছাড়বেন না। গঙ্গারাম বললেন, 'তোমার প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে থাকা দেখাচ্ছি।'

'তবে রে গঙ্গা ঘোষ।' বলেই হরলাল তাঁর কালো রোগা রোগা আঙুল দিয়ে, গঙ্গারামের ভুঁড়িতে খোঁচা দিলেন। দশাসই গঙ্গারাম সারা শরীর কাঁপিয়ে খ্যালখ্যাল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'হরো, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, কাতুকুতু লাগছে।'

গঙ্গারামের হাসি দেখে, হরলালের মুখেও হাসি ফুটল। বললেন, 'আর আমার বুঝি লাগে না ?'

হাসতে হাসতে হাত টানাটানি করে দুজনেই হাঁপিয়ে পড়লেন। একটু চুপচাপ থেকে, হরলাল আবার দুই গেলাস মদ ঢাললেন।

গঙ্গারাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হরো, সেই ফুলকির কথা মনে আছে? রামনগিনের বউ হে, মাথাভাঙার সেই ঘাটমাঝির বউ, যে-মাঝির ঘরে প্রায়ই আমরা মালপত্তর রাখতাম?'

হরলালের ভাঙাচোরা রেখাবহুল মুখে পুরনো দিনের স্মৃতির অন্যমনস্কতা ফুটল। ইতিমধ্যেই তাঁর চোখ কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ হয়েছে। চোখে একটি স্বপ্নিল ছবি যেন ভেসে উঠল। আবেগ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মনে নেই আবার। দুজনে তখন কাঁধে মাল বয়ে বয়ে কত জায়গায় সাপ্লাই দিতে গেছি। নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, মাজদিয়া,ওদিকে বর্ধমান, হাওড়া। কিন্তু তুমি আজ কোথায়, আর আমি কোথায়।'

গঙ্গারাম আদা, পেঁয়াজের কুচো চিবোচ্ছিলেন। বললেন, 'সেজন্য তোমাকে রামনগিনের বউযের কথা বলিনি।'

হরলাল গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'সেটা বুঝেছি ফুলকির সঙ্গে আমাদের সেই যাকে বলে, ভাব ভালবাসার কথা বলছ তো? শুধু কি তা-ই। যেমন স্বাস্থ্যখানি, ঢলঢলে টলটলে, তেমনি ছিল হাসিটি। একবার তাকালেই মনে রঙ ধরে যেত। মেয়েছেলেটি আমাদেব যেন কী চোখে দেখেছিল, তাই না?'

গঙ্গারাম গেলাসে চুমুক দিলেন, চানা চটপটি মুখে দিয়ে, একটু চিবিয়ে নিলেন। বললেন, 'তুমি তখন থেকে, "আমাদের আমাদের" করে বলছ কেন বুঝতে পারছি না। তোমার সঙ্গে আবাব তাব ভাব ভালবাসা হল কবে?'

হবলাল গেলাসে চুমুক দিতে উদ্যত হয়ে থামলেন। কোঁচকানো মুখে নিচের দাঁত একবার জিভ দিয়ে ঠেলে, জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

গঙ্গারাম বললেন, 'তোমাব অই খেঁকুরে চেহারার দিকে তাকিয়ে ফুলকি কোনোদিন ভাবের হাসি হেসেছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

হবলাল রাগে রি রি করে উঠলেন, গেলাসে আব চুমুক দেওয়া হল না। তর্জনী দিয়ে গঙ্গারামেব আপাদমস্তক দেখিয়ে ভ্যাংচানো সুবে বললেন, 'অ ফুলকিব যত ভাবের হাসি ঝরত বুঝি এই—ঢ্যাপসা ভোঁদকা গঙ্গা ঘোষকে দেখেই?'

গঙ্গারাম একটু অসহায়ভাবে নিজের খালি গা শরীরটার দিকে তাকালেন। বললেন, 'কিন্তু সেই অল্প বয়সে আমি এরকম মোটা ছিলাম না।'

আর অই বয়সে, আমি বুঝি খেঁকরে ছিলাম? শক্ত ছিপছিপে শরীরকে বুঝি তাই বলে?'

'ছিপছিপে শক্ত! আজকাল যাকে স্লিম বলে? বাব্বা, হরো তুমি নিজের প্রশংসা করতে পার বাপু। তা সে কথা যাক গে, তোমার পকেটে সে কোনোদিন ছুটে এসে লিট্‌ঠি গুঁজে দিয়েছে? চামচের বাঁট দিয়ে, চা ঘুঁটতে ঘুঁটতে, রসের গানের কলি শুনিযেছে। হরিণীর মতো তাকিয়ে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছে, ফির কব আওযেগে বাবুজী?'

হরলাল ইতিমধ্যে গেলাসে চুমুক দিয়েছিলেন। বললেন, 'কী করেছে আর কী বলেছে তা তুমি জানবে কী করে।' আমাকে যখন একলা পেয়েছে, তখন ওরকম অনেক কিছুই হয়েছে। তোমাকে কোনোদিন ভুট্টা পুড়িয়ে, নুন কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাইয়েছে?'

'বহুবার'। তোমাকে আমাকে দুজনকে একসঙ্গেই খাইয়েছে।'

'আমাকে একলাও খাইয়েছে। অনেক কিছুই খাইয়েছে।'

গঙ্গারাম একবার আরক্ত চক্ষু বড় বড় করলেন, তারপর এক চোখ বুজে বললেন, 'সে সব

অনেক-কিছু জিনিসের নাম কী,হবো ?'

হরলাল সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে গঙ্গাবামেব দিকে তাকালেন। পবমুহূর্তে প্রশ্নের গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'বজ্জাতি করো না গঙ্গা, ওসব খারাপ কথা আমি মোটেই বলি নি। অনেক কিছু মানে, আচার পুরি ছোলাভাজা, এইসব। তোমাকে আর কী খাইযেছে সে কথা তুমিই বলতে পার।'

বলে, হরলাল ত্যাবছা চোখে তাকালেন। গঙ্গাবাম জিভ কেটে বললেন, 'না না ফুলকির নামে আমি মিছে কথা বলতে পাবব না। সে রকম মেযে ছিল না। আমাকে যে তার খুব ভাল লাগত, সেটা বুঝতে পারতাম।'

'সেটা আমার বেলা, আমিও পাবতাম। কিন্তু নিজেব মনের কথাটা বল গঙ্গা ঘোষ।'

গঙ্গারাম একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, ' সে কথা বলে আব কী লাভ। বে থা'ব পবেও ফুলকিকে স্বপ্ন দেখেছি।'

হরলালের গলাটা এবাব কোলা ব্যাঙ-এর মতো শোনাল, 'আমি তো এই বুড়ো বয়সেও তাকে ভুলতে পারলাম না। মেয়েছেলেটির মনটা বড ভাল ছিল।'

গঙ্গাবাম বললেন, 'মাঝি বামনগিন্নকে সে কোনোদিন ঠকাযনি, কিন্তু তার মনে একটা খেদ ছিল।'

দুজনেই খানিকক্ষণ কথা বললেন না। বোতলেব শেষাংশ দুই গেলাসে ঢেলে, আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগলেন। চুরুট আব বিড়িব ধোঁযাব এবং গন্ধে, খুপবি ঘবটা আবর্তিত হচ্ছে। চানা চটপটি আব আদা পেঁয়াজের কুচো শেষ। এখন দুজনে কেবল আঙুল বুলিয়ে চুষছেন। তারপবে হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যাওযায আবাব ব্যাগ খুললেন গঙ্গাবাম। এখন হাতের অবস্থা কিঞ্চিৎ অসাব্যস্ত। ব্যাগের ভিতব থেকে একটি নতুন দেশী মদেব বোতল বের করে হরলালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'আজকে তুমি খাওযালে, ধর কালকেব বরাদ্দ।'

হরলাল বোতলটি নিয়ে এক জাযগায় ঢুকিযে দিলেন। গঙ্গাবাম বললেন, 'তাহলে এই হুইস্কি আর দোপেঁয়াজির কী হবে।'

হবলাল বললেন, 'যেখানকাব জিনিস, সেখানে নিয়ে যাও। বোজ রোজ ধ্যালাং কবতে নিযে আসাই বা কেন, বুঝি না।'

গঙ্গাবাম বোতল আর প্যাকেট ব্যাগের মধ্যে পুবলেন। জামাটা কাঁধে নিয়ে, গেলাসে শেষ চুমুক দিযে, ছড়িটা তুলে নিলেন। বললেন, 'উঃ, একেবাবে ইঁদুবেব গর্ত। কোথায় একটু ছড়িয়ে বসে আবাম কবে খাব, তা না—।'

হবলাল বলে উঠলেন, 'অই দশাসই চেহাবা নিযে, কুড়ি বছর ধবে তো এই ইঁদুরেব গর্তেই কাটালে। অন্য কোথাও যাবাব নাম তো শুনি না। ইঁদুরের গর্ত! বলতে লজ্জা করে না?'

বলে তিনি গেলাস বোতল সব সরিযে ফেললেন। গঙ্গারাম গুনগুন কবে উঠলেন, 'কী কারণে কারণবাবি করি পান ।'

হরলাল ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর, আশেপাশের লোক শুনতে পাবে।'

'আমাব থেকে তো তোমাব গলার জোব বেশী, সেটা বুঝি কেউ শোনে না? আসলে আমি একটু গাইতে পাবি বলে তোমার হিংসা হয়।'

'আহা, একেবারে কে মল্লিক আব কানাকেষ্টর মতন গলা।'

হবলাল দরজা খুলে দিলেন। ঘরে একটু ঠান্ডা হাওয়া ঢুকল। গঙ্গারাম ছড়ি আর ব্যাগ নিয়ে বেরোলেন। কাঁধের ওপব পাঞ্জাবি। হরলাল তালা-চাবি নিয়ে পেছনে। দবজা ঠেলে, গোটা

ছয়েক ভাবি ভারি তালা তিনটে কড়ায় আটলেন। তারপর দুজনেই হাঁটতে লাগলেন। রাস্তা বেশ ফাঁকা। রাত প্রায় এগারোটা।

হরলাল হঠাৎ থামলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবার এদিকে চললে?'

গঙ্গারাম বললেন, 'চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'না না, রোজ রোজ এসব ভাল লাগে না। তোমাকে দেখলে আমার বউ আরো চটে যায়।'

'বউয়েরা সব ওরকমই। কিন্তু তোমার বউ আমাকে দেখতে পাবে না, সে থাকবে ঘরে।'

'ঘরে? ঠিক কোথাও অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে দেখলে সে বেশি চটে যায়।'

'সেটা আমি বড়লোক বলে। আমার বউও তোমাকে দেখলে চটে যায়।'

'তা আর জানি না। তোমার বউ যে ভাবে, আমি গঙ্গা ঘোষের পকেট মারছি। তেলে জলে কোনো দিন মিশ খায় না বুঝলে।'

হরলাল একবার গঙ্গারামের মুখ দেখবার চেষ্টা করলেন। মফঃস্বল শহরের ভিতরের রাস্তা দিয়ে, দুজনে হেঁটে চলেছেন। টিমটিমে বিজলি আলোয় তাঁদের ছায়া দুটো অতিকায় দেখাচ্ছে। মলপোঁতা পাড়ার কাছে এসে, গঙ্গারাম থমকে দাঁড়ালেন। পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ বলা যায় না। তবে বিখ্যাত ঘোষালদের রক্ষিতারা এ পাড়াতেই বেশি ছিল। ঘোষালদের সেদিন আর নেই, রক্ষিতারা অনেকটা অর্ধগৃহস্থ জীবন নিয়ে এ পাড়াতেই মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসে আছে। এখন আশেপাশে অনেক বাড়ি করছে।

হরলাল বলল, 'দাঁড়ালে কেন?'

গঙ্গারাম চুপিচুপি বললেন, 'আস্তে। ওই টালির ঘরটা হক ঘোষালের বাঁড়ের না?'

হরলাল বললেন, হ্যাঁ।' সে বুড়ির কাছে এখন যাবে নাকি?'

'আরে না না। সেই মজাটা একটু করলে হয় না। বহুদিন তো করা হয়নি।'

হরলাল বললেন, 'না বাবা, আমি ওসবের মধ্যে নেই। আর কি সে বয়স আছে?'

গঙ্গারাম তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, 'দাঁড়াও না। রাত হয়েছে, জায়গাটাও ফাঁকা। অনেকদিন অমন চণ্ডীপাঠ শোনা হয়নি।'

বলে, তিনি নিচু হয়ে, আশপাশ থেকে কয়েকটা ঢিল তুলে নিলেন। দুজনেই আরো কিছুটা এগোলেন, একটা গাম্বিল গাছের কোল আঁধারে দাঁড়ালেন। গঙ্গারাম দুটো ঢিল হরলালকে দিয়ে বললেন, 'নাও, তুমি দুটো নাও, এবার মার।'

বলে তিনিই প্রথমে টালির ঘরের জানালা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লেন। হরলাল ছুঁড়লেন টালির চালে। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই, জানালা খুলে গেল। কাঁসাভাঙা গলায় চিৎকার শোনা গেল, 'কোন্ শুয়োর ব্যাটারে, অ্যাঁ, রাতদুপুরে মরণ নেই, ঢিল মেরে বুড়ি মাগীটাকে ডাকছিস? ওরে মা-মেগো বোন-মেগোরা, ওরে বাপ ভাতারি, ভাই-ভাতারি ব্যাটারা ।'

ক্রমেই চিৎকার এবং ভাষা অতি উগ্র আর অশ্রাব্য হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু হরলাল আর গঙ্গারাম তখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পেটে হাত চেপে হাসি সামলাচ্ছেন। সামলাতে সামলাতেই গঙ্গারাম অন্ধকার থেকে আবার একটা ঢিল ছুঁড়লেন টালির চালে। এবার বুড়ির গলার সঙ্গে, যুবির গলা মিলল এবং গালাগালির ভাষা আরো ভয়াবহ। সম্ভবত বুড়ির মেয়ে না নাতনী, যারা পেশায় একই। এদিকে গঙ্গারাম আর হরলাল, সেই গালাগালির ভাষা শুনতে শুনতে পেটে হাত দিয়েও হাসি সামলাতে পারছেন না। দুজনেই তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। খানিক দূর গিয়ে, গলা খুললেন।

হরলাল বললেন, 'তোমার ফিচলেমি কোনোদিন গেল না।'

গঙ্গারাম বললেন, 'কিন্তু কতদিন বাদে এমন মধুর কথা শোনা গেল। একটু যেন হালকা হওয়া গেল।'

প্রায় হাসতে হাসতে, দুজনে হরলালের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছুলেন। গলির মধ্যে, সেকালের দোতলা বাড়ি। গজাল পোঁতা দেউড়ি ভিতর থেকে বন্ধ। অন্ধকার চুপচাপ। হরলাল ঠোঁটে আঙুল চেপে, গঙ্গারামকে কোনোরকম শব্দ করতে বারণ করলেন। দেউড়ির কাছে কান দিয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করলেন। তারপরে বললেন, 'চল ?'

'কোথায় ?'

'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না। রোজ রোজ তোমার ওই এক বাতিক, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। আজ আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। চলি।'

গঙ্গারাম হাঁটা ধরলেন। হরলাল পিছন ছাড়লেন না। গঙ্গারাম বললেন, কী হল, আবার আসছ কেন ?'

হরলালের এক কথা, 'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'বলছি না।'

গঙ্গারামের ধমক শুনেও হরলাল নিরস্ত হলেন না। হাঁটতে লাগলেন। গঙ্গারাম খেঁকিয়ে উঠলেন, 'যত মাতালের গোঁ।'

হরলাল বললেন, 'তোমার দাঁতালের জেদ।'

গঙ্গারাম সে কথার জবাব না দিয়ে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে উঠলেন, 'কে বিদেশী, মন-উদাসী—।'

হরলাল ধমকে উঠলেন, 'চুপ চুপ, মনে রেখ পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ।'

'যাচ্ছি তো কী হয়েছে, গান গাইতেও মানা ?'

'রাত অনেক।'

'হোকগে, আমি এখন গাইব।'

'তুমি না গঙ্গা ঘোষ, ষাট বছরের বুড়ো। রাত দুপুরে পাড়ার ভেতর গান গাইতে গাইতে যাবে ?'

কথাটা বোধ হয় গঙ্গারামের মনে ধরল, কিন্তু বিরক্তও হলেন। হরলালের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, 'একটু যে প্রাণ খুলে আমোদ করব, তার উপায় নেই। হয় কারখানার ঝকমারি, নয় ইনকাম ট্যাকসের খবরদারি, তার ওপরে সংসার তো আছেই।'

হরলাল বললেন, 'কেন মলপোঁতা পাড়ার মেয়েমানুষের অমন চণ্ডীপাঠ শুনেও হল না ?'

গঙ্গারাম খ্যালখ্যাল করে হেসে উঠলেন। হরলালও। গঙ্গারাম বললেন, 'যা বলেছ। রাত্রে শুয়ে যতবার মনে পড়বে, ততবার হাসতে হবে।'

দুজনেই হাসতে হাসতে, গঙ্গারামের প্রাসাদোপম অট্টালিকার কাছাকাছি হলেন। গঙ্গারাম হরলালের হাত চেপে ধরলেন। চুপিচুপি বললেন, 'গেট দিয়ে ঢুকবো না। দারোয়ানটা রোজ রোজ কী মনে করে। বাড়ির লোকেরাও জেগে যায়। আজ পাঁচিল টপকে ঢুকব।'

'পাঁচিল টপকে ?'

'হ্যাঁ। খুব উঁচু তো না। যে দিকটায় শোবার ঘর, সেদিক দিয়ে টপকাব।'

'ওরে বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই ভাই গঙ্গা।'

গঙ্গারাম তাঁর হাত ছাড়লেন না। বললেন, 'আহা, আমি পাঁচিলে উঠলে ব্যাগটা আর ছড়িটা তুমি আমার হাতে তুলে দিয়ে চলে যেও।'

হরলাল চেষ্টা করেও হাত ছাড়াতে পারলেন না। গঙ্গারাম তাঁকে পাঁচিলের কোল আঁধার জায়গায় টেনে নিয়ে গেলেন। হরলাল বললেন, 'কী রকম বিপদ বল দিকিনি। দাঁতালমার সঙ্গে না এলেই হত আজ।'

গঙ্গারাম তখন পাঁচিলের উচ্চতা মাপছিলেন। বললেন, 'ভাই হরো, তুমি উপুড় হয়ে বসো, আমি তোমার পিঠে পা দিয়ে—।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই হরলাল এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে খানিকটা ছিটকে গেলেন। অবাক ভয়ে বলে উঠলেন, 'ওই লাশ আমার পিঠে? কথাটা বলতে পারলে? তার চেয়ে রেল লাইনে মাথা দিয়ে মরাও সোজা।'

গঙ্গারাম চুপি স্বরে ডাকলেন, 'আরে শোন না।'

'না না না, খুন করতে চাও তুমি আমাকে?'

অগত্যা গঙ্গারাম বললেন, 'তবে ঠিক আছে, নাও ব্যাগ আর ছড়িটা ধর, আমি উঠি।'

হরলাল ভয়ে এবং অনিচ্ছায় এগিয়ে এসে ব্যাগ আর ছড়ি ধরলেন। গঙ্গারাম দু'হাত তুলে পাঁচিল চেপে ধরলেন। ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে, শরীরের কোথাও একটু নড়াতে পারলেন না। বললেন, 'হরো, একটু ঠ্যালা দাও তো।'

ঠিক এই মুহূর্তেই পাঁচিলের কাছে, দোতলা ব্যালকনিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। বারান্দায় একজন যুবককে দেখা গেল। সে খুব শান্ত স্বরেই বলল, 'বাবা, তুমি গেট দিয়ে ঢুকে এস। এখান দিয়ে আসা সম্ভব নয়।'

দুই বন্ধুতেই এত হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে, হরলাল পাঁচিলের অন্ধকারে ঝুপ করে বসে পড়লেন, আর গঙ্গারাম ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'আমি শিবু।'

'অ।' গঙ্গারাম গলা খাঁকিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ অ, আচ্ছা, তাই যাচ্ছি।'

শিবু আবার বলল, 'আর কাকাকে এবার বাড়ি যেতে বল। অনেক রাত হয়েছে।'

হরলাল অন্ধকারেই জিভ কাটে, চোখ বুজে ফেললেন। গঙ্গারাম বলে উঠলেন, 'এই হরোর জন্যই তো এসব। দাও, ব্যাগ আর ছড়ি দাও।'

হরলাল প্রথমে বজ্রাহত, পরে ক্রুদ্ধ। কিন্তু মাথা তুলে আলোর সামনে উঠতে পারছেন না। শিবু দেখে ফেলবে। চুপি চুপি চিবিয়ে বললেন, 'নচ্ছার বজ্জাত বুড়ো মাতাল মিথ্যুক ···· ।'

সেসব না শুনে গঙ্গারাম ব্যাগ ছড়ি নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। হরলাল জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে, মনে মনে গালাগাল দিয়ে, নিচু হয়েই পাঁচিলের সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। বাড়ি ফেরার সারাটা পথই মাথায় যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। এ সময়ে কেউ তাঁর মুখ দেখলে, ভয়ে আঁতকে উঠত। উত্তেজনায় নিচের নকল দাঁতগুলো ঠেলে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছেন। আরক্ত চোখ দপদপ করছে। রেখাবহুল কোঁচকানো মুখটা যেন ফুলে উঠেছে।

কিন্তু বাড়ি যত কাছে এল, মুখের পরিবর্তন হতে লাগল। একেবারে দেউড়ির সামনে এসে, প্রায় স্বাভাবিক। এমন কি একটা চেষ্টাকৃত অমায়িকতা আনবার চেষ্টা করলেন। খুব আস্তে কড়া নাড়লেন, প্রায় চুপিস্বরে বড় নাতির নাম ধরে ডাকলেন, 'ন্যালা, ভাই নেলু, ওরে নেলু!'

নেলু দেউড়ির পাশে বাইরের ঘরে শোয়। ভিতরে শব্দ হল ঘটাং, দরজা খুলল, আলো জ্বলল

ক্লিক করে। সুমুখে দশাসই হরলাল গিন্নি। এখনো চোখে বাঘিনীর দপদপানি, নাকছাবিতে ঝলকানি। পানদোক্তা খাওয়া ঠোঁট ব্যাদান করে, ভেংচি কেটে বললেন, 'রাত দুপুরে মাতলামি, ভাই নেলু, ভাই নেলু! কেন, নেলুকে নিয়ে এখন মদ টানতে যাবে নাকি।'

হরলাল অসহায়ভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'ছি ছি, কী যে বল, একটু আস্তে, সবাই শুনতে পাবে।'

জবাব হল আরো উচ্চগ্রাম ও বিকৃতস্বরে, 'যেন জানতে কারোর বাকী আছে। বুড়ো হয়ে মরতে চললে, এখনো খোকামী গেল না। সেটা কই—সেই গঙ্গা ঘোষটা, তাকে আমি—।'

'ও তো বাড়ি চলে গেছে।'

'কেন, আবার তোমাকে পৌঁছুতে আসে নি। তুমি তো গেছলে।'

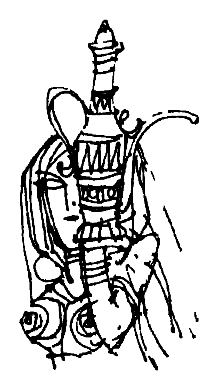
হরলাল এবার থমকে গেলেন। স্ত্রী বললেন, 'মনে কর কিছু দেখি নি। অন্ধকার ছাদের আলসেয় দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। তখনই চেঁচিয়ে ডাকি নি, গোঁসাই বংশের ভাগ্য।'

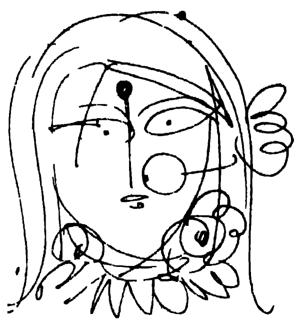
হরলাল বলে উঠলেন, 'তা ঠিক।'

'চুপ! চুপ করে থাকবে, মুখ নাড়বে না, বুড়ো মিনসে—।'

হরলাল যত হাত তুলে স্ত্রীকে চুপ করাতে চাইলেন, তিনি ততোধিক চিৎকার করে বলতে বলতে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে গেলেন। হরলাল অসহায়ের মতো শুনলেন, ছেলেদের কার কাব ঘরে যেন কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ জানতে কারোরই বাকী নেই, যে-ভয়টা তিনি পাচ্ছিলেন। তিনি দেউড়ি বন্ধ করে অতিমাত্রায় লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে, আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর দিকে চললেন। এ সময়ে চকিতে একবার গঙ্গারামের মুখটা মনে পড়তে আর একবার তাঁর মনে আগুন জ্বলে উঠল। মনে মনে বললেন, 'অই মাতালটার জন্যই এইরকম হল। নিজের ছেলেটার কাছে মিথ্যে বদনাম দিল। আর রোজ রোজ বাড়িতে—না, কাল থেকে আর নয়।'

কিন্তু মহাকালের খাঁচাকলে যাঁরা বাঁধা, তেলে জলে মিশ খায না এই আপ্তবাক্য বলার বা কালাকালের ব্যবস্থা করবার তাঁরা কে!





কপালকুণ্ডলা

কলম্বাস বা কুকের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পাবলে মন্দ হত না। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর শোনাবে, অতএব সেদিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনাটা অনেকখানি খেটে যায়। অবিশ্যিই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে তুলনা আদৌ করতে চাই না। সম্রাট হবার কোনো বাসনা আমার নেই।

যোগ্যতা থাকলে তো বাসনার প্রশ্ন ওঠে। বরং দীন কাঙাল হরিনাথের মতো কিছু গান গেয়ে যেতে পারলেই সার্থক মনে করবো।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট অপরদিকে সাহিত্যসম্রাট। আমি ওসবের ধারে কাছে নেই। কিন্তু আমার একটি জিজ্ঞাসা মনকে খুবই উতলা করে। তিনি কি সত্যি কপালকুণ্ডলা নাম্নী কোনো তরুণীকে বনমধ্যে দেখেছিলেন ? না কি কপালকুণ্ডলা একান্তই তাঁর কল্পনার প্রতিমা ?

কাঁথি শহরের এক প্রান্তে আমি কপালকুণ্ডলার মন্দির এবং প্রতিমা দর্শন করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যে কাঁথি বা ইংরেজী উচ্চারণে কন্টাই শহরটা ছিল, নিশ্চয়ই তা অনেক ছোট ছিল। সেই হিসাবে তৎকালীন কাঁথি মহকুমা শহর থেকে কপালকুণ্ডলার মন্দির নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা দূরে গ্রামে ছিল। সেখানকার গ্রামীণ পরিবেশটা [illegible]না যায় নি, যদিও নতুন শহর সেইদিকেও ছড়িয়েছে। সেই মন্দিরের দেওয়ালে, শ্বেত পাথরের ফলকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতির কথা লিখিত আছে।

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। আমি প্রত্নতত্ত্বের লোক নই, অনুসন্ধানীও বলা চলে

না। কিন্তু একটা শুধু জিজ্ঞেসা আমাব থেকেই গিয়েছে। আমি প্রথম যখন কপালকুণ্ডলার মন্দিরে গিয়েছিলাম, তখন প্রতিমার রূপ দেখেছিলাম একরকম। সেই মূর্তি ছিল রক্তস্তনী। পাশেই কয়েকটি খড়্গ ঝোলানো ছিল, পুবনো আর জীর্ণ, ধারগুলো মরচে পডা। মন্দিবেব পূজারীর মুখে শুনেছিলাম, ওখানে যে পশুবলি হয় খড়্গগুলো তাবই।

কপালকুণ্ডলা মন্দিরেব পূজারীর একটি প্রথা, যে খডগ দিয়ে বলি হয়, তার রক্ত কখনো খড়্গের গা থেকে জল দিয়ে ধোয়া হত না। রক্ত খড়্গের গায়ে লেগে থাকাব দরুন একটি খড়্গ দিয়ে বেশি দিন বলির কাজ চালানো যেতো না, সেইজন্যই অনেক খড়্গ জমে যেতো।

মন্দিরের পিছনে একটি বড জলাশয় আছে। আশেপাশে বেশকিছু জমিও। সেখানে শবদাহ কবা হয়, তার চিহ্নসকলও আছে। বক্রেশ্বব বা তাবাপীঠের মতো মহাশ্মশানেব কথাই মনে কবিয়ে দেয।

কয়েক বছব পবে আবাব যখন যাই, দেখলাম কপালকুণ্ডলা আব বক্তস্তনী নেই, মাটিব প্রতিমাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। খড়্গগুলো নেই, ইতিমধ্যে পূজাবী পুবোহিতেবও পরিবর্তন হয়েছিল। জিজ্ঞেস কবতে সে আমাকে পরিষ্কার জানিযে দিল, এই মূর্তিই ছিল, যা আদৌ সত্যি না। খড়্গগুলো যে কোনকালে ছিল, তা ই সে বলতে পাবলো না। অত্যন্ত বিবক্ত হযেই আমাকে ফিরতে হয়েছিল।

যাই হোক, সংবাদপত্রেব চিঠিব মতো আমি কোন বক্তব্য এখানে তুলতে বসি নি। কপালকুণ্ডলা এবং তাব মন্দিব এবং বঙ্কিমচন্দ্রই আপাততঃ আমাব জিজ্ঞাসা আব কৌতূহলেব বিষয়। আমি জিজ্ঞাসু মনে ভাবি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই মন্দিব দর্শনে এসেছিলেন (নিশ্চযই ঘোডাব পিঠে চেপে।) তখন কি এব চাবপাশে গভীব বন ছিল? সমুদ্র কি ছিল খুবই নিকটে, যাব উত্তুঙ্গ ঢেউয়েব আছড়ে পড়াব গর্জন শোনা যেতো?

আশ্চর্যের কিছুই না। স্থানীয মৃত্তিকায আমি বালিব স্তবে দেখেছি। আশেপাশে যে সব গাছপালা রয়েছে, নাবকেল গাছ সহ সবই প্রায সামুদ্রিক অঞ্চলেব।কাঁথি থেকে সমুদ্র যে এখন খুব বেশি দূব সবে গিযেছে তাও নয। সমুদ্রতীবে বনমধ্যে কপালকুণ্ডলাব মন্দিবের বাস্তবতা একেবাবে উডিযে দেওযা যায না। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চযই অভিভূত হযেছিলেন, এবং কপালকুণ্ডলা উপন্যাস বচনাব কল্পনা, সেই মুহূর্তেই হযতো তাঁব ধ্যানে ঝিলিক হেনেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী দেখে? কপালকুণ্ডলার মতো তরুণী কি তাঁব চোখে পডেছিল? কাপালিকের মতো কোনো তান্ত্রিক যোগীকে তিনি কপালকুণ্ডলা মন্দিবে ব তাব আশেপাশে বনেব মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন? নাকি সে সবই তাঁব কল্পনা, প্রতিভার দ্বাবা বচিত। এসব প্রশ্ন আমাব মনকে চঞ্চল কবেছিল। মনে হয, এব জন্য বর্তমান কালের একজন সাহিত্যিক হওয়াব প্রয়োজন হয না, যে-কোনো মানুষেব মনকেই এসব জিজ্ঞাসা কৌতূহলিত ও চঞ্চল কবতে পারে। এসবই হলো, আমার নিজের কপালকুণ্ডলাব ভূমিকা। কপালকুণ্ডলা, উনিশশো আটষট্টি। কথাটা এভাবেই আমাকে বলতে হয়। উনিশশো আটষট্টি থেকে এটাই বোঝাবাব চেষ্টা কবছি, ঘটনাটা সেই সালেব।

আমরা কয়েকজন বন্ধু সেই সালেব শীতের সময় একটি বড নৌকায সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। যাত্রা করেছিলাম মোল্লাখালি থেকে। খুব বিশদ বর্ণনায় আমি যাব না, কাবণ

আপাততঃ আমি কোনো ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসিনি। কলকাতা থেকে বিশেষ যোগাযোগে আগে থেকেই আমাদের একটি বড় নৌকার ব্যবস্থা করা ছিল। এক্ষেত্রে লঞ্চে যাবার আমি ছিলাম ঘোরতর বিরোধী। লঞ্চের মোটরের যান্ত্রিক শব্দটাই আমার কাছে বিরক্তিকর। সমুদ্র নদী আর বনকে চকিত চমকে জাগিয়ে দিয়ে দাপিয়ে বেড়াবার পক্ষপাতী আমি মোটেই ছিলাম না।

নৌকাটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। বড় না বলে সেটাকে বিরাট আখ্যা দেওয়া ভালো। আমাদের শোবার বিছানা পাতার ভালো পরিসর ছিল। রান্নার জায়গাও অনেকখানি। মস্ত বড় বড় দুটো জলের জালা উঠেছিল। কেননা নোনা জলের অকূলে ভাসতে হলে, মিষ্টি পানীয় জলের ব্যবস্থা যথেষ্ট রাখতেই হয়। দশ দিনের খাদ্য তুলে নিয়েছিলাম। প্রধানতঃ চাল ডাল নুন লঙ্কা তেল ইত্যাদি। চিড়ে-মুড়ি যতোটা সম্ভব আনাজপাতি আর মিষ্টি। প্রধান মাঝিটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। শক্ত স্বাস্থ্যবান অভিজ্ঞ, কিন্তু অল্প বয়সের পুরুষ। মাথায় বড় বড় চুল। সে ভক্ত মানুষ, ভালো গান জানে। সে ছাড়া আরো দুজন যুবক শক্তিশালী মাঝিও তার সঙ্গী ছিল। প্রধান মাঝির নাম সত্য সাঁই।

দয়া করে এর থেকে কেউ ধরে নেবেন না, সাঁইবাবা নামক সাধক সিদ্ধপুরুষের বিষয়ে কিছু বলছি। মাঝি তার এই নামটিই বলেছিল। সে একদা সাঁইদার ছিল। তারও আগে ছিল মৌলি—অর্থাৎ যারা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের বাঘকে সে নিতান্ত বাঘ মনে করে না, দেবতা মনে করে এবং তাকে বশ করার মন্ত্রতন্ত্রও তার জানা আছে। বাঘ ভূত ডাকাত সুন্দরবনের জলে ডাঙায় এই ত্রিবিধ জীবদেরই একমাত্র ভয়। এসব নিতান্ত ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্য সাঁইদের আন্তরিক বিশ্বাস। ভূত যতোই অবায়বীয় হোক, অতি বাস্তব সত্য। সত্য সাঁই সে-সব ভূতের বন্ধন আর মুক্তির মন্ত্রও জানে। এসবই হচ্ছে একজন খাঁটি সাঁইদারের লক্ষণ। কারণ সে নেতা। মাঝিদের জীবনের দায়দায়িত্ব সবই তার। সুন্দরবনের গভীরে সর্পিল খাড়ি এবং অকূলে সর্বত্রই মাঝিদের মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। মাঝিরা নিশি পাওয়া আচ্ছন্নের মতোই সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে চলে যায়। আর কখনো ফিরে আসে না।

সাঁইদারের কাজ সেই সব অদৃশ্য দুরাত্মাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখা এবং তাকে বিতাড়িত করা, অথবা তুষ্ট করে ফিরিয়ে দেওয়া। বনবিবি প্রধানতঃ ব্যাধির দেবী। অসুখের মধ্যে আমাশয়, কলেরা, আর ঘা-পাঁচড়া। বনবিবির পূজা এক্ষেত্রে অতি আবশ্যিক। আর দক্ষিণরায় হলেন ব্যাঘ্রদেবতা। অর্থাৎ দক্ষিণের রাজা।

সত্য সাঁইয়ের গল্পের ভাণ্ডার এতোই ঐশ্বর্যপূর্ণ, আমি তার কাছে একান্ত গরীব। ধরে নিতে হবে, এই যাত্রায়, সে-ই আমাদের রক্ষক এবং নেতা। আমরা তা সর্বাংশে মেনেও নিয়েছিলাম।

এবার কপালকুণ্ডলার কথায় আসা যাক।

যাত্রা করবার তৃতীয় দিনে সাত জেলিয়াতে আমরা স্নান করবার সুযোগ নিয়েছিলাম। সাত জেলিয়ার হাটের ধারেই টিউবওয়েল ছিল। শীতের দিন হলেও আমাদের প্রতিটি রোমকূপ একটু মিষ্টি জলে স্নান করার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। মলমূত্র ত্যাগের জন্য আমাদের সব সময়ই বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিতে হতো। বিপজ্জনক এই কারণে, আমরা মাঝিদের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

নৌকার ধার থেকে একটি দড়ি আর বাঁশের ঝোলানো মই নেমে গিয়েছে জলের গায়ে। সেই

মই বেয়ে নিচে নেমে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা। বিপজ্জনক বলার কারণ এই না যে সাঁতার না-জানা। সাঁতার আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সুন্দরবনের নদী নালায় কেউ নামে না, স্নান তো দূরের কথা। জলে নেমে জল শৌচের কথাও কেউ ভাবে না। সেটা যে কেবল জল লবণাক্ত বলেই তা না। কুমীর কামটের ভয়। কুমীরের থেকেও স্থানীয় লোকের ভয় কামটকে। কামট হাঙর শ্রেণীর এক জাতীয় হিংস্র জলজন্তু। হাঙরের মতোই অতি তীক্ষ্ণ দুই পাটি দাঁত। আকারেও কম বেশী সেই রকম। রঙটা কালো-সবুজ শ্যাওলার মতো, মুখ অনেকটা শূকরের মতো ছুঁচলো। অতি ক্ষিপ্র আর দ্রুতগামী এবং সজাগ জলচর প্রাণী। মানুষবাহী নৌকার এবং মনুষ্যবসতি ডাঙার কাছেপিঠেই তারা ঘুরে বেড়ায়। আর সুযোগ পেলেই ধারালো দাঁতে নিমেষে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে নেয়। কুমীর তবু চিবিয়ে খায়, কামট যান্ত্রিক ধারালো করাতের মতো চোখের পলকে শরীর টুকরো টুকরো করে দেয়।

অতঃপরও যে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মগুলো সারতে পেবেছি। সেটা ভাগ্য বলতে হবে। নোনাজলে স্নান করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সারা গা যে কেবল চটচট কবে তাই না, শুকিয়ে যাবার পরে চুলকাতে আরম্ভ করে। সুন্দরবনের মাঝিদের একটা বড় চর্মবোগই হলো দাদ। হাজার কথা তো বাদই দিলাম।

সাত জেলিয়াতে আমরা কেবল স্নান করলাম না। জালার জল যতোখানি ব্যয় হয়েছিল তা আবার পূর্ণ করে নিলাম। গোটা কয়েক মুবগীও কেনা গেল। সত্যি বলতে কি, মুরগী কেনার কোনো দরকারই আমাদের ছিল না। নিতান্ত মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যই কেনা হযেছিল। মাছ আমরা প্রচুর পেতাম। ভোরবেলা যে কোন নদীর বুকেই জেলে-মাঝিরা যখন জাল তুলতো, প্রথম সূর্যালোকে জালে আটক পড়া নীলকান্তমণি রঙেব ভেটকিব গাযে যেন সাত বঙ খেলে যেতো। অথবা রূপালি আভাস। অতি তৈলাক্ত স্বাদু মাছ। দামেও পেতাম অনেক কম।

সাত জেলিয়ার পরে পঞ্চম দিন বাত্রে আমাদেব কুমীরখালি পৌছুবার কথা। এবং সেখানেই রাত্রিবাস হবে এরকম ঠিক ছিল। কিন্তু সত্য সাঁইয়েব মতো মাঝিও বাতের অন্ধকারে ঘোষণা করলো, পথ ভুল হয়েছে। ইতিমধ্যে রান্না হয়ে গিয়েছিল। আমরা কম্বল আর লেপ মুড়ি দিয়ে ছইয়ের ভিতরে হারিকেনের আলোয় তাস খেলছিলাম।

তখন ভাঁটা চলছিল। পথ ভুলেব কথা শুনে বাইরে গেলাম। দুটো দাঁড় পড়ছিল ঝপ্‌ঝপ্‌ করে আর অন্ধকারে দাঁড়ের আঘাতে জলের মধ্যে ফসফরাসের জন্য অজস্র জোনাকির মতো জল ছিটকে উঠছিল। দিগন্তব্যাপী আর কিছুই দেখা যায় না। তারাভরা আকাশ আর দিগন্তবিস্তৃত জল মেশামেশি করে আছে।

সত্য সাঁইকে কেমন চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখলাম। সে উৎকর্ণ হয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলো। আমরা ভয় পেলাম, বোধ হয় নৌকা সমুদ্রের অকূলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, 'সমুদ্র না, ডাকাত। আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

তারপরেই সাঁইদারের নির্দেশ, হারিকেন নিভিয়ে দিন। কেউ বিড়ি-সিগারেট খাবেন না। একটি আলোর বিন্দুও যেন দেখা না যায়। কথাবার্তা একদম বন্ধ। একটি কথাও যেন কেউ উচ্চারণ না করি। এবং মাঝিরা ছাড়া আমরা সকলেই যেন ছইয়ের ভিতরে থাকি। এই নির্দেশের পর ছইয়ের মধ্যে আমরা কেবল নিজেদের বুকের স্পন্দনের শব্দ শুনতে লাগলাম। সে শব্দ

দাঁড়ের ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দের থেকেও যেন প্রচন্ড হয়ে বাজছিল।

প্রায় ঘন্টা দেড়েক এই রকম রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার পরে সত্য সাঁইয়ের স্বরে বিপদ মুক্তির সাইরেন শুনতে পেলাম, 'বাবুরা, বাতি জ্বালেন, এবারে খেয়ে নেয়া যাক। খারাপ জায়গাটা পেরুইয়ে এসেছি।'

ভোরবেলার ঝাপসা কুয়াশায় আবিষ্কার করা গেল, আমরা পাখিরালা বনবিভাগের অফিসের ঘাটের নিচে রয়েছি। আমার এক বন্ধু বোধ হয় রাত্রের উদ্বেগের ধকল সহ্য করতে পারছিল না। সে মুখে জল না দিয়েই হুইস্কির বোতল তুলে নিট্ চুমুক দিল।

তারপরে আমরা যখন বড় বড় মোটা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে বনবিভাগের অফিসের মাটিতে পা দিলাম, তখনই একটা ঘরের ভিতর থেকে রীতিমতো ধমকানো আর উদ্বিগ্ন চিৎকার শুনতে পেলাম, 'আরে মশাই, কে আপনারা? কোন্ সাহসে এখানে উঠে এসেছেন? তিন দিন ধরে একটা বাঘ অফিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীগ্‌গির পালান।'

আমরা নিরস্ত্র,বন্ধুরা আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি সেই পলিপড়া পিছিল কাঠের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। একজন আছাড়ও খেলো। কিন্তু আমরা প্রাণে বাঁচলাম।

আমার এসব বিষয়কেও বিংশ শতাব্দীর অর্ধশতক অতিক্রান্ত কপালকুণ্ডলার ভূমিকাই বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলার নবকুমারকে আমাদের মতো বিপত্তি ভোগ করতে হয় নি। কামট কুমীর ভূত বাঘ ইত্যাদির কথা কপালকুণ্ডলা পড়তে গেলে মনেই আসে না। বরং আরণ্যক ভয়াবহতার মধ্যে কেমন একটা রোমান্টিক ভাবই জেগে ওঠে। তারপরে যখন শুনতে পাই, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' তখন তো মনে হয়, নবকুমারের পরিবর্তে আমিই কেন সেখানে উপস্থিত হতে পারলাম না। রমণীর স্বরে সেই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র, সুন্দর-বনের ভয়াবহতার কথা আর একটুও মনে থাকে না। সুন্দরবন হয়ে ওঠে এক রহস্যময় নন্দনকানন।

এখন বেলা প্রায় বারোটা। ভোরবেলাই পাখিরালার স্যাংচুয়ারির মাচায় আমরা চুরি করে উঠেছিলাম। আমাদের কোনো অনুমতি ছিল না এবং বিনানুমতিতে অভয়ারণ্যের খালে যাওয়া বা মাচায় ওঠার অধিকার আমাদের ছিল না।

কিন্তু আমরা নিরস্ত্র, শিকার আমাদের লক্ষ্য ছিল না, লাভের মধ্যে একটু পাখি দেখা। এই চৌর্যবৃত্তিটুকু আমরা না করে পারি নি। এমন কি বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে আমরা কুমীরখালির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

বেলা বারোটার সময় যখন রান্নবান্না প্রায় শেষ, আমরা আবার স্নানের জন্য উন্মুখ হলাম। কিন্তু মিষ্টি জল পাবার কোনো উপায় নেই। আমরা কোমরে সংক্ষিপ্ত বাস জড়িয়ে খালি গায়ে মাচার রোদে বসেছিলাম।

এমন সময় আমাদের চোখে পড়লো একখণ্ড জমি। একটি ছোট্ট দ্বীপ,যেন জলে ভেসে রয়েছে। বড় গাছপালা চোখে না পড়লেও জনমানবহীন ছোট্ট দ্বীপটিকে সবুজ দেখাচ্ছিল। আমাদের সকলের দৃষ্টিই দ্বীপটি আকর্ষণ করলো। দ্বীপটির পঁচিশ-তিরিশ হাত দূর দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। আমি প্রস্তাব করলাম, 'মিষ্টি জলের সন্ধান পেয়ে স্নান করতে আমাদের অনেক দেরি হবে। আমরা এই দ্বীপে নেমে গায়ে তেল মাখতে পারি, তারপরে খানিকটা রোদ খেয়ে নোনা জলেই স্নানটা সেরে নেওয়া যেতে পারে। গায়ে যা জ্বালা ধরেছে, একটু স্নান না করলে আর চলবে না।'

আমাদের মধ্যে যে সাঁতার জানে না সে বললো, 'নোনা জলেই চান করবো, কিন্তু জলে নামবো কী করে? এখানে কুমীর না থাক, কামট কি নেই?'

কামটের কথা আমার মনেই ছিল না। আর এক বন্ধু বললো, 'তা ছাড়া এ দ্বীপে আমাদের নামা উচিত হবে কী না, সেটাও জানা দরকার।'

নিঃসন্দেহে! সত্য সাঁইয়ের অনুমতি না পেলে আমরা দ্বীপে নামতে পারি না। তবে দ্বীপটি সবুজ দেখে আমার মনে হলো, ভরা বর্ষায়ও হয়তো দ্বীপটি পুরোপুরি জলে ডোবে না। অন্যথায় সবুজ হাঁটুসমান জঙ্গলে ভরে উঠতো না। আমি সত্য সাঁইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস্ করলাম, 'আমরা কি ওই ডাঙায় নেয়ে একটু তেল মেখে চান করতে পারি?'

সত্য সাঁই দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে দেখলো, বললো, 'তা পারেন। ভয় হলে নামতি পারবেন না। একটা বালটিতে দড়ি বেঁধে দিতেছি, জল তুলি তুলি মাথায় ঢালতে পারবেন।' বলেই সে হালে মোচড় দিয়ে মুখ ঘোরালো। তার কথা শুনে বড় আনন্দ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা জোয়ারের জলে ডুবে যায় না?'

সত্য সাঁই বললো,'ইদানীং বছর-দুই ধরি দেখতিছি ডাঙ্গাটা জাগতিছে। মনে হয় কি, আর দু-একবছব বাদে এটা আরো বড় হবি, ত্যাখন আবাদ হতি পারবে।'

আমি লক্ষ্য কবে দেখলাম, দ্বীপটির একটা অংশ খানিকটা উঁচু ঢিপিব মতো উঠে গিয়েছে। সেদিকটায় এক শ্রেণীর গাঢ় সবুজ লতানে ঝোপঝাড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। সত্য সাঁইকে জিজ্ঞেস কবলাম 'এ ডাঙায় বাঘ বা কুমীব নেই তো?'

সত্য সাঁই হেসে বললো, 'আইজ্ঞে না। ওঁয়ারা (বাঘ কুমীর) এখেনে কী করতি থাকবেন বলেন? খাবেনটা কী? জঙ্গল বাড়লি পবে জানোয়ার-টানোযার থাকলি ওঁয়ারা থাকতেন। সোম্‌সারের জীব যেখেনে খাতি পায়, সেখেনে যায। তয মেছো কুমীব এক আধটা থাকলি থাকতিও পারে। একটু দেখে শুনি চলবেন!'

আবার মেছো কুমীর কেন? মনে একটু ভয়-ভয় ভাব থেকে গেল। কিন্তু ডাঙায় নামতে পারার আনন্দে সে ভয় বেশিক্ষণ টিকল না। মাটিব ওপরে রোদে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কত দিন তেল মাখিনি! শত হলেও ডাঙার জীব আমবা। দু-এক দিন জলে থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ আমাদের সপ্তম দিন।

নৌকা দ্বীপের ভূমি স্পর্শ করলো। এক জোয়াম দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে লাফিয়ে নামলো, আর একজন লোহার ভারি নোঙর ছুঁড়ে ফেলে নিজেও লাফিয়ে নামলো। তারপরে নোঙর গাঁথলো। আমরা তেলের শিশি,সিগাবেটের প্যাকেট, তোযালে ইত্যাদি নিয়ে আণ্ডারওয্যাব পরে নামলাম। শীতকাল বটে, তবু মাটি ঠাণ্ডা স্পর্শে যেন একটি অনির্বচনীয় সুখানুভূতি হলো।

দ্বীপের যে গাছগুলো হাঁটুসমান মনে হয়েছিল, এখন দেখলাম সেগুলো প্রায কোমরের সমান। দেখতে অনেকটা আসশ্যাওড়ার মতো, কিন্তু তা নয়। গাছের পাতাগুলো তার চেয়ে বড়। অনেকটা ডুমুরের মতো, তবে খসখসে নয়, মোলায়েম। এক বন্ধু হুইস্কির বোতল নিয়ে নামতে ভোলে নি। সকলেই আমরা যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। সিগারেট ধরিয়ে সবাই যে যার ইচ্ছামতো ছড়িয়ে পড়লাম।

অল্প অল্প বাতাস বইছে। গাছের মাথাগুলো হেলে পড়েছে। নীল আকাশ চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। উত্তরদিকে আকাশের গায়ে ঠেকে আছে গাছপালাহীন একটি ভেড়ি বাঁধের রেখা। পূব-দক্ষিণে কোনো গভীর বনের সীমানা জেগে আছে, দেখাচ্ছে একটি কৃষ্ণনীল দ্বীপের মতো। সেই দিকেই কিছু দূরে জলের বুকের ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে কয়েক সহস্র

বেলেহাঁস। মাঝে মাঝে তাদের অদ্ভুত ডাক শোনা যাচ্ছে।

আমার কৌতূহলিত দৃষ্টি উঁচু ঢিবির দিকে। আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললাম। জমিতে এখনো বালির ভাগই বেশি। মৃত্তিকার জন্ম হয় নি। যতই এগোতে লাগলাম ততই গাছগুলো যেন পাল্লা দিয়ে বড় হতে হতে আমার বুক আর মাথার সমান হয়ে উঠতে লাগলো। এক ধরনের লতাঝোপও গাছগুলিকে জড়িয়ে উঠেছে আমার ভয় হলো জোঁকের জন্য। জোঁককে আমার বড় ভয়। তবে নোনাজলে জঙ্গলে জোঁকের কথা কখনো শুনিনি। বড় বড় মিষ্টিজলের বাওরে জোঁক থাকে। আর জোঁকের সব থেকে বেশি উৎপাত দেখেছি তরাইয়ে পাহাড়ে আর আসামের জঙ্গলে, যেখানে নোনার কোনো স্পর্শ নেই।

আমি হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়ালাম। আর একটু হলেই আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসতো। কিন্তু আমি রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে আমার বাঁদিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অভাবিত আর অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একটি মেয়ে গাছেব পাতার ফাঁক দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখছে। সম্ভবতঃ আমার বন্ধুদেরই সে দেখছে। এবং এমনই নিবিড় অন্যমনস্ক আর কৌতূহল, কিছুটা উদ্বেগেও দেখছে, আমাকে সে দেখতেই পেলো না। টেরও পায় নি, একজন মানুষ তার কাছ থেকে মাত্র দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই দ্বীপে মানুষ! তাও একটি মেয়ে? বয়স ষোল-সঁতরোর বেশি কোনোমতেই না। গায়ের বঙ কালো, স্বাস্থ্যটি উজ্জ্বল। মুখেব এক পাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে, নাক তেমন চোখা নয় চোখ ভাসা-ভাসা। চোখে রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে। বিস্ময়ে আর কৌতূহলে তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়েছে, সাদা কয়েকটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। নাকের নিচেই ওপব-ঠোঁটের ওপরে একটি চুটকি নোলক দুলছে। সেটি সোনা বা পিতলের বুঝতে পারছি না। গায়ে কোনো জামা নেই। নীলের ওপরে কালো ডোরাকাটা কালো পাড়েরই একটি সস্তা শাড়ি তার পরনে। পুষ্ট বাহু, উদ্ধত বুক, ক্ষীণকটির নীচেই সুগঠিত কোমর থেকে স্তম্ভের মতো উরুদেশ। দুই হাতে লাল আর নীল কাঁচের চুড়ি।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তদুপরি মানুষ দেখে কেমন যেন ভয় হতে লাগলো। এখানে মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। চাষ আবাদ নেই, জেলেদের মাছ শুকোবার কাববার নেই। তাহলে দুই চারটি নৌকা অন্ততঃ দেখা যেতো। নৌকায আসবাব সময় অন্য কোন নৌকাকে নোঙর করে থাকতে দেখি নি।

শহরের মানুষ হিসাবে এবং আধুনিকতাব বড়াই থাকা সত্ত্বেও, ভূতের প্রসঙ্গটা আমার বুকের স্পন্দনের সঙ্গে বাজতে লাগলো। এ কোনো অশরীর মায়া নয় তো?

যাই হোক আমি পালাতে চাই, মেয়েটিকে বা সে যাই হোক, ফাঁকি দিয়ে। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বিশেষ করে সত্য সাঁইকে এ খবরটা দিতে চাই।

ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামান্য নড়তেই মেয়েটি সচকিত বাঘিনীর মতই ঝটিতি আমার দিকে ফিবে তাকালো। ঘাড়ের ঝটকায তাব কপালে চুল এলিয়ে পড়লো। আমি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়েটির চোখেমুখে প্রথমে অপার বিস্ময় ও ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। এবং তারপরেই তার মুখ আর ভাসা-ভাসা চোখের দৃষ্টি যেন কঠিন হয়ে উঠলো। কিন্তু আমি মানুষ। বিস্ময়-চমকের মধ্যেই একটা মুগ্ধতা আমার চোখে ফুটে উঠলো। মেয়েটির কালো মুখখানি যে এত সুন্দর, এই নির্জন দ্বীপবাসের রুক্ষতাও তা ম্লান করতে পারে নি। তার মুখে একটা তেজোদৃপ্ত ভাব।

আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক পলক দেখেই মেয়েটি পিছন ফিরে দৌড় দিল। আমি কী

করবো ভেবে পেলাম না। পালাবো ? চিৎকার করে সবাইকে ডাকবো ? কিন্তু নিজের আচরণে আমি নিজেই বিস্মিত হলাম। মেয়েটির পলায়মান পথের দিকেই আমি এগিয়ে চললাম। এক অতি আকর্ষক চুম্বকেব টানে আমি যেন নিশি-পাওয়া ঘোরে চলতে লাগলাম। কিছুটা দূরে গাছের পাতা নড়ে উঠতে দেখে সেই দিকে গেলাম। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না।

আমি তখন ঢিবিটাব কাছে। আমাব নাকে একটা দুর্গন্ধ লাগলো। প্রথমে মনে হলো শুকনো মাছের গন্ধ। কিন্তু শুকনো মাছেব গন্ধ আমার চেনা। এ গন্ধ যেন আরো বিকট আর চামসা। কিসের গন্ধ হতে পারে ? মানুষ মবে পড়ে নেই তো কোথাও ? একবাব ভাবলাম ফিরে যাই। কিন্তু পারলাম না।

মানুষ সব সময়ে দৈবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সে নিজেই তাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি নিচের দিকে তাকালাম। মানুষেব পায়েব ছাপ স্পষ্ট বাঁদিকে গিয়েছে। আমি সেই ছাপ অনুসরণ করে ঢিবিটা প্রদক্ষিণ কবতে উত্তবদিকে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম গোলপাতাব একটি অবিন্যস্ত ছাউনি ঢিবিব নিচেই যেন গুঁড়ি মেবে রয়েছে। কযেকটি ছোট ছোট মোটা গাছের গুঁড়িব ওপরে গোলপাতার চাল মাটি স্পর্শ কবেছে। ভিতরে প্রবেশের একটি প্রায সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক। নিশ্চয়ই মাথা নিচু কবে উপুড় হযে ঢুকতে হয।

এটি যদি একটি বাসস্থান হয, তবে বাইরে থেকে তা দেখবাব কোনো উপায নেই। ঢিবিব নিচেই অন্যান্য গাছের সঙ্গে গোলপাতাব চাল মিশে রযেছে। তাবপরেই আমাব চোখে পড়লো, কতকগুলো হাড়গোড আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু স্পষ্টতই তা মানুষের নয। কোনো জন্তু-জানোযারেরই হবে। গন্ধ ওখান থেকেই উত্তরেব বাতাসে ছড়িযে যাচ্ছে। তাবপবেই হঠাৎ আমাব চোখে পড়লো একটি ছোট বাহাবি নৌকা। ভেজা হোগলা পাতা দিযে ঢাকা।

কী এর অর্থ ? নিশ্চয়ই কেউ এই নৌকায বাইবের জগতেব সঙ্গে যোগাযোগ বাখে। কিন্তু কোথায গেল মেযেটি ? আমি কি কোনো ডাকাতেব আস্তানায এসে পড়েছি। এই কথা ভাবতেই গোলপাতার ছাউনিব সুড়ঙ্গেব ফাঁকে সেই মেযেটির মুখ দেখা গেল। যেন সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একটা বাঘিনী উঁকি নিয়ে আমাকে দেখছে। তারপবেই আমার বুক হিম কবে দিযে একটি লোহাব নল আমার দিকে এগিয়ে এলো। বন্দুকেব নল। দেশী পাইপগানেব নল আমার অচেনা না।

আমি চিৎকাব করে ওঠবাব আগেই মেযেটিকে সবিযে দিযে একটি মূর্তি বেবিযে এলো। পেশীবহুল শক্তপোক্ত খালি গা একটি মধ্যবয়স্ক লোক। মাথায কাঁচাপাকা রুক্ষ বাববি চুল, গোঁফদাড়ি ভরা মুখ। গলায় একটি তাবিজ, স্পষ্টই সেটা বাঘেব নখেব তাবিজ। পবনে একটা লুঙ্গি। হাতে তার একটি পাইপগান। কিন্তু তা আমার দিকে উদ্যত নয়। লোকটির দুই চোখে বাঘের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। মেযেটি বোধহয এসে তাব পাশে দাঁড়ালো।

মেয়েটির চোখে-মুখে এখন সেবকম কাঠিন্য নেই। কেবল বিস্ময় আব কৌতূহলে ভরা। দুজনেই আমাব আণ্ডারওয্যাব পবা খালি গায়ের আপাদমস্তক দেখলো। তাবপরে লোকটিই জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে বাবা ? এখেনে কী কবি এলেন ?'

আমি যেন একটু ভরসা পেলাম। এ নিতান্ত কাপালিক না, মেয়েটিকেও কপালকুণ্ডলার মতো বন্দিনী মনে হলো না। লোকটিব কথার মধ্যেও কিঞ্চিৎ কোমলতা আর সম্ভ্রমের স্পর্শ আছে। আমি সত্যি কথাই বললাম।

আমার কথা শুনে লোকটার চোখ-মুখেব ভাব একটু নরম হলো। বললো, 'আমব বেটি ছাওয়ালের মুখিও তাই শোনলাম। কলকাতার থেকে আসিছেন ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

লোকটি আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে নৌকা নিইছেন, মাঝির নাম কী?'

বললাম, 'মোল্লার হাট থেকে। মাঝি সত্য সাঁই।'

লোকটি মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটি হাসলো। তার নোলক দুলে উঠে চিকচিক করলো। বেটি ছাওয়াল মানে নিশ্চয়ই কন্যা। এরা তাহলে পিতা-পুত্রী? কিন্তু এখানে কী করে? হাতে এই দেশী পাইপগান বা কেন?

মেয়েটির সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হতেই এবার তার মুখে লজ্জার ছটা ফুটলো। লোকটি বললো, 'ময়না, বাবুকে একটা চ্যাটাই পাতি বসতি দে। তামুক খাবেন?'

রীতিমতো আতিথেয়তা। মেয়েটির নাম ময়না? কপালকুণ্ডলা নয়? বললাম, 'আমি তামাক খাই না।'

ময়না একটা হোগলার চাটাই নিয়ে বাইরে আসতেই লোকটি আবার বলে উঠলো, 'থাক, বাইরি বসতি লাগবে না। আপনি ঘরের ভিতর চলেন।'

ঘরের ভিতর? ঐখানেই কি হাড়িকাঠ আছে নাকি? ময়না কিন্তু হেসে উঠে মুখে আঁচল চেপে এই প্রথম কথা বললো, 'বাপজানের মাথার ঠিক নাই।'

লোকটি হাসলো। গোঁফদাড়ির মধ্যে তার শক্ত অটুট দাঁতের সারি দেখতে পেলাম। বললো, 'তুই ঘরের মধ্যি বাতি জ্বালা গা।'

ময়না আর একবার আমার দিকে দেখে হেসে হোগলার চাটাই নিয়ে ভিতরে চলে গেল। আমি বললাম, 'ভেতরে যাবার আর দরকার কী? আমি বরং যাই, আমার বন্ধুরা আমাকে খুঁজবে।'

লোকটি বললো, 'খুঁজলিও আপনারে পাবে না। আসেন।'

স্বর নিরীহ, কিন্তু আমার অমান্য করবার সাহস হলো না। আমাকে এগিয়ে দিয়ে সে পিছনে দাঁড়ালো। ভিতরে উঁকি দিয়ে একটা লম্ফর শিস্ দেখতে পেলাম, তার পাশে আলুলায়িত ময়নার কেশ-মুখ। আর কিছুই চোখে পড়লো না। ঢুকতেই ময়না আঙুল দিয়ে হোগলার চাটাই দেখিয়ে বললো, 'ওটোয় বস।'

বসতে গিয়েই বুক কেঁপে উঠল। দেখলাম আমার দু হাত দূরেই একটি প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগার অপলক তাকিয়ে আছে। ময়না খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'ওটা মরা বাঘ। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডুটা জোড়া রয়িছি।'

ধড়ে প্রাণ এলো। এখানেও সেই চামসা গন্ধ: তার সঙ্গে তামাক। আরো নানা কিছুর গন্ধ মেশানো। লোকটি ভিতরে ঢুকে বাঘের মুণ্ডটার সামনেই বসলো। পাশে রাখলো বন্দুক। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম। বাঁশের ফ্রেমের ওপরে গোলপাতা বিছানো। গোলপাতা আসলে খড়ের মতোই লম্বা। কিন্তু খড়ের থেকেও বেশি শক্ত। এক পাশে মাটির হাঁড়িকলসী রয়েছে। পিতলের ঘটি, লোহার কলাই করা দু'একটা থালা দেখতে পেলাম।

লোকটি বললো, 'বাবা, আপনারে একটা কথা কই। আমি ফেরার মানুষ জঙ্গলপুলিস আমারে খুঁজি ফিরিতেছে। তয় মানুষ খুন করি নাই। বাঘ মেরে আমার নামে হুলিয়া হয়িছি। এখেনে এইসি পালায়ে রয়িছি। এখনও বাঘ মারি, এই বন্ধুকে।'

বলে সে বন্দুকটি তুলে দেখালো, দেখিয়ে আবার পাশে রেখে বললে, 'একটা নয়, আরো আছে, নিজের হাতেই বানাই। টোটা কিনতি লাগে। তার জন্যে লোক আছে। আপনি তোরাপ

সর্দারের নাম কখনো শুনিছেন?'

তোরাপ সর্দার? নামটা চেনা লাগলো। কোথাও শুনেছি, না খবরের কাগজে পড়েছি, ঠিক মনে করতে পারলাম না। বললাম, 'আমার খুবই শোনা মনে হচ্ছে।' লোকটি বললো, 'আমার নাম তোরাপ সর্দার। এক সময় বাউলি ছিলাম। এই সোন্দরবনে ঘুরাফিরা করতাম। আমার এক ওস্তাদ ছিল, ওনার কাছে বন্দুক বানানো শিখি, বাঘ মারতে আরম্ভ করি। আজতক অনেক মাইরেছি। কিন্তু বাবা, নিজির জন্যে না, আমার পিছনে লোক আছে। তাদের ট্যাকার কাঁড়ি আছে। তারা বাঘ মারতি পারে না, কিন্তু মরা বাঘের ব্যবসা করে। বড় মানুষ আর সাহেবসুবোদের বিক্রি করে মেলাই টাকা রোজগার করে। আমি বাঘ মারি, ওরা মারে আমারে। তারাই এখেনে আমারে লুকোয়ে রেখিছে। হপ্তায়, একদিন ওরা আমারে মিঠা পানি আর চাল ডাল দিযি যায়। বাইরে একখান লৌকা দেখিছেন?'

বললাম, 'দেখেছি।'

তোরাপ সর্দার বললো, 'ওই লৌকায় করি আমি সুযোগ মতন বাঘ মারতি যাই। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডু রেখি, আর বাঘের চার পায়ের নখ সব রাখি। হাড় মাস ফেলি দিই। কিন্তু বাবা, আপনারে বলি, এই বেআইনি কাম আর করতি পারি না, মন চায না।'

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। জীবনে কখনো এমন একটি লোকের সংস্পর্শে আসবো, এমন এক অজানা দ্বীপে, আর এই কাহিনী শুনবো ভাবিনি। জিজ্ঞেস করলাম, তবে কেন করছেন?'

তোরাপ সর্দার বললো 'কী উপায় বাবা? যারা আমাদের দিযে বাঘ মারায়, তাদের গায়ের বিস্তর তেল, জল লাগে না। পুলিশ তাদের কিছু বইলবে না। তারা আমাকে ধরায়ে দিবে। তার উপরে এই বেটি ছাওয়াল আমার, বয়সটা দেখেন। ওরে আমি কোথায় রাখব? এক এক সোমায় ভাবি যে, ওরে একটা গুলি করি মারি, তারপরে নিজির গলায় নল ঢুকয়ে গুলি খেযি মরি।'

শেষের দিকে তোরাপ সর্দারের স্বর ভারি শোনালো। আমি ময়নার দিকে তাকালাম। সে নত মুখে লম্ফর কাছে বসে আছে। খোলা দীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি তার মুখের দু-পাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। আমি তার ভুরু, নাকের ডগা, নোলক ঠোঁট চিবুক দেখতে পাচ্ছি। সে হঠাৎ তোরাপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'বাপজান, তুমি তা কোনদিন পারবে না। বন্দুক চালাতে আমি শিখিছি। একদিন আমিই নিজিরি মারি ফ্যালাবো।'

তোরাপের গোঁফদাড়িতে বিষণ্ণ হাসি, বললো, 'অই শোনেন বাবা।'

ময়না ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বাবার দিকে দীপ্ত চোখে তাকিয়ে বললো, 'এতে আবার শুনবার কী আছে? তা না হলি আমারে কও, বন্দুক নিয়ি গোসাবায় যেয়ি তোমার কত্তা বাবুদের খুন করি আসি।'

কৃষ্ণাঙ্গী ময়না কোনো মনস্তাত্ত্বিকের সৃষ্টি জটিল চরিত্রের কপালকুণ্ডলা না। আমার চোখে সামনে ভেসে উঠলো সেই রক্তস্তনী শক্তি দেবী কপালকুণ্ডলার মূর্তি। যে কাপালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় না। নিজের হাতে খড়্গ ধারণ করতে চায়। আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে দেখলাম। ময়নার চক্ষে আগুন, নাসারন্ধ্র স্ফীত। উদ্ধত বুক দ্রুত নিশ্বাসে ঢেউয়ের মতো ওঠা নামা করছে। নীলের ওপর কালো ডোরায় তোকে অন্য এক রূপদান করেছে।

তোরাপ গম্ভীর মুখে বললো, 'বাঘ মারার জন্যি যদি জেলে যেতি হয়, তা বাবুদের খুন করি যাওয়া ভাল। কিন্তু বেটি, মানুষ তো কখনো মারি নাই।'

ময়না বললো, 'আমি মারব।' বলে আমার দিকে ফিরে বলে উঠলো, 'আমি বাপজানরে বলি,

তুমি আব বাঘ মারতি যেইও না। পুলুশকে বুঝযে বললি কি তাবা শুনবি না ?'

আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না। ময়না আমাকে কথাগুলো বলে লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। লম্ফর আলো ওর গায়ে কাঁপছে। অস্বীকার করবো না, আমি এক বিশেষ আবেগেব স্রোতে ভেসে চলেছি। মনে হলো, এই পলাতক তোরাপ সর্দারের ঘবে তাব মতো করেই তার ঘবে জীবনটা কাটিযে দিই।

আমাব এই আবেগ আচ্ছন্নতাব মধ্যে বন্ধুদেব চিৎকাব শোনা গেল। তাবা আমার নাম ধবে ডাকছে। সত্য সাঁইয়ের স্ববও আমি চিনি। সেও 'বাবু বাবু' বলে চিৎকাব কবছে।

তোবাপ সচকিত হয়ে বাইবেব দিকে মাথা নিচু কবে তাকালো। বললো, 'বাবা, সত্য সাঁই আমাবে চিনে। সে যদি জানতে পারে আমি এখানে আছি, আব আমর উপায নাই। ধম্মের নাম কবি বলি যান, ওদের কিছু বলবেন না'

সেই ধর্ম যদি মানুষের ধর্ম হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বলবো না। কিন্তু এ কি ভযাবহ অবাস্তব জীবনযাত্রা ? এব হাত থেকে কি মুক্তি নেই ? আমি আবাব ময়নাব দিকে তাকালাম।

তোবাপ কী ভেবে বলে উঠলো, 'বাবা, আমাব এই বেটিও আজতক তিনটা বাঘ মারিছে। ওবে যদি একটা শাদী দিতে পাবতাম ! সে যাক বাবা, আমাব কথাটা বাখবেন।'

আমি বললাম, 'মানুষের ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, সত্য সাঁইদেব আমি আপনার কথা বলবো না। কিন্তু আপনি এ মেয়েকে নিয়ে এভাবে এখানে আব কতদিন থাকবেন ?

তোবাপ বললো, 'সেটা বাবা খোদায বলতি পারে, আব দক্ষিণ বায।'

একটা কথা সহসা মনে এলো। বললাম, 'আপনি তো মুসলমান। আপনি যশোর বা খুলনায়

একটা কথা সহসা মনে এলো। বললাম, 'আপনি তো মুসলমান। আপনি যশোর বা খুলনায়
পালিযে যান না কেন। সেটা তো ভিন্ন দেশ। এ দেশেব পুলিশ আপনাকে ধবতে পাববে না।'

ময়না ক্রূর চোখে আমাব দিকে তাকালো। তোবাপ বললো, 'সে কথা যে ভাবি নাই, তা না। কিন্তু বাবা, সে দেশেব পুলিশ কি আমাবে ছেড়ি দেবে ? আমাব কাগজ-পত্তব নাই।'

বাইবে বন্ধুদেব আর সত্য সাঁইযেব চিৎকাব ক্রমে যেন এদিকেই এগিযে আসছে। আমি বললাম, 'আপনাব কোন শাস্তি হবে বলে আমাব মনে হয না। আপনি সব সত্যি কথা বলবেন। দেখুন আপনি জানেন একটা কথা আছে, যুদ্ধে ছল বলকৌশল সবই দবকাব হয়।পাশেব দেশ ইসলামেব দেশ, মুসলমান হলে মাপ। আপনি চলে যান। এ ছাড়া আপনাব আর কোনো বাঁচার বাস্তা ছিল না। তবু যদি বলবার আপত্তি না থাকে আপনাব সেই বাঘেব ব্যবসাযী বাবুদেব নামগুলো আমাকে বলতে পাবেন।'

তোবাপ সর্দাব দ্বিধা কবলো, কন্যাব দিকে তাকালো। ময়না বলে উঠলো, 'বল, কেন বলব না। আমিই বলতিছি, একজন যোগেন দযাল, আব একজন ভূষণ চৌধুবী। তাদের ধান চাল মধুব মস্ত ব্যবসা আছে।'

তোরাপ বললো, 'বাবা আপনি ওঠেন।'

আমি হামাগুড়ি দিযে চালাব বাইবে এলাম। আমাব পিছনে ময়না আর তোরাপ সর্দার। তোরাপ নিচু স্বরে বললো, 'ও বাবু, আপনাব কথা মতন পাকিস্তানের কথাটাই আমাব মনে ধরতিছে। গেলি পবে খুলনেতেই যাবগা।'

চিৎকার ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিকে পা বাড়াতে যেতেই ময়না আমার হাত চেপে ধরলো, টেনে নিযে গেল বিপরীত দিকে, এবং রীতিমতো ছুটতে লাগলো। আমার পতনের ভয় প্রতি মুহূর্তে। বেশ খানিকটা ছোটার পরে ময়না থেমে

ফিসফিস করে বললো, 'এখেন থেকে জবাব কর। বল তুমি এখেনে।'

আমি মুহূর্তেই ময়নার মনোগত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। আমার বন্ধুরা পাছে তোরাপদের গোপন ডেরায় চলে যায়, তাদের বিপথগামী করাই ময়নার উদ্দেশ্য। আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি এখানে।'

ময়না আবার আমার হাত ধরে খানিকটা ছুটিযে নিয়ে গিয়ে বললো, 'আবার হেঁকি বল।'

আমি কয়েকবার চিৎকার করলাম। তার উত্তরে বন্ধুদের চিৎকার শোনা গেল, 'শালা বেঁচে আছিস? দাঁড়া যাচ্ছি।'

ময়না ফিক্ করে হেসে উঠলো। আমি তার হাতের দিকে তাকালাম, যে-হাত দিয়ে সে আমার হাত ধরে রেখেছিল। আমি তাকাতেই ও আমার হাতটা ছেড়ে দিল। ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখে লজ্জা ফুটলো। এই শীতেও তার কপালে চিবুকে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। অবিন্যস্ত চুলে তাকে এলোকেশীর মতো দেখাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি, আমার আবেগ মুগ্ধতা এমন কি রক্তেও সঞ্চারিত হচ্ছে। আমি আমাব নাগরিক মনটাকে কথঞ্চিৎ চিনি। কিন্তু এই দুর্জয় কপালকুণ্ডলার কাছে নিজেকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কেবল বলতে পারলাম, 'ময়না, চলি।'

ময়না কোনো জবাব দিল না, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। তাবপর নিজেই পিছন ফিবে চলতে লাগলো।

কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো। ওর হাসিটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। একটু আবেগও কি চোখের তারায সঞ্চারিত? ও আবাব ঘাড় কাত কবে বললো, 'এইস গা।'

বলেই গাছলতাগুল্মেব আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্য সাঁইকে আমি নৌকায কিছু বলি নি। মোল্লাহাটে ফিরে গিয়ে কথায় কথায জিজ্ঞেস কবেছিলাম, সে তোরাপ সর্দারকে চেনে কী না। সত্য সাঁই জবাব দিয়েছিল, 'আরে বাপ্‌রে বাঁপ! তোরাপ সর্দার তো বাবু আর এক দক্ষিণ রায়। তাবে পুলিশ খুঁজি বেড়াতিছি। বাঘেরাও খুঁজি ফিরতিছি। সে মন্তর দিয়ি বাঘেরে ঘুম পাড়াতি পারে। আর তাব এক মেযে আছে। শুনি বাপ বেটিতে এই সোন্দরবনে বাঘেব সঙ্গেই থাকে।' ..

এই ঘটনার ছ'মাস পবে, খববেব কাগজে একটি ছোট সংবাদ বেরোয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংবাদদাতা জানায়, 'বাঘের যম তোবাপ সর্দার নিখোঁজ। অনেকেরই সন্দেহ, সে শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গিয়েছে। সবকারী হিসাবে এ পর্যন্ত সে প্রায় পনেরোটি বাঘ হত্যা করেছে। .....

সংবাদটা আমাকে দ্বিধান্বিত ও বিচলিত করে। তোরাপ কি সকন্যা বাঘের পেটে গিয়েছে, অথবা সীমান্তের ওপারে পালিয়েছে। বাঘের পেটে গেলে সম্ভবতঃ কোনো না কোনো ভাবে জানা যেতো।

বাংলাদেশে বিপ্লবেব পব সেই দেশে গিয়াছিলাম। তোরাপের খুলনেয় (খুলনায়) নানা জায়গায খোঁজখবর করেছি। তোরাপ সর্দারের সন্ধান কেউ দিতে পারি নি। অতএব ময়নারও না।

ময়না না, আমার কাছে সে কপালকুণ্ডলা। নবকুমারের দুর্জয় মোহ আর স্তব্ধ হৃদয়ের কথা শোনবাব দুর্মর আকাঙক্ষা কোনটাই আমার নেই।

সেই দিক থেকে আমার ট্র্যাজেডির রূপটা আলাদা।



পাড়ি

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময়ে পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এল হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট অশ্বত্থ পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকেছে হঠাৎ। তারপর লাটিমটির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস্ করে! বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্র স্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তর্তর্ করে।

দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই দুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে দেখছিল। সেই সময়ে জানোয়ারগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত তেমন নেই। বাইরে থেকে মা হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধু-ধু করছে ইট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ এসেছে, ইঁট পোড়াবার মরশুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা।

জেলেনৌকারও তেমন ভিড় হয়নি এখনো। তার মাঝে এ দুজন বসেছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বনঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাঁট করে কাপড় পরা। গোঁফজোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো নরম বোঁয়াটে ভাব যায়নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আভাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে, শরীর মানেনি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের মতো পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে। হাহা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে দুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল।

এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটীর' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই।

গাঁয়ের মানুষ ননকু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দার। দু'মাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় দুটিতে ছিল গাঁয়ে। ননকু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল্। মাস গেলে দুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপ্‌রে বাপ। ষাট টাকা। সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছমাস। একলা মানুষ নয়, যে মনের রাশ নেই, শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরের দুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে-কোন অভিযানে নামতে পারে। নাগিন প্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল দুটিতে ননকুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা! দুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে মাসে। দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে দুটিতে। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। ননকুকে বলল, কেন কাজ নেই?

ননকু বলল, ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল।

ওরা বলল, তবে কি হবে?

কি হবে! ননকু বোধহয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম। আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গীদ্ধরের বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল ননকুর কান্নায়, রোহ, রোহ, তু তু তু, রহো সর্দার, ন রো। তুমি ভালো মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

একা দুটিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ কবে গেছিল। লোকটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে।

সাতদিন কোনোবকমে খাইয়েছিল কেউ কেউ দুটিকে। পবশু বাতে শেষবাব খাওয়া পাওয়া গেছে। আব নয়।

গতকাল সাবাদিন কেটেছে এখানে। আজো এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। শহবের মধ্যে থাকা যায় না। পুবেব উঁচু পাড়েব খানিকটা গেলেই ধাঙড বস্তি। সেখানেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ-বেবিয়ে পড়া কুকুবেব মতো হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনেব হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। আব গায়ে গা বেখে দুটিতে জীইয়ে বাখছিল বক্তপ্রবাহ। গায়ে গা দিয়ে যেন বক্তে বক্তে সাহস সঞ্চয় কবছিল। গা শুঁকে, চটকে,'বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে বাখছিল সবিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে ওদেব একেবাবে শেষ কবে দিতে চাইছিল। যেন ওদেব ভয় ধবিয়ে দেওযাব জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল। জল আবো লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণেব বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল। ভেজা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদেব চাবপাশ ঘিবে, বটতলায় পিঁপড়েবা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোযাবেব শুরুতে। একটা পুবো জোযাবেব উজান গেছে। তাবপরে নেমেছে দীর্ঘ সময় ধবে ভাঁটাব ঢল। আবাব লেগেছে জোযার।

এমন সময়ে এল সেই জানোয়াবগুলি পুবেব উঁচু থেকে। মেঘেব বুকে আব এক পোঁচ কালিমাব মতো নেমে'এল কালো কুঁত্‌কুঁতে চোখো, ছুঁচলো মুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল।

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুযোবেব দল একবাব থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে তাবপব আবাব ঘোঁৎঘোঁৎ কবে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পেছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনাব মার্কড়ি কানে। দুটি সামনেব দাঁত পুবো সোনাব। শুযোবগুলি কিনেছে এ অঞ্চলেব যাবৎ ধাঙড-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপাবে। সঙ্গে আব একটি লোক। সামনেব বস্তিব ময়লা টানা গাড়ির গাড়োযান।

এই দুটিকে দেখে সোনাব মাকড়িকে বলল, মহাশযজী, এ দুটোকে দিয়ে আপনাব কাজ হতে পাবে ?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এল। দেখল দুটিকে একবাব। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োযান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদের চেনে। বেকাব বসে আছে। রাজী হয়ে যেতে পাবে।

সোনাব মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আবো খানিকক্ষণ। আর শুযোরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়েব শাঁসেব সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবাব হু দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সবে যাবে কিনা ভাবছে।

তারপব বলল সোনাব মাকড়ি, কাজ করবি ?

কাজ। কাজ মানে খাওয়া। ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হল, পুরুষটি বলল, কি কাজ ?

সোনাব মাকড়ি বলল, শুয়োবগুলি নিযে যেতে হবে দরিয়ার ওপাবে।

আবে বাপ্। ভরা দরিযা, আরো বাড়ছে। ফুলছে, আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে! ওবা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে। দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই শুযোরগুলিব পাশে পাশে। ওটিই নিযম। কিন্তু সোনাব মাকড়ি সেদিকে ঢু-ঢু। নৌকাব পযসা খরচ কবতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিবে তাকাল দবিযার জলে। তাবপব শুযোবগুলিব দিকে। কালো কিম্ভূত দলা দলা ছডানো। মাদীই বেশি। চোখগুলি ট্যাবা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য আছে ঠিক মানুষের দিকে।

ওবা পবস্পব চোখাচোখি কবল আবাব। আব সেই মুহূর্তেই মনে মনে রাজী হযে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদেব নটবক্ত উঠল তোলপাড কবে। আঁকুপাঁকু কবে উঠল অভুক্ত পেটেব মধ্যে। পডে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপডে কযুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেযেমানুষ। বলল, কিন্তু বিনা লাও, পানব তো?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনাব মাকডি বলল, উই যে ওপাবে উত্তবে দেখা যায শিউমন্দিব, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোযাবেব জন্য উনত্রিশ আনা দুজনেব মজুবি। আব উপবি পাওয়া যাবে কিছু কেড়ুয়া তেল, দবিয়াব থেকে উঠে গাযে মাখাব জন্যে। একটি খোযা গেলে ছমাস হাজত।

বলে তাব হাতেব লম্বা লাঠি বাডিযে দিল পুরুষটিব দিকে। মেযেটি পাতা ছাডিযে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনাব মাকডি আব গাডোযান, দুজনেই চোখাচোখি কবল হতবাক হযে। বাজী হযে গেল দুটোতেই? শেষে জানোযাবগুলি মেবে দুটোতে মববে না তো। কিন্তু ওদেব দুজনকে শুযোবগুলিকে ঘিরে দাঁডাবাব ভঙ্গি দেখে সে তবব হযে গেল।

ওবা দুজনে দাঁডিযে গেল দুদিকে। মেযেটি তাব সরু মিষ্টি গলায টান দিল একটানা, উ-ব্ ব্-ব-ব্-ব্-আ

আব পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায, আ হুঃ! আ হুঃ! যেন মেয়েটির টানা সুবে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদেব ক্ষুধিত পেটেব ভেতব থেকে। কেমন ক্লান্ত আব গম্ভীব সেই সুব। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানেব মাযা ছডিযে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলেব তবঙ্গে তবঙ্গে লাগল সেই সুব। বাতাসে বাতাসে সে সুব লাগল গিযে মেঘে মেঘে।

জানোযাবগুলি ঘোৎঘোৎ কবে উঠল সোহাগী সংশযেব সুবে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাডেব ফাঁক দিযে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকেব ভাব। চক্‌চক্ কবে উঠল কুঁতকুঁতে গোল চোখগুলি। ঘেষাঘেঁসি কবে এল সবাই গাযে। গাযে গাযে সবাই ঠিক জডো হতে লাগল ওদেব মাঝখানে।

উ ব্-ব্-ব্-ব-আ-উ-ব্-ব্-ব-আ

আ হুঃ! আ হুঃ!

সোনাব মাকডিব সোনাব দাঁত উঠল চক্‌চকিযে। গাডোযানটা ঠিক জানোযাবগুলির মতো গোল গোল চোখে তাবিফ কবতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োবেব আদত বাপ-মা দুটি।

আব ওদেব উপোসে মবণেব ভযটা যেন হারিযে গেল ওই সুবেব মধ্যে। অভব পেটেব

ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে, সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে তাগ্ বাগ। চেনে না শুধু দরিয়াটাকে। লাল দরিয়া চলেছে খরবেগে তর্‌তর্ করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, একজায়গায় থুকথুকিয়ে উঠেছে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

তারা যত জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এল কাছাকাছি। মেয়েটি আড়চোখে ফিরে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল নাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া। ·

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পেছন-টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে!

পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে খালি, হাঁ. বহুৎ বড়!

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত? পুরা রুপয়ার বেশি না কম?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ। সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রুপয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধার একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন। কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবারী। জানোয়ারের তখ্‌লিফ পরোয়া করে না।

ওরা ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে শুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী। হ্যাঁ, কিন্তু একটা গাভিন যে! গাভিন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনটা পাঁচটা দেয়, কোনোটা ছটা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পারে তো!

পারে। নয়া গাভিন। এখনো হালকা আছে।

ডাকের সুরটা কিছু রকমফেরে। তাড়া দেওয়ার সুর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ হাঁ।

হাঁ বাবা! এতবড় দরিয়া, যুঝবে কি করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে, তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ণ বিলম্বিত হাঁক দিল, হা-ই—ই—হা· ·

মেয়েটা টান দিল, উ-র্‌-র্‌-র—আ,—উ-র্‌-র্‌-আ

জানোয়ারগুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের সুরে। গোল গোল

ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাঠি আর ছপটি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ভাবখানা এ সবের মানে কি? গায়ে গায়ে ঘষাব খসখস শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মতো।

তাবপর লাঠি-ছপটিব নিশানা আর হাঁকেব ইশাবায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিবল নদীর দিকে। পবমুহূর্তেই কোনো খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতেব লাঠি আল্‌তোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেযে, মাটিতে অদ্ভুত শব্দ কবে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনেব লাঠি-ছপটি হাতেব ঘেবাওযে ঊনত্রিশটি জানোয়ার। বড জাতেব জানোযাব।

ততক্ষণে আযাঢের জোয়াবেব গঙ্গা এগিযে এসেছে কল্‌কল্ কবে। বাড়ছে আবো বাড়বে।

কালো-কালো খোঁচা-খোঁচা লোমওযালা পিঠেব ঢেউ থমকে থমকে পডছে। শুযোব জল চায়। টানেব দরিযায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদেব টানা ঘোলা স্রোতেব শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস কবছে, কি হবে? কোথায যেতে হবে?

পুরুষটি বুঢ় হাঁকেব ফাঁকে ফাঁকে তোযাজেব সুব দিচ্ছে, আহু আহু আহু, উতাবো, উতাবো। তোদেব দরিয়া পাব কবি তাবপব। হেই হা হা

উ-র্‌-ব্‌-ব্‌—আ উ ব-ব্‌-ব-আ

মেযেটি কেবল দেখছে, দবিযা বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ততই ফুলছে, স্রোতেব টান বেঁকে বেঁকে হিলহিল্ কবে যাচ্ছে। দেখছে আব ফিবছে পুরুষেব দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলেব কিনাবায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোযাবেবা। এ ওকে গুঁতিযে ঠেলে এগিযে দিযে পেছিযে আসছে নিজে। এমনি কবে অনিচ্ছায় এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটি জানোযাব তীব্র চিৎকাব কবে ছুটে বেবিয়ে গেল। সেই গাভিন শুযোরীটি। আকাশ ফাটিযে চেঁচিযে ছুটেছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ কবে বলছে, যাব না, কখ্‌খনো যাব না।

যাবে না। ভয পেযেছে। হাবামজাদীব পেটে বাচ্চা আছে কিনা।

কিন্তু মেযেটি হুতাশে পেছন তাড়া কবতে গিযে, জলেব ধাবেব কাদায় হুমড়ি খেযে আবাব উঠে ছুটতে যাবে পুরুষটি হাঁক দিল, ছুট্ মত্।

কাদা মেখে প্রায় খালি গাযে দাঁড়িযে গেল মেযেটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেপে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুযোবেব দলেব সঙ্গে। পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিযে আগে বাডতে হবে।

জলে নামাল না শুযোবেব দলকে। ডাঙাব উপব দিযে চলল নরম সুব ছাড়তে ছাড়তে। উবরব-আ, উববব-আ, আ-হুই আ-হুই।

শুযোরীটা অনেক দূব গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায়, তাবস্বরে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে আবাব মুখ নামিযে কি সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।

এরা দুটিতে জলেব ধাব দিয়ে দলটাকে নিযে চলেছে এগিযে। শুযোরীটা দেখছে, খাচ্ছে আব চেঁচাচ্ছে। তাবপবে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতেই পিল্‌পিল্ কবে ছুটে এল দলেব মধ্যে। চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ কবে আডচোখে তাকিযে চেঁচাতে লাগল জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে! শয়তান মানুষ!

মেয়েমানুষ আব পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবাব। সময় হয়েছে। এইবাব, এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবাব সবে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিযে যাচ্ছে

অনেকখানি।

শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তাব সব কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হঁ হঁ! কোনো ডর নাই। হঁ হঁ। আ-হুই! বলতে বলতে সে আবার গঙ্গাব দিকে তাকাল। গঙ্গা 'গঙ্গামায়ী যেন খিলখিল করে হাসছে, কল্‌কল্‌ কবে কি সব বলছে। আর যেন ঠিক চেয়ে আছে ওদেব দিকে। কি যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস ? আসবি ? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হযেছি। এই বলছে আব হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আব মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপাব অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই যেন দবিযার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কি বহস্য আছে সেখানে। কি ভয় আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মবণের।

এইবাব বোঝা যাচ্ছে, ওবা দুটি যেন শিশুর মতো সবল। শিশুর মতো নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁচল আঁটছে কোমবে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয গিবিশৃঙ্গের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক।

পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রোঁয়াটে গোঁফ আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পাব হতে দাও। সোনাব মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পাব করাচ্ছে বিনা নৌকায। উনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ! দুটো মানুষ! হাই বাপ্‌! জানোয়ারগুলোব কোনো দোষ নেই। হেই মায়ী! দুদিন ধবে দেখছ, আমাদেবও কোনো দোষ নেই।

ওরা বলছে আব দরিযা যেন যোগেড়ী নাচওযালীব মতো কলকল্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌ করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওবা কেবলি সবে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষদুটোর দিকে। কান পাতছে বাতাসে আব জলে। বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে ঘোঁৎঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবাব। এইবাব। পুরুষটি জানোযাব পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হযে যা।

দাঁড়িযে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেরাতে হল জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবাব জলে পডলেই স্রোতেব টান। তখন আর কিছু ভাববাব অবসব থাকবে না।

শেষবার দুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটিব সীমানায়। জানোযাবগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাডছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল একটি তীব্র চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহু এসে পড়তে লাগল জানোযাবগুলিব গায়ে।

পর মুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দবিয়া খানিকটা টেনে নিযে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পেছনে রেখে, জানোযাবগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এরকম উত্তর দিকে গেলে,এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হত না।

পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ, জলদি।

তখনো বুকজল। দুজনে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কিসব বলাবলি করছে। গাভিন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির সামনে। উনত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার জানোয়ারের মতো ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে, গঙ্গার ওপারের দিকে মেয়েটি পেছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা-ই! হা-ই! পেছন থেকে মেয়েটি হুমহুম্ শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবিনে।

শুয়োরগুলি তখনো ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎঘোঁৎ করছে। এখনো বোধ হয় পেছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই এগিয়ে যেতে চাইবে এখন ভয়ে ও শঙ্কায় ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অ্যাঁ? মরতে হবে? কি চায় এরা।

ওপারে নিয়ে যেতে চায়!

পুরুষটি কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পেছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরো উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল, ঠেলে থাক। জোরে ঠেলে থাক্। খবরদার ইধারে আসিসনে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। কিন্তু তীব্র স্রোতে হাত-পা গুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী আর দুটোর জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে পড়ছে সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ারগুলি মরত নির্ঘাত।

পুবের হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে, সেইটাই ভয়ের। মেঘগুলি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হুহু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন কি এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গভীর কালিমায়। ভাবভঙ্গি ভালো নয়। মেঘ তাতে আরো জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুটিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে

মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনো সেটুকু ভাববার, অনুভব করার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে হা—হা—! মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক-একটা জানোয়ার। আর ওরা দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে। কে তোকে কি করেছে। ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়।

ভাবতেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা ওদের দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে কিছু নেই। কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মতো লাফিয়ে উঠল জলে। কি হল?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁপোঁ করে পালাচ্ছে উত্তর পুবে! যাবে না, কিছুতেই যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি।

পুরুষটি একমুহূর্ত আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পেছন ধাওয়া করল। পাছাপাছি গিয়ে, মুখোমুখি হল। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস্ করে। ছুঁচলো মুখ আবার ফিরাল। সেই গাভিনটা। আর দুটো উঠতি বয়সের। সময় হয়েছে গাভিন হওয়ার। এখনো মানুষ চিনতে শেখেনি, বিশ্বাস আসেনি মনে।

পুরুষটার রাগ হল, আবার মায়াও হল। খালি বলল, জানোয়ার। একদম জানোয়ার। হাই-হাই।

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে। লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জানোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি।

পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মতো। বলছে, আমি আছি না, হ্যাঁ? হারামজাদী।

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখই শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে। ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরো বাড়ছে। ফুলছে। এক-একটা জায়গার জল যেন নিচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক-এক জায়গায়। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। ঢালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।

শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাসফ্যাস করছে জলের মধ্যে। গোঁগোঁ করে কিসব বলাবলি করছে। জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছপটি। তবু ওরই মধ্যে যত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে।

আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনো মাঝামাঝিও আসা যায়নি। জলের ধাক্কার ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে মাথায় শিরাগুলি টানটান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের গা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।

জল হাসছে কলকল্ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা

করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আব বলছে, এসেছিস ? আয়, আরো আয়।

বলছে আব সমুদ্র উজাড করে খল্‌খল্‌ করে আসছে।

হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মাযী ! মায়ী দবিযা, যেতে হবে। অনেক লাঠি আব ঘা পড়ছে তোব গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোব কত সহ্য মাযী। আমাদের কোন দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয।

মেয়েটাব মুখেব দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারেব দরিযা কেবলই বাডছে আব ওব চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না। দূবে সবে যাচ্ছে কেবলই। হাতেব আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।

পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস কবতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পাবছে না। যদি বলে, নাই সক্‌তি ! আব পারছিনে। বিদায দাও। বাবুসাহাব নাগিন প্রসাদ ওদেব বিযেতে দুটো শুয়োব মেবেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিযেছিল চাব জালা তাডি।

আকাশ আরো নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথাব উপব এসে হাবিয়ে গেল। পবমুহূর্তেই কড়কড় ব্যুম কবে শব্দ হল।

অমনি জানোযারগুলি মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল।

আঁা আঁা শব্দে চেঁচিযে উঠল কযেকটা।

মেয়েটাও লাফ দিল মস্তবড কাতলা মাছেব মতো। ছপটি উঠেছে আবাব হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খববদাব ! কিছু ডব নেই, চল্‌। যত জল্‌দি পাবিস চল্‌।

যা দু-একটা জেলেনৌকা ছিল আশেপাশে, তাবা সব পাব ঘেঁষছে।

যত পশ্চিম, ততই স্রোত। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির কোথায ? শিউমন্দিব ? ওই, ওই যে। অনেক দূবে। এখনো অর্ধেক। ওই বাঁকেব মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিযে উঠেছে।

ওবা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুযোবগুলিব কাছ থেকে। শুযোরগুলি চাক বাঁধা। সেজন্যে ওদেব গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওবা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মতো।

জানোয়াবগুলিব বিশ্বাস ফিবে এসেছে মানুষদুটোব উপব। ওদেব সবে যেতে দেখে ভয পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্ববে ডাকছে বাববাব।

আব ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পাবছে না। ওবা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আব হাঁটুতে টান পডেছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেযেটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল। বলল, আচ্ছা, আমবা ফিবে আসব কি কবে ? খেয়া পাবেব পযসা দেবে তো ?

মেযেটা মেয়েমানুষ। ও এখন ফিরে আসার ভাবনায পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানিনে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মতো বেখাহীন অথচ ভযংকব বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয।

এক লহমায মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবাব ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি ?

এই যে !

না, ডোবেনি। পুরুষটি গোঁফেব ফাঁকে হাসবার চেষ্টা কবল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেযেটাকে হারাবার ভয় হযেছে। বলল, কি তখলিফ হচ্ছে ?

তখলিফ ! এ আবার জিজ্ঞেস কবতে হয। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাডল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্‌ করে উঠল। একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে, জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ারগুলিও।

মেয়েটা কি যেন টেনে টেনে তুলছে। কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের আস্‌কে পিটের মতো ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বারবার, আর এই ঘোলা জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ওদের বিয়েতে কী বাঁশিটাই বাজিয়েছিল বানুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী দরিয়ায় —

চিক্‌চিক্‌ দুম! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

পুরুষটি ঢোকে ঢোকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস?

হাঁ। আছি।

তারপর আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে, উনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে গেছে, না? হাঁ।

গঙ্গা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, দুলে দুলে যেন হেসে উঠেছে ওদের কথায়। আবার, আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায়?

পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাঁটা পড়ে গেল নাকি। সর্বনাশ! মন্দিরের কাছাকাছি এসে আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে! একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের হাতে উনত্রিশটা জানোয়ার।

পরমুহূর্তে সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণি। ঘূর্ণি।

জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত পেল। ওরা পুরুষটির দিকেই এগুতে লাগল।

পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই।

উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ! হেই মায়ী। আবার জোর ফিরে এল দুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার। খবরদার!

সে ঘূর্ণির কাছাকাছি চলে গেল জানোয়ারগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হল, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল। কাপড়। দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।

পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মুড় করে উত্তরে ছোটে।

কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী। সেই গাভিন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন

উপায়।

শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওইরকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু উপায়।

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এস। ওকে মরতে দাও।

মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।

বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এল খাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এল শেষপর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।

হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরল শুয়োরীটার মুখের কাছে. নে, পারিস তো ধর কামড়ে।

কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নিচের পাটির একটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠেছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভালো করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।

পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিচ্ছে [illegible] তারপর হঠাৎ লাঠিটা গেল ফসকে। দেখা গেল শুয়োরীটা। পুরুষটির মাথার কাছে [illegible] ছুটছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে, অনেকদূর দাঁড়াবার উপায় নেই জোয়ারের ধাক্কায়।

শুয়োরীটা আরো জোরে চেঁচাচ্ছে তখন। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।

আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে. চুপ্, চুপ্, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে. ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।

দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, কী হ—ল?

পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।

বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘনঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।

মন্দিরটার সামনেই নিচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা শুয়োরগুলো নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটা ভেসে গেল সেইদিকে।

কাছে এসে দেখল মেয়েটা বারবার ডুবছে' আর শুয়োরগুলি ভেসে যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি. এখানে এই জায়গায় তুলতে হবে।

কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে যে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।

মেয়েটার তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে-উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও নিদারুণ ক্লান্তি। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া! আমি জানোয়ারগুলোকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও। বলল, দরিয়ায় দিল্লেগী।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এল জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এল সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাটার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে। দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে হাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করছে আশেপাশে।

পরশু রাতের পর এই আবার খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল এসে পড়ছে। ছোট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা-ঢাকতে পারেনি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ন রো। কাঁদিস্ নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরঙ্গুদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

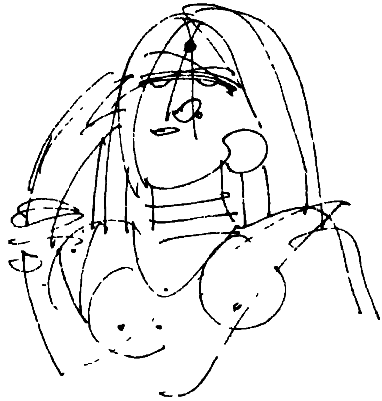
শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারও অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুন্‌গুন করতে লাগল:

যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবন-সুত মহাবীর—হই রামো।

তার তার বাসা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।





দুলে বাড়ির ভাত

সমস্ত বাড়িব মধ্যে একটা থম্‌থমে ভাব।

বাডির কর্তা এবং গিন্নি. পবস্পব প্রায মুখোমুখি হয়ে বসে আছেন। বড মেয়ে, প্রায় বছর ত্রিশ বয়স হবে, বাপেব বাডিতেই বাবো মাস থাকে। বিধবা নয, বিযে হযেছিল চৌদ্দ পনর বছব বয়সে, স্বামী তাকে নিযে ঘব করে নি। তাব নাম নির্মলা, সবাই নিমি বলে ডাকে।

নিমি, সেই ঘবেই, দবজাব কাছে বসে বয়েছে। গালে হাত দিযে এমনভাবে বাইবের দিকে তাকিয়ে বয়েছে, যেন এইমাত্র কোন ভযংকব দুর্ঘটনাব খবব শুনে, ভযে বিস্ময়ে ব্যথায় একেবারে পাথবেব মত হযে গিয়েছে।

সেই ঘরেরই দবজার কাছ থেকে দেখা যায়, খোলা উঠোনেব ওপারে, ঘবেব সামনে যে খডেব চালে ঢাকা জায়গা বযেছে, সেটাই রান্নাঘর। সেখানে কাঠেব উনুনে, আগুন জ্বলছে। আগুনেব থেকে ধোঁয়াই বেশী। এ সময়ে শুকনো কাঠকুটোর বড় অভাব। ভাদ্র মাস, সবই ভেজা ভেজা, স্যাতা স্যাতা। তাই কাঠের জ্বালে ধোঁযা বেশী।

সেখানে উনুনেব ওপরে একটা বড় হাঁড়ি। হাঁডিব মুখ খোলা, তা থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে না। কারণ, অমি, যার পুরো নাম অমলা, যার বয়স বছব আঠাবোব বেশী না,এখনো আইবুড়ো, ও এইমাত্র একটা আড়াই কে, জি ওজনের ডিঙ্‌লে টুকবো টুকরো কবে হাঁডিতে দিয়েছে। হাঁড়িতে জল আছে, ডিঙ্‌লে সেদ্ধ হবে। কুমড়োকেই বর্ধমানের লোকেরা ডিঙ্‌লে বলে।

অমি বসে আছে, হাঁটুব ওপরে হাত বেখে, হাতের ওপবে গাল চেপে, উঠোনের মাঝখানে তাকিয়ে আছে। ওর বড বড কালো চোখ দুটিব চাহনিও প্রায় সেইরকম। যেন দুঃখে ব্যথায় হতাশায় কথা বলতে ভুলে গিযেছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন খুব শোক পেয়েছে। ওব খোলা চুলগুলো কাঁধের এক পাশ দিযে, পিঠে ছডানো। উঠোনের মাঝখান থেকে দৃষ্টি তুলতে গেলে, পাছে কারুব সঙ্গে চোখাচোখি হয়, এটাও যেন ওর একটা ভয়!

নিমি অমি, দুই বোন। দু'জনে দেখতে প্রায় একবকমই। তবে অমিব এখনো বয়স কম, রঙটাও একটু বেশী ফরসা। তা-ই ওকে দেখলে, প্রায় সুন্দরী বলতে ইচ্ছা করে। ওর বয়সে হয়তো নিমিও এরকমই ছিল। নিমির চোখ দুটি, এমনিতে দেখে মনে হয়. ওব চাহনি বোধহয়

ছোট বোনের থেকেও সুন্দর। কেন না, নিমির চোখ কেবল বড় আর কালো নয়। টানা টানাও।

কর্তার বিড়িটা অনেকক্ষণ নিভে গিয়েছে। সেটা উনি দুই আঙুলের ফাঁকে ধরে আছেন। পরনে একখানি খেটো ময়লা ধুতি, আদুড় গায়ে পৈতাটি এলিয়ে রয়েছে। আর চক্রবর্তী গৃহিণী লাল পাড় খাটো শাড়ি জড়িয়ে আছেন। চোখে মোটা কাচের চশমা। তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে নেই, মাটির দেওয়ালের দিকে যেন দিশেহারা ভয়ে চেয়ে আছেন। চক্রবর্তী মশায়ের চোখের ভাব অনেকটা ভাবলেশহীন।

কদিন ধরে অনবরতই প্রায় বৃষ্টি হয়েছে। আজ রোদটা খুবই চড়া। কথায় বলে ভাদ্রের রোদ আর আশ্বিনের ওষ, বড় খারাপ। উঠোনের ওপর, পিছনের বাঁশঝাড়ের খানিকটা ছায়া পড়েছে খিড়কির কাছ ঘেঁষে। রান্নাঘরের চালের ওপর দিয়ে, উঠোনের প্রায় মাঝখানে একটা তাল গাছের ছায়া এসে পড়েছে।

পিছনে, বাঁশঝাড়ের পাশেই পুকুর। দেখা যায় না, কিন্তু খুব কাছে বলে, জলে কাপড় কাচার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাঁশঝাড় কিংবা, কাছাকাছি কোথাও একটা ঘুঘু, টানা সুরে ডেকেই চলেছে। ডাকটা এমনিই, শুনলেই মনে হয়, কেউ যেন ডেকে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করছে। আবার এর মধ্যেই, চালের উপর, কাক খড় নিয়ে টানাটানি করছে, তাও শোনা যায়।

এ সময়েই, যে-ঘরে কর্তা গিন্নি ও মেয়ে বসে আছে, তার পাশের ঘর থেকে একটি শিশুর অর্ধস্ফুট কান্না একবার শোনা যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায়।

সেই শব্দেই যেন কর্তার চোখের পলক পড়ে। নিভে যাওয়া বিড়িটাকে আঙুলের টোকা দিলেন ছাই ঝাড়বার জন্যে। এর আগেও অনেকবারই দিয়েছেন, ওতে আর ছাই নেই। তিনি নিমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,'কথাটা সব্বাইয়ের আগে কে বললে?'

নিমি মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল, 'মিশ্রগিন্নি।'

'সে বুড়িকে কে বললে?'

'তা কিছু বলে নি।'

কর্তা এবার গিন্নির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?'

গিন্নিও মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'মুখুজ্জে মাস্টারের বউয়ের কাছ থেকে।'

চক্রবর্তী তাঁর দাঁতহীন মাড়ি চাপলেন। আরো গভীর দুশ্চিন্তায় চোখ দুটো একবার বড় করলেন, আর একবার ছোট করলেন। কপালের রেখাগুলো, এঁকেবেঁকে স্থির হয়ে রইল। যেন অনেকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে রইলেন, তারপরে হঠাৎ নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, 'তা হলে গোটা গাঁয়েই জানাজানি হয়ে গেছে?'

সেকথার জবাব কেউ দিল না। চক্রবর্তী উঠে, রান্নাঘরের উনোনের কাছে গেলেন। জ্বলন্ত কাঠ তুলে কোনরকমে পোড়া বিড়িটা ধরিয়ে, ফিরে এলেন আবার। আসতে গিয়ে, পাশের ঘরের দিকে তাকালেন একবার। সেখান থেকেই শিশুর কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল। ঘরটার দরজা খোলা। বিছানা তক্তপোশ দেখা যায়। আর কিছু না। তিনি আবার ঘরে এসে ঢুকলেন, বিড়ি টানলেন কয়েকবার। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমি শুনেছে কার কাছ থেকে?'

নিমি জবাব দিল, 'ও বাড়ির রেণুর কাছ থেকে।'

রেণু, চক্রবর্তীমশায়ের ছোট ভাইয়ের মেয়ে। পাশাপাশি বাড়ি। চক্রবর্তী বললেন, 'হুম্ ঘরের শত্তুর বিভীষণ, ওরা তো আরো বেশী করে বলবে, গোটা গাঁয়ে রটাবে।'

গিন্নি বললেন, 'বাকী রেখেছে নাকি।'

চক্রবর্তী দেখলেন, বিড়ির ঘুনসিসুদ্ধ পুড়ে গিয়েছে, নিভেও গিয়েছে। সেটাকে দুই আঙুলে

টিপতে টিপতে, তিনি আবার বললেন, 'না—মানে, আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, কথাটা দশ কান হল কী করে। ঘটনা যখন চুপি সাড়েই ঘটেছে, তখন জানাজানিটা হল কেমন করে।'

নিমি বলল, 'তুমি যেন একতরো, এমন কথা বল! কথাটা কে ফাঁস করেছে, তা আবাব কেউ বলে নাকি।'

কর্তা বললেন, 'তা'লে গোববা হারামজাদা, নয় তো ওব মাগীটাই ফাঁস কবেছে।'

গিন্নি মোটা কাচেব ভিতর থেকে চোখ পাকিয়ে, প্রায় ফুঁসে উঠলেন, 'বাজে কথা কয়ো না। মিছিমিছি ওদেব গালিগালাজ কবা কেন। ওদের কি দায় কেঁদে গেছে, পাড়াব লোককে ডেকে বলবার।'

'কিন্তু ঘটনাটা তো ওদেব বাড়িতেই ঘটেছে, না কী?'

'ঘটলেই বা। ওবা নিজেবা লুকিযে লুকিয়ে কাজ কববে, আবাব নিজেরাই কখনো ফাঁস করে?'

'তা করতে পাবে। ভাবল হয় তো, একবার কালী চক্কোত্তিব পিছনে কাঠি দেওযা যাক।'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু।'

গিন্নি আবাব ফুঁসে উঠলেন। বললেন, 'গোবরাব বউ মন্দোদরীকে আমাব ভালই জানা আছে। ও কখনো অমন কাজ কববে না।'

নিমি সায় দিযে বলল, আমারও তাই বিশ্বাস। ও যা মেযে, তাতে ওব মুখ থেকে কেউ কথা বেব কবতে পারবে না।'

চক্রবর্তী মুখখানি বিকৃত কবে বললেন, 'হ্যাঁ, সে সব আমাব জানা আছে। মাগী মদ গিলে যে কাণ্ড কবে—।'

গিন্নি আবাব মুখ থাবাডি দিলেন। বললেন, 'তা সে তাব নিজেব ঘরে। ভাতাবেব সঙ্গে বসে যা খুশি তা-ই করুক, কাকব ভিটেব পাড়ায গিযে, অন্যেব সঙ্গে ব্যালা কবে নি তো।'

'হয় তো, সেই মুখেই কথা বেবিয়ে গেছে, কেউ শুনতে পেযেছে।'

এবার গিন্নি নিমিকে সাক্ষী মানেন। বললেন 'শুনছিস তো, তোব বাপেব হাড়জ্বালানে কথা শুনেছিস? এখন ওই ছুঁড়িটাব সব দোষ হল। তবু একবার বলবে না, এমন কেলেঙ্কারি হল কেন। কেন, এখন গিযে সেই পটেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করতে পাব না, সে অমন কাজ কবলে কী কবে?'

কর্তা বললেন, 'পটেশ্ববী না বাক্‌কুসি। অত বড মন্বন্তব গেল যুদ্ধেব সময়, তখনো তো এ বাডিতে এমন ঘটনা ঘটেনি।'

নিমি বলল, 'আহা, তখন কি তোমাব এমন চাব টাকা সেব চাল হযেছিল?'

'তা না হোক, তবু সেবাবে কলকাতায হাজার হাজার লোক মরেছিল। আমাদের বর্ধমান জেলায় কিছু হযনি বটে, কিন্তু এবাব আব কটা লোকের মরাব খবর শোনা যাচ্ছে। সেবারের মতন কিছুই না, তবু আমাব বাড়িতে, কালী চক্কোত্তিব বাড়িতে, এমন কেলেঙ্কারি! বংশে এত বড কলঙ্ক?'

বলতে বলতেই কর্তা হঠাৎ রুদ্র হয়ে উঠলেন। দু পাক ঘুবে, প্রায় চিৎকাব করে বললেন, 'বাক্‌কুসিকে আজ কেটে দুখান করব আমি।'

বলে, দরজার দিকে এগোতেই, নিমি বাবাব হাত চেপে ধবল। বলল, 'এখন কিছু কবতে যেও না।'

'না, আমাকে ছেড়ে দে, একবাব হা মুখ আমি চিরে দেখি, কত বড় সেটা।'

নিমি আরো জোরে চেপে ধরে বলল, 'না, এখন তুমি কিছুই বলবে না। বেন্দা আসুক, তারপরে যা বলার বলো। যার জিনিস সে-ই তার ব্যবস্থা করবে।'

চক্রবর্তী থেমে যান। কথাটা ভাববার মত মনে হল তাঁর। হ্যাঁ, বৃন্দাবন আসুক, তারপরেই কথাটা তোলা যাবে। ইতিমধ্যে বাড়ির পিছন থেকে, ছাগলের ডাক শুনে, নিমি চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'যাই সোনা, যাচ্ছি।'

নিমি উঠতে উঠতে আবার বাবাকে বলে, 'মাথা গরম করো না। সত্যি মিথ্যে বলেও একটা কথা আছে তো। আগে আসল লোকের কাছ থেকে সব শোনা যাক, তারপরে যা করবার করা যাবে। মা কী বল ?'

গিন্নি বলেন, 'তা অবিশ্যি ঠিক । তবে, যা রটে, তা বটে। একটা কিছু কেলেঙ্কারি নিশ্চয়ই কারুর চোখে পড়েছে বা প্রমাণ পেয়েছে। তা না হলে কি আর সাহস করে বলতে পারে ?'

গিন্নি নিমির দিকে তাকালেন। নিমিও মায়ের দিকে তাকাল। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখে চেয়ে রইল। তারপরে নিমি ভুরু কুঁচকে, অনেকটা যেন আপন মনেই বলল, 'কিন্তু, আমি বলি, যদি ঘটেই থাকে কিছু, জানাজানি হল কেমন করে ?'

বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়। বাপের সংসারে তার নিজের আয় বলতে ছাগল। গোটাকয়েক ছাগল আছে, বাচ্চা বিক্রি করে কিছু হয়। শহরের মাংসওয়ালাদের লোকেরা এসে চড়া দামেই কিনে নিয়ে যায়। গোবরা দুলে পাঁঠাকে খাসী করতে জানে, করেও দেয়। খাসীর দামই বেশী।

তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেখে, অমিও পিছু পিছু যায়। খিড়কি দিয়ে, দুজনেই বাড়ির বাইরে যায়। পুকুরঘাটে তখন আর কেউ নেই। ঘাটে এক ফোঁটা ছায়া নেই, ভাদ্রের মাংস গলানো রোদ সেখানে। পুকুরের ওপারে, বাঁশঝাড়ে ঘুঘুটা তেমনি ডেকেই চলেছে। বাঁশঝাড়ের ওপারে দুটো পুরনো ভাঙা মন্দির। তার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে গ্রামের বাইরে। চারদিকে ভাদ্রের রোদ ঠা-ঠা করছে।

পুকুরের এক পাশে, গ্রামের অন্য দিকে যাবার রাস্তা। দুটো অশ্বত্থ গাছ রাস্তার ধারে। সেই ছায়াতেই নিমির ছাগল বাঁধা রয়েছে। কিন্তু একটি ছাগলের গায়ে এখন আর ছায়া নেই। সে একেবারে রোদে। তা-ই ডাকাডাকি করছিল।

ঘোর দুপুরে রাস্তাটাও ফাঁকা। নিমি গাছতলায় গিয়ে ছাগলটাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বাঁধে। কাছে পিঠে যেখানে ঘাস আছে, সেরকম জায়গাতেই বাঁধে। তারপরে অমি এসে ভয় ভয় গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বাবা কী বলছিল দিদি, মারবে ?'

নিমি বলল, 'তা ওরকম ক্ষেপে গেলে, গায়ে হাত তোলা আর আশ্চর্যের কী।'

'কিন্তু দ্যাখ্ দিদি, আমি বুঝতে পারি না, সত্যি বলছি বৌদির খুব খারাপ কাজ হয়েছে কি এটা ?'

নিমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'বলিস কি অমি ছি ছি ছি ! ওই জন্যে তোকে আমি বেরুতে বারণ করি। তুই কোন্ দিন কী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাকবি !'

'কেন, আমি আবার কী কাণ্ড করব ?'

'করবি একটা কেলেঙ্কারি কিছু ! তোর যখন এটা খারাপ মনে হচ্ছে না, তুই কোন্ দিন হয়তো মুসলমান বিয়ে করে বসবি।'

'তোর মুখে আগুন। তুই একটা মুখপোড়া দিদি।'

নিমি হেসে ফেলে। বলে, 'অমি শোন। হ্যাঁরে, ডিঙলে সেদ্ধ যে চাপালি, মাখবি কী দিয়ে ?

তেল আছে একটুও ?'

'দু পলা মতন আছে।'

'আর চাল ?'

'দেড় কৌটো।'

'ছ'জনের জন্যে ?'

'তাইতো কথা হল, ডিঙলে খাওযা হবে ভাতেব টাকনা দিয়ে।' বলতে বলতে অমিব শুকনো ঠোঁট দুটো কী বকম কেঁপে যায়। ডাগর চোখ দুটো টলটলিযে ওঠে।

নিমির মুখখানিও অন্ধকাব হয়ে ওঠে, চোখ ছলছলিযে যায়। বোনের পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'কাঁদিস না। এ বছবটাই এত বেশী কষ্ট।'

অমি বলল, 'বাবা তো এক বিঘে জমি এ সময় বিক্রি করে দিতে পাবে। দেড় দু হাজার টাকা তো পাওযা যাবে।'

'ওকি বলছিস্ অমি। মাত্তব তো সাত বিঘে জমি আমাদেব। তাতেই কযেক মাসের চালটা হয়। তাব ওপবে তোব বিযে আছে, তখন বিঘে দুযেক বিক্রি কবতে হবেই।'

'ছাই, অমন বিযেব আমার দবকার নেই।'

বলতে বলতে বাড়ি ফিবে যায়। নিমি সেদিকে চেযে মনে মনে বলল, 'ছাই নযবে অমি। ঘবে দুটো খাবাব আছে, এমন লোকের সঙ্গে যদি বিযেটা হয়, তা হলে সেটা বিযের থেকে বড হবে।'

একথা নিমি মনে মনে বলে। তবু অশ্বত্থেব তলায়, একলা দাঁড়িযে তাব চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। টলটলানো জলে, ভাদ্রের বোদে-পোড়া চবাচব কাঁপতে থাকে।

কিন্তু এসব কোন ঘটনা নয়। বাড়িব থম্‌থমানি একটুও কাটল না। বাবা মা দু মেয়ে ডিঙলে সেদ্ধ নিয়ে যখন বসল, তখন বেলা গড়িযে গিযেছে। পাশেব ঘবে আবো একজন আছে, যাব পাপে বাড়িতে আজ কুগ্রহ লেগেছে। উঠোনে দাঁড়িযে অমি একবাব ডেকেছিল, 'বউদি, খেতে এস।'

ঘরের ভিতব থেকে জবাব এসেছে, 'তোমরা খেয়ে নাও, আমি খাব না।'

তৎক্ষণাৎ চক্রবর্তী চিৎকাব কবে উঠেছিলেন, 'মুখ নেড়ে কথা বলতে লজ্জা করছে না, কালামুখী।'

নিমি তখন আবাব বলেছে, 'থাক বাবা, এখন কিছু বলো না, বেন্দা আসুক, তাবপবে।'

তখন আব একবাব শিশুব কান্না শোনা গিযেছিল। এক মুহূর্তেব জন্যে। সঙ্গে সঙ্গেই আবাব চুপ হযে গিযেছিল।

সকলেই ডিঙলে সেদ্ধ খেয়েছিল ভাতের বদলে। তাতে ক্ষুধা হযতো মিটেছে, কিন্তু বুকেব মধ্যে একটা যন্ত্রণা কুরে কুবে খেযেছে। একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং দুঃখ, সকলেব বুকের মধ্যে রুযে রুযে উঠেছে। সবাই এক মুঠো করে ভাত খেয়েছে, ঠিক এক মুঠো বলতে যা বোঝায়। তার পরিণামে, সকলেবই বিতৃষ্ণা ঘৃণা, একজনের ওপবেই গিয়ে পড়েছিল। একমাত্র অমি ছাড়া।

হয়তো, অমির এখনো যৌবন আছে। যে যৌবনকে পবিত্র বলা হযেছে। বিশ্বসংসারে যৌবনেব মত শুদ্ধ কী আছে? যৌবন যেমন ঘৃণার আগুনে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি সর্বংসহা পৃথিবীর মত সবকিছু ক্ষমাও করতে পারে।

যে মানুষটিকে ঘিরে, যে মানুষটির আচরণকে কেন্দ্র করে গোটা বাড়ি থম্‌থম্ করছে, ফুলছে,

ফুঁসছে তার ওপরে সে কিছুতেই রাগ করতে পারছে না।

প্রায় বিকাল ঘেঁষে, বৃন্দাবন বাড়ি ফিরল। বলা চলে, একটি কঙ্কাল জামাকাপড় পরে বাড়ি ফিরল। সে জামাকাপড়ের দশাও সেই রকম। নানা জায়গায় তালি, ময়লা। এসেই ডাক দিল, 'মা।'

কোন সাড়া পেল না সে। অথচ দেখল, প্রত্যেকটি ঘরেরই দরজা খোলা। হাতে তার একটি ছোট ঝোলা। বড় নয়। খুব ছোট একটি ঝোলা, কিন্তু সেটিকে সে বুকে ধরে আছে।

কোন ঘর থেকেই কেউ এল না দেখে, সে আবার ডাকল, 'দিদি, দিদি কোথায় গেলিরে।'

তখনো কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বৃন্দাবন রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, অমি সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করল, 'কীরে অমি, কেউ বাড়ি নেই? ছাত্রের বাড়ি থেকে আজ দু' কিলো চাল নিয়ে এলাম মাইরি। আর বাড়িতে কারুর কোন পাত্তা নেই?'

অমি একবার ঝোলাটার দিকে তাকাল। তারপরে বাবার ঘরের দিকে। দেখে, বৃন্দাবনের সন্দেহ হল। কোথায় একটা কী গোলমাল ঘটেছে। সে উঠোনের আর এক পাশে গিয়ে, উঁকি মেরে দেখল, বাবার ঘরে কে আছে। দেখল, সেখানে বাবা মা দিদি, সবাই রয়েছে। সে সেই ঘরের দিকে গেল। দাওয়ার ওপর উঠে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী গো, তোমরা সব এমন করে বসে আছ কেন? কোন বিপদ আপদ হয়েছে নাকি?'

কেউ কোন জবাব দিল না। কেবল কালীনাথ চক্রবর্তী বললেন, 'তুমি গায়ক মানুষ, যাত্রার দলের অ্যাকটর। তা ছাত্রদের সব শেখানো হল?'

বৃন্দাবনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। বললো, 'দ্যাখ বাবা, বাজে খোঁচাটি করো না। তোমার তো সে মুরোদও নেই। তোমার বাপ কী রেখে গেছল তার ওপর আয়েশ চালিয়ে যাচ্ছ। আমাকে তো তবু কিছু ছোটাছুটি মানে। পেটে সদা ইঁদুরের ডন মারছে, তবু যা হোক, তাদের সঙ্গে থেকে, কিছু একটা শিখিয়ে পড়িয়ে কিছু চাল যোগাড় করে এনেছি। এখন মেলা কাঁচ কাঁচ না করে বল দিকিনি কী ঘটেছে?'

তবুও কেউ কিছু বলতে চায় না। মা কাঁদতে লাগলো। নিমিও প্রায় সেই দশা। বৃন্দাবন তখন একটু উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে উঠলো। সে প্রায় ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা বলছ না কেন কী ঘটেছে? আর এমন দগ্ধে মেরো না। শিবানী আর ওর ছেলেটা ভালো আছে তো?'

তখন চক্রবর্তী বললেন, 'তোমার শিবানীকে ডেকেই তা জিজ্ঞেস কর না।'

বৃন্দাবন আরো ভাবিত হয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, চক্রবর্তীই শেষ পর্যন্ত নিজের মুখে বললেন সমস্ত কথা। জানালেন, তার পুত্রবধূ, বৃন্দাবনের স্ত্রী, গোবরা দুলের বাড়িতে পরশু দিন ভাত খেয়েছে। দুলে বাড়ির ভাত, বামুনের বউয়ের পেটে! ছি ছি ছি, তার আগে, অমন বাড়ির বউ কেন, শ্বশুর শাশুড়ি ননদ স্বামী পরের মুখে বিষ তুলে দিয়ে যায় নি। গাঁয়ে যে আর টেকা যাবে না।

বৃন্দাবন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ডাক দিল, 'অমি তোর বউদিকে এ ঘরে ডাক তো একবার।'

নিমি বলে উঠলো, 'কেন বাপু ঝামেলা বাড়ানো। ঘরে গিয়েই কথা বল না।'

তার আগেই অমি গিয়ে ডাকলো। বৃন্দাবনের স্ত্রী শিবানী এসে দাঁড়ালো। মাথায় খানিকটা ঘোমটা। তবু মুখখানি পরিষ্কার দেখা যায়। সকালবেলা পুকুরে চান করে, সিঁদুরের টিপ পরেছিল। সেটা এখন অনেকখানি গলে গিয়েছে, তবু টের পাওয়া যায়। একটা চলচলে

সেমিজের ওপর জ্যালজেলে একটা লালপাড় শাড়ি। উপবাসে শুকনো মুখ, বড় চোখ দুটি আরো বড় দেখাচ্ছে। শবীর ভাঙনেব মুখে, তবু মনে হয়, একটি মিষ্টি মুখ, ডাগর চোখ বউ এসে দাঁড়ালো।

বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে বউ, তুই গোবরা দুলের বাড়ি ভাত খেযেছিস পরশু?'

বউ একটু চুপ করে থেকে বললো, 'খেযেছি।'

'কেন?'

'মন্দোদরী খেতে বললো, বড্ড খিদে পেযেছিল। ছেলেটাক গলা শুকনো, বুকে একটু দুধ আসছিল না।'

সরল, সহজ জবাব। তবু বৃন্দাবন বললো, 'তা বলে তুই দুলে বাড়ির ভাত খাবি? গাঁযে টিকবো কেমন করে?

শিবানী মাথা নিচু কবেছিল। তেমনি ভাবেই বললো, 'মন্দোদরী বললে কি না, 'তোমাব লজ্জা কী বউদি, তোমাব শাশুড়ী, বড় ননদ সবাই আমার ঘবে লুকিযে ভাত খেযে যায। তুমি না হয ছেলেটাব জন্যে দুটো খাবে। মিন্‌সে যোগাড় কবতে পাবে, তাই বলছি, নইলে—।'

শিবানী কথা শেষ করতে পারে না, চোখে জল এসে পড়ে, কথা বন্ধ হয়ে যায।

নিমি একবাব চিৎকার দিযে ওঠে, 'মা।'

কিন্তু মায়ের কাছ থেকে কোন জবাব আসে না। তিনি মাটিতেই পাশ ফিবে শুয়েছিলেন। তাঁর শবীবটা থবথর কবে কাঁপছিল, ফুলছিল। নিমিও হঠাৎ সবে গিযে, মাযের পাশে শুযে পড়ে। ওরও শরীবটা ফুলতে থাকে, কাঁপতে থাকে।

চক্রবর্তী অবাক চোখে স্ত্রী আর কন্যাব দিকে তাকিযে থাকেন। রান্নাঘবের দাওযায় অমি চুপ করে বসে আছে, মাথা নিচু। ওব চোখেও জল।

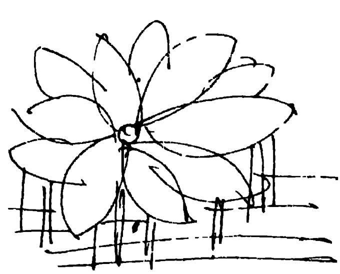
শিবানী সেই যে মাথা নিচু কবেছে, আর তোলে নি।

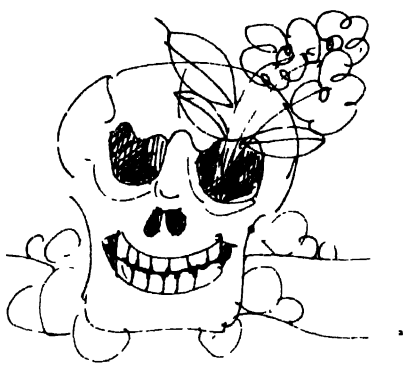
বৃন্দাবন বউযেব কাঁধে হাত বেখে বললো, 'চল্ ঘবে যাই। চাল এনেছি, রান্না কব আজকেব রাতটার মত হোক, আবাব দেখা যাবে।'

বউ তবু দাঁড়িযে থাকে। তখন বউযেব শবীবটাও ফুলে ফুলে উঠছে।

বৃন্দাবন বললো, 'অমন করিস না মাযেব ভাগী আমাব বাবা, তোব ভাগী আমি। দুলেদেব আমি চিনি। ওদেব ভাত আমাদেব থেকে খাবাপ নয়। ওদেব একটাই দোষ, ওবা দুলে। চল।'

বউকে সে হাত ধরে ঘবেব দিকে নিযে যায।





নরবাক্ষস

নববাক্ষস ! নববাক্ষস ' ·

পুরুষেব গম্ভীব গলায ভয দেখানোব সুবে, হঠাৎ কথাগুলো ভেসে এলঃ 'নববাক্ষস ৷ নববাক্ষস এসেছে ৷ আগেই বলছি, হুঁশিযার ৷ এখানে নরবাক্ষস এসেছে ৷'

মিনু—মিনতি, বেল কোযার্টাবের বাবান্দায বোদে পিঠ দিযে, কেবোসিনেব স্টোভে চা তৈরি কবতে বসেছিল। মাঘ মাস, বেলা আটটা। তাবক স্টেশন থেকে আধ ঘণ্টাব ফাঁকে কোয়ার্টাবে এসেছে। এ সময কোন গাড়ি নেই। ভোব ছ'টায গিযে এ সময়ে সে বোজই চা খেতে আসে। আজ চা খেতে এসে মিনতিব অদূবেই বাবান্দাব বোদে বসে সে তিন দিনের বাসি দাড়ি কামাচ্ছিল।

মিনতিব স্টোভে যখন কেটলিতে চাযেব জল টগ্‌বগিযে ফুটছিল, জল ঢালাব মুখ দিয়ে ধোঁযা ফুঁসছিল, ঢাকনাটা বাষ্পেব ধাক্কায ঝিনিঝিনি শব্দে কাঁপছিল, যখন মিনতি বুকেব কাছ থেকে টান দিযে কাঁধের আঁচলটা টেনে নামাচ্ছিল কেটলি তুলবে বলে , এবং আব তাবকের সাবানাক্ত গালে যখন চোখ ঝলসানো শাণিত ক্ষুরটা কচ্‌কচ্‌ শব্দে লেহন কবছিল, ঠিক তখনই নববাক্ষসের আগমনেব সংবাদ ধ্বনিত হযে উঠল। পুরুষেব গম্ভীব গলাব ঘোষণার মধ্যে ঈষৎ উত্তেজনা মেশানো, বিলম্বিত স্বরে একটু নাটকীয়তা ছিল। নাটুকে নাটুকে গলায সংবাদ ঘোষিত হচ্ছিলঃ 'নরবাক্ষস এসেছে। নববাক্ষস ৷ গরু সামলান, ভেড়া সামলান ৷ ছাগল সামলান, মুবগী সামলান, নিজেদেবও সামলান, আগেই বলছি। নববাক্ষস এসেছে, নরবাক্ষস ৷'

এই দুব বাঢ অঞ্চলে, দিগন্তবিস্তৃত সদ্য ধান কাটা মাঠেব নিরালায ছোট এক স্টেশন-কেন্দ্রিক দু-একটি দোকান, দুটি রেলকোযার্টাব, অদূবেই গ্রাম, মাঘেব সকাল-বৌদ্রে পিঠ পেতে, জাগতিক তাবৎ টানাপোড়েনেব কথা বিস্মৃত হযে যখন ওম্‌ কবছিল, পৃথিবীতে যখন টেলিগ্রাফেব তারে ফিঙেব ক্কচিৎ ডাক, ধান কাটা মাঠে বনচড়াইদেব ঝাঁকে ক্ষুধাতৃপ্ত দু-একটি গলাব খুশিব শিস ছাড়া আব কোন শব্দই ছিল না, তখন পুরুষ গলাব গম্ভীব নাটুকে স্বব বেজে উঠল।

মিনতির কেটলি নামানো হল না। তারকের হাত অচল। মিনতির চোখ আর স্টোভ বা কেটলির দিকে নেই, দেয়ালে ঠেস দেওয়া পুরনো ভাঙা আরশিটাতেও তারকের আর দৃষ্টি নেই। মিনতির চোখ তারকের মুখের দিকে। উৎকর্ণ তারকের দৃষ্টি উঠোনের ওপরে। মিনতির বাসি মুখে, প্রথম যতখানি জল দেওয়া সম্ভব, দেওয়া হয়েছে, যদিও তাতে, গত সন্ধ্যার সিঁদুরের টিপ এখনো লেপে যাওয়া অস্পষ্টতায় দৃশ্যমান, রাত্রের খাওয়া পানের ছোপ এখনো ঠোঁটে। জিজ্ঞাসায় ভুরু বাঁকা, কালো চোখ দুটিতে যেন সহসা বিস্মিত উত্তেজনার ছটায় ঝিলিক হানছে, ঠোঁট দুটি টেপা। পিঠে রোদ, বুকের ও কোলের কাছে জ্বলন্ত স্টোভ। স্বভাবতই সদর বন্ধ, স্বামী সান্নিধ্যের নিরালায়, রোদের ও আগুনের উত্তাপ আদায়ের প্রত্যাশায়, শাড়ি অগোছালো, জামার বোতাম খোলা। এখন স্বামীর কাছে আর গোপনতার ঢাকাঢাকি নেই, ঔদাস্যই সুন্দর, যেহেতু সন্তানেরা ও স্বামী সকলেই এই দেহকে ঘিরেই রকমে রকমে বিকশিত। হয়তো এইদূরে নিরিবিলি নিরুদ্বেগ সংসারে, খুশি স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে থাকবার সুযোগ ছাব্বিশ সাতাশে মিনতির স্বাস্থ্য দীপ্তি বর্তমান। যেমন ফলন্ত বনলতারা হয়, পুষ্ট পরিপূর্ণ উজ্জ্বল, আপন ফলভারে যে নত হয়েও বলিষ্ঠ সুন্দর। খোলা জামার ফাঁক দিয়ে বুকে যেখানে কয়েকটি রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে, যেন নখে বিঁধে রক্তপাত হয়ে জমে গিয়েছে, আসলে সেটা ছোট মেয়ে আড়াই বছরের খুকুর নখে লাগানো কুমকুমের দাগ। গতকাল সন্ধ্যায় যখন নিজের নখ রাঙিয়েছিল মিনতি, মেয়েকেও তখনই লাগিয়ে দিতে হয়েছিল এবং কোন্ ফাঁকে যেন গা খোলা বুকে লাগিয়ে দিয়েছিল, অথচ ওঠানো হয় নি। ডুবে শাড়ির আঁচল ধরে, কেটলির দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত হয়েও, উৎকর্ণ বিস্ময়ে নিশ্চল।

তারকের অবস্থাও তথৈবচ। হাড় চওড়া লম্বা শরীরটা অনড়। গায়ে নীল গরম কোটের বোতাম খোলা। তলায় জামা নেই, গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে। অস্নাত চুল উস্কখুস্ক, পঁয়ত্রিশেই জুলফির কাছে কিছু কিছু রুপোলী রং ধরেছে। যদিচ একটি নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততা চোখে মুখে শরীরে নিবিড় হয়ে উঠেছে। উঠোনের দিকে দৃষ্টিতে তার বিস্ময়ের সঙ্গে যেন কোন এক সুদূরে হারিয়ে যাওয়ার আভাস। সে কারণে সে হতচকিত হয়ে মিনতির দিকে তাকায় নি, আপনাতে আপনি হারিয়েছে।

তারপরে সহসা যেন মিনতির দৃষ্টি তাকে সচেতন করল। সে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্ট খুশি ও বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠল, 'নররাক্ষস এসেছে?'

সেই মুহূর্তেই কেটলির ফুটন্ত জল উত্তেজনার চরমে উপচে পড়ল, আর কেরোসিনের স্টোভের কয়েকটা শিখা নিভে গিয়ে ফোঁসফোঁস শব্দ করে, কালো ধোঁয়ায় কটু গন্ধ ছড়াল। মিনতি ঝপ্ করে কেটলিটা ধরে নামাল। তারকের কথারই জবাব দিল তাড়াতাড়ি, 'তাই তো গো। কী ভীষণ যে চমকে উঠেছি না!'

তারক অবাক হেসে বলল, 'আমি তো কানে যেতেই চমকে উঠেছি, এ আবার কে রে বাবা!'

মিনতি বলল, 'উঃ, কত বছর বাদে কথাটা শুনলাম!'

বলে দুজনে দুজনের দিকে তাকাল, দৃষ্টিতে একটি নিবিড়তা ফুটে উঠল, আবেশ যেন নেমে এল। এবং দুজনেই তারপরে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল।

তারক বলে উঠল, 'আশ্চর্য।'

মিনতি বলল, 'আমার খুব মজা লাগছে, জানো? ওই মেলাতলা থেকে বলছে তো, না?'

তারক বলল, 'তা ছাড়া আর কোত্থেকে বলবে। কাল থেকে তো মাঘের মেলা শুরু হয়েছে!'

গতকাল থেকে স্টেশনের ওপারে, রাধাকান্ত জীউর মাঠে, মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমানন্দ

ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব শুরু হয়েছে। মাঘী পূর্ণিমা সেই তিথি। তার এখনো কয়েক দিন দেরি আছে। ভক্তরা উৎসব শুরু করে দেয় আগেই। সেই উপলক্ষে প্রতি বছরই মেলা। দিনে দিনে মেলা বড়ই হচ্ছে। খাবার আর মনোহারী দোকানের সঙ্গে আস্তে আস্তে নানান্ জাদু আর সার্কাসের দল আজকাল ভিড় করে। নররাক্ষসের আবির্ভাব এই বছরেই প্রথম। মাইকে সেই ঘোষণাটি চলছে। অন্তত গত চার বছরের মধ্যে নররাক্ষসের আবির্ভাব হয় নি, এটা তারক আর মিনতি জানে। চার বছর হল, তারক এই দূর নিবালা স্টেশনে আসিস্ট্যান্ট স্টেশনে মাস্টার হয়ে এসেছে। ছোট মেয়েটির জন্মও এখানেই হয়েছে। চার বছরের মধ্যে অনেক রকমের খেলা এসেছে, নররাক্ষস আসে নি।

একটু বিরতি দিয়ে, আবার সেই মোটা বিলম্বিত সুরের নাটুকে গলা ভেসে এল, 'নররাক্ষস এসেছে, নররাক্ষস। ধরবে আর কাঁচা খাবে। হাঁউ।'

বাঘের মতো গর্জন করে উঠল মাইকে। মিনতি আর তারক, দুজনেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এই ঘোষণা শুনতে লাগল। আবার তাকাল দুজন দুজনের দিকে। মিনতির কালো চোখের তারায় যেন ঝিলিক হেনে উঠল. দৃষ্টি নিবিড়তর হল, এবং দুজনেই আবার হেসে উঠল।

তারক বলে উঠল, 'আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে, সত্যি বলছি।'

মিনতি যেন আচ্ছন্ন নিবিড় হাসি হেসে বলল, 'আর আমার যে কত কথা মনে পড়ছে, উঃ।'

তার কথা শেষ হবার আগেই, তারক হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে আরশির দিকে ফিরে বলল, 'ওগো, আর নয়, আটটা বেজে গেল, তাড়াতাড়ি চা কর।'

সে গালে ক্ষুর চালাল। মিনতি চা তৈরিতে মনোযোগ দিল। কিন্তু তার মুখের অন্যমনস্ক হাসিটি গেল না। হাতের কাজ হচ্ছে নিতান্ত অভ্যাসে. কিন্তু মন দূরান্তে। অনেক কথা তার মনে পড়ছে। ওদিকে ঘর ঝাঁট দিয়ে বাউরি বউটি রান্নাঘরে ঢুকেছে। ছ' বছরের বড় মেয়েটি, নাম কণু, বাউরি বউয়ের পিছনে পিছনে ঘুরছে। তাদেরও আলোচ্য বিষয় নররাক্ষস। কণু জিজ্ঞেস করছে, বউ কখনো নররাক্ষস দেখেছে কি না। বউ জবাব দিচ্ছে, 'না গো খুকী দিদি, কখুনও দেখি নাই। আজ যেয়ে দেখতে লাগবে।' কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে, তাই নিয়ে তাদের আলোচনা থামল না।

মিনতি চায়ে দুধ মেশাতে মেশাতে, গালের ওপর, রুক্ষ চুলের পাশ থেকে তারকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি গো, তোমার মেয়েই যে নররাক্ষস চেনে না।'

তারকও নিতান্ত অভ্যাসে ক্ষুর চালাচ্ছিল। সেও অন্যমনস্ক, মন যেন কোন দূরে উধাও। মিনতির কথার জবাবে শুধু হাসল। মিনতি চায়ের কাপটা তারকের দিকে এগিয়ে দিয়ে, ঠোঁট টিপে হেসে এক ঝলক আবার দেখে নিল। তারপরে বলল, 'এখন আর পারবে?'

তারক পোয়াভর ওজনের ফটকিরিটা জলে ভিজিয়ে গালে বোলাতে লাগল. হঠাৎ কোন জবাব দিল না। তার মুখেও হাসি, এবং হাসিটা তেমনি অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন। হাত থেকে ফটকিরির টুকরোটা নামিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বের করেই সে মুখটা মুছে নিল। তারপরে বলল, 'দূর! আরও ওসব হয় নাকি? এখন ভাবতেই পারি না।'

সে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল। মিনতির দিকে তাকাল। মিনতির দৃষ্টি তখন পাঁচিল টপ্‌কে দূরে নিবদ্ধ। তার অস্তিত্ব যেন আর এখানে নেই।

তারক বলল, 'তোমার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে, খাও।'

মিনতি যেন দূর থেকে মন নিয়ে ফিরে এল। প্রায় আদুরে গলায় ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'জুড়োক গে, আমার এখন চা খাবার মন নেই।'

বলেই, হেসে উঠে, চোখ উজ্জ্বল করে বলল, 'আজকাল সব কিছুই মাইকে বলে। সে সময়ে, আমাদের পাড়ায় কিন্তু দেযালে দেয়ালে, খবরের কাগজের ওপর লিখে পোস্টার দেওয়া হয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, পোস্টারে কী লেখা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল, 'নররাক্ষসের খেলা, জীবন্ত পশু ভক্ষণ। কালাচাঁদবাবুর মাঠে, বিকেল পাঁচটায়। পুরো টিকেট দু-আনা, হাফ টিকেট এক আনা। তাই লেখা ছিল না গো?'

তারক হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'আমার মামাতো ভাই বিশু ওগুলো লিখে লিখে দেয়ালে সেঁটে দিত। তোমার তো সব মনে আছে দেখছি?'

মিনতি ঘাড় বাঁকিয়ে, ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি বুঝি ভুলে গেছ সব?'

তারক হাসতে হাসতেই বলল,'হ্যাঁ, ও আবার কেউ মনে করে বসে থাকে নাকি?'

মিনতির দুই চোখ বিস্মিত অভিমানে ভরে উঠল। সে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। তারক চায়ের কাপ নামিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়ে, বলে উঠল, 'আরে তা বলে কি আর সেই ইস্কুল মাস্টারের মেয়েটির কথা ভুলে গেছি, যে মেয়েটি নররাক্ষসকে একটুও ভয় করত না, বরং জিভ ভেংচে দিত!'

বলে, নিচু হয়ে আলগোছে মিনতির গলাটা একটু টিপে দিয়ে, উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ে দৌড় দিল। গলাবন্ধ গরম বেলকোটের বোতাম বন্ধ করতে করতে বলল, 'চলি, আপ গাড়ি আসবার সময় হল।'

তারকের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে, কোপ কটাক্ষে হাসতে গেল মিনতি, কিন্তু মুখের অভিমান বিষণ্ন বিধুরতাটুকু ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারল না। ও আস্তে আস্তে নিজের গালে হাত দিল, যেখানে তারক আলগোছে টিপে দিয়ে গেল। তারপরে ওর মনে হল, তারক মিছে কথা বলে নি। সত্যি ওর আর সে সব কথা মনে নেই। ন বছর আগের সেই দিনগুলো। ওর অবহেলাভরে উচ্চারণের মতোই, সেই দিনগুলো বিস্মৃতির চির অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়ে, যেন সব কিছু চুকিয়ে বুকিয়ে, একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে বসে আছে। এখন একেবারে নিস্তরঙ্গ, এখন শুধুই অভ্যাস এই জীবনটা। প্রত্যহের অভ্যাস।

মিনতিও নিশ্চয় মনে করে বসে নেই সব সময়ে। কিন্তু ন বছর আগের সেই দিনগুলো আছে সব সময়ে। মনের তলে সে ঘুমিয়ে আছে, স্পর্শ পেলেই জেগে ওঠে। চমকে চমকে জেগে ওঠে, আর চোখ বেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে একটি চেনা মুখ দেখতে গিয়ে, বারে বারেই একটি অচেনা মুখকেই দেখতে পায়। চেনা শুধু মুখের অবয়বটি, আর সবই অচেনা। চোখের দৃষ্টি, হাসি, গলার স্বরও। সেই তারক আর নেই।

নিশ্চয় সেই মিনতিও আর নেই। হয়তো তারও অবয়বটিই মাত্র আছে, কিন্তু দৃষ্টি বদলে গিয়েছে, হাসি বদলে গিয়েছে, গলার স্বরও। তবু মনের তলার সেই ঘুমন্ত অনুভূতি যখন স্পর্শে জেগে ওঠে, তখন তার সেই মিনতি হতেই ইচ্ছে করে। তারকের সেই ইচ্ছেও যেন আর নেই। এখন সবকিছুই, এমনি নিরুদ্বেগ হাতে, আলগোছে গাল টিপে দেওয়া। এরপরে আপ গাড়ি এলে, স্টেশনের কুলি, উপরি পাওনার গৌরব ঘাড়ে বয়ে নিয়ে এসে মাঠাকরুণের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

মিনতির সহসা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর তখনই আবার মাইকের শব্দ শোনা গেল 'সাবধান!' সাবধান! নররাক্ষস এসেছে, নররাক্ষস! চুপিচুপি আসবেন, পয়সা নিয়ে আসবেন। বড়দের চার আনা, ছোটদের দু-আনা। হাতে পায়ে শেকল দিয়ে বাঁধা নররাক্ষস, বেলা দুটোয় দেখতে পাবেন। জ্যান্ত হাঁস মুরগী-পায়রা ধরে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, জ্যান্ত পাঁঠার ঘাড় মটকে

খায়! নররাক্ষস, নররাক্ষস!'—

মিনতি ঠোঁট নেড়ে উচ্চারণ করল, 'নররাক্ষস!' তার চোখের সামনে তখন ভাসছে, তাদের চব্বিশ পরগণার সেই শহরে, কালাচাঁদবাবুর মাঠে চট-ঘেরা জায়গা। স্টেজের ওপরে দড়ি দিয়ে বাঁধা তারক, উজ্জ্বল রং তারক, চওড়া বুকটা তার টকটকে লাল। মুখটাও লাল, চোখগুলো পাকানো। গুটিয়ে পরা কাপড়ের নিচে পেশল উরু ও জঙ্ঘা, দড়ি দিয়ে বাঁধা বলিষ্ঠ হাত। দু'হাত বাড়িয়ে দাপাদাপি করছে, হুংকার ছাড়ছে, আর পায়ের কাছে বাঁধা মুরগী তুলে নিয়ে, ডানা ছিঁড়ে, বুক চিরে, রক্ত বের করে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে চিবুচ্ছে। মুরগীটা চিৎকার করে কক্‌কিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তারকের গালের দু-পাশে রক্ত বেয়ে পড়ছে। মিনতি আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে, ছোট বড় সকলেরই চোখেমুখে একটা যেন আতঙ্কের ছায়া। তারকের হুংকার শুনলেই সব চমকে উঠছে। কিন্তু মিনতির প্রাণে কি একটু ভয় ছিল না? সংসারে সকল জটিলতার মতোই, মিনতির চোখে ঠোঁটের সেই মুগ্ধ হাসি। সবাই যখন ভয়ে জড়োসড়ো, তখন তার মনে হত, বেশ লাগছে বিশুদার পিসতুতো ভাইকে দেখতে।

পাড়ার বিশুদার পিসতুতো ভাই তারক, তারক ব্যানার্জী। মামার বাড়ি কতবারই তো বেড়াতে এসেছে। কিন্তু নররাক্ষসের খেলা কখনো দেখায় নি। তাই তেমনভাবে কখনো চোখে পড়ে নি। ম্যাট্রিক পাস বেকার যুবক, চাকরির ধান্দাটাই আসল। নররাক্ষসের খেলা কোথা থেকে শিখে এসেছিল। আর সেইবারে এসে ছ'মাস ছিল বিশুদাদের বাড়িতে। তখন নররাক্ষসের খেলা বারো তেরো দিন ধরে রোজ হয়েছিল। মিনতিদের বাড়ি থেকে বেশী দূরে নয় বিশুদার বাড়ি। খেলা দেখার পরেই মিনতি বিশুদের বাড়ি যেত। নররাক্ষসের টানে। নররাক্ষসটা যে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। হেসে বলত, 'নররাক্ষস দেখতে এসেছ? ভয় করে না?'

মিনতি ঠোঁট উল্টে জবাব দিত, 'নররাক্ষস না ছাই! দিদিমা তো চা খাচ্ছেন।'

তারক বলত, 'ও! দেখবে তবে?'

মিনতির বাঁকা ঠোঁটের ওপর, দৃষ্টিও তির্যক হয়ে উঠত। বলত, 'দেখান না কী দেখাবেন।'

বোঝা যেত, নররাক্ষসটার দু-হাত যেন মিনতির দিকে এগিয়ে আসার জন্যে থরথর করছে। চোখের তারায় ঘিরে আসত নিবিড়তা। মিনতির ওপর থেকে তার সম্মোহিত দৃষ্টি ফেরাতে পারত না।

আর মিনতি! মিনতিরও বুকের মধ্যে থরথরিয়ে কাঁপত না? তার সমস্ত শরীর যেন একটি ছিনিয়ে নেবার প্রতীক্ষায়, একটি পেশল বুকের আকর্ষণে একটা অসহায় আবেশে দুলে উঠত না? তারপর যখন দেখত, নররাক্ষসটার পা সত্যি বাঁধা, হাত বাঁধা, লোকলজ্জা আর সংকোচের দড়িতে, শুধু চোখের তারায় অসহায় ব্যাকুলতা, তখন নিজের ইচ্ছেয় যেন ঠিক নয়, মিনতির জিহ্বা আপনি বেরিয়ে এসে, নাক কুঁচকে দেখিয়ে, দৌড়ে পালিয়ে যেত, এবং বাড়িতে পালিয়ে গিয়েও, নররাক্ষসের মুখখানি ভুলতে পারত না।

কেন? আশ্চর্য! নররাক্ষসটার অমন পশুপাখি ছিঁড়ে খাওয়া দেখে আর সব মেয়েদের মতোই মিনতির গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠত না কেন? শিউরে উঠত না কেন? তারককে অন্য সময় সুবেশ যুবকের বেশে দেখা যেত বলে? ওর চোখের তারার নিবিড় ঘনতায়? মিনতির দিকে তাকিয়ে ওর সেই অসহায় মুগ্ধতায়? কিন্তু তারক তো নররাক্ষস। ওর সেই রূপ দেখেও তো মিনতি যেন একটি আনন্দের উত্তেজনা বোধ করত। অথচ ও ছিল এক স্কুল মাস্টারের মেয়ে। বাবা ছিলেন নিরীহ ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, মা ছিলেন শান্ত। যে লোকটি দুর্জয় নিষ্ঠুর হিংস্র দৃশ্যের অবতারণা করে, তার দিকেই কে টেনেছিল ওকে? নররাক্ষসের খেলা দেখতে ওর

বাবা মা কোনদিনই যান নি। মা বলতেন, 'মানুষ পশুর মতন কাণ্ড করবে, তাই আবার দেখতে যায় কেউ? ছি!' অথচ তাদেরই সন্তান সেই নবরাক্ষসকে দেখে মনে মনে স্বপ্ন রচনা করেছিল। কী একটা অনুভূতি যে মিনতিকে উল্কার বেগে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আজও তার সঠিক ব্যাখ্যা জানা নেই ওর। কখনো মন হত তারক কী সাংঘাতিক, কিন্তু কী সুন্দর। কখনো মনে হত, যে দাঁত দিয়ে ও জীবন্ত পশুপাখি ছেঁড়ে, সেই ঝকঝকে দাঁতেই তো মিনতির দিকে তাকিয়ে অপূর্ব হেসে, মন দুলিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে মনে হত, তারক যদি ওই দাঁত দিয়ে আমাকে—আমাকে...। ভাবনাটা শেষ করতে পারত না। এক বিচিত্র শিহরণে, ওর সর্বাঙ্গে একটা আবেশ ঘনিয়ে আসত। কিন্তু তার মধ্যে কোন ভয় বা যাতনা ছিল না।

তারপরেই তো একদিন নবরাক্ষসটার হাত পায়ের বাঁধন খুলে গিয়েছিল। এক সাঁঝ আঁধারে, বিশুদের দোতলার দালানে, সত্যি মিনতিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। যেন আছড়ে ফেলেছিল তার পেশল বুকে, আর দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে নবরাক্ষসটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুখের ওপরে। আঃ! নবরাক্ষসটা যেন ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছিল মিনতিকে। নিশ্বাস বন্ধ করে মারতে চেয়েছিল নাকি?

তবু—তবু সেই যে এক প্রতীক্ষার থরথরানি ছিল মিনতির, সেই যে এক অসহায় আবেশ আবর্তিত হচ্ছিল, তারকের বাহুবেষ্টনের মধ্যে, একবার থমকে গিয়ে পরমুহূর্তেই সে যেন এক নামহীন সুধারসে ডুবে গিয়েছিল। অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিল যেন। নবরাক্ষসটার পেষণে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরতেও যেন সুখ বোধ হচ্ছিল।

সেই সাঁঝ আঁধারের পর থেকে কয়েকদিন ধরে শুধু সাঁঝ আঁধারের প্রতীক্ষাতেই দিনগুলো কাটত। বিশুদের পুরনো সেকেলে বাড়িতে লোক ছিল কম। দেখা সাক্ষাতের অসুবিধে ছিল না। কয়েকদিন পরেই, তারকের চুপিচুপি স্বরে উচ্চারিত হয়েছিল, 'চাকরির চিঠি পেয়েছি। আর তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের পাল্টি ঘর। কোথাও আটকায় না। প্রস্তাবটা করে ফেলি?'

'জানি নে' বলে পালিয়ে গিয়েছিল মিনতি। পরদিনই ঘটকালি করেছিলেন বিশুদার মা। কোন বাধা উপস্থিত হয় নি। মিনতির তখন পরিপূর্ণ আঠারো। বাবা মা নবরাক্ষসের কাণ্ড দেখতে যান নি, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে খুশি হয়ে উঠেছিলেন। উদ্যোগী হয়ে তারকের বাবার কাছে ছুটেছিলেন মিনতির বাবা। আর তারক চাকরিতে যোগ দেবার আগেই, বিয়ে মিটে গিয়েছিল। পাড়ার বান্ধবীরা মিনতির দিকে তাকিয়ে, চোখ বড় বড় করে বলেছিল, 'শেষে নবরাক্ষসী হলি?'

মিনতি তারকের বুকের ওপর পড়ে বলেছিল, 'তোমার নবরাক্ষসের খেলার কী হবে?'

তারক হেসে বলেছিল, 'কী আবার হবে! বন্ধুদের সঙ্গে একদিন বাজী ধরে জ্যান্ত মুরগী ছিঁড়ে, কাঁচা মাংস খানিকটা চিবিয়ে ফেলেছিলাম। সেই থেকে নবরাক্ষস বনে গেছলাম। ওটা তো আমার পেশা নয়। বন্ধুরা জোর করে ধরলে, দেখাতে হয়।'

একটু থেমে, আবার বলেছিল, 'জানি তোমার বাবা মা পছন্দ করেন না। তোমার বাবা বলেছেন, ও খেলাটা যেন আমি আর কোথাও না দেখাতে যাই। আর যাবও না।'

মিনতি হতাশ বিস্ময়ে বলেছিল, 'কেন? বেশ তো লাগে। খেলা দেখাবে, তার আবার ভাল মন্দের কী আছে?'

তারকও অবাক হয়েছিল মিনতির কথা শুনে, তবু 'বেশ লাগাটাকে' বিশ্বাস করে নি। বলেছিল, 'চাকরি করে আর সময়ই বা পাব কোথায়? কে-ই বা দেখতে চাইছে নবরাক্ষসের খেলা।'

তারক কোনদিন বুঝতে পারে নি, মিনতির মনটা বিমর্ষ হয়েছিল। আর বিমর্ষ হবার কোন

যুক্তিসঙ্গত কারণও নিজে খুঁজে পায় নি মিনতি। তারপরে অফিসে বন্ধুদের তাগিদে, দু-একবার দেখিয়েছিল, বিয়ের প্রথম বছরে। আর নয়। এক সময়ে এসেছিল বদলির ধাক্কা। তিন ঘাটের জল খাবার পর, দূর রাঢ়ের এই স্টেশনে এসে আপাতত নোঙর বাঁধা হয়েছে।

কিন্তু নররাক্ষস? সে তো কবেই হারিয়ে গিয়েছে। আজ আবার এ কোন নররাক্ষস এল, কার বার্তা ঘোষণা হচ্ছে এই মাঘের সকালে।

অই মা, আপনকার চা যে কখুন জুড়িয়ে যেইলেন গ ঠাকরুণ, খাবেন নাই?

ঝি বাউরি বউয়ের কথায় চমকে উঠল মিনতি। তাই তো, চা পড়ে রয়েছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অমন নেশার জিনিস, ঘুম থেকে উঠে মুখে না দিলে রাতের জড়তা কাটে না। তাই ভুলে বসে আছে সে! এখনো রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে। চান করে রান্না বসাতে হবে। বারোটা না বাজতেই তো তারক এসে পড়বে। খেয়ে দেয়ে তিনটে পর্যন্ত ঘুম দেবে। আবার সাড়ে তিনটেয় ছুটবে স্টেশনে। তখন একটা গাড়ি আসবে।

মিনতি ঠাণ্ডা চা-ই খেল। চান করতে গেল, রান্নাও বসাল। স্টেশনের খালাসী এসে বাজার দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ সবই মন্থর। কেমন যেন গা টিসটিস্ ভাব। কাজের মাঝে যতবার নররাক্ষসের আগমন ঘোষিত হল, ততবারই কান পেতে শুনল। তারপরে যখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিতে পারল, আজ বেলা দুটোয় নররাক্ষসের খেলা দেখতে যাবে, তখন দশভুজা হয়ে উঠল। রান্না মিটল চোখের পলকে। কণু আর খুকু, দুই মেয়েকে খাওয়ানো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারক এসে দেখল সব কিছু তৈরি।

তাকে খেতে দিয়েই মিনতি ঘোষণা করল, আজ দুপুরে সে নররাক্ষস দেখতে যাবে। খেতে খেতে তারকের প্রায় বিষম লাগার অবস্থা। বলল, 'এই দুপুরে? আমি কিন্তু যেতে পারব না।'

নিপাট গৃহিণীটি আজ যেন কেমন অল্পবয়সী বালা হয়ে উঠেছে। মিনতি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'একদিন একটু না ঘুমোলে নয়, না? মেয়ে দুটোকে নিয়ে ওই মেলার ভিড়ে আমি সামলাতে পারব?'

তারক বলল, 'বউকে নিয়ে যাও না।'

অর্থাৎ ঝি-কে। মিনতি বলল, 'হ্যাঁ, হাদা বউটাকে নিয়ে কখনো তাই যাওয়া যায়? তুমি যাবে কিনা পরিষ্কার বলে দাও।'

মিনতির মুখ থমথমিয়ে উঠল। কালো চোখ দুটিতে দুর্জয় অভিমানের ঝিলিক। তারক আস্তে আস্তে মুখের গরাস গিলে, জল খেল। তারপর মুখ টিপে হেসে বলল, 'আর নররাক্ষস দেখে কী হবে। এক নররাক্ষসকে তো অনেকদিনই কাত করেছ।'

মিনতি ফোঁস করে উঠল, 'ফাজলামি করো না। যাবে কিনা বলে দাও।'

তারক লম্বা ঢেকুর তুলে বলল, 'আরে বাপু, বেলা দুটোয় তো? তার মধ্যে তো একটু গড়িয়ে নিতে পারব। আমাকে ডেকে দিও।'

নররাক্ষস, নররাক্ষস জ্যান্ত পাঁঠা ছিঁড়ে খায়, জ্যান্ত পাখি চিবিয়ে খায়। ভয় পাবেন না, দেখে যান। চার আনা, দু আনা, চার আনা, দু-আনা।

মাইকে সেই গলাটাই চিৎকার করছে। সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে যেন কানে তালা লেগে যাচ্ছে। কাছাকাছি আরো নানান্ খেলার তাঁবু পড়েছে। ব্যাটারিওয়ালা মাইকে সবাই সবার প্রচারে গলা ফাটাচ্ছে। মেলা বেশ জমেছে। মিনতির ঠোঁটে যেন একটু শ্লেষের হাসি লেগেছিল, শুধু দু-চোখে কৌতূহলের অন্ত নেই। তারকের কোলে খুকুকে দিয়ে কণুর হাত ধরে সে, নররাক্ষসের তাঁবুর গায়ে, রকমারি ছবি দেখল। নররাক্ষস জ্যান্ত পশুপাখি খাচ্ছে, মুখে বুকে

রক্তের ছড়াছড়ি। সবাই যখন ড্যাবা ড্যাবা চোখে, হাঁ করে সেই ছবি দেখছে, মিনতির ঠোঁটে তখন বক্র হাসি। মনে মনে বলছে, ঢের দেখেছি।'

আর ঢের দেখা লোকটি তখন, মেয়ে কোলে করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকেছে টিকেট কাটবার জন্যে। হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে বলল, 'আরে মাস্টারমশাই, আপনি কোথায় টিকেট কাটতে যাচ্ছেন? ছি ছি ছি, রাধাকান্তের মেলায় ইস্টিশান মাস্টের পয়সা দিয়ে খেলা দেখবে, রাম্ রাম। আসুন দেখি এদিকে।'

যে লোকটি মাইকের সামনে চিৎকার করছিল, সে নিজে এগিয়ে এসে নমস্কার করে আহ্বান করল, 'আসুন স্যার আসুন। আমাদের না চিনিয়ে দিলে চিনব কী করে বলুন।'

তারক খুশি বিব্রত মুখে একবার মিনতির দিকে তাকাল। তারপর হাসতে হাসতে ভিতরে গেল। একেবারে স্টেজের সামনে তাদের বসতে দিল। পর্দা ঢাকা স্টেজ। মিনতির সমস্ত কৌতূহল ক্রমে একটা উত্তেজিত কেন্দ্রে এসে যেন সূচাগ্র হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে পর্দাটা দুলে উঠলে, তার বুকের মধ্যে ধকধকিয়ে উঠছে। এই বুঝি উঠল। [illegible] কণু যে কী বকবক করছে, তার কানে যাচ্ছে না। তারক যে ছোট মেয়েটাকে নিয়ে বেসামাল হচ্ছে সেদিকেও তার খেয়াল নেই। বরং বেসামাল লোকটাকেই সে জিজ্ঞেস করছে, 'এদের শুরু হবে কখন?'

তারক জবাব দিয়েছে, 'কী জানি। আজকাল আবার কী কায়দা হয়েছে, কে জানে।'

আসলে তাঁবুর ভিতরে জনতার স্থান পূর্ণ না হলে, খেলা শুরু করা যায় না। এবং তাই হল। যখন আর তিল ধারণের জায়গা রইল না, যখন [illegible] দর্শকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বার উপক্রম হল তখন হঠাৎ স্টেজের ভিতর থেকে [illegible] শোনা গেল। গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা উঠল। অন্ধকার মঞ্চ। কিছুই দেখা যায় না। কেবল [illegible], আর গর্জন শোনা যাচ্ছে। তার পরেই হঠাৎ এক কোণে একটা আলোর রেখা ফুটে উঠল, [illegible] সেই আলোয় দেখা গেল, একটি পেশল শরীর ঝাঁকড়া-চুলো ভয়ঙ্কর দর্শন লোক হিংস্র চোখে [illegible] আছে।

গোটা তাঁবুর লোকগুলো যেন রুদ্ধশ্বাস। একটা পিন পড়লেও শব্দ হয় বুঝি। নররাক্ষসকে দেখতে পাওয়া গেছে। নররাক্ষস। কিন্তু মিনতি উত্তেজিত মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে, এ ঠিক তারকদের সেই খেলার মতো নয়। এখানে অভিনয় আছে, মঞ্চসজ্জা আছে।

হঠাৎ নররাক্ষস চিৎকার করে জনতার দিকে ছুটে আসতে চাইল। আর তখনই দেখা গেল, তার হাত পা বাঁধা। সে আসতে পারছে না, তাই আরো জোরে চিৎকার করছে। সেই সময়ে একটা গলার স্বর শোনা গেল, 'কী রে রাক্ষস, তোর খিদে পেয়েছে?'

নররাক্ষস চিৎকার করে সম্মতি জানাতেই একটি জ্যান্ত মুরগী এসে তার হাতের সামনে পড়ল। মুরগীটা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু মুহূর্তে তাকে ছিঁড়ে চামড়া ছাড়িয়ে লাল দগদগে মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল রাক্ষস। আর সেই সঙ্গেই গর্জন।

এই খেলা শেষ হতেই পর্দা নেমে এল। এরপর দু নম্বর খেলা। মিনতি তাকাল তারকের দিকে।

তারক হেসে বলল, 'কায়দাকানুন খুব করেছে।'

মিনতি নিচু গলায় বলল, 'তুমি এখন পারবে?'

তারক বলল, 'তা কী জানি। চেষ্টা করলে হতে পারে। কিন্তু নররাক্ষসটির মুখ যেন একটু চেনা লাগল। মুখে রঙ মেখেছে বলে বুঝতে পারলাম না।' মিনতি অবাক কৌতূহলে বলল, 'চেনা নাকি?' তারক বলল, 'মনে হল যেন।' মিনতি বলে উঠল, 'তাহলে বেশ হয়।'

তারক মুখ নামিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'তা হলে আর একটাকে কাত করবে?'

মিনতি তারকের হাঁটুর কাছে কুট করে একটা চিমটি কাটল।

তারক অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, 'উঃ! লোকে দেখবে যে? ইস্টিশান মাস্টারের বউ!'

মিনতি বলল, 'দেখুক গে! যা তা বলছ কেন?'

তারক বলল, 'ও, আমি যা তা বলছি! আর তুমি যে সামান্য মেলায় আসতে এত সেজেছ আজ?'

মিনতি অবাক হয়ে বলল, 'ও মা, কোথায়?'

'নিজেই চেয়ে দেখ না। মেলায় আসতে কোনোবার তো এত সাজাগোজার ঘটা দেখি না। স্নো পাউডার মেখেছ, কাজল এঁকে ।'

মিনতি বলে উঠল, 'মিথ্যুক, মিছে কথা বলছ? স্নো পাউডার কাজল তো রোজই মাখি।'

'আর কুঁচিয়ে ঘুরিয়ে টকটকে লাল শাড়ি--। যাই বল, আজ একেবারে মার মার কাটি কাটি।'

'অসভ্য! আমি বুঝি তোমাদের নরবাক্ষসের সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছি?'

কিন্তু সে কথার আর জবাব পাওয়া গেল না। মাইক বলে উঠল, 'এবার দ্বিতীয় খেলা। চুপ করে বসুন, নরবাক্ষস আসছে।'

সবাই মঞ্চের দিকে তাকাল, আস্তে আস্তে পর্দা উঠল। কিন্তু তখনো মিনতি মনে মনে বলছিল, 'সত্যি, আজ বোধ হয় একটু বেশী সেজে এসেছি। তা বলে ইচ্ছে করে সাজি নি, যেমন মনে হয়েছে, তেমনি সেজে চলে এসেছি। কী করব, লাল রঙের শাড়িটাই যে হাতে উঠে এল। অনেকদিন পরে বিনুনি দুলিয়েছি, খোঁপা করতে আর মন গেল না। সময় তো ছিল না।'

ইতিমধ্যে মঞ্চে পাঁঠার ডাক শোনা গেল। দেখা গেল, মস্ত বড় কালীর মূর্তি, ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে তার সামনে একজন পুজোয় বসেছে। সামনে হাড়িকাঠ, ধারালো খড়্গ। কাছেই একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা কালো নধর ছোটখাট একটি পাঁঠা ঘাস খাচ্ছে। মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। দূরে শেয়াল ডাকছে। যে পুজো করছে তার খালি গা। শক্ত পেশল শরীর, চুল ঝাঁকড়া। সে কালী মূর্তির দিকে পিছন ফিরে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বীভৎস চিৎকার করে উঠছে। তারপরে হঠাৎ 'জয় মা কালী' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল, সামনে ফিরল। ছোঁ, মেরে তুলে নিল পাঁঠাটাকে। পাঁঠাটা ভ্যা করে ডেকে উঠল। নরবাক্ষস পাঁঠাটাকে লুফতে লাগল, আর চিৎকার গর্জনে বলতে লাগল, 'মায়ের বলি মায়ের বলি।'

জনতা একেবারে স্তব্ধ, বড় বড় চোখগুলো অপলক, আতঙ্কে নড়তে পর্যন্ত পারছে না। নরবাক্ষস আবার একটা চিৎকার করে উঠল, এবং হঠাৎ পাঁঠাটার ঘাড়ের কাছে ঝাঁকিয়ে দিয়ে, গলায় দাঁত বসিয়ে দিল। পশুটার শেষ আর্তনাদ শোনা গেল, আর সেই মুহূর্তেই নরবাক্ষসের মুখে গায়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়ল। পশুটা হাত পা ছুঁড়তে লাগল, আর নরবাক্ষসের সারা গায়ের পেশীগুলো আরো ফুলে ফুলে উঠল। যেন সারা গায়ের কতগুলো সাপ কিলবিল করে ফুঁসছে। একটা গর্জন করে, পাঁঠাটাকে মঞ্চের ওপর ফেলে দিয়ে নরবাক্ষস দৌড়ে চলে গেল পর্দা নেমে এল।

তারক বলে উঠল, 'বিচ্ছিরি!'

মিনতি বলল, 'সত্যি তো আর নয়! তুমি নিজে যখন ও রকম করতে?'

তারক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমি কি ও রকম জ্যান্ত পাঁঠার গলার নলি ছিঁড়তাম? আমি খাঁড়া দিয়ে বলি দেবার পর তুলে নিতাম।'

মিনতি বলল, 'ওই একই কথা। কিন্তু ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?' অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

তারক মঞ্চের দিকে চলেছে। বলল, 'দাঁড়াও একটু। ছেলেটাকে চিনি মনে হল। বোধ হয় আমাদের ওখানকারই ছেলে।'

বলে সে চট সরিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনতি কণুর হাত ধরে, ভ্রূকুটি বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যি চেনা লোক নাকি? নিতান্ত চোখের ভুল নয় তা হলে? ভাবতে ভাবতেই সহসা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল মিনতি। একটা বিহ্বল ব্যস্ততায় সে তাড়াতাড়ি নিজের বেশবাস একটু গুছিয়ে নিল। ঘোমটাটা অনেকখানি সরিয়ে দিল!

বেশ খানিকক্ষণ পর তারক বেরিয়ে এল, সঙ্গে একটি যুবক। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুল আঁচড়ানো, ফিটফাট। কিন্তু দেখেই চিনতে পারল মিনতি, এ সেই নররাক্ষস। সত্যি চেনা তা হলে? সহসা মিনতি যেন ব্রীড়াময়ী হয়ে উঠল, লজ্জা ও কৌতুকের হাসিতে প্রায় একটি আঠারো বছরের মেয়ের মতোই নতুন নররাক্ষসের দিকে তাকাল। শুনতে পেল, সে বলছে, 'সত্যি বলছি তারকদা, এ ব্যাপারে আপনিই কিন্তু আমার গুরু। আপনার খেলা অনেকবার দেখেছি, দেখে দেখেই শিখেছি। ম্যাট্রিকটা তো আমিও পাস করেছিলাম, অবিশ্যি দু-বারে, থার্ড ডিভিশনে। তারপর ভাবলাম, ধু-র তোর চাকরির নিকুচি করেছে। নররাক্ষসই হব। কিন্তু দাদা, আপনি যে আমাকে চিনতে পারবেন, চিনে দেখা করবেন, সত্যি—।'

তারক বলে উঠল, 'সে কি কথা, দেশের ছেলে, যতীন কাকার ছেলে তুমি, চিনতে পেরেও দেখা করব না?'

'আর দাদা, সেসব পরিচয় এখন ভুলে যান। এখন এই মেলায় ঘুরি, নররাক্ষসের পেশা নিয়ে এক রকম কাটিয়ে দিচ্ছি।'

তারক সেকথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'এই যে তোমার বউদি। দেখ গো তোমাদের নররাক্ষসকে। ওর নাম পিনাকী হালদার, আমাদের দেশের ছেলে।'

পিনাকী নিচু হয়ে মিনতিকে প্রণাম করতে গেল। মিনতি যেন লজ্জায় কাঁটা হয়ে উঠল। তার মুখ আরক্ত, চোখে সলজ্জ কৌতুকের হাসি। দু-হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে, বলে উঠল, 'না না, ও কি।'

ঈষৎ নিচু হতে গিয়ে তার ঘোমটা খসে গেল, বিনুনি দেখা গেল। ঘোমটা তুলে দেবার কথা তার মনে এল না।

পিনাকী বলল, 'তা বললে কি হয় বউদি? তারকদার বউ আপনি। বউভাতে পরিবেশন করেছিলাম সে কথা ভুলে গেছেন।'

তারক বলে উঠল, 'তার ওপরে আবার নররাক্ষস দাদার বউ!'

বলেই, মিনতির বাধা ডিঙিয়ে ঝপ্ করে পিনাকী একবার পা স্পর্শ করে নিল। তারপরে দু-একটি নিতান্ত জীবনধারণের কথাবার্তা, মেলার ব্যবসার হালচাল ইত্যাদি কথাবার্তা বলে, বিদায় নেবার মুহূর্তে মিনতি বলে উঠল, 'সারাদিন তো আর খেলা দেখান না, যখন সময় পাবেন, চলে আসবেন আমাদের বাসায়।'

পিনাকী বলল, 'যাব বৈ কি, এসেছি যখন নিশ্চয়ই যাব।'

তারক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আসা চাই কিন্তু। সত্যিই তো, সারাদিন এই গুমসো তাঁবুর মধ্যে বসে করবেই বা কী! সময় পেলেই চলে আসবে।'

মিনতি ইতিমধ্যে তাকিয়ে দেখছিল পিনাকীকে। রংটা তারকের মতো ফর্সা নয়, তবে কালোও নয়। চোখ দুটি বড় আছে, চুলগুলো কোঁকড়ানো। এই বয়সে তারকের শরীরও পেশল শক্ত ছিল। কিন্তু যেন ঠিক পিনাকীর মতো এতটা শক্ত, এতটা ভাল বাঁধুনি ছিল না।

যতবার চোখাচোখি হল, ততবারই মিনতি লক্ষ্য করল, পিনাকীর দৃষ্টি চকিত, নিবিড়

কৌতুকে ঝলকাচ্ছে। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি চিনতে ভুল হয় না, দৃষ্টির ঠিকানাটাও অচেনা নয়। সব ডাকঘরের হদিস তো এই শরীরেই। কিন্তু, কেন, মিনতি তো এখন আর সেই আঠারো বছরের মেয়ে নয়। পিনাকী সেই নররাক্ষসও নয় তবে– তবু —তবে, বুকের মধ্যে একটা পুরনো তাল কেন বেজে উঠছে। এখানকার এই জীবনের তালের সঙ্গে যে এ বড় বেতালের মতো বাজছে। কেন বাজে ? কোন তালটাই যে ঠিক তাতে শোনা যাচ্ছে না। এবং অস্বস্তি।

বিদায় নেবার আগে আর একবার, মুখ ফিরিয়ে মিনতি বলল, 'আসবেন কিন্তু।'

পিনাকী হেসে বলল, 'তখন তাড়াবেন না যেন।'

মিনতি আর একবার তাকিয়ে ভ্রূকুটি হেনে হাসল।

নররাক্ষস এল। পরদিন বেলা দশটাতেই এল। উঠোনে তার শোনা গেল, 'বউদি, নররাক্ষস এসেছে, চা দিন।'

মিনতির তখন উথলানো ভাতের হাঁড়িতে হাতা ঢুকেছে। গলা শুনেই চমকে উঠে, আর একটু হলে হাঁড়ি উল্টে পড়ে মরবার অবস্থা হয়েছিল আর কী। আর দেখবার দরকার হল না। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে, উপুড় করে দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল সে। দু-চোখে লজ্জিত কৌতুকাবেশ। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'আসুন।'

এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসন পেতে দিল। একটু যেন বেসামালই হয়ে উঠল মিনতি। পিনাকীর দিকে তাকাতে গিয়ে, ব্রীড়াভাব একটু বেশীই হল। মুখে আগুনের আঁচের ছোঁয়া ছিল, তার ওপরেও ঈষৎ রক্তাভা লেগে গেল। রোদ চলকানো জলের মতো, চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

নররাক্ষসের চোখের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। বউদির দিকে তাকিয়ে, গতকালের মোহটাই আর একটু রং চড়িয়েছে যেন। অর্ধেক আসনে, অর্ধেক মাটিতে বসে বলল, 'দেখুন, ঠিক এসে পড়েছি। ভয় পাবেন না যেন।'

অমনি তারকের পুরনো কথা মনে পড়ে গেল, 'নররাক্ষস দেখতে এসেছ ? ভয় করে না ?'

মিনতি বলেছিল, 'নররাক্ষস না ছাই। দিব্যি তো চা খাচ্ছেন।'

মিনতি বলল, 'নররাক্ষস নিয়ে ঘর করি, আমার কি ভয় আছে ? বসুন, চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি।'

মিনতি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। চলতে গিয়ে শরীর যেন একটু বেশী হিল্লোলিত হয়ে উঠল। ঘোমটা তো কখনই খসেছে। স্নানের পর চুল এখন খোলা, তৈলবর্জিত। দেহ হিল্লোলে কোমরের কাছে খোলা চুল ছপছপিয়ে উঠল।

পিনাকী বলল, 'কিন্তু বউদি, আপনার নররাক্ষস্ এখন শুধু নর হয়ে গেছে, রাক্ষস আর নেই। আমি কিন্তু এখনো পুরোপুরি রাক্ষস।'

কেটলিতে কাপ মেপে জল ঢালতে গিয়ে, মিনতির হাতটা যেন কেঁপে গেল। বুকের মধ্যে দুরার ধক্‌ধক করে উঠল। তবু জবাব দিল, 'তা হতে পারে। তবু এক সময় তো পুরোপুরি রাক্ষস ছিল।'

পিনাকী হেসে বলল, 'তা বটে। তারকদা কি এখন ডিউটিতে ?'

উনুনে কেটলি বসিয়ে জবাব দিল মিনতি, 'হ্যাঁ, নরের কাজে।'

'আর বাচ্চারা কোথায় ?'

'ঝিয়ের সঙ্গে বাইরে কোথাও বসে খেলা করছে হয়তো।'

মিনতি রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। পিনাকী রান্নাঘরের দিকেই তাকিয়েছিল। মিনতির

দেখা পেয়ে, মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন দেখলেন কাল বলুন।'

মিনতি ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর। আপনাব দাদা আপনাব মতো কলাকৌশল করতেন না।'

পিনাকী বলল, 'কী করব বলুন, এখন কলাকৌশল না করলে কেউ ভোলে না। সোজা জিনিস কেউ চায় না।'

মিনতি বলে উঠল, 'তাতে জমে ভাল।'

কথাটা বলে ফেলেই, আরক্ত হয়ে উঠল মিনতি। পিনাকীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, লজ্জাবশে তাড়াতাড়ি রান্নাঘবের মধ্যে গিয়ে ঢুকল সে। আড়ষ্ট হযে, দু-হাত কোলের কাছে জড়ো করে দাঁড়িয়ে বইল। পিনাকীবও কয়েক মুহূর্ত কোন সাড়া শব্দ পাওযা গেল না। একটু পরে তাব নিচু উচ্ছ্বসিত গলা শোনা গেল, 'কথাটা খুব মোক্ষম বলেছেন বউদি।'

একলা ঘবে মিনতির লজ্জাটা আরও বেড়ে গেল। সে হঠাৎ জিভ কেটে, অস্ফুট উচ্চাবণ করল, 'ছিঃ!' ইতিমধ্যে কেটলির জলে আওযাজ দিয়েছে। দেখতে দেখতে, নলের মুখে ধোঁযা বেরিযে এল। আঁচল দিয়ে কেটলি নামিযে চায়ের পাতা ছেড়ে দিল। পিনাকীর সামনে দিযেই অন্য ঘবে গেল, কিন্তু তাকাল না। সন্দেশ ছিল ঘবে। তাই দুটি নিয়ে আবাব ফিবে গেল। আব মিনতি অনুভব কবল, নয়া নবরাক্ষসটা বউদিব দিক থেকে একবাবও চোখ ফেবাতে পারছে না। দৃষ্টির বেড়িতে যেন বাঁধতে চাইছে। ন বছর আগে একজন এমনি করেই বেঁধেছিল। দৃষ্টি দিযে বেঁধে বেঁধে, এক সাঁঝ আধারে ছোঁ মেবে তুলে নিযেছিল।

ভাবতেই, শবীবটা যেন কেঁপে গেল একবাব। চাযেব জল ছাঁকতে গিযে হাত নড়ে লিকাব চল্‌কে গেল। নিজেকে আর একবাব বলল, 'ছিঃ। আমি কি আর সেই আঠাবো বছরেব মেযেটি আছি নাকি? মনটা যেন কী ছাই।'

চা আর সন্দেশ পবিবেশন কবল সে পিনাকীকে। পিনাকী বলল, 'আঃ, তবু একটু ঘবের খাবার খেযে বাঁচব। আব বউদিব হাতেব চা।'

মিনতি তখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিযেছে। বলল, কেন নিজের নববাক্ষসীটিকে কোথায বেখে এসেছেন?'

পিনাকী সন্দেশে কামড দিযে অবাক হযে বলল, 'নববাক্ষসী? সে আবাব কে?'

'কেন, বউ?' পিনাকী হো হো কবে হেসে উঠে বলল, 'মেলায মেলায ঘুবে বউ জোটাবার আর সময় পেলাম কোথায়?'

কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল পিনাকীর। মিনতি বলল, 'কেন, আপনাব দাদা তো খেলা দেখাতে দেখাতেই বউ জুটিয়েছিলেন।'

পিনাকী বলল, 'আমাব কপাল মন্দ বউদি। এতদিন বাদে এই দূব দেশেব মেলায এসে একটি বৌদি ছাড়া আর তো কিছু জুটল না।'

মিনতি মনে মনে বলল, 'ফাজিল।' কিন্তু চোখেব কালো তাবায ঝিলিক হেনে গেল। মুখের বক্তাভা গাঢ় হল। যেন মুখ ফিবিযে সবে যেতে উদ্যত হযে বলল, 'বউদি দিয়ে তো আব বউযেব সাধ মিটবে না।'

বলেই বুকেব মধ্যে অসম্ভব ধকধক্ করতে লাগল মিনতিব। কিন্তু পিনাকীব কোন জবাব পাওযা গেল না। মিনতি ফিবে তাকাল। তাকিযে আবক্ত লজ্জায ও দুর্বোধ্য ভয়ে যেন চমকে উঠল। দেখল, পিনাকীব চোখে নিবিড় আবেশ। দৃষ্টি স্থিব নিবদ্ধ।

হাসতে হাসতেই যদিও মিনতি মুখ ফিরিযে নিল, তবু একদা, ছিনিযে নেবার প্রতীক্ষায থরথবানি যেন তাকে আজ বিহ্বল কবে তুলল। অথচ একটা ভয তাকে বান্নাঘবেব দিকে তাড়িয়ে

নিয়ে গেল।

পিনাকী বলল, 'বউদি দিয়ে বউযেব সাধ মেটে না জানি—।'

কথাটা সে শেষ করল না। মিনতি আবার ফিরে তাকাল। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

পিনাকী মিনতির চোখের দিকে তাকিয়ে, চাযেব কাপে শেষ চুমুক দিল,তারপরে বলল, 'স্বাদ জানতে তো ইচ্ছে করে।'

মিনতির গায়ের মধ্যে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। মুখের হাসিটা বজায় বেখেই সে বান্নাঘরে গিযে ঢুকল। ঢুকে দু'হাত দিয়ে নিজের বক্তাভ মুখটি চেপে ধরল। মনে মনে প্রায় ঠোঁট ফুলিয়েই বলল, 'অসভ্য!' কিন্তু সাতাশের দেহে একি আঠাবোর ঘূর্ণি। মিনতিব মৃত্তিকা যে কাঁপে। দেহ যে প্লাবনের উচ্ছ্বাস উপচে পডতে চায।

কিছুক্ষণ পরে পিনাকীব গলা আবাব শোনা গেল,'কই বউদি, বাগ-টাগ কবলেন নাকি?'

বাগ কবাব সাধ্য কোথায মিনতিব। সে যে নিজেকে নিযেই বিডম্বিত। নিজেব তালবেতালেই সে যে আলুথালু। আঁচল দিয়ে তাডাতাড়ি মুখ মুছে, সামনে এসে অবাক হওয়াব চেষ্টা কবে বলল, 'বাগ কবব্ কেন?'

পিনাকী যেন স্বস্তি পেযে বলল, 'না কবলেই বাঁচি। ঘব ভুলে গেছি অনেকদিন—।' কথা শেষ না কবে সে উঠল। এবাব মিনতিব বিস্মিত ব্যাকুল হবার পালা। বলল, 'কোথায চললেন?'

পিনাকী বলল, 'যাই, আবাব কাল আসব। নবরাক্ষসেব খাবাব যোগাড কবতে হবে তো।'

মিনতি বলল, 'এখানে খেযে গেলেই তো হত।'

'কাঙালকে কেন আব শাকেব ক্ষেত দেখাচ্ছেন।'

'শাকেব অভাব নেই বলেই।'

যা বলতে চায না, তাই অপ্রতিবোধ্য হযে বেবিয়ে আসে মিনতিব মুখ দিযে। চোখাচোখি করে হেসে উঠল দুজনেই।

পিনাকী বলল, 'জানা রইল, আসব।'

'নইলে বাগ কবব।'

ঠোঁট টিপে হাসল মিনতি।

পিনাকী বলল, 'আর যদি মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসি তখন যেন রাগ কববেন না।'

পিনাকী দবজাব দিকে এগিযে গেল। মিনতিও উঠোনে নেমে এল। পিনাকী আবার বলল, 'আপনাব যখন ভাল লেগেছে, তখন খেলা দেখাব নেমন্তন্ন আপনাব বোজ বইল।'

মিনতি বলল, 'সেই তো একই খেলা।'

পিনাকী বলে উঠল, 'মানুষ খাওযাব খেলাটা আব কেমন করে দেখাব বলুন। সেটা বেআইনি।'

বলে মিনতিব প্রতি কটাক্ষ হেনে, পিনাকী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। মিনতি খোলা দবজার সামনে স্তব্ধ হযে দাঁডিযে বইল। তাব দু-চোখে আবেশের স্থিরতা। বুকে যেন প্লাবনের ছলাৎ ছলাৎ।

দূরের উঁচু-নিচুতে যখন পিনাকীর মূর্তি অদৃশ্য হযে গেল, তখন সহসা বুকের ওপর হাত বেখে মিনতি চুপিচুপি স্ববে বলে উঠল, 'কোথায় চলে যাচ্ছি আমি, কোথায চলে যাচ্ছি।'

দুপুরে তাবক এল বকবক করতে করতে, 'কুগ্রহ লেগেছে পেছনে, বুঝলে মিনু?'

মিনতি আজ এখনো বান্নাঘরে। সময় তার কোন্‌খান দিযে কখন চলে গিয়েছে, টেব পায় নি। বান্না নামে নি এখনো। কিন্তু তাবকের কথা শুনে, বুকের ভিতরটা তার চমকে উঠল। বলল, 'কী

হয়েছে?'

তারক রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হল। হাতে একটি কাগজ। বলল, 'আর বল কেন ঝকমারির কথা। কলকাতায় হেড অফিসের ডাক, কালকেই পৌঁছুতে হবে রাত্রে, পরশু হাজিরা।'

সংবাদটা শুনে, মিনতি সহসা কোন কথা বলতে পারল না। ওর প্রাণের ভিতরটা যেন আবর্তিত হয়ে, একটা বাধাবন্ধহীন মুক্তির বেগে ছুট দিতে চাইল। আর একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের ঘোর ওর ভিতরে চুপি-চুপি বলে উঠল, 'এ কিসের ইঙ্গিত! কিসের!' চোখের সামনে পিনাকীর ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি মুখটি ভেসে উঠল।

তারক তখনো বলে চলেছে, 'তার মানে বুঝলে তো, আবার কুগ্রহ। আবার অন্য কোন ঘাটের জল খাওয়াবে বাপু, একেবারে অর্ডার দিয়ে দিলেই তো হয়।'

বলতে বলতে সে হঠাৎ থামল। মিনতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি হল তোমার? কি ভাবছ?'

মিনতি চমকে উঠল একটু। মুখখানি চকিতে গম্ভীর করে বলল, 'কী আবার হবে। তোমার চাকরির ঝকমারিটা দেখছি।'

তারক অসহায় হয়ে বলল, 'কী করব বল, কাল যেতেই হবে সন্ধের গাড়িতে। পরশু রাত্রের গাড়িতেই আবার ফিরে আসব আমি। বাউরি বউটা বাড়িতে থাকবে, খালাসীটা বারান্দায় শোবে এসে রাত্রে। দুটো রাত কাটিয়ে দিতে পারবে না?'

মিনতির বুকের মধ্যে যেন একটা দুঃসহ ধকধকানি। কিন্তু প্রায় অভিমানের সুরে বলল 'জানিনে যাও। কাজ ছাড়া আর কী-ই বা করছ? ভাল লাগে না।'

মিনতি বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে। তারক আবার অসহায়ভাবে বলল, 'কী করি বল, কিন্তু তোমার রান্না এখনো নামে নি?'

মিনতি অন্য ঘর থেকে বলল, 'কী করে নামবে? তোমার নররাক্ষস ভাইটি এসে এতক্ষণ বকবক করে গেলেন।'

তারক বলে উঠল, 'পিনাকী তো? ও তো এখন স্টেশনেও গেছল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

মিনতি শোবার ঘরের জানলার গরাদে বুক চেপে, বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। মেলাতলা থেকে মাইক তখন ঘোষণা করছে, 'নররাক্ষস এসেছে, নররাক্ষস! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!'

পরদিন বেলা দশটায় আবার এল নররাক্ষস। তারকের কলকাতা যাওয়ার বিষয় বলাবলি করতে করতে, পিনাকী এক সময় বলে উঠল, 'বলেন তো রাতে এসে পাহারা দিতে পারি।'

মিনতি আরক্ত মুখে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'নররাক্ষসের পাহারা? ভরসা আছে কিছু?'

'কিসের ভরসা চান?'

মিনতি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'বুঝে নিন।'

পিনাকী এক মুহূর্ত মিনতির চোখের দিকে তাকিয়ে, বলে উঠল, 'বুঝেই নিলাম।'

মিনতি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে, চকিতে একবার পিনাকীকে দেখে নিল। বলল, 'তা হলে আসবেন।'

বলতে বলতে মিনতি রান্নাঘরে গেল। তার যেন নিশ্বাস আটকে এসেছিল। যেমন ন বছর আগে তারকের এক-একটা কথায় আসত।

কিছুক্ষণ পর পিনাকীর গলা আবার শোনা গেল, 'একটা সত্যি কথা বলব বউদি?'

বলুন।'

'আপনার বউভাতের সময় যে-রকম চেহারা দেখেছিলাম, এখনো সে-রকমটিই আছেন।'

'তাই নাকি ?'

হ্যাঁ।'

মিনতির যেন নেশা লাগল, একটা মাতালের আবেশ তার সর্বাঙ্গে। সে যে সেই মিনতিই আছে, সেই পূর্ণ আঠারো বছরের মিনতি। নইলে আজ সকল দিক থেকে মনে প্রাণে ভাষায় ভঙ্গিতে সেই মেয়েটি তার মধ্যে উদয় হচ্ছে কেন !

হঠাৎ দরজায় ছায়া দেখে সে চমকে উঠল। দেখল, রান্নাঘরের দরজায় পিনাকী। মিনতির মনে হল, সেই ছিনিয়ে নেবার প্রতীক্ষা থরথর করছে তার বুকে। পিনাকীর দিকে তাকিয়ে তার মাতাল চোখ যেন ভীরু হয়ে উঠল সহসা।

কিন্তু পিনাকী গাঢ় নিচু স্বরে বলল, 'যাচ্ছি।'

পিনাকী ফিরে যায় দেখে মিনতি যেন এক অপ্রতিরোধ্য বেগে এগিয়ে এল। নিজের থেকেই বলে উঠল, 'পাহারার কথা মনে আছে তো ?'

পিনাকী বলল, 'সেই কথা মনে রেখেই তো এখন তাড়াতাড়ি যাচ্ছি।'

'তা হলে রাত্রের খাওয়াটাও যেন এখানেই হয়।'

পিনাকী বলল, 'তা হলে অনেক ভাগ্য, বহুদিন বাদে কাঁচা মাংসের বদলে নররাক্ষসের দুটি ঘরের অন্ন জুটবে।'

পিনাকী চলে যেতেই মিনতি শোবাব ঘবে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। তার রক্তধারায় একটা উন্মত্ত কলরোল বাজছে। বুক চেপেও সে শান্ত কবতে পাবছে না।

রাত্রি প্রায বাবোটা। ডাউন প্যাসেঞ্জাব ট্রেনটা চলেছে প্রায় ছ্যাকরা গাড়ির মতো। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় তারক জড়োসড়ো হয়ে, গুটিয়ে শুয়ে রয়েছে। বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। মাথাটা তার মিনতিব বিছিয়ে বাখা কোলেব ওপব। উল্টো দিকের গদিতে খুকু আর রুণু ঘুমোচ্ছে।

কামরায় আর কেউ নেই। গাড়িটা এমনিতেই প্রায় ফাঁকা যায়। সেকেণ্ড ক্লাস একেবারেই ফাঁকা থাকে। তারক কাত হয়ে শুয়ে আছে। ক্লান্ত, কপালের রেখাগুলো গাঢ় হয়ে উঠেছে। মিনতি দেখছে। তার একটি হাত তারকের কাঁধের ওপর। আব একটি হাত গাড়ির জানলায়। মিনতি তাবকের ঘুমন্ত মুখের দিকে দেখছে, কিন্তু চোখে যেন ঘুম ঘুম ভাব। সেও বড় ক্লান্ত, যেন একটা যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। দুঃসহ যুদ্ধ, আঠাবো বছরে ফিরে গিয়ে, আবার সাতাশে প্রত্যাবর্তন। প্রাণান্তকর যুদ্ধ। বিকেলেব শেষ মুহূর্তে, তারকের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে গিয়ে দুর্জয় হয়ে উঠেছিল সে। থাকতে পারবে না, তারককে ছেড়ে এক বাত সে কিছুতেই কোথাও থাকতে পাববে না। ...সব নবরাক্ষসই যে আসলে নর হয়ে ঘর বাঁধতে চায় ! একটি ঘর, একটু নিবিড় করে, ঠিক এই মানুষটার মতোই ! পিনাকীব স্বপ্নও যে, একদা তারক হব। সব, সব পিনাকীরই সেই স্বপ্ন। তবে—ন বছর ধরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে, সুখে দুঃখে যে মানুষটি মিনতিতে একান্ত হয়ে আছে, তাকে কেন ফাঁকি দেবে সে।

সে যেন দেখতে পেল, নররাক্ষসটা রেল কোয়ার্টারের অন্ধকাব বন্ধ দরজার কাছে এসে ফুঁসছে ! দুঃখ, ঘরের অন্ন তাকে দিতে পারল না মিনতি। দিতে গেলে, জীবনের একটা পুনরাবৃত্তির পাপ তাকে করতে হত। পুনরাবৃত্তিতে কী লাভ। পিনাকী যেন তারকের মতোই নিজেব মিনতিকে সংগ্রহ করে নেয়।

তারকের দিকে তাকিয়ে, সহসা মিনতির বুকটা টনটন করে উঠল। জানলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এসে তারকের গালের ওপব বাখল সে।

তারক বোধ হয় ঘুমোয় নি। সে তার গালের ওপর রাখা মিনতির হাতের ওপর নিজের একটি হাত রাখল। একটু চাপ দিল, গভীর নিশ্বাস ফেলল।



ও আপনার কাছে গেচে

সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি।একটা গল্প-ছোট গল্প লিখতে হবে। সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি। গল্প তো আর হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না। আমার মস্তিষ্কটা তেমন জলে ভেজা উর্বর না, বারো মাস যেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গল্প গজায়। ঘরে বাইরে অনেক সময় অনেক ঘটনা আর চরিত্রের নানা সমাবেশে, বিদ্যুচ্চমকের মতো হঠাৎ এক একটা গল্প ঝলকিয়ে ওঠে। পথে, পান্থশালায়, শুঁড়িখানায়, ট্রেনে, বাসে, এমন কি আকাশপথেও, এক একটা সামান্য বিষয় কল্পনার আশ্চর্য স্পর্শে হঠাৎ গল্প হয়ে বিদ্যুচ্চমকের মতো মস্তিষ্কে বিঁধে যায়। এটা কী বলে! উপাদান? বিষয়বস্তু? ভাষা সেই মুহূর্তে কোনো কাজই দেয় না। নারীর ডিম্বাণুকোষে পুরুষের শুক্রকীটের প্রবেশের মতো, সেই মুহূর্তে মস্তিষ্ক কেবল ধারণ করে। অথবা জন্ম নেয়। একটা আশ্চর্য সুখের মতো হৃদয় তখন মথিত হয়। আলোড়িত হয়। এই পর্যন্তই। আর সেই বিদ্ধ হওয়ার মুহূর্তেই, ভাষা তার ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। মস্তিষ্কে বিদ্ধ ভ্রূণের সঙ্গে, তার ভবিষ্যৎ অবয়ব বা কলেবর, যাকে আমি সহসা-বিদ্ধ সেই গল্পের বিষয়বস্তুটির ভাষা বলে মনে করি, যা দিয়ে বিষয়টি তার যথার্থরূপে ফুটে উঠছে, ধীরে ধীরে—ভাষা যার নাম, দীর্ঘকাল গর্ভধারণের মতোই যা একাধারে কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, অথচ অনিবার্য স্বাভাবিক এবং ভবিষ্যতের একটি দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভরা স্বপ্নের মূর্তি, সেই বাহনও সেই মুহূর্তেই জন্ম নেয়। আসলে এই রূপের বাহন নিহিত থাকে ভ্রূণের মধ্যেই।

বিদ্যুচ্চমকের মতো যা ঝলকিয়ে ওঠে, যা জন্ম নেয়, আমি তো তখনই—তৎক্ষণাৎ তা লিখে উঠতে পারি না। আমাকে নোটবুকে টুকে রাখতে হয়। সেই ঝলকটাকে ধরে রাখতে হয়। পেশাদার লেখকের মতো, কথাগুলো মনে হচ্ছে? ঠিক, আমি সত্যি একজন পেশাদার লেখক। সব বিদ্যুচ্চমকই যথেষ্ট জলভারাক্রান্ত গাঢ় মেঘের বুকে ঝলকিয়ে ওঠে না, অতএব কিছু তো বিফলেও যায়। তবু, যা কিছু বিঁধে যায়, সবই আমি নোটবুকে নোট করি। একজন অতিশয়

পেশাদার লেখকের মতো সঙ্গে নোটবুক থাকলে, তখনই নোট করি। আমার লেখার টেবিলের নির্জনতায় এরকম ঘটলে তো কথাই নেই। নোটবুক হাতের সামনেই থাকে। বাইরে থাকলেও আমার পকেটে অনেক সময়েই নোটবুক থাকে। না থাকলে বাড়ি ফিরেই আমি সেই ঝলকটাকে নোট করি, যা গল্পের আলোয় ঝলকানো। আর একটামাত্র নোটবুকে তা সম্ভব হয় না। একাধিক নোটবুক, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় আমার সঙ্গে ঘোরে।

সবই আমি সাজিয়ে নিয়ে বসেছি। একটা গল্প লিখতে হবে। সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি। রাজনীতি, সমাজ, গ্রাম, শহর, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী, প্রেম ঘৃণা লাম্পট্য, সঙ্ঘর্ষ, হাসিকান্না, অত্যাচার উৎপীড়ন, সবই যেন মিছিল করে চলেছে নোটবুকের পাতায়। দেখে মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটাই এক একটা বর্ণাঢ্য আর উজ্জ্বল সবল আর গতিশীল মাছের মতো। মনের বঁড়শি ডুবিয়ে, কলমের ছিপে গেঁথে তুলতে পারলেই হয়। যদিও ব্যাপারটা আদৌ সহজ না। ...হ্যাঁ, আর একটা চিঠিও আছে। রুলটানা কাগজে, কয়েক পাতা দোমড়ানো মোচড়ানো, খাঁজে খাঁজে জলে ভিজে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া লেখা, অথবা একেবারেই ধুয়ে যাওয়া কোনো কোনো অক্ষর, কয়েক জায়গায় আঙুল দিয়ে মুছে দেওয়া কালির দাগ, যার পাশে কাদার দাগও কিছু কিছু আছে, এমন কি একটা জায়গায় যেন আবছা সিন্দুরের দাগও রয়েছে। তিনটে নোটবুক দিয়ে চিঠির পাতাগুলো মেলে চাপা দিয়ে রেখেছি। প্রথমে দেখলে মনে হবে, অনেককালের পুরোনো চিঠি, মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ থেকে টেনে বের করা হয়েছে। এমনভাবে মোচড়ানো, ভাঁজের জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে। হাতের লেখাগুলো বড় বড়, গোল গোল। যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, চিঠি যে লিখেছে, লেখা তার হাতে নিয়মিত সরে না। অনভ্যাসের একটা আড়ষ্টতার ছাপ স্পষ্ট, অথচ তার নিজস্ব গ্রামীণ ভাষায় বেশ একটা আঁটসাট বুনোট দানা বেঁধে উঠেছে। এই চিঠিটাও আমি নোটবুকগুলো চাপা দিয়ে, একরকম সাজিয়ে নিয়েই বসেছি। সাহিত্যের থেকে কি জীবন বড় ? বড় ? এই তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, গল্প লেখার এমন একটা সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, চিঠিটাও নিয়ে বসতে হয়েছে।

সঙ্কট যেমনই হোক গল্প তো আমাকে একটা লিখতেই হবে। নোটবুকগুলো সাজিয়ে বসেও, কোনো একটাকেও গেঁথে তুলতে পারছি না। সবই যেন অতল জলে ডুবে যাচ্ছে। কলকাতার আকাশে আজ অভাবিত রৌদ্র-মেঘের খেলা। আজ একুশে ভাদ্র, বেস্পতিবার। গত কয়েকদিন, প্রায় সময়েই আকাশের মুখ কালো ছিল। চিকুরহানা বাজের হুঙ্কার, তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই বৃষ্টি, আর বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যাওয়া—ট্রাম বাস বন্ধ। আবার জল সরে গেলেই, কলকাতার আর এক রূপ। যেমন আজ, সত্যি যেন শরৎ এসেছে। যদিও এ শরৎ ভ্যাপসা আর ঝাপসা, আসলে যেন শরতের একটা ছদ্মবেশ। কারণ, মেঘের দাপটই বেশী, মাঝে মাঝে চিড় খাওয়া ফাটলে আবছা নীল এবং সাদার সঙ্গে কালো মেঘ মাখামাখি, পুব থেকে ধেয়ে আসা, অতি বেগবতী। সব সাজিয়ে নিয়ে বসেও, মাঝে মাঝেই আমার হাত চলে যাচ্ছে খবরের কাগজের দিকে। হাতে নিয়ে এক পলক দেখতে না দেখতেই, একটা অসহ্য গুমরানো যন্ত্রণায়, কাগজ দলা পাকিয়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু আবার পরমুহূর্তেই টেনে নিচ্ছি। না, কোনো কোনো সময় খবরের কাগজ সম্পর্কে আমি যেমন ক্যালাস হয়ে যাই, পাতা ওল্টাবার কোনো কৌতূহল বা উৎসাহই থাকে না। এখন সেরকম হচ্ছে না। কেননা, এখন খবরের কাগজের পাতা জুড়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা, দলবাজী, ক্ষমতা নিয়ে ষড়যন্ত্র আর ফেরেববাজীর কথা প্রায় নেই। যেটুকু আছে, তা, ভয়ঙ্কর আর বিধ্বংসী বন্যার জলের তোড়ে, মলমূত্রের মতো ভেসে যাচ্ছে। এখন খবরের কাগজে কেবল উপরঝাপ্টে বৃষ্টির শব্দ, বাঁধ ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ, ঘরবাড়ি গ্রামগ্রামান্তর

ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায়, অতি ভয়াবহ রাক্ষুসী বন্যার জলের অতি ভয়ঙ্কর গর্জন ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাঁচবার—আর একবার,শেষবার এ জীবনের মতো, আর একবার বেঁচে থাকবার শেষ চেষ্টায়, মানুষের দুরন্ত চিৎকার আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। খবরের কাগজে তাদের চিৎকার আর আশ্রয়ের আশায় উত্তোলিত সহস্র হাত দেখা যাচ্ছে মানুষ আর গৃহপালিত পশুরা সমান অসহায়, একই সঙ্গে তাদের আর্তনাদ, আর তাদের ভেসে যাওয়া শব থেকে দুর্গন্ধও উঠে আসছে খবরের কাগজ থেকে।

এ খবরের কাগজের চেহারা আলাদা। হাতে পাওয়া মাত্র, অতি ব্যগ্রতায় তার মুখ দেখবার জন্য ভাঁজ খুলছি, আর মুহূর্তেই বন্যার রাশি রাশি জলের খলখল হাসি শুনে, দুমড়ে পাশে সরিয়ে রাখছি। কিন্তু স্থির থাকতে পারছি না, আবার টেনে তুলে নিচ্ছি, আর তৎক্ষণাৎ মরণ-চিৎকার শুনে মুচড়ে সরিয়ে রাখছি। তথাপি স্থির থাকতে পারছি না, আবার তুলে নিচ্ছি, আর মুহূর্তেই মানুষ আর পশুব শবের দুর্গন্ধে দলা পাকিয়ে সরিয়ে রাখছি। না, এভাবে সরিয়ে রেখেও নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। দোমড়ানো মোচড়ানো খবরের কাগজ থেকে ক্ষুধার্তদের আকুল চিৎকার ভেসে আসছে। তার মধ্যেই আমি সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি, একটা গল্প লিখতে হবে।

কী আর কোন্ গল্প লিখবো, এই সিদ্ধান্তই একমাত্র উদ্ধাবের উপায়, আর মেঘের গাঢ ছায়া ঘরের মধ্যে নিবিড়তর হয়ে উঠছে। রোদ ফুটলেই স্বাভাবিকের থেকেও আলো যেন উজ্জ্বলতর। কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে টেলিফোনটা বোবা আর কালা। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলতে পাবলে ভালো হত। অথবা বাইরে বেবিয়ে কোথাও খানিকটা ঘুরে এলে স্বস্তি বোধ কবা যেত। আসলে, এ সব ভাবাই সার। কী লিখবো, এই সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, আর মনে মনে ছটপট করে মবা,এব থেকে আমাকে এখন কেউ-ই উদ্ধাব করতে পারে না। এখন নিজেকে নিজে উদ্ধাব কবা ছাড়া উপায় নেই।

কী আর কোন্ গল্প লিখবো, এই সিদ্ধান্তই একমাত্র উদ্ধারের উপায়, আর এই ভেবেই নোটবুকের পাতার গল্পের চুম্বকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছি, ওরাই যেন এক ধবনের ভ্রুকুটি আর অসহায় চোখে আমাব দিকে তাকিযে আছে। যেন ওবা আদৌ কেউ শিকার হতে রাজী না। কী আশ্চর্য আব করুণ সঙ্কট! অতঃপব নোটবুকেব পাতাগুলো মুড়ে, মলাট বন্ধ করে সরিয়ে রাখা ছাড়া কিছু করার নেই এ শিকারের লেখাটা অন্যবকম। এভাবে এ খেলা, খেলা যায় না। নোটবুকগুলো সবিযে রাখতে, রইলো শুধু রুলটানা কাগজে লেখা কয়েক পাতার সেই চিঠি স্যাঁতসেঁতে দোমড়ানো, কাদার দাগ লাগা, জলে ধুয়ে যাওয়া অক্ষর, ভাঁজের মুখে মুখে ছিঁড়ে যাওয়া, পুরনো দলিলের মতো চিঠিটা।

আশ্চর্য, সঙ্কটের মূলে চিঠিটা আমার চোখের সামনে বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝলকিয়ে উঠলো। আসলে, বিধ্বংসী বন্যা আর গল্পের মাঝখানে, এই চিঠিটাই অবচেতনে আমার মনকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছিল। কারণ, চিঠিটা এসেছে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে। আজ একুশে ভাদ্র, বেস্পতিবার। এখন বেলা প্রায় বারোটা। চিঠিটা আমি আবার খুলে সামনে মেলে ধরলাম। সেই বড় বড় গোল হাতের লেখা। চিঠির একেবারে মাথায় লেখা আছে, "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।" ডান দিকে তারিখ, "২০ শে ভাদ্র, বুধবার।" তারিখের ওপরেই, যেখান থেকে চিঠিটা এসেছে, সেখানকার—সেই গ্রামের নাম লেখা ছিল। জল লেগে, গ্রামের নামটা উঠে গিয়েছে, সেখানে একটু কাদার দাগও আছে। কিন্তু গ্রামের নামটা আমার অজানা না। ঘাটাল মহকুমার, দাশপুর থানার এক গ্রামেব নাম লেখা ছিল। হয়তো খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে, এখনো, ধুয়ে যাওয়া আবছা কাদার দাগের ভিতরে গ্রামের নামটা পড়া যায়। তার আর দরকার নেই। দরকার নেই, কারণ এখন এই

চিঠিটাই, আমার গল্প লেখার সঙ্কট মোচনের উপায় স্বরূপ। সেই জন্যই গ্রামের নামটা আমি উল্লেখ করতে চাই না। অসুবিধা আছে। চিঠিটাই এখন গল্প, আর চিঠিতে ভয়াবহ বন্যার বিবরণের সঙ্গে, এমন সব কথা লেখা আছে, এমন বিষয়, আর ব্যক্তির বীভৎসতার কথা, ভয়ঙ্কর বন্যা যার কাছে এসেছে পৌষ মাসের উল্লসিত সুখের পৌষ মাসের মতো, এক্ষেত্রে গ্রামের নামটা উল্লেখ করার উপায় নেই।

স্বভাবতই চিঠিটা যে ডাকে আসে নি, এটা অনুমানের অপেক্ষায় রাখে না। একটু আগেই চিঠিটা একজন হাতে করে নিয়ে এসেছে। সে এখন পাশের ঘরে রয়েছে। বিশ বাইশ বছরের একটি জোয়ান ছেলে। একটু আগেই এসে সে যখন আমার ঘরে ঢুকলো আর আমি ভালো করে তার দিকে তাকাবার আগেই সে নিচু হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো, আমি প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। কে, এ কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই সে যখন মুখ তুললো, আমি দেখলাম, প্রায় হাঁটুর ওপরে কাপড় তোলা, বোতাম খোলা হাফ শার্ট পরা, কালো বেঁটে গাট্টাগোট্টা আঁটসাঁট গড়নের একটি জোয়ান ছেলে, যার চুল উসকো খুসকো, প্রায় জট পাকানো, চোখের কোল বসা, দৃষ্টিতে হতাশা, না ভয় না রুদ্ধ উদগত কান্না, না অসহায় একটা আর্তি, আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এক পলক তাকিয়েই আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম, আর ভূত দেখার মতো চমকিয়ে উঠেছিলাম। হ্যাঁ, ভূত দেখার মতোই, কারণ তার আসাটা কেবল আশাতীত না, সে কেমন করে এলো, তা আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলাম না। এমন কি, সংবাদপত্র পড়ে আমি আশঙ্কা করছিলাম, সে, বা তাদের পরিবারের কেউ আদৌ বেঁচে আছে কী না। এরকম একজনকে সশরীরে কলকাতার ঘরে হঠাৎ দেখলে ভূত দেখার মতো চমকিয়ে উঠতেই হয়। আমি তার খালি পা থেকে, মাথা পর্যন্ত দেখে বলে উঠেছিলাম, 'তুমি? কোথা থেকে এলে?' ছেলেটির স্বর শোনা গিয়েছিল যেন ওর সেই দূরের গ্রাম থেকে ভেসে আসার মতো, 'বাড়ি থেকে।'

'বাড়ি থেকে?' কথাটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল আমার কানে, 'কী করে এলে?'

ছেলেটি জবাব দিয়েছিল, 'নৌকায় আর পিপের ভেলায় করে ঘাটাল-পাঁশকুড়া চাতালে এয়েচি, সেখান থেকে পাঁশকুড়া ইস্টিশনে, মিছিলগাড়িতে কলকাতা।'

চাতাল বোধ হয় পাকা সড়ককে বোঝায়। কিন্তু মিছিলগাড়ি? সেটা আবার কী? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মিছিলগাড়িটা কী?'

ছেলেটির কোল বসা চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টির মধ্যে চকিতেই যেন অবাক জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল, তারপরে বলেছিল, 'আজ তো কলকাতায় মিটিং আছে, মিটিং থাকলেই তো মিছিলগাড়ি আসে। মিছিলগাড়িতে আসতে ভাড়া লাগে না।'

আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আজ একুশে ভাদ্র, বেস্পতিবার। বামফ্রন্ট কমিটি না সরকার, কারা যেন আজ মিটিং ডেকেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, কতো কী জানি না। মিছিলগাড়ির কথা আগে কখনো শুনেছি বলে মনে করতে পারিনি। কবে থেকে, কারা এ ব্যবস্থা করেছেন, সে বিষয়েও কোনো ধারণা নেই। আমি চমৎকৃত বিস্ময়ে বলেছিলাম, 'তুমি মিছিলগাড়িতে মিটিংয়ে এসেছো?'

ছেলেটি মাথা নেড়েছিল, 'না, আমি আপনার কাছে এয়েচি। কাকী আপনাকে একটা চিঠি দেচে।'

এ কথা বলবার সময় তার গলাটা যেন চেপে আসছিল, আর জামাটা তুলে কোমরের কাপড়ের কষির কয়েক ভাঁজ খুলে, দলা মোচড়া করা চিঠিটা বের করে আমার দিকে এগিয়ে

দিয়েছিল।

চিঠিটা বের করবার অবকাশেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তা তোমাদের খবর কী? সব ভালো তো?'

জোয়ান শক্ত সমর্থ, অথচ স্পষ্টতই দুর্দশাগ্রস্ত ছেলেটি আমার দিকে না তাকিয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিয়েছিল। তার মুখের অভিব্যক্তি বদলিয়ে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম না, তার চোখে জল আসছে কী না, এবং নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল কী না। প্রায়-রুদ্ধ আর স্খলিত স্বরে কোনো রকমে বলেছিল, 'কাকীর চিঠিতে সব কথা লেখা আছে।'

আমি ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে কাগজের দলাটা নিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, ও কথা বলতে পারছে না। আমি যতটা সহজ ভাবছিলাম, ব্যাপারটা মোটেই সে রকম না। শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলেটার ভিতরে প্রচণ্ড একটা গোলমাল চলছিল। এটা বুঝতে পেরে আমি ওকে বলেছিলাম, 'আচ্ছা, তুমি ভেতরে গিয়ে বস।'

ছেলেটি এখন অন্য ঘরে, বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলছে। চিঠিটা আমি ইতিমধ্যেই একবার পড়েছি। তার এক জায়গায় লেখা আছে, "এক রকম জোর করেই ভাসুরপো দুলালকে চিঠি দিয়ে আপনার কাছে পাঠালাম। জল এখন খানিক কমের দিকে। রেল এখনো চলচে শুনে কেউ কেউ মিছিলগাড়িতে কলকাতা যাচ্ছে। বুঝতেই পারচেন দাদা, আমার মনের কী দশা। দুলালকে এভাবে না পাঠিয়ে পারছি না। জানি না, ও পাঁশকুড়া পর্যন্ত কেমন করে পৌঁছবে। ভগবানের একটা দয়া, কাল কলকাতায় মিছিলগাড়ি যাবে। হাতে একটা পয়সা নাই। দুলাল মিছিলগাড়িতে যাবে, আবার মিছিলগাড়িতেই ফিরবে। ভাড়া লাগবে না। আর এক ভরসা, ও একলা যাচ্ছে না. অন্য লোকেরাও যাচ্ছে। অন্য কারুর হাত দিয়ে এ চিঠি পাঠাতে পারতাম। ভরসা হলো না। তাই দুলালকেই বলে কয়ে রাজী করেছি। দুলালের মেজকাকাকে বলবেন, সবই তো গেছে, এ বছরের মত ঠিকা ব্যবসা মাথায় থাক, আর দরকার নাই। যে কবে হক, যেন চলে আসে।" ...

দুলালকে পাঠানোর প্রসঙ্গ এইভাবে লিখেছে। কিন্তু চিঠির মূল প্রসঙ্গটা হলো, "ও আপনার কাছে গেচে।" ...'ও' মানে দুলালের মেজকাকা। চিঠিটি লিখেছে দুলালের মেজকাকী। ঠিক এভাবে, চিঠির টুকরো অংশ তুলে লাভ নেই। প্রথম থেকেই চিঠিটা আমি আবার পড়তে শুরু করলাম। চিঠির বয়ান এইভাবে শুরু হয়েছে, "পূজনীয় দাদা, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেচে, কিছু বলতে কিছুই নেই, সব ভেসে গেচে। বিষ্ণুপুরে বাপের বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হলে কতবার বলিচি, দাদা একবার আমার শ্বশুরবাড়ি আসবেন। ও যখন বিষ্ণুপুরে আপনাকে আমাদের বাড়িতে দেখেচে, তখন কত করে বলেচে, দাদা একবার আমাদের বাড়ি আসবেন, আপনার ভাল লাগবে। পুকুরের মাছ খাওয়াব, গাছের নারকেল খাওয়াব, গরমের সময় আমাদের পুকুরের বাঁধান ঘাটে বসলে আপনার আরাম লাগবে। কিন্তু দাদা, আমাদের মাটির দোতলা ঘর জলে ধুয়ে ভেসে গেচে, তার কোন চিহ্ন নাই। পুকুরঘাট সব কত জলের তলায়, কিছু জানি না। আপনাকে আর কোনদিন বলতে পারব না, দাদা একবার আমাদের বাড়ি আসুন। আমাদের কী হবে, কিছু জানি না। এদিকে ১৬ই ভাদ্র শনিবার, বৃষ্টি মাথায় করে এক কোমর জল ভেঙে, ও আপনার কাছে গেচে। আমি বারণ করেছিলাম, শুনল না। বিষ্ণুপুর থেকে দু হপ্তা আগে মাল নিয়ে এসেচে। তারপর থেকেই সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েচে, তার আর ধরা কাটা নাই। এত বৃষ্টি আমি আমার জন্মে দেখি নাই। বৃষ্টির জলেই উঠান ডুবেছিল, পুকুর ডোবা সব জলে থই থই। আর তার মধ্যে লোকটা কলকাতা যাবার জন্য অস্থির। রোজই ভাবচে বৃষ্টি থামবে,

আর মাল নিয়ে কলকাতায় রওনা দেবে। কিন্তু বৃষ্টি ধরা তো দূরের কথা, ১৫ই ভাদ্র শুক্রবার অনেক রাত্রে আমাদের উঁচু দাওয়া ডুবিয়ে ঘরে জল ঢুকল। তখন কেউ ভাবি নাই, আমাদের কী সর্বনাশ হতে চলেচে। বরং ভেবেছিলাম, বৃষ্টির জলই ঘরে ঢুকেচে। আমাদের গাঁয়েও তেমন হাঁকডাক কিছু শুনা যায় নাই। আমরা উপরের ঘরে ছিলাম। তিন বছরের ভাসুরঝিটি আমার কাছে রাত্রে শোয়। ভাসুর আর ছোট দেওরের ডাকাডাকিতে আমাদের ঘুম ভাঙল। ও তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। ওর ভয়, মালের গাঁট্‌রিটা নিচে রাখা ছিল, জলে ভিজে না যায় আমি লন্ঠন জ্বালাবার আগেই দেখি ও গাঁট্‌রিটা মাথায় করে উপরে উঠে এল, বলল, মেজবউ মা কালীর কি দয়া গো, গাঁটরিটা আর একটু হলেই জলে ভিজত। এত টাকার মাল, সব বরবাদ হয়ে যেত। গাঁটরিটা রেখেই আবার নিচে চলে গেল। পাশে আমার খুড়াশ্বশুরের বাড়ি। তাদের হাঁকডাকে বুঝলাম, তাদেরও আমাদের মতন হাল, দাওয়া উবজে ঘরে জল ঢুকেচে। ভাসুরঝিটা ঘুমাচ্চে দেখে আমি নিচে গেলাম। ঘরের মেজেয় পায়ের পাতা ডোবা জল ঢুকেচে। আমার বড় জা এক বছরের ছেলে কোলে কাঁদচে, আর খালি বলচে, মাগো এ কি বৃষ্টি, সব যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আব আমার ভাসুরঝি, যাকে আপনি বিষ্ণুপুরে দেখেচেন, হাইস্কুলেব এগারো ক্লাসে পড়ে, মাকে ধমক ধামক করচে, আর এটা সেটা মালপত্তর তক্তপোশের উপর তোলা করচে। ওদিকে ভাসুর তাব দু ভাই আর দুলালকে নিয়ে উঠানের মরাই থেকে বস্তায় ভরে ধান ঘরে তুলে আনচে। দশ দিনেব বৃষ্টির জলে উঠান ডুবলেও মবাই ডোবে নাই। সেই রাত্রে মরাই ডুবতে বসেচে দেখে ধান ঘরে না তুলে উপায় ছিল না। দাদা, তখন কি জানতাম, আমাদের উত্তরে শিলাই, দক্ষিণে কাঁসাই ভেসেচে। কি করে বা জানব। সবাই সারা বাত্র জেগে জেগে জল দেখিচি। ঘরের মধ্যে সেই পায়ের পাতা ডোবা জল তার বেশী উটে নাই। মনে কবলাম, বৃষ্টির জল। বৃষ্টি ধরলেই নেমে যাবে। দুলালের মেজকাকাও তাই ভেবে রাত না পোয়াতেই গাঁটরি নিয়ে রওনা দিল। নিজের দাদা বউদি বারণ করল, কারুর কথা শুনল না। আমাব কথা শুনল না, বললে, পূজা এসে গেল, আর কবে মাল বেচব। যা থাকে কপালে, চাতালে গিয়ে প্রথম বাস ধরে পাঁশকুড়ায় গাড়ি ধরব। মাল ত কম না। মাথার উপরে এত বড় গাঁটরি, তার উপরে ছাতা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক বছর ধরেই তো এ সময়ে কলকাতায় আপনার কাছে যায়। এবারেও জল ভেঙে, বৃষ্টি মাথায় করে আপনার কাছে গেচে, কিন্তু দাদা, এদিকে আমাদের যে একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেচে, ও জানতেও পারচে না। এখনো পাগল হই নাই, এখনো বেঁচে আছি, আর কাল রাত পোয়ালেই মিছিলগাড়ি যাবে, দুলালকে যেতে রাজী করেচি। সব বৃত্তান্ত লিখে এই চিঠি দিচ্ছি, ওকে দেখাবেন, আর দুলালের সঙ্গে ফিরতি মিছিলগাড়িতেই পাঠিয়ে দিবেন ..... ।"

আপাতদৃষ্টিতে চিঠিটি এই পর্যন্ত পড়লে, "সব বৃত্তান্ত" কতো ভয়াবহ হতে পারে, তার একটিমাত্র ইঙ্গিত রয়েছে, "এখনো পাগল হই নাই" কথাটিতে। কিন্তু এই পর্যন্ত পড়ার পরে পত্রলেখিকাব আর তার স্বামীর কিছু পরিচয় আর বিবরণ না লিখে পারছি না। চিঠির শেষে নিচে, আমি আগেই নামটি দেখে নিয়েছিলাম, "ইতি নির্মলা (নিমি)।" হ্যাঁ, ব্রাকেটে ডাক নামটা লিখতে ভোলে নি। আসলে চিঠিটি দেখবার আগে, দুলালের মুখে কাকী শুনেই একটি প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়েব চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। এখনো ভাসছে। মাজা মাজা ফর্সা রঙ, মাঝারি লম্বা, ছিপছিপে শরীরের গড়ন, এবং সব মিলিয়ে ওকে দেখায় যেন একটি স্বাস্থ্যোদ্ধত কুমারীর মতো। এখনো ওর শরীরে উপচানো যৌবনের ঢল কোথায় যেন থমকিয়ে রয়েছে। বড় আর টানা দুই চোখ, নাক সরু, কিন্তু নিচু না, ঈষৎ মোটা ঠোঁট। অধিকাংশ

সময়েই দেখেছি, লালপাড় শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা, নাকে নাকচাবি, গলায় একটি সোনার হার, হাতে শাঁখা নোয়া,কয়েক গোছা সামান্য চুড়ি, আর বাপের বাড়িতে দেখেছি বলেই বোধ হয়, ঘোমটা থাকতো না কোনো সময়েই। হয় এলো চুল, নয় তো খোঁপা বাঁধা। খুঁটিয়ে দেখলে ওকে সুন্দরী বলা যায় না, হঠাৎ দেখলে মনে হয় রূপসী। ওর একটা চটক আছে, মিষ্টি চটক, ঠিক আলগা না, এবং মুখে প্রায় সব সময়েই হাসি, চোখে মুখে একটা দীপ্তি, চলাফেরায় একটা চঞ্চলতা।

নির্মলার এই মূর্তিটাই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, নিমি যার ডাক নাম। আত্মীয়তাব সূত্রে ওকে ঠিক কী বলা যাবে, জানি না। আমার এক শ্যালিকার ও ছোট ননদ। ক্লাস এইট অবধি পড়েছে। তারপরেই বিয়ে। কিন্তু ওর বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির সকলের একটাই দুঃখ, বিয়ের যা ফল, বিয়ের দশ বছবের মধ্যেও সেই “মা ষষ্ঠীর কৃপা” হয়নি। সেই জন্যই ওর বাঁ হাতে একটা মাদুলি বাঁধা আছে। গলার হাবেও জড়ানো আছে একটা মাদুলি।

আমি বিষ্ণুপুরে ওর পিত্রালয়ে ওকে কয়েকবার দেখেছি। ওর মুখেই শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ির কথা। পুকুর, বাড়ি, বাগান আর চাষআবাদেব কথা। সমস্ত বছব খেয়ে আর কিছু বাডতি ফসল বিক্রি করে, অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়ে জীবন ধারণেব মতো জমি আর চাষআবাদ ওদের আছে। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পবিবার বলতে যা বোঝায়, সেই রকম। যদিও, বিষ্ণুপুরেই ওর স্বামী দিগ্বিজয়—যার ডাক নাম বুড়ো—দেখে আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, কালো কুচকুচে শক্ত পোক্ত একজন চাষী মুনিষ ছাড়া কিছু নয়।অনেকটা পত্রবাহক দুলালের মতোই বুড়োর চেহাবা। সমস্ত চেহারা আব জামাকাপড়ের মধ্যেই একটি অতি গ্রাম্য যুবককে চিনে নিতে ভুল হয় না। কিন্তু তার কুণ্ঠা আর সঙ্কোচ বিশেষ নেই। কথা সে একটু বেশীই বলে। সে চাষ বোঝে, জল আর মাছ বোঝে, গাছ আর ফল বোঝে, গাইবাছুরের রোগ শোক মর্জি বোঝে। এমন কি বলদের মর্জিমেজাজও বোঝে। যদিও নিজের হাতে চাষ করে না। সে নিজেই আমাকে তার ডাক নাম ধরে ডাকতে অনুরোধ করেছে।

নারী চরিত্রেব সবটা বুঝি, এমন কথা কবুল করে বলা আমাব পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু নিমিকে আর বুড়োকে দেখে, আমার মনে হয়েছে, ওদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর একটা সহজ আর অনায়াস বোঝাপড়া আছে। নিমি শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর সঙ্গে কী বকম ব্যবহার করে, আমি জানি না। বিষ্ণুপুরে ও পিত্রালযে দেখেছি, স্বামীকে ও একটু বেশী রকা ধমক করে। বিশেষ করে, কোনো আত্মীয়বাড়ি বা সিনেমায যাবার সময, স্বামীব সাজগোজ জামাকাপড়ের ব্যাপারেই ওর যতো ধমকধামক। বুড়ো অবিশ্যি হাসে, হেসেই ওকে বলতে শুনেছি, ‘বিষ্টুপুরে এসে আমাকে ভদ্রলোক সাজতে শিখতে হবে? কিন্তু দোহাই মেজবউ, আমাকে হিমানী পাউডার মাখতে বলো না। উটি পাবব না।’ ...কিন্তু একটু দেশী সেন্ট না লাগালে নিমি ছাড়ে না। বুড়োকে বলতে শুনেছি, ‘মাখাচ্ছ মাখাও, লোকে জানবে গন্ধ তোমার গা থেকেই বেরোচ্ছে। হাতে পায়ে চাষ করি না বটে, দেখতে তো হেলে চাষা ছাড়া লোকে আর কিছু বলবে না।’

নিমির আপত্তি আব ধমক তখনই। ‘হেলে চাষা’ কে বলবে? কাব এত বড় সাহস? এ সব ঘটনা আর কথাবার্তা আমার সামনেই ঘটেছে, হয়েছে এবং ওদের সঙ্গে হাসাহাসিও করেছি। বুড়োদের পরিবারকে জোতদার বলা যাবে না, কেন না, সেই পরিমাণ জমি ওদের নেই। উদ্বৃত্ত ফসল, গাছের ফল, পুকুরের মাছ বিক্রি করে নগদ যেটা আয় হয়, তার পরিমাণ এমন না, যে কোনো রকম ব্যবসা বা মহাজনী ফেঁদে বসবে। ও খুব অকপটেই আমাকে বলেছে, ‘দাদা, আপনারা যারা শহরে থাকেন, তারা বর্গাদারদের জন্য খুব চোখের জল ফ্যালেন। সরকারও

ওদের দিকে, যত অপরাধ আমাদের। একবার চলেন আমাদের ওখানে, আপনাকে দেখাব। দেখলে বুঝবেন, ওদের দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি।'

এ ধরনের কথা শুনলেই কী রকম খটকা লাগে। ভূমিহীন কৃষক বা বর্গাদারদের এরকম একটা ইমেজ কল্পনা করতেই পারি না। অবিশ্বাসের স্বরেই বলেছি, 'তা আবার কখনো সম্ভব নাকি?'

'সম্ভব কি অসম্ভব, একবার নিজের চোখেই দেখে আসবেন চলেন।' বুড়ো বলেছে, 'হাতে পায়ে চাষ করি না ঠিক, কিন্তু ধান তোলার সময় আমাদের পাগলের মতন দশা হয়। নানা জায়গায় ছড়ান ছিটান জমি। চোখে চোখে না রাখতে পারলেই, ধান খড়, সবই ভাগে কম পড়ে যাবে। আমরা ভাবি, ওদের থেকে আমরা হিসাবে দড়। ওরাই আমাদের হিসাব শিখিয়ে দিতে পারে। কোথা দিয়ে যে কী লোপাট হয়ে যাচ্ছে, কিছু বোঝার উপায় নেই।'

আমি বুড়োর এ সব কথা কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নি, আর এখন, এই মুহূর্তে এ সব কথা আমি বলতেও চাই না। আসলে আমি বলতে চাইছি, বুড়ো চাষআবাদ নিয়ে নেহাত অসুখী না। কিন্তু অন্যদিকেও ওর উদ্যোগ আর উৎসাহ আছে। আর সেই সূত্রেই, ওর সঙ্গে আমার কলকাতার যোগাযোগ। বিষ্ণুপুরে ওর শ্বশুরমশাই অর্থাৎ নিমির বাবার সৎ আর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে খ্যাতি আছে। আমি নিজেও দেখেছি, তিনি পূজাআর্চা নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটান, দু বেলা দীর্ঘ সময় আহ্নিক জপতপ, গীতা চণ্ডী পাঠ করেন। কয়েক বাড়ি নিত্য পূজাদিও করেন। অবিশ্যি এরকম জীবনযাপন সম্ভব হয়েছে, তাঁদের জমির ফসলের জন্য। বিষ্ণুপুরে অনেক তাঁতীই তাঁর যজমান। বুড়োদেরও যজমানের অভাব নেই। কলকাতায়ও ওদের কিছু যজমান আছে, অতএব ওর যাতায়াতও আছে। নিমির বাবার কাছে প্রস্তাবটা একদা বুড়োই তুলেছিল, তাঁর তাঁতী যজমানরা যদি বিশ্বাস করে, কিছু ভালো কাপড়চোপড় দেয়, তা হলে কলকাতার যজমানদের, আর তাদের চেনাশোনা বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনদের বিক্রি করতে পারে। অবিশ্যি বাছাই করা রেশম তসরের কাপড়ই দরকার, বড়লোক যজমানদের যাতে সহজেই নজরে পড়ে। দোকানদারদের মতো লাভ করার ইচ্ছা ওর নেই। খরচা বাদ দিয়ে মোটামুটি একটা লাভ থাকলেই ও তুষ্ট। তবু তো কিছু আয় করা যাবে।

নিমির বাবা রাজী হয়েছিলেন, আর তাঁর তাঁতী যজমানদেরও কোনো রকম টাকা না নিয়ে জামাইকে মাল দিতে রাজী করিয়েছিলেন। এরকম ঘটে আসছে প্রায় বছর ছয়েক। ইতিমধ্যে বুড়ো বড়বাজারের দু-একজন মহাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল, আর আমার সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল। বছর তিনেক আগে, ও আমাকে প্রথম বলেছিল, 'দাদা, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কাছে একটা আবদার করব।'

আমি আদৌ ওর আবদারের বিষয়টি বুঝতে পারিনি, জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী ব্যাপার?'

বুড়ো বেশ কুণ্ঠার সঙ্গেই হেসে বলেছিল, 'প্রত্যেক বছরই পুজোর আগে একবার বিষ্টুপুরি রেশম তসর নিয়ে কলকাতায় যাই। কিন্তু আপনার কাছে কখনো যাওয়া হয় না।'

'আমাকে রেশম তসর গছাবে?' হেসে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

বুড়ো মা কালীর মতো জিভ কেটে বলেছিল, 'ছি ছি দাদা, আপনাকে আমি খদ্দের চোখে দেখি না। দেখে শুনে আপনার যদি কিছু পছন্দ হয়, সেটা আলাদা কথা। আসলে কথাটা কী জানেন দাদা, যজমানরা আমার খদ্দের, আবার কলকাতায় তাদের বাড়িতেই যেয়ে আমাকে উঠতে হয়। বড় লজ্জা করে। তাই বলছিলাম, পুজোর মাস খানেক আগে কয়েকটা দিনের জন্য যদি আপনার কলকাতার বাসায় একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই দেন, তা হলে বর্তে যাই।'

সত্যি কথা বলতে কি, বুড়োর সেই আচমকা প্রস্তাবটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। আবদারটা যে আসলে ওর একটি ব্যবসায়িক প্রস্তাব হতে পারে, আমি আদৌ তা বুঝতে পারিনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি স্তব্ধ, হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কলকাতার বাসা, মানে বাসাই। মাথা গোঁজবার ঠাঁই বলা চলে। সেখানে ও গিয়ে উঠবে ওর রেশম তসরের বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে ভেবেই কী রকম অস্বস্তি হচ্ছিল। অথচ এক কথায় 'না' বলে দিতেও কেমন যেন বাধছিল। তা ছাড়া, আমি কলকাতার বাসাব একলা বাসিন্দা না। পরিবার পরিজন নিয়ে আমার বাস। আমি একটু দ্বিধা করে বলেছিলাম, 'তুমি তোমার দাশপুরের বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দিও, আমি তোমাকে লিখে জানাবো।'

বুড়ো গ্রাম্য হতে পারে, কিন্তু বোকা না। তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'আমার থাকা খাওয়ার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না দাদা। সে আমার ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। যজমানদেব তো সে-কথা বলতে পারি না, অথচ থাকতে লজ্জা করে। ওরা ছাড়েও না, কিন্তু তাদের মনের কথা বুঝতে তো পারি। আপনার ঘবে কেবল আমার মালটা রাখব—তাও সারাদিন ঘুরে রাত্তিরে। সারাদিন তো আমার বাইবে বাইরেই কাটবে।

বুড়ো কুণ্ঠিত হেসে কথাগুলো বলেছিল, কিন্তু আমাব চোখে ওর সেই মুখ, সেই হাসি, আর কথা বলার ধবনটা বেশ করুণ লেগেছিল। আমি মনে মনে, দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। বুড়ো আবার বলেছিল, 'তাই হবে দাদা, আপনি আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন। আপনাকে আমি ঠিকানা লিখে দেব। তবে দাদা, মনে কিছু রাখবেন না, অসুবিধে হলে সেকথা লিখে দেবেন। মনে এল, তাই বললাম, তা বলে মানুষের সুবিধে অসুবিধে দেখতে হবে না? এ তো আর গাঁ ঘরের কথা নয়, এস বস খাও শোও, যেমন ইচ্ছে তেমন থাক, কলকাতা বলে কথা।'

বুড়ো তারপরেও অনেক কথা বলেছিল, কিন্তু আমি ক্রমেই অন্যমনস্ক হযে পড়ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ও প্রস্তাবটা করেই আমার কথা শুনে লজ্জা পেযে গিযেছে, আর সেই লজ্জা ঢাকবাব জন্যই নানা কথা বলে যাচ্ছিল। আমি অন্যমনস্ক অস্বস্তিতে চুপ করেই ছিলাম। আর আমার কানে বাজছিল, 'আমার থাকা খাওয়ার কথা ভাবতে হবে না দাদা ...আপনাব ঘরে কেবল আমার মালটা রাখব।' "এ তো আর গাঁ ঘরের কথা নয়, এস বস খাও শোও, যেমন ইচ্ছে থাক। কলকাতা বলে কথা।" ... শেষেব এই কথাগুলো আমি বিদ্রুপ বলে মনে কবতে পাবতাম। কিন্তু বুড়োকে আমি যতোটুকু বুঝেছিলাম, ও আমাকে বিদ্রূপ করতে পারে, সেটা অভাবিত। ও ওর ধারনা আর বিশ্বাসেই কথাটা বলেছিল। আমি অস্বস্তিব ভাবটা কাটাতে পাবছিলাম না, মনটাও কেমন খচখচ করছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কলকাতায় গেলে তোমাকে কতোদিন থাকতে হয়?'

বুড়ো বলেছিল, 'ক'দিন আর। চাব পাঁচদিন, বড় জোড় সাতদিন। বৎসরান্তে ক'দিনের ঠিকা ব্যবসা, বুঝতে পারছেন তো দাদা। এ তো আর আমার সাবা বছরের কারবার নয়, ভাত কাপড়ের তাগিদেও করি না। পুজোর সময় হাতে দু চারটে টাকা আসে, বাড়ির সকলের জন্য এক আধখানি নতুন জামাকাপড় কেনাকাটা করতে পারি, আপনাকে আর কী বলব, বুঝতেই পারছেন, ওতেই আমাদের অনেক সাধ মিটে যায়। তবে দাদা, আপনিই ভাববেন না। আপনাকে সামনে পেয়ে কথাটা মুখ থেকে খসে গেল, আর যজমানদের কথা ভেবে, আপনাদের নিমিই কথাটা বলতে বলেছিল। তা সে থাক, আপনাকে ও নিয়ে এত ভাবতে হবে না।' ...ওর কালো মুখে সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসিটা বড় করুণ আর কুণ্ঠিত দেখাচ্ছিল।

নিমির নামটা শুনে, আমার অস্বস্তি আরও বেড়ে উঠেছিল। আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আমি না বলে পারিনি, 'ভাববার আর কী আছে? এ তো সামান্য কয়েকদিনের ব্যাপার। তোমার সময় মতো তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে চলে এসো। তাতে তোমার যদি কিছু সুরাহা হয়, ভালোই তো।'

বুড়োর কালো মুখখানি, বড় চোখ দুটো খুশিতে জ্বলজ্বল্ করে উঠেছিল। তবু বলেছিল, 'কিন্তু দাদা, আপনাদের যদি অসুবিধে হয়—।'

'সে তো তোমারও হতে পারে।' আমি হেসে বলে উঠেছিলাম, 'কয়েকটা দিনের জন্য সুবিধে অসুবিধেটা ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে।'

বুড়ো খুশিতে উপচে উঠে, আমার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি ওর হাত দুটো চেপে ধরেছিলাম। একজন ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে আমার পায়ে হাত দেওয়াটা, গ্রামীণ ব্রাহ্মণদের পক্ষে কতোখানি বিগর্হিত ব্যাপার, আমি তা ভালোই জানি। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ আত্মীয় স্বজনরা বিষয়টিকে সহজ করে নিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, বুড়োকে কলকাতার বাসায় আসবার অনুমতিটা দিয়েও, বাড়ির লোকদের কথা ভেবে, আমি মনে মনে বেশ কিছুটা উদ্বিগ্নই ছিলাম। আমার বাড়িতে আমি কর্তা হতে পারি, তবে সেটাই শেষ কথা না। পরিবারের—বিশেষতঃ আমার স্ত্রীর ভালো মন্দ বোধের প্রশ্নটা কোনোরকমেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বুড়োর আসা নিয়ে, আমাদের পরিবারে কোনো সংকটেরই সৃষ্টি হয় নি।

মুখে আমরা যাই বলি না কেন, স্বার্থের ভাবনাটা আমাদের সকলেরই কমবেশি থাকে। সেদিক থেকে বুড়ো আমাদেরই বরং লজ্জা দিয়েছে। ও গত তিন বছর ধরে, পুজোর মাসখানেক আগে আমাদের কলকাতার বাড়িতে আসছে। এটা ওর চতুর্থ বছর। গত তিন বছর, প্রত্যেকবারই ও রেশম তসরের গাঁটরি ছাড়াও, আমাদের জন্য কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে, নারকেল, ডাব, মোচা, কলা, এমন কি থোড় আর বড়িও বাদ যায়নি। আমি বা আমার স্ত্রী, হা হা করে উঠলেও, মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছি। তা ছাড়া, সব থেকে বড় কথা যা, তা হলো, বুড়ো যে-কদিন থাকে, রাত্রে ছাড়া সারাদিনে ওর অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায় না। ও আমাদের সকলের আগে, ভোর বেলা উঠে বেরিয়ে যায়, সারাদিনে আর ফেরে না। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, রাত্রেও ফেরে নি। জিজ্ঞেস করলে জবাব পেয়েছি, 'বড়বাজারে নতুন মহাজনদের সঙ্গে খাতির জমে গেচে, তাদের একজনের গদীতেই ছিলাম।'

জানি না, বুড়ো কতোখানি কুণ্ঠা আর সংকোচের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসে আর থাকে, কিন্তু ও যে খুবই সচেতন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ বছরটা আমি একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম, বুড়ো আসতে পারবে না। বরং খবরের কাগজ পড়ে, আমি যে অস্থিরতা বোধ করছি, তার একটা কারণও বুড়োদের পরিবার। ঘাটাল দাশপুরের ভয়াবহ খবর পড়ে, বুড়োদের জন্য একটা অসহায় উদ্বেগ আর অস্থিরতা বোধ করা ছাড়া, কিছুই আমার করার ছিল না। তার মধ্যেই এলো নিমির এই মর্মান্তিক চিঠি। "ও আপনার কাছে গেচে।" তারিখ আর সময়টাও স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে, "১৬ই ভাদ্র শনিবার।" ভোর রাত্রের অন্ধকার থাকতেই এক কোমর জল ভেঙে, গাঁটরি মাথায় ছাতা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আজ একুশে ভাদ্র, বেস্পতিবার। দিনের হিসাবে আজ ষষ্ঠ দিন। ভাদ্র মাসের ষোল তারিখেই তো বুড়োর কলকাতা পৌঁছুনো উচিত ছিল। কিন্তু ও আসেনি। এই ছ'দিন ধরে ও কোথায় ঘুরছে? ও কী কোনো যজমানের বাড়িতে উঠেছে? অথবা বড়বাজারের কোনো গদীতে? তা

যদি হবে, আমাকে কি একটা খবর দিতো না ?

আমার চোখের সামনে, বুড়োর মাথায় গাঁটরি আর ছাতা ঢাকা দেওয়া চেহারাটা ভাসছে। ও কোমর জল ভেঙে হেঁটে আসছে। অথচ, আশ্চর্য, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কারণ খবরের কাগজে দেখছি ১৫ ভাদ্র শুক্রবার গভীর রাত্রেই ঘাটাল একতলা সমান জলের নীচে ডুবে গিয়েছে। দাশপুর সেখান থেকে কতোটুকু দূর ? অথবা দাশপুরের সেই গ্রাম ? সেখানকার মানুষ তখনো বৃষ্টির জল ভেবে, কোমর জলে কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? সেই অঞ্চলও কি একতলা সমান ডোবেনি ?

ডুবেছে। নিমির থেকে আমার আরও বেশি অজানা, কেন একসঙ্গেই শুক্রবার রাত্রে ঘাটালের পার্শ্ববর্তী দাশপুরের সব অঞ্চল ঘরের মাথা ছাপিয়ে ডুবে যায়নি। আমি ওর চিঠিটাই আবার মেলে ধরলাম, "আর দুলালের সঙ্গে ফিরতি মিছিল গাড়িতেই ওকে পাটিয়ে দেবেন। বলবেন, তা নইলে আমার মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না। দাদা, ভাববেন না, বানের জলে আমি ডুবে মরতে বসিচি। আমি এখন খুব ভাল জায়গায় আছি। পাশের গাঁযের একমাত্তর তেতলা বাড়ি, আমার শ্বশুরবাড়িরই আত্মীয়সূত্রতায় জ্ঞাতিদের বাড়ি। কিন্তু দাদা বড় পাপের জায়গায় এসে উটিচি ! তবে সে কথা পরে, আগে আমাদের সব বৃত্তান্ত লিখি। লিখব কি, লিখতে হাত সরচে না দাদা। আমরা বৃষ্টির জল ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু ও চলে গেল আর আশেপাশের লোকের মুখে নানান কথা শুনতে লাগলাম। কেউ বলচে কাঁসাইয়ের হানা দিয়ে জল আসচে, কেউ বলচে শিলাইয়ের বাঁধের হানা দিয়ে উবজেচে আবার কেউ বলচে রূপনারাণ ধেয়ে আসচে। গাঁযে লোকের হাঁকডাক্ কান্নাকাটি। সবাই গরু বাছুর ছাগল হাঁস উঁচু জায়গায় নিয়ে তুলচে। যাদের দোতলা ঘর আছে, তারা সেখানেই গরু ছাগল ঠেলে তোলা করচে। আমরাও বাদ যাইনি। তখনো ভাবচি, মাটির ঘরের দোতলায় থাকলে বিপদে পড়ব না।

"দাদা, ভগবানের কি কল, ও চলে গেল, ঘণ্টা দুয়েকও হয় নাই, আমরা সব দোতলা ঘরে তোলা করছি। বৃষ্টি তো আছেই, আচমকা দেখি চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে জল আসচে। দেখতে দেখতে মাটির ঘরের একতলায় কোমর সমান জল। প্রথম আমার খুড়াশ্বশুরের মাটির দোতলা ভেঙে পড়ল, তার শব্দেতেই মরে যাবার মতন হল। আর মানুষ গরু ছাগলের কি হাঁক চিৎকার। সারা গাঁ ঘরে কান্নাকাটি. কে কাকে দেখবে। আমার দেওর আর দুলাল তাড়াতাড়ি দক্ষিণের বাগানের একটা বড় আম গাছে মই ঠেকিয়ে আমাদের ডেকে উটতে বলল। বললেই কি উটা যায় ? দেখতে দেখতে জল বাড়ছে, আর জলের কি তোড়, কি মাতন। কোন্দিক থেকে আসচে. কোন্দিকে টানচে, কিছু বুঝতে পারি না। তখন আমাদের মাথা ডোবা জল। দুলাল ওর তিন বছরের বোনটাকে আগেই টেনে গাছে তুলেচে, সে আবার আমার ভারি ন্যাওটা, খালি কাকি কাকি বলে কাঁদচে। আমি ভেসে গাছ জড়িয়ে থাকলাম, ওদিকে আমার জাকে ঠাকুরপো টেনে আনচে মইয়ের কাছে ! জা সাঁতার জানে, কিন্তু তোড় ঠেকাতে পারচে না। ঠাকুরপোর এক হাতে জায়ের এক বছর ছেলেটা। জা কোনরকমে গাছ ধরে মই বেয়ে ওপরে ওটল। ঠাকুরপো তার হাতে ছেলে দিল। তারপরে আমি উঠলাম। তখনই দুলাল হাঁক দিল, টেঁপি—অ টেঁপি, কোতায় গেলি লো। মনে আছে ত দাদা, টেঁপি আমার সেই ভাসুরঝি, এগার ক্লাসে পড়ত। ভাসুর তখনো দোতলার ঘরে, সেখান থেকে বলল, টেঁপি তো তোদের কাচেই গেছে। কিন্তু কোতায় টেঁপি. কোতাও নাই। দাদা সর্বনাশের কথা কি বলব, জা দুহাত তুলে হাঁক দিল টেঁপি লো, আর অমনি ঝপাসে তার ছেলে পড়ে গেল জলে। পড়ল আর ডুবল, তোড়ে ভেসে গেল, দুলাল জলে ঝাঁপ দিল। আমার জাও ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, আমি হাত টেনে ধরলাম। আমার কি শক্তি দিদিকে ধরে

রাখি। সে আমার হাত ছাড়িয়ে নিতে গেল, আর কান্না, অরে আমার খোকা কোতায়। তখন ঠাকুরপো বউদির চুলের মুটি চেপে ধরল, ওদিকে ভাশুর দোতলার ঘর থেকে নামচে না। দুলাল ফিরে এল খালি হাতে, গাছে উটে বাপকে ডাকল। ভাশুর হেঁকে বলল, গরু বাছুর নিয়ে সে ঘর ছাড়বে না। দুলাল কত মুখ খারাপ করে বাপকে ডাকল, উপায়ান্তর না দেখে আবার জলে ঝাঁপ দিল। একতলা তখন ডুবুডুবু তার ভিতরেই ঘরে ঢুকে উপরে উটে, বাপকে টানতে টানতে জলে ভাসিয়ে নিয়ে এল। ভাশুর তখনো তাব কোমরের কষিতে কিছু গুঁজচে। হয় তো নগদ টাকা যা ছিল সামান্য, আর সোনা দানার দু একটা টুকরো। দাদা, ভাশুর আমাব প্রাণে মরত। দুলাল তাকে নিয়ে গাছে উঠতে না উঠতেই, আমার এতকালের শ্বশুরঘর মুখ থুবড়ে পড়ল। গরু বাছুবগুলো ভাসল। তাদের মরণ ডাক এখনো শুনতে পাচ্ছি। ভাশুর পাগলেব মতন গাছে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত বের করে ফেলল। তাকে ধরে বেখেচে দুলাল, দিদিকে ধবেচে ঠাকুরপো। তিন বছরেব মেয়েটা আমার কোমর জড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদচে।

"দাদা, সর্বনাশেব বাখান আর লিখতে পাবচি না। একটা ছেলে গেল, টেঁপির খোঁজ নাই—" .. হ্যাঁ, টেঁপিকে আমি বিষ্ণুপুরে দেখেছিলাম। কালো হিলহিলে হাসিখুশি চেহাবা, তেমন ময়লা কাপড়চোপড পবে থাকলে, ওকে বাউবিদেব মেয়ে ছাড়া কিছু মনে হতো না। কিন্তু ও সেজেগুজেই থাকতো, আব চোখে মুখে ধাবালো বুদ্ধিব ছাপ ছিল। শুনেছি, মেয়েটি লেখাপডায ভালো ছিল। ঘাটালেব কলেজে সে পডতে যাবে, এই তাব বড় সাধ ছিল। তার ভালো নাম ছিল ঝরনা। আমাব মুহূর্তের অন্যমনস্কতায সেই হাসিখুশি কালো, হিলহিলে মেযেটি, নিমিব চিঠির ওপরে ভেসে উঠলো। আবাব নিমির চিঠির কথা পডলাম, "টেঁপিব খোজ আব কোনোদিন পাওযা যাবে না। দাদা, টেঁপি সাঁতাব জানে, তবু কি কবে ভেসে গেল। দুলাল আব ঠাকুবপো সাঁতার দিযে কলা গাছ কেটেচে, গাছেব উপব তোলা করেচে, মাচা বেঁধেচে। দুদিন কেউ খোঁজ করে নাই। লজ্জাব কথা না দাদা, ঘেন্নাব কথা, ময়লা কাপড়ে দুদিন কেটেচে, খাওযা তো দূরেব কথা, তাবপরে নৌকা নিয়ে এসেচে গাঁযেব জোয়ান ছেলেরা, সবাইকে ইস্কুলবাডিতে নিয়ে যাবাব জন্য। কিন্তু ভগবানেব কি মতি, তখনই আব একখানা নৌকা আমাদেব গাছেব সামনে এসে ভিডল। জল তখন কিছু নীচেব দিকে, টান বেজায। এসে আমার ভাশুবকে ডেকে একজন বলল, আপনাকে নিতে এসেচি বতনদা পাটিয়েচেন। নাম শুনেই চিনতে পাবলাম, বতন চক্রবর্তী, আমাদেবই জ্ঞাতি, মস্ত বডলোক, গাঁযেব বুকে তেতলা বাডি। ভাবুন, আমাদের গাঁযের মুখে একতলা হাসপাতাল ডুবে গেচে, (আসলে হেলথ সেন্টাব) ইস্কুলেব একতলাও ডুবেচে। আমার ভাশুব যাব না যাব না বলে হাঁক। ঠাকুবদা ঠেলে তুলে দিল নৌকায়। আমরাও সবাই উঠলাম। কিন্তু জানি না, আমাবই মনের পাপ হবে বা, বতন চক্রবর্তী আমাব সম্পর্কে ভাশুর হলেও, লোকটাকে কোনদিন ভাল লাগে নাই। এক একজনেব চোখ মুখ হাসি দেখলেই কেমন যেন লাগে। লোকটাব সামনে বেরলেই যেন কেমন গাযে কাঁটা দেয়। দুলালের মেজকাকাও (বুড়ো) তাব দাদাটিকে দেখতে পারে না। তবে সেই সময় মনে হল, আমাদের মতন ভাগ্যি কারুর নাই।

"দাদা, আজ ২০ শে ভাদ্র, বৃষ্টি এখন নাই। তেতলাব এক ঘবে বসে আপনাকে ছাই মাথা কি লিখচি জানি না। পাশের ঘরে বেটারির বেডিও বাজচে। গান বাজনা শোনা যাচ্ছে। এ বাড়িতে বেছে বেছে লোক তোলা হয়েচে। কোতা থেকে এত এত পোঁটলা খাবার আসচে, কোথা থেকে নৌকায় করে টিন টিন কেরোসিন আসছে, তেরপল পলিতিন আসচে, কিছু বুঝতে পারচি না। কি বলব দাদা, যেন এক যজ্ঞি বাড়িতে রয়েছি। খাবারের কোন অভাব নাই। আর আমার জ্ঞাতি

ভাশুর—দাদা লিখতে লজ্জা করে, এর মধ্যে মদ খাচ্ছে। দু চারটি মেয়েমানুষকে দেখে আমাব ভয় লাগচে, তারাও যেন মেতে উঠেচে. আর ভাশুরের সঙ্গে এক ঘরে দরজা বন্ধ করে কি হাসাহাসি করচে। গেল কাল ১৯ শে ভাদ্র দিনের বেলা এসিচি, সন্ধে ঝোঁকেই জ্ঞাতি ভাশুব আমার হাত ধরে টানল। তার বউ এসে না পড়লে বোধহয় ছাড়ত না।

"এ কার পাপ, কিসেব পাপ জানি না, রাজ্যের মানুষ ডুবচে, মরচে; চারদিকে মড়ার গন্ধ, তাব মধ্যে এই পাপ। কেন বলচি দাদা, আমাব জ্ঞাতি ভাশুরের বাড়িতে দেখচি ষণ্ডাগুণ্ডার মতন সব ছেলেরা রয়েচে, তাদের ভাব-গাবও ভাল ঠেকচে না। তাদের চোখ টকটকে লাল, খলখল হাসচে, থেকে থেকে নৌকা নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর খাবাব দাবার বিস্তর দ্রব্য সব নিয়ে আসচে। আজ সকালেও জ্ঞাতি ভাশুর কয়েকবার আমাকে ধরবার ফাঁদ করেচে, পারে নাই। আমি একটা কাটারি যোগাড় করে কোমচে গুঁজেচি। কাগজ কলম যোগাড করে, এক ঘর লোকের সামনে আপনাকে চিটি লিখচি। আমার নিজের জা ভাশুর পাগল পাগল মতন হয়েচে, কথা বলে না। দিদির তিন বছরেব মেয়েটা সব সময়ে আমাব আঁচল ধবে আছে। দাদা আব লিখতে পাবি না। ওকে বলবেন, কাটারি সম্বল কবে এখন বেঁচে আছি, ও যেন দুলালেব সঙ্গে ফিবতি মিছিল গাড়িতে কাল চলে আসে। মা দুর্গা যখন আমাদের দেখলেন না, তখন ও আব কি কববে। দিনকাল ভাল হলে আবাব কোতায আপনার দেখা পাব জানি না। আমার প্রণাম নিবেন। ওকে ফিরে আসতে বলবেন। ইতি ··· ।"

আমি আবাব ওপবের লেখা পড়ছি, ভাবছি, বন্যাব তাণ্ডবের কথা সবাই জানে। সেই ভযঙ্কর মৃত্যুলীলাব মধ্যে মানুষেব এই পাপেব ঘটনা অবিশ্বাস্য লাগছে। বুঝতে পাবি না, কে বেশি ভয়াবহ। মানুষ, না প্রকৃতি? কিন্তু আমবা তো জানি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হাবানো পাপ। সেই জানাটাই কী নিমির কোমবে গোঁজা কাটাবি?

যেন তাই হয। নিমি, তুমি মহিষমর্দিনী হও। কিন্তু ভাই, যে আমাব কাছে আসেনি, তাকে আমি তোমাব কাছে ফেরত পাঠাবো কেমন করে? সে কোথায়? বুড়ো? ষোলই ভাদ্র শনিবার ভোব রাত্রে বেরিয়ে—। মুহূর্তেই আমার মস্তিষ্কে যেন বিদ্যুৎ ঝলক ফালা ফালা করে দিল। দুলাল এসে কেবল চিঠিটাই দিল, কিন্তু একবাবও তো জিজ্ঞেস করেনি, মেজকাকা ভালো মতো পৌছেছে কী না? অথবা মেজ কাকা কোথায। আমি চেযার ছেড়ে উঠে, চিৎকার করে ডাকলাম 'দুলাল, দুলাল এ ঘরে এসো।'

আমার পাশের ঘবে এখন স্তব্ধতা। দুলাল এসে আমাব সামনে দাঁড়ালো। আমি ওব গর্তে ঢোকা চোখেব দিকে তাকালাম, চেষ্টা করলাম গলার স্বব অকম্পিত রাখতে। বললাম, 'দুলাল, বুড়ো তো আমাব কাছে আসেনি।'

'জানি।' দুলাল মুখ ফিরিয়ে নিল।

তীক্ষ্ণ কশাঘাতে চমকিয়ে উঠলাম, 'জানো?' কী জানো?'

'কাকা, মোটর বাসেব চাতাল তক্ পৌছোতে পাবে নাই।' দুলালের স্বর যেন সেই দূবের গ্রাম থেকে ভেসে আসছে, 'মাইল দুয়েক আগেই কাঁসাইয়েব হানায় তলিয়ে গেচে।'

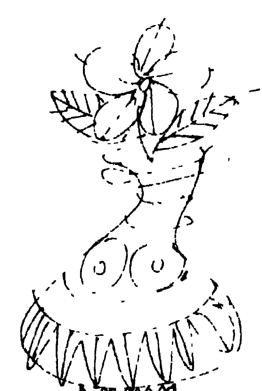
আমি দুলালের মুখের দিকে তাকালাম। বুকের মধ্যে খামচাচ্ছে। দুলালের গলা আগেব থেকে স্বচ্ছ, চোখে ওব জলেব কোনো আভাসই নেই। আমার গলার কাছে শক্ত কিছু আটকে যাচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে জানলে?'

'কাকাকে সবাই চেনে, সবাই বলেছে। গাঁটরি ছাতা, সব পাওয়া গেচে। সে সব আমাদের বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরেব এক পঞ্চায়তের লোকের কাছে রাখা আচে, আমি আসবার সময়

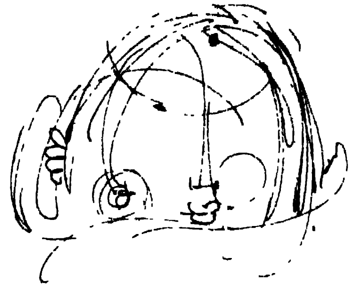
দেখে এসিচি।' দুলাল আমার দিকে না তাকিয়ে, সেই দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে বলল।

আমি মুহূর্তেই আমার সমস্ত ধৈর্য হারালাম, রূঢ় তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপরেও তুমি কাকির চিঠি নিয়ে আর আমার কাছে এলে কেন?'

দুলাল আমার দিকে তাকাল। অন্ধকার কোটরে সেই দুই চোখ, দৃষ্টিতে ভয়, না ব্যথা না যন্ত্রণা, কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কোনো জবাব দিল না। ওর মাত্র কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার চিত্রগুলো, নিমির চিঠির অক্ষরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, মুখ ফিরিয়ে নিলাম আর আমার ধৈর্যচ্যুতি রূঢ় তীক্ষ্ণতা সবেগে ধাক্কা খেয়ে, আমাকে কোনো অতলে টেনে নিতে লাগলো। আমি অনুভব করলাম, আমার মস্তিষ্কটা একটা বিশাল মৃত্যুপুরীর মতো হয়ে উঠছে, আর সেখানে প্রতি কক্ষে, কোষে, রন্ধ্রে নিমির চিৎকার বাজছে, 'ও আপনার কাছে গেচে। ও আপনার ।'



শহীদের মা



শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হলো, পেটেব মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁটে টিপে পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনেব উনোনে তরকারি চাপানো, চড়চড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি বকড়ায় লেগে পুড়ে যাবে, বিমলা তথাপি নডতে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজেব গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আব তাঁব বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল' বাদল রয়েছিস?' পরমুহূর্তেই তাঁব শবীবটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইবের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তাবপরে দরজাব দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তবকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কডাটাব দিকে একবাব তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পাবলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হযে যাক। চোখ ফিবিযে নিযে রান্নাঘরেব বাইরে এলেন। আকাশে ঘন মেঘ। পুবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধাবে টগর গাছটা বাতাসেব ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। একবছবেব শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পডতে চাইছে। বাডিটা নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনেব দেওযাল, মাথায টিনের চাল। মনে হয় বাডিতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশেব বাডিতে কণারমা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফণিমনসার বেড়া ডিঙিযে সেদিকে একবাব দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায। লোকজন দেখা যায না। তিনি চোখ ফিবিযে আবার ঘরেব দবজা খোলা বাড়িটাব দিকে তাকালেন। কাবোব কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথেয বাসি সিঁদুবেব দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আব বিবর্ণ কযেক গাছা সোনাব চুড়ি। সেমিজের ওপবে খয়েবি পাড়ের সাদা শাড়ি। ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রৌঢ় বয়সেও শবীর বেশ শক্ত মুখেব রেখাতে বযসটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়সে সুশ্রী আর সবল ছিলেন। এখন তাব চওড়া শরীর যেন শক্ত আব কঠিন।

বিমলা কযেক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরেব পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে একটা জবাফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তব দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইঁট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে

ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই,আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইঁটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখেছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদীটার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর কিছু নেই। বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরি হলো, তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই ওরা ডাকতে এসেছিল। এ বাড়িতে আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের দুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তার ধারে, এখন যেখানে কয়েকটা ইঁট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন। কেন গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, 'মাসীমা আপনি একবার চলুন।' বিমলা গিয়েছিলেন যেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মতো। তার দুদিন আগে, আঠারো বছরের বাদলকে ওইখানেই কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট। নিথর বাদলকে এ বাড়ির উঠোনে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোট ছেলে। বিমলার শেষ সন্তান না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচে নি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপনমনেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল।' উঠোন জুড়ে মানুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হরিবোল ধ্বনি দেয় নি। স্লোগান দিয়েছিল। 'কমরেড বাদল, জিন্দাবাদ! খুন কা বদলা খুন।' কিন্তু বিমলা আর ভালো করে কাঁদতে পারেন নি ডাক ছেড়ে কান্না যাকে বলে, তেমন করে কাঁদতে পারেন নি। সময়ে অসময়ে,কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বেদীটা তৈরি হয়েছিল। বাদল যেদিন খুন হয়, সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অন্য কোনো দলের সভা, বাদলের না। সেখান থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারে নি। সন্ধের ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারে নি। কেউ বলে, বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনীরা আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরো অনেক রকম কথা কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিৎকার লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধের ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পুলিস এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিস কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। হত্যাকারী বলে যাদের নাম করা হয়েছিল, তাদের মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তাদের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হবার দু দিন পরে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও ছোটখাটো সঙ্ঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহীদ বেদীর কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনেব ষোলটা ইঁট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল, 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন' ···ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলেব নাম করে কী সব বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায় নি। তিনি আচ্ছন্নেব মতো দাঁড়িযেছিলেন। আবাব আচ্ছন্নেব মতোই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মতো গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কাবোব সঙ্গে কথা বলেন নি। কৃপা দয়ালের সঙ্গে না, হরপ্রসাদ নিজে এসে বান্নাঘরেব দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'কত দিন বলেছি, ওই দলটাব সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।'

বিমলা কোনো জবাব দেন নি। হবপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, 'এখনকার এ সব পার্টি, খুনখাবাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যাব গেল, তাব গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।'

হরপ্রসাদ চুপ কবেছিলেন। বিমলা কোনো জবাব দেন নি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হবপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী কববাব আছে। আমাব দেরি হয়ে গেছে, অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছে নেই।'

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোনো কথা হয় নি। তবে এই তিন মাসে মাঝে মধ্যেই ওই কথাটা বলেছিলেন, 'মনকে শক্ত কব। বাদলকে তো আব ফিরে পাওয়া যাবে না।'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেন নি। সংসারেব কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে কী দরকাব, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষযে কোনো কথা বলেন নি। কৃপাল দযাল কোনো কথাই বিমলাকে বলে নি। কৃপাল চাকরি কবে। দয়াল বেকাব। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলেব লোক। বাড়িতে ওবা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা-তেল-সাবান, চান করাব কথা বলে, সিনেমা থিযেটাবের কথাও বলে। দলেব কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলাব কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজাব কবে দেয়। কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলেব বিষযে কোনো কথা হয না। যেন ওদেব ভাই মরে নি। অন্য পার্টিব একটা ছেলে মরেছে। হযতো নিজেদের পার্টিব লোকের সঙ্গে কথা হয। বাড়িতে কোনো কথাই নেই।

বিমলা জবাগাছেব গা ঘেঁযে ভাঙা বেদীব দিকে দেখছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলাব সাবা শবীরে জেগে বযেছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেই দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠাবো বছর আগে এই দিনে, এ সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবাব জন্য বিমলাব পেটে অশান্ত হয়ে উঠছে।

বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ যে কোনো সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পাবে। এ সমযেই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তাব কবিরাজেব দবকার ছিল না। বিমলা নিঃশঙ্ক। তিনি সবই বুঝতে পাবছিলেন। অভিজ্ঞতা তাঁব শবীরেব প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। ব্যথা উঠলে বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা নিস্ফল ব্যথা না। সময় আসন্ন। আঠাবো বছর আগে এই দিনে, এই

সময়ে উপরঝাপ্তি বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না। বিমলা কোনোরকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপিচুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি, আর সময় নেই।'

কণাব মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলাব সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছ'সাত বছবের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিলেন মেঘুব মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকাব মতো ঢাকঢোল পিটিযে বিমলাদেব প্রসব হতো না। মেঘুব মা-ই খালাস করাত। মেঘুব মা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল, হ্যাঁ, আসল ব্যথা। আব বেশি দেবি নেই।

কণাব মা তাড়াতাড়ি বান্নাঘব খালি করে দিযেছিল। সেই ঘবেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্যবকম ছিল। টিনেব দেওযাল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। ছেঁচা বেড়াব দেওযাল। মাথায তখনো টিনের চাল, কাঁচা মাটিব মেঝে। বিমলা বান্নাঘবে মাদুবেব ওপব শুযে বসে ব্যথাব তীব্রতা সহ্য কবছিলেন। কণাব মা কী কববে ভেবে পাচ্ছিল না। তাবও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা নিঃশ্বাস বন্ধ কবে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে স্থিব থাকবাব চেষ্টা কবছিলেন। তার মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে! হবপ্রসাদের সাধ ছিল মেয়ে হয যেন। হরপ্রসাদেব সাধ, বিমলাবও সাধ। দুই ছেলেব পরে একটি মেয়ে। কিন্তু তাব শেষ গোঙানিব সঙ্গে, যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে ছেলে। মেঘুর মায়েব হাত, বিমলারপেটে চেপেছিল। তখনো ফুল পড়ে নি, আব একটি ব্যথাব অপেক্ষা। তাব মধ্যেই, বিমলা লহমায দেখে নিযেছিলেন। বক্তে আব লালায মাখানো একটি ছেলে। তখনো গলায কান্না ফোটে নি। ছোটখাটো এক-আধটা গোঙানি মাত্র। ফুল পড়াব পবে প্রথম গম্ভীরস্ববে কেঁদে উঠেছিল, ওঁয়া ওঁযা।

মেঘুব মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, কত বড়। যেন পেট থেকেই এক বছরেব ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।

মাতৃমুখী। বিমলা তাকিযে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেন নি। মেঘুব মাযেব কোলেব দিকে তাকিয়েছিলেন আব হঠাৎ-ই নিজেব কোলটা বড় ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে না হোক, নাড়ি ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা কর্বেছিল। সে কথা বলতে পাবেন নি। মনে মনে বলেছিলেন, মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয।

বাইবে তখনো মুষলধাবে বৃষ্টি হচ্ছিল। কণাব মা বিমলাকে সাব্যস্ত হযে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গবম কবে খেতে দিয়েছিল। মেঘুব মা নতুন শিশুকে গবম জল দিয়ে ধুযে মুছিযে, কাঁথায মুড়ে বিমলাব কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি বে বাপু। জলেব তোড়ে এলি, বাপেব যেন এবকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাদুলে ছেলে বাবা, জগৎ ডোবানো বিষ্টি মাথায কবে এলো।' জগৎ-সংসাবভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থৈথৈ কবছিল। তখন বান্নাঘবেব অবস্থাই বা কি। এখন তো অনেক পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপবে ক্যানেস্তাবাব গোজামিলের চাল। ঘবেব এখানে সেখানে টপটপ কবে জল পড়ে। বিমলা একটা কোণ বেছে নিযে ছেলেকে বুকেব কাছে ঢেকে শুযেছিলেন। কণাব মা চলে গিযেছিল। তার তো সংসাবেব কাজ। মেঘুব মা ছিল। তাব ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকেব কাছে নিযেও কপাল দযালেব কথা বিমলাব মনে পড়েছিল। ওবা তখন স্কুলে গিযেছিল। বিমলার দুশ্চিন্তা যা দুবন্ত তাঁর ছেলেবা। বৃষ্টি মাথায কবে, স্কুল থেকে বেবিয়ে পড়েছে কিনা কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজাব ইচ্ছে হলে, মাস্টাবমশাইবা কি আব ধবে বাখতে পাববে। হবপ্রসাদেব কথা মনে পড়েছিল।

অফিসে যাবার ইচ্ছা ছিল না। বিমলা-ই জোব করে পাঠিযে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া কবার কিছুই নেই। তাব চেযে অফিসেব কাজে থাকলে ভালো থাকবে। এদিককাব ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কণার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুব মাকে ডেকে নিযে আসা। এমন কিছু হাতি ঘোড়া ব্যাপার তো নয়। পোয়াতী মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োবে, তাব জন্য পাড়া দূরেব কথা, বাড়ি মাথায় কবার কিছুই নেই। ভালোভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাকপক্ষীতেও টেব পায় নি। ঝমঝম বৃষ্টিব শব্দে, আশেপাশে কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবাব চেষ্টায মুখেব কাছে ছুঁইযে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধবিয়ে দিতে হয। শিশুব মুখেব দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবাব কেমন হবে কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হযেছে। কৃপাল দযালেব বেলাতেও। সব মাযেব কি এমনি মনে হয়? কে জানে। কৃপাল দযালেব পবে আবও দুটি হযেছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী কববে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বুকেব কাছে আবও চেপে ধরেছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুবমা বলেছে, মাতৃমুখ। বলেছে, খুব দুষ্টু হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয না, দুষ্টুও হয়। কী দুষ্টুমী কববে? বিমলাকে জ্বালাতন কববে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন্ ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। কৃপাল দযাল যে বকম দুবন্ত, এও সেইবকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলেপিলে তো দুবন্ত হবেই। তাব জন্য বকুনি খাবে, মাব খাবে, আবাব ভুলেও যাবে। কৃপাল দয়াল যে রকম করে। ওদের দৌরাত্ম্যে এক এক সময অস্থিব হযে পড়েন। তখন না মেরে উপায থাকে না। এও দুষ্টুমি করলে মাব খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন? বড হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বুকেব কাছে তুলে, স্তন গুঁজে দিযেছিলেন। সদ্যোজাত শিশু তা নিতে পাবে নি। তখন দুধেতে পলতে ভিজিযে মুখে দিযেছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনো কথাই ভোলেন নি। এই তো যেন সেদিনেব কথা। প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট মনে আছে। কৃপাল দয়ালেব কথাও মনে আছে। ওবা জন্মে ছিল পদ্মাব ওপারে, নিজেদের ভিটেয। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল।

বৃষ্টি একটু ধবতেই, কাক ভেজা হযে, কৃপাল আব দযাল বাড়ি এসেছিল।

আঁতুড় মানতে চায নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দযাল তো বায়না ধবেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুব মা ধমক দিয়েছিল, বিমলা সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল চান কববার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধ্যেবেলা হবপ্রসাদ বাড়িতে এসে আগেই আঁতুড়েব দবজায গিযে দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিযেছিলেন। দবজাটা বন্ধ ছিল। বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুব মাকে বলেছিলেন, 'কৃপাব বাবা এসেছে, দবজাটা খুলে দাও।'

মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস কবেছিলেন, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথাব কোনো জবাব দেন নি। হাবিকেনেব আলোব সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীবভাবে শব্দ করেছিলেন, 'হুম্!' তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন, 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মতো হয নি।'

বিমলা ওসব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিলেন, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিলেন। বিমলা একটু গর্ববোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই মুখ দেখে হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখে নি।

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখ যে।'

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। নামটা তখনই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জবর বাদুলে, একেবারে বাদলা।'

ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনীরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে সে রান্না-বান্না করবে। বীণা বড় ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতেছিলেন। সেদিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয় নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। এদিকে মেঘুর মা নানানখানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সন্তান নিয়ে কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ সেই দিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন এখন, বেলা এগারোটা। চুপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে জবাগাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ, আবার, আবার মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন? সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর, অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তাঁর গর্ভের মধ্যে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে। তিনি মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল।'

'মা! ও মা।'

কৃপালের গলা। কৃপাল ডাকছে, বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি, ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনোদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে আস্তে আস্তে তাঁর মনে পড়ল, কৃপাল দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতো। কৃপাল-দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে দুজন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোট বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখাশোনা করেছে। ছোট্ট ভাইটিকে দুজনেই ভালবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলতো। ছোট ভাইকে কিছু না দিয়ে দুজনে মুখে তুলতো না। পিঠোপিঠি হলে যা হতো না। কৃপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগেছিল। ওরা দুজনে ছিল সমানে। ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি তুলতে হতো। হরপ্রসাদও শাসন করতেন। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দুজনেই কাড়াকাড়ি। সব কথাই মনে আছে বিমলার। বাদল যখন কথা বলতে শিখেছিল তখন কৃপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালবাসে। কার কাছে থাকতে চাইতো। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারতো, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন যুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন, 'একফোঁটা ছেলের চালাকি দেখ।'

হরপ্রসাদও ছোট ছেলেটিকে ভালবাসতেন। কৃপাল দয়াল যত না আদর কাড়তে পেরেছে,

কোলে চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে। কিন্তু সে সবই ছেলেবেলাব কথা। তখন সংসাবের চেহাবা ছিল অন্য বকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতেন আব প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতেন। অবসর সময়ে, নিজেব দল নিয়ে মেতে থাকতেন। বিমলার তাতে কোনোদিন কিছু যায় আসে নি। পুরুষমানুষ কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদেব সে সব ভাবতে গেলে চলেনা বিমলা ববং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনেব সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা-সমিতি করছে। তবু নেশা ভাঙ করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট কবে না। সবাই হবপ্রসাদ বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়াব একজন গণ্যমান্য লোক বাইরে বাইরেব মতো, সংসারে সংসাবেব মতো। স্ত্রী পুত্রদেব নিয়ে, গবীব মধ্যবিত্তেব জমজমাট পবিবাব।

আস্তে আস্তে কৃপাল দয়াল বড হয়ে উঠতে লাগলো। ওদেব পিছনে বাদল যত বড হয়ে উঠতে লাগল সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো। বাদল দাদাদেব সঙ্গ আব পাচ্ছিল না। ওবা তখন বাইবেব জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। ওদেব কোথায় কী দল, বন্ধু, সে সব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগৎ খুঁজে নিয়েছিল। ওবও বন্ধু ছিল, খেলাধুলা ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ কবে কখনো কিছু ভাবেন নি। ববং মনে হয়েছে, এবকমই হয়। সকলেবই হয। বড় হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যাব আলাদা পথে ফিবছে।

কেবল হবপ্রসাদ বিবক্ত হচ্ছিলেন। কখনো বাগ, কখনো ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ কবে কৃপাল আব দয়ালের ওপরে। বিমলা হবপ্রসাদেব কাছে শুনতেন, কৃপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে। ছাত্রবা সবাই করে। কৃপাল দয়ালেব কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পাবতেন, হরপ্রসাদ যে বাজনীতি করে কৃপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, 'কলেজে ওবা কী কবছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?'

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, 'ওসব বাজনীতির নামে গুণ্ডামি। আমাব পযসায় কলেজে পড়ে ওসব চলবে না। তোমার ছেলেদেব এ কথা জানিয়ে দিও।'

হবপ্রসাদেব কথার ধরনে বিমলা মনে মনে রুষ্ট হতেন। আবাব ভাবতেন, বাবা যে বকম বলে ছেলেদের সেবকম চলাই উচিত। তাহলে আব সংসারে কোনো গোলমাল থাকে না। কৃপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, 'কলেজে যাস্ পডতে, সেখানে আবাব ওসব কী। তোদেব বাবা পছন্দ কবে না।'

ওদের এক জবাব, 'ওসব তুমি বুঝবে না মা।'

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখন কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। হবপ্রসাদেবও কোনো অভিযোগ ছিল না। মাযের সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশি। সংসারের কাজে কর্মে, বাদলকেই পেতেন। বকে ধমকেই করাতে হতো, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারেব চেহাবাটা বদলে যাচ্ছিল।

কৃপালেব সঙ্গেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগলো। বাইরেব বিবাদ ঘবে এসে ঢুকেছিল। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হতো না। হরপ্রসাদ ক্ষেপে উঠতেন। ক্ষেপে উঠে যা তা বলতেন। কৃপাল মাথা নোয়াতো না। সে হবপ্রসাদেব দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে থাকতো। বিমলা এসে কৃপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সবে যা এখান থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না!'

বিমলা হরপ্রসাদের ওপব খুশি হতেন না। কৃপাল তো ওঁর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু শুনলে সেই রকমই মনে হতো। কেবল কৃপালের সঙ্গে না, দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদেব একই ব্যাপার ঘটতো। বিমলা মনে করতেন, কৃপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয় নি, যখন দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়

নিতান্ত বাড়ির মধ্যে, আর বিমলা সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা কবতে পারতো না। এত দলাদলি কিসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হবপ্রসাদ কৃপাল দয়াল। আর এক দলে বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালেব দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস ক বতেন, 'কেন?'

বাদল বলতো, 'আমাদেব স্কুলেব সব ওপব ক্লাসেব ছেলেবা ছোড়দাকে মানে—ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলেবা ধর্মঘট কবে বেবিয়ে আসে।'

'তাই বুঝি ছোড়দার মতো হবি!'

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলতো না। ওব জবাব ছিল, 'তা আমি কি কবে জানবো।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ওসবেব মধ্যে যাস নি। দেখছিস্ না,বাড়িতে কী বকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তিব চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হবপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল কেউ কাবোব সঙ্গে কথা বলতো না। বিমলা বান্না-বান্না কবেন, ওবা এসে খায়। বাত্রে শোয়। কৃপাল দয়াল রোজ বাত্রে বাড়িতেও থাকতোনা। পড়াশোনা হচ্ছিল না। কৃপাল একটা চাকরি যোগাড কবে নিয়েছিল। দয়ালেবও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পার্টি করলে চলবে না। ওবও একটা চাকবি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড হয়ে উঠেছিল। ক্লাস টেনে পড়বাব সময ওব টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভিতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এতখানি বড বয়সে কোনো সন্তান তাঁকে হাবাতে হয় নি। এমন ভাবী বোগও কাবোর হয় নি। তখন দেখা গিয়েছিল, কৃপাল ডাক্তাব ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলেব মাথায় বরফ দিয়েছে। বক্ত বিষ্ঠা পবীক্ষা কবাবাব জন্য নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে, বাদলের বিছানাব সামনে বসে থেকেছেন।

তখন তো বাদল কোনো পার্টি কবে না। কবলে কী চেহাবা হতো, কে জানে। বিমলার চোখেব সামনে ভেসে উঠলো শ্মশানযাত্রাব ছবি। এ বাড়ির উঠোন থেকেই, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলেব বন্ধুবাই, ওব পার্টিব লোকেবা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায় নি। বোধহয় দাঁড়াতে পারে নি। হবপ্রসাদ একটু দূবে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে কেউ একটা কথা বলে নি। তিনিও বলেন নি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে কবে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইযেবা নয়, পার্টিব ছেলেদেব কাঁধে বাদলের মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হবপ্রসাদ চুপ কবে দাঁড়িয়েছিলেন। দাদাবা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পার্টি কবতো, তাহলে কী হতো কে জানে। শ্মশানযাত্রার মতোই হযতো, বাবা দাদারা দূবে সবে থাকতো। পার্টিব কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টিব পবিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় কবে রেখেছেন।

কিন্তু পার্টিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আগুনেব আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহীদ বেদী থেকে। তিনি বাড়িব দিকে ফিবে তাকান। ঘাড ফিরিয়ে, পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবাব চেষ্টা করেন।

'কোথায় গেলে অ্যাঁ? শুনছ।'

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছেন। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবার তাকালেন ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কিসের ছুটি। কৃপাল হরপ্রসাদ কেউ-ই কাজে যায় নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এইদিনে, এই সময়ে য ঘটেছিল, তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদীতে না, শ্মশানে না, বাদল যেন তাঁর ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে।

বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড় রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো, ওকে শিশুর মতো কোলে নেওয়া যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক তবু প্রাণে বেঁচেছিল, বিমলার সেটাই সান্ত্বনা। কৃপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেইরকম হতো। হরপ্রসাদের অল্পস্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তাছাড়া, হরপ্রসাদই তো একমাত্র কাণ্ডারী। স্বামীকে তিনি কখনো কোনো কারণে অযত্ন করেন নি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠেছিল। আগের মতো স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলতো। বিমলার মতো। বিমলা কথা কম বলেন। বেশি বলবার অবকাশ এ সংসার তাকে দেয় নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলতো। বিমলা মনে করতেন, বাদল, কৃপাল দয়ালের পথ ধরবে না বাড়িতে তিনটে পার্টির লোক। কারোর সঙ্গে কারোর স্বদ্ভাব নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখে শুনে ও আর ও-পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এলো, বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ওসব পার্টি করতে যাচ্ছিস।'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয় নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়েন নি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছেন, তেমনি করেই বাদলকে বকেছেন, ধমকেছেন। বলেছেন, 'তুই গিয়ে একটা খুনী পার্টির সঙ্গে জুটেছিস।'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিলেন, বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছেন, 'আলবৎ খুনী পার্টি। কতগুলো গুণ্ডা বদমাইস লোচ্চা ছাড়াও-পার্টিতে কোনো ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।' বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি যেন চিনতে পারছেন না। ও শান্ত আর গম্ভীরভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। কৃপাল দয়ালের মতো গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথাবলে নি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখলো। ও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে, একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করতো, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন। অথচ আবার, বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ববোধ করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দুরকম কথা জানতেন না। ঠিক যেমনভাবে কৃপাল দয়ালকে বলেছিলেন, তেমনিভাবেই বাদলকে বলেছিলেন, 'ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে, তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা, বিমলার কখনো ভালো লাগে না। মানুষটা কথায় কথায়

বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনো জবাব দেয় নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিলেন, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে ।' এমনি অনেক কথা বলেছিলেন। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনো দেখা গেল না, মাথা ঠাণ্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন কৃপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেইরকম করে কথা বলেছিল।

বিমলার বুকভরা অশান্তি আর উদ্বেগ। শেষ পর্যন্ত বাদলের ওপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে পার্টি ছাড়া, আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষপর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলেছিলেন, 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবিদাবি খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি ?'

বাদল শান্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ওসব ক্ষতি-টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে, তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওসব পার্টি-টার্টি ছাড়।'

বাদল গম্ভীরভাবে বলেছিল, আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারবো না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'তা ছাড়বি কেন। তাহলে যে আমার একটু সুখ হয়। বুঝেছি আমি না মরলে তোরা বাপ ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার। কতগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।' বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, 'এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

মায়ের কথা শুনে বাদল বোধহয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এরকম করছ কেন। বলেছি তো, আমি বাবা দাদাদের কারো সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।'

কিন্তু বাদলের সে-কথা টেকে নি। কখনো কৃপাল, কখনো দয়াল, কখনো বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে, বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমতো পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।

প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোন্‌দিন একটা কি ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'

'ও বোঝাবার বাইরে চলে গেছে।'

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না ?'

কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।'

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল

বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হবপ্রসাদও যখন একবকমভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে, 'তোমার ছোট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'

বিমলার বুকের মধ্যে সেদিন একবাব কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, 'নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পাব না। তুমি তো আব ছেলেমানুষ নও। তুমি পার্টি ছাড়তে পাব না তারপবে ছেলেকে বলতে পাব না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?'

হবপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি ওসব বুঝবে না। আমাব পার্টি ছাড়াব কিছু নেই। আমি ওদেব মতো গুণ্ডা পার্টি করছি না। কিন্তু বাদলা যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, ও একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না।'

বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, আমাকে ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদেব সংসাবে একটা দাসী বাঁদি আছি। তোমাদেব খেদমত খাটছি। আব তোমবা লড়াই করছ। এবাব আমাকে তোমবা বেহাই দাও।'

বিমলা হবপ্রসাদেব কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তাবপবেও হবপ্রসাদ আপনমনে বকবক কবছিলেন, 'বাদলাব মবণ ধবেছে। পার্টিব নেতাদের উস্‌কানিতে, ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আবম্ভ কবেছে।'

বিমলাব বুকেব মধ্যে আবাব কেঁপে উঠেছিল। বাপ হয়ে হবপ্রসাদ কেমন কবে বলেছিল, ছেলেটাব মবণ ধরেছে। কেবল বাদলেব বেলায় না। হবপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছেন। কৃপাল দয়ালেব কথাতেও বলেছেন, ওদেব মবণ ধবেছে। হবপ্রসাদ কি ছেলেদেব বাবা নয়? পিতৃত্বেব থেকেও পার্টি কি বড়? ওদের কি পিতৃত্ব বলতে কিছু নেই? পার্টি কি তাব আপন? এই সংসারেব মাঝখানে বসে, এ কথাটা কোনোদিন তিনি বুঝতে পারেন নি। কেবল ভেবেছেন, তাঁব ঘবে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেবা মিলে, একটা সুখেব সংসাব কি গড়তে পাবতো না। তাব বদলে ওবা এক একজন, এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মবণ ধবাটাই দেখতে পেয়েছে।

বিমলা বাদলকে বলেছিলেন; 'তোব বাবা দাদাবা সবাই তোব নামে নালিশ কবছে। তুই কি একটা বিপদ-আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না?'

বাদল বলেছে, 'বিপদ-আপদ আবাব কী। ওবা চায়, ওরা পার্টি কববে, আমি চুপচাপ বসে থাকব। তা আমি থাকব কেন? ওদব শাসানিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যাণ্ডা-ম্যাণ্ডাই কবতে এলে, আমবাও ছেড়ে কথা বলব না। বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, তুই কেন ওদেব সঙ্গে লাগতে যাস্?'

বাদল বলেছিল, 'আমি কেন লাগতে যাব। ওবাই আমাদেব সঙ্গে লাগতে আসে।' 'কেন, তুই বাবা দাদাদেব সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পাবিস না?'

'বাবা দাদাবা বুঝি মিলে-মিশে আছে? পার্টিব ব্যাপারে কাবোব সঙ্গে কারোর মিল-মিশ হবে না।' একটু চুপ কবে থেকে, আবাব বলেছে, 'পার্টিব সঙ্গে আমি বেইমানি কবতে পারব না। তা বাবা আব দাদাবা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদেব মধ্যে মাবামারি করছে, আমাব বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারোর পরোয়া করি না।'

বিমলা তারপবেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েন নি, 'বাপের অমতে এসব করছিস। এব

পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে?'

বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, 'বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টিকে সমর্থন করতে পারব না।'

বিমলা যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়েছিলেন। কোনোদিকে তাঁর শান্তি ছিল না। স্বামী পুত্রদের কারোকে তিনি বোঝাতে পারেন নি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টির লড়াই চলছিল। এক সঙ্গে বসে বাবা ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনোদিন সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারোর সঙ্গে একটি কথা বলতে না। কলের পুতুলের মতো সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।

'মা। মা কোথায় গেলে?'

এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে কৃপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করেছে। বিমলা কোনো সাড়া দেন নি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবে বাতাসের সঙ্গে এবার ইলশেগুঁড়ি দাটের মতো বৃষ্টি নেমে এলো। জবাগাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্নাঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে, বাদলের ওই আঁতুড়ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়ে চড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনো তাঁর গর্ভে।

বিমলা চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই আবার ভেসে উঠল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। কৃপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারে নি। পুলিস যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারে নি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদের পার্টি ছাড়াও, আরও পার্টি আছে। কিন্তু স্বীকার করে নি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।

যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন পার্টি? কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে! অথচ তারা বিমলার স্বামী পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না? কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধে পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে? তা-ই যদি হয় তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।

বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাকে ডাকাডাকি করছে। কৃপাল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছেন। ওরা নিজেরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা আলাদা ডেকে চলেছে!

'মা, ও মা!'

'মা কোথায় গেলে?'

'কই গো শুনছো, কোথায় গেলে ?'

বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে, ঘরে ঘরে, রান্নাঘরে, সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে। বৃষ্টির ছাটে ছোটাছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন, দয়াল রান্নাঘরের কাছ থেকে কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, 'মাসীমা, ও মাসীমা।'

কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, 'কী বলছিস রে দয়াল।'

'মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে ?'

'না তো। সকাল থেকে একবারও আসে নি তো। কোথায় গেল তোর মা ?'

'কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্নাঘরের দরজা খোলা। কুকুর ঢুকে, কড়াই তরকারি খেয়ে গেছে। রান্নাবান্না কিছু হয় নি।'

কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, 'সে কি রে। তোর মায়ের তো এরকম কখনো হয় না। দ্যাখ্ খুঁজে, কোথায় গেল। আমিও দেখছি।'

কোথাও যান নি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে দেখছেন। যারা বেদী তৈরি করেছিল, তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহীদ বেদী করেছিল। তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহীদ বেদীতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর আসে নি। তারা যেমন পার্টি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা ছেলেরাও করছে। বিমলারই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে বাদল পৃথিবীতে এসেছে। এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। গম্ভীর স্বরে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনাবার চেষ্টা করছেন।

বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহীদ বেদীতে না। তাঁর বুকেই আছে।

'বড়বৌ!'

হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তাঁর ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড়বৌ বলেই ডাকা হতো। হরপ্রসাদ কখনো কখনো তাঁকে ওই নামে ডাকেন। বিমলা কোনো জবাব দিলেন না।

হরপ্রসাদ বললেন, 'আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ?'

সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। বিমলা জানেন, আজ বাদলের জন্মদিন, হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারোর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন্ ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না। কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে, ওদের একটু পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে, বাদলকে পায়েস রান্না করে খাইয়েছিলেন। বাদলের জন্য আর তাঁকে পায়েস রান্না করতে হবে না।

হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিস্ময়, কারণ তিনি বিমলার কিছুই বুঝতে পারছেন না। বলেই চলেছেন, 'রান্নাবান্না কিছু কর নি। আধকাঁচা তারকারি কুকুরে খেয়ে গেছে। কী ব্যাপার তোমার ?'

হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবেন না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু

বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।

হরপ্রসাদের গলার শব্দে কৃপাল দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

কৃপাল বলল, 'মা, তুমি এখানে কী করছ?'

দয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড়বৌ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।' তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্না-বান্না করো নি, আমরা খাব কী?'

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'

তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী করব এখন?'

বিমলা বললেন, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।' অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিনজনেই দেখল। তিনজনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ কোনো কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না এই প্রথম. তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।

তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় আর বৃষ্টির ছাটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিস্ময় নিয়ে একে একে চলে গেল।

বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির ছাটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠছে, গলার কাছে উঠে আসছে। তাঁর চোখে এখন জল আসছে, বৃষ্টির জলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বুকের কাছে হাত রেখে মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমার কাছে থাক।'





মানুষ রতন

কথা চোখে চোখে। তারপর চোখের তারা উলটে খানিকটা শিবনেত্র ভঙ্গি করল। মনা ওর দিকে চেয়ে, নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, পঁক পঁক করে হর্ন বাজিয়ে দিল। যেন একটা জন্তুর খুশির ডাক। পুনিয়া তখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে, তলপেটের নিচে রঙ ওঠা ময়লা চাপা প্যান্ট, পা দুটো অনেকখানি ফাঁক করা। হাত দুটোও ওপর দিকে তুলে দু'দিকে ছড়ানো। সরু গলার ওপরে রুক্ষ ঝাঁকড়াচুলো মাথাটা না থাকলে, রোগা শরীরটা পুরো ইংরেজী এক্স অক্ষর। শরীরটাকে দুলিয়ে মনাকে চোখ টিপল। সোতে, ওদের তিন জনের দিকেই তাকিয়ে, চোখের কোণে বাঁ দিকে ইশারা করল। তারপরে লাফ দিয়ে রিকশার সিটের ওপর উঠে, উলটো দিকে প্যাডেল ঘুরিয়ে দিল বনবনিয়ে। পথ চলতি এক মহিলাকে ডেকে, চেঁচিয়ে বলল, 'রিকশা নিয়ে আসব দিদিমণি?'

দিদিমণি ওর দিকে চেয়ে, হেসে বললেন, 'এখন না।'

সোতে মুখের ভাব করল, যেন হতাশ হয়েছে। মাথাটা নীচু করে হাত ঝুলিয়ে দিল। তারপরেই আবার চারজনে, চারজনের দিকে তাকাল। আবার কথা চোখে চোখে। তারপর এমন ভাবে ঘাড় কাত করে, জিভটা এক পাশে বের করে ঝুলিয়ে দিলে, মরা মানুষের মুখের কথা মনে হয়। সেই সঙ্গে আবার চোখ ওলটানো, আর ঘাড়ের একটা ইশারা। মনা মাথা নেড়ে কয়েকবার খাবি খাওয়ার ভঙ্গি করল। পুনিয়া ঠোঁট টিপে, ভুরু কুঁচকে, ঘাড় নেড়ে মনাকে সায় দিল। সোতে এমন মুখ চোখ করল, আর শক্ত হাতে হর্ন টিপল, যেন কারোর গলা টিপছে। তারপর ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, 'ভাগ শালা।'

সোতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার শালা আর দেরি সইছে না।'

এই সময়ে গণেশ এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গির মত করে ময়লা কাপড় দু' ভাঁজ দিয়ে পরা। গায়ে একটা সাবানের কোম্পানির ছাপ মারা, বিনা পয়সায় পাওয়া ধবধবে সাদা গেঞ্জি। মফস্বলের রিকশাওয়ালাদের গেঞ্জি দান করে কোম্পানিগুলো এভাবে বিজ্ঞাপন করে।

ওর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সন্দেহে ভরা। চারজনের দিকেই তাকিয়ে, রাস্তার আশেপাশে একবার দেখে নিল। ইস্টিশনের দিকেও একবার দেখল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার রে তোদের?'

ত্যাবড়া সমস্ত দাঁতগুলো বের করে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যানারে গণিশ ?'

বলে, চারজনে আবার চারজনের দিকে তাকাল। চারজনেই হাসল। মনা আর সোতে জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগল। সেপাই লাঠি তুলে ছুটে এসে বলল, 'এই শালারা, শুধু শুধু হল্লা করছিস কেন ?' •

ঠিক এ সময়েই, কুড়ি হাত দূরে স্ট্রিটকর্নার মিটিং শুরু হয়ে গেল, 'বন্ধুগণ, মহকুমার আসন্ন ছাত্র ও যুবকদের যে সম্মেলন হতে যাচ্ছে, সেখানে বিপ্লবী মোর্চায় দীক্ষিত ... '

ওরা চারজন বা গণেশ সেদিকে ফিরেও তাকাল না। কানওনেই। গণেশের সন্দিগ্ধ চোখ দুটো যেন দপ দপ করে জ্বলে উঠল। নাকের পাটা ফুলে উঠল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ফটকে, অ্যাই ফট্‌কে।'

যার নাম ফট্‌কে সে একটা হুডতোলা রিকশার মধ্যে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে আয়েস করে বসেছিল। গণেশের ডাক শুনে লাফ দিয়ে নেমে এসে বলল, 'কী বলছ গুরু।'

গণেশ আবার ওদের চারজনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, 'এরা একটা মতলবে আছে মনে হচ্ছে। আমি যেন কীরকম একটা গন্ধ পাচ্ছি। দ্যাখ্ তো, ইস্টিশনে একটা পাক মেরে আয়। সব ভাল করে দেখে আসবি।'

ফটকেও গণেশের মতই সন্দিগ্ধ চোখে চারজনের দিকে একবার দেখে দৌড় দিল। বলে গেল, 'এখুনি দেখে আসছি গুরু।'

মনা ঘাড় কাত করে গণেশের দিকে তাকাল। চোখ আধবোজা করে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল রে গণিশ ?'

গণেশ একটা বিড়ি কামড়ে ধরে চোয়াল শক্ত করে বলল, 'তোদের পোল্ খুলব।'

ওরা চারজনেই আবার হেসে উঠল। কেউ খালখেলিয়ে, কেউ কিতকিতিয়ে। আর ঢলে ঢলে পড়তে লাগল। পুনিয়া বলল, 'খালি পোল কেন রে, বল, আমাদের সব খুলি নিবি।'

ত্যাবড়া ওর কোমরের প্যান্টটা টেনে দেখিয়ে বলল, 'ইস্তক এটা।'

সোতে তাড়াতাড়ি ওর পাছায় দুহাত চেপে ভয়ে ভয়ে বলল, 'উ রে শালা ফাদরাফাই করে দেবে. গণিশ মরদ বলে কথা।'

বলেই, আবার একটি সাজগোজ করা, কালো চুলি পরা যুবতীকে ডেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'রিকশা নিয়ে আসব দিদিমণি ?'

মেয়েটি ফিরে তাকাল না। মনা বলল, 'শালার খালি দিদিমণি দেখলেই ডাকাডাকি। মা-ঠাকরুণ বাবুদের ডাকতে পারিস্ না ?'

সোতে হাত নেড়ে বলল, 'ওসব তুই বুঝবি না! প্যাসেঞ্জার হালকা হবে, দানাদ্দান চালান, পয়সাও বেশি, ওদিকে নজরেও মেজাজ।'

' ...সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের মুখোশ আমরা টেনে ছিঁড়ে ফেলব '

মাইকে গলা শোনা যাচ্ছে। এ সময়েই একটা ট্রেন এল। রাস্তার ওপরে জলের স্রোতের মত প্যাসেঞ্জার নেমে এল। একসঙ্গে বোধ হয় পঞ্চাশটা রিকশাওয়ালা হর্ন বাজিয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকতে লাগল। মাইকের শব্দ একটু সময়ের জন্যে চাপা পড়ল। ফাঁকা হতেও সময় লাগল না।

ওরা চারজন তেমনি দাঁড়িয়ে। গণেশ প্যাসেঞ্জার ধরবার জন্য যেতে গিয়েও থমকে গেল। ওর চোখের পাতা কুঁচকে উঠল। নাকের পাটা আবার ফুলল, সন্দেহের সঙ্গে উত্তেজনায় চোখ ঝকঝকিয়ে উঠল। বলল, 'উ রে শালা, প্যাসেঞ্জার ধরবার তাল নেই তোদের ?'

মনা বললে, 'শালা এমন লক্ষ্মী গাড়ি না, দেখবি প্যাসেঞ্জার নিজেই এসে গেছে।'

গণেশের উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তা বেড়ে উঠল। বলল, 'নির্ঘাত তোরা কিছু পেয়েছিস, না হলে— '

ফটকে ফিরে এসে বলল, 'না গুরু, ইস্টিশনে প্যালেটফর্মে কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।'

'ঝাড়ুদারনিটাকে জিজ্ঞেস করেছিলি?'

'হ্যাঁ, বললে কিছু দেখতে পায় নি।'

এই সময়েই পুনিয়ার রিকশায় গাদাখানেক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে একটি গরীব বউ উঠে পড়ল।

পুনিয়া খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে আরে কোথায় যাবে?'

বউটি ব্যস্ত। কোলে একটি, কোলের নিচে একটি কোল ধরে, পাশে দুটি। বলল, 'জোড়া তালাও।'

পুনিয়ার মুখ বিকৃত। বলল, 'বার আনা লাগবে।'

বউটি প্রতিবাদ করে বলল, 'কেন? ছ' আনা ভাড়া তো।'

পুনিয়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'হবে না, অন্য রিকশা দেখ।'

গণেশ ইতিমধ্যে ওদের আরো কয়েকবার দেখে সরে গেল। যাবার আগে বলে গেল, 'আচ্ছা, আমিও দেখছি।'

ত্যাবড়া বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ, দেখে লে গণিশ।'

ওরা চারজনেই আবার হেসে উঠল। হাসির মধ্যেই মনা পুনিয়ার রিকশার যাত্রী বউটিকে জিজ্ঞেস করল 'দশ আনা দেবেন দিদি?'

বউটি বলল, 'না ভাই, আট আনা দিতে পারি।

'পাঁচজন যাবেন তো।'

'সব তো ছেলেমানুষ বাপু।'

মনা রাজি হয়ে গেল, 'আসুন, দিনের বেলাটা চালাতে হবে তো।'

বউটি বাচ্চাদের নিয়ে হুড়মুড় করে পুনিয়ার রিকশা থেকে নেমে মনার রিকশায় এসে উঠল।

পুনিয়া বলল, 'বা রে শালা!'

মনা বলল, 'তোমার শালা এখন গরম বেশি। সক্কালেই লম্বা টিরিপ মেরেছে, দেড় টাকা করকর করছে।'

ওরা চারজনে আবার চোখাচোখি করল। আবার ইশারা, চোখে চোখে কথা। বোঝা যায় তার সঙ্গে ভাড়ার কোন ব্যাপার নেই। ত্যাবড়া বলল মনাকে, 'যাচ্ছিস, একটা টাকা ছেড়ে যা, জিনিস কিনতে হবে না?'

'ঘুরে আসি।'

ত্যাবড়া ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'না না, ঘুরে এলে হবে না। বেডি করতে হবে।'

মনা মুখ বিকৃত করে প্যান্টের পকেট হাতড়াল। একটা আধুলি বের করে দিয়ে বলল, 'এখন এটা রাখ, ফিরে এসে বাকীটা দিচ্ছি।'

ত্যাবড়া আধুলিটা নিয়ে বলল, 'থাকলেও দিবি না, খচ্চর! আচ্ছা শোন— '

ও রিকশা-সারির সকলের মুখের দিকে একবার দেখে নিল। গণেশ ওর দিকেই তাকিয়েছিল। মনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওদিকে যাচ্ছিস, একবার দেখে আসিস।'

মনা জিজ্ঞেস করল, 'পটল তোলা হয়ে গেলে নিয়ে আসব?'

ত্যাবড়া নেতার মত মুখ করে বলল, 'না, একলা আনিস না। আমাদের কাউকে ডেকে নিয়ে

যাস। আমার শালা খুব ভয় লাগছে।'

'কেন?'

'গণেশ ফট্‌কেরা না টের পেয়ে যায়।'

মনা একবার গণেশের দিকে দেখল, বলল, 'শালা খট্টাসের মতন চেয়ে রয়েছে। তবে কিছু আনজাদ করতে পারছে না। আচ্ছা আমি ঘুরে আসি।'

ওরা চারজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। মনা যাত্রী নিয়ে চলে গেল। আর দুটি কলেজের মেয়ে সোতের রিকশার কাছে এসে বলল, 'ভাড়া যাবে?'

সোতে তড়াক করে রিকশার কাছ ঘেঁষে বলল, 'কোথায় যাবেন?'

'লক্ষ্মীপুর।'

'বসুন।'

'ভাড়া কত?'

আপনাদের আবার ভাড়া বলব কি, উঠুন না। যা ভাড়া তা-ই দেবেন।

মেয়ে দুটি ওঠবার সময়েই ত্যাবড়া ডেকে উঠল, 'সোতে— '

সোতে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। প্যান্টের হিপ পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ত্যাবড়ার হাতে দিয়ে বলল, 'সসতীশ দাস্ ওস্‌সব ভোলে না।'

বলেই রিকশাটাকে নিয়ে দৌড়ে ছুটে গেল রাস্তার ওপর। লাফ দিয়ে সিটের ওপর উঠতে উঠতে কপালে পড়া চুলে একটা ঝাপটা মারল, হর্ন বাজাল।

পুনিয়া বলল, 'শালার কপাল দেখলি। ঠিক দিদিমণি মিলে গেল।'

ত্যাবড়াও সেই দিকে চেয়ে কবুল করল, 'হ্যাঁ, ওর কপালে দিদিমণি আছে।'

কথা বলতে বলতেই ত্যাবড়া আর পুনিয়া আবার চোখে চোখে তাকাল।

'আজকের যুবক আর ছাত্রেরা সংগ্রামী জনতার এক বিরাট অংশ, তারা অতন্দ্র প্রহরীর মত '

'ওই দ্যাখ, গণশা শালা ফট্‌কের কানে কানে কী বলছে।' পুনিয়া বলল। ত্যাবড়া বলল, দেখছি। শালারা খেকুরে শকুন হয়ে আছে। এর আগেরটাও ওদের হাত ফসকে ছিল। এটাও— '

'ভাড়া যাবে?'

ত্যাবড়ার বদলে পুনিয়া যাত্রীর দিকে দেখল। ভোঁদকা মোটা, পাতলুন কোট পরা, হাতে ব্যাগ। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'রেজিস্ট্রি আপিস।'

'আট আনা।'

'চার আনা।'

পুনিয়া গণেশকে দেখিয়ে বলল, 'ওই রিকশায় যান।'

লোকটা একটু অবাক হয়ে গণেশের দিকে এগিয়ে গেল। কী দু' একটা কথা হল। গণেশ চেঁচিয়ে খিস্তি করে উঠল, 'শালা ইয়ে মজাকি হচ্ছে আমার সঙ্গে, অ্যাঁ? প্যাসেঞ্জার লিয়ে ইয়ার্কি। খুপরি খুলে নেব।'

পুনিয়া ত্যাবড়ার দিকে চেয়ে ওর পাকানো শরীর কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ত্যাবড়া বলল, 'পেছুতে লাগিস না, বুড়ো এমনিতেই বমকে আছে।' গণেশের সঙ্গে লোকটার ভাড়ার রফা হয়ে গিয়েছে। যাত্রী তুলে নিয়ে যাওয়ার আগেও সে দপদপে চোখে পুনিয়ার দিকে চেয়ে

খেউড় করে গেল। ত্যাবড়া বলল, 'দে, তোব টাকাটা ছাড়।' পুনিয়া বলল, 'এখনই?' 'হ্যাঁ, দে, মালপত্তব রেডি রাখি।'

পুনিয়া টাকাটা বের করে দিতে একটু দেবি করল। তাব আগে বলল, 'আগে যেয়ে একবাব দেখে আসব, মাল মজুত আছে, না হাপিস হয়ে গেল।'

ত্যাবড়া ধমকে উঠল, 'ধ্যাৎ শালা, বলছি টাকাটা দে। হাপিস হবে কেন?'

পুনিয়া একটা টাকা দিল ত্যাবড়াকে। ত্যাবড়া বলল, 'তুই থাক আমি আসছি।'

পুনিয়া তবু বলল, 'আমি একবার দেখে আসি না।'

'ফট্‌কেবা টের পেয়ে যাবে।'

'বাজাবেব পেছুনকাব গলি ঘুরে যাব। বুঝতে পারবে না।'

ত্যাবড়া একটু ভেবে বলল, 'যা তবে।'

পুনিয়া চলে গেল। ত্যাবড়া দাঁড়িয়ে বইল। আড়চোখে ফট্‌ককে দেখল। তাবপবেই হঠাৎ মেয়ে গলাব খলখলে হাসি শুনে পিছন ফিবে তাকাল। রিকশা-সাবিব পিছনে দেখল দেওয়ালেব গায়ে হেলান দিয়ে জগা ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে আছে। পান-খাওয়া লাল দাঁত বেব করে মেয়েটাব দিকে চেয়ে হাসছে। ত্যাবড়াব মুখ শক্ত হয়ে উঠল। মেয়েটাকে দেখলে ওব গা জ্বালা কবে। বছব দুই তিন আগে কোথা থেকে ছুঁড়ি এল। তখন গায়ে গতবে একফোঁটা মাংস নেই। গায়ে একটা বুকখোলা ফ্রক, তলায় একটা ইজেব। আব এখন দেখ একটা ধুমসী মাগী হয়ে উঠেছে। ভিক্ষের বহব বজায় বেখেছে, কিন্তু জগাদেব একটা গুরুপের সঙ্গে মেয়েটাব কাববাবেব কথা জানতে কাবোব বাকি নেই। বাত্রেব অন্ধকারে আনাচে কানাচে আবো উটকো প্যাসেঞ্জাব কি না আছে।

ইস্টিশনেব সেপাইবাও নিশ্চয় ছেড়ে কথা কয় না। মেয়েটাব নাম, কে জানে সত্যি না মিথ্যে, যমুনা। দুই ঠ্যাঙেব ফাঁকেব মাঝখানে কাপড় উঁচু কবে তুলে ধবে যেভাবে খলখলিয়ে হাসছে মনে হয় যেন এখনই একটা কাণ্ড কববে। অনেকেই এখন ওদেব দিকে তাকিয়ে আছে। পথ চলতি ভদ্দবলোকেবাও ছেড়ে দিচ্ছে না। মেয়েমানুষ এব নাম।

'খচ্‌ড়ি।' ত্যাবড়া মনে মনে বলল। কিন্তু যাই হোক গিয়ে, ওব কিছু যায় আসে না। জগা এখন বসে বসে মজা মাবছে কেন। বলেছিল, শবীর খাবাপ, জ্বব হয়েছে, আজ এ বেলা গাড়ি চালাতে পাববো না। ও দলেব লোক, এক টাকা ওব দেবাব কথা খাটতে না পাবলে কথা ছিল না। যমনাব আঁচে বসে গা গবম কববে, আব দু চারটে টিবিং মাবতে পাবে না। ও জগাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যমুনা বলল, 'এই যে ত্যাওড়া দাদা।'

ত্যাবড়া খিস্তি কবে, তাকে অন্য ভাবে উচ্চাবণ কবল, তাবপব বলল, 'ত্যাওড়া তোব বাপেব নাম।'

যমুনা খলখলিয়ে আগেব মতই হাসতে লাগল। জগা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ত্যাওড়া আমাব শ্বশুরেব নাম। খবব কি ওস্তাদ, ফট্ না খাবি?'

ত্যাবড়া বলল, 'সে যাই হোক গে, একটা টাকা ছাড়, মজাকি কবলে হবে না।'

জগা নবম স্ববে বলল, 'নেই মাইবি, বিশ্বাস কব।'

'তবে খাটতে যাও না। কাল বাত্রে তো শালা বেশি মাল খেয়ে, সকালে পড়ে আছ। জ্বব না হাতি।'

জগা বলল, 'যাব যাব, বেলা দুটো থেকে গাড়ি চালাব।'

যমুনা জিজ্ঞেস করল, 'কিসেব টাকা?'

জগা বলল, 'সে খোঁজে তোর দবকার কী। টাকা আছে? দিবি?'

যমুনা নাচবে কী না কে জানে, একটু একটু কোমব দুলিয়ে, ভুরু কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চোখ ঘুবিয়ে বলল, 'দিতে পাবি, সুদ কত দেবে?'

জগা যমুনার সাবা গায়েব দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'যত চাস।'

যমুনা ঠোঁট উলটে বলল, 'মুবোদ দেখবখনি। টাকা একটা দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের মতলব কী বল তো?'

বলতে বলতে যমুনা, কোমবেব কষি ঢিলে কবে, ভিতরে হাত ঢোকাল। ত্যাবড়া আর জগা চোখাচোখি করল। ত্যাবডাব চোখে সাবধানে ইশাবা। বলল, 'খুব হুঁশিযাব। গণেশ শালা একটা কিছু আন্‌জাদ কবছে। ফট্‌কেকে ইস্টিশনে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজতে পাঠিযেছিল। আমাদেব ওপব ওদেব নজব আছে।'

যমুনা ছোট একটা গেঁজে থেকে, ছোট কবে পাকানো এক টাকাব নোট জগার কোলেব ওপব ছুঁড়ে দিল। বলল, 'তোমাদেব মতলব তো? পবে ঠিক জানতে পারব।'

জগা বলল, 'সে টাইম হলে দেখা যাবে।'

ত্যাবড়া জগাব কোল থেকে টাকাটা কুড়িযে নিতে নিতে খ্যাঁক কবে উঠল, 'না, মেয়েমানুষেব ওসবে দবকাব নেই। এসব তোদেব বাত্রেব কাববাব না।'

যমুনা শবীব দুলিযে হি হি করে হাসল, বলল, 'কাববাব কবলে আব এসব বলতে না ত্যাওডা দাদা।'

ত্যাবডা হাত তুলে খেঁকিযে উঠল, 'ভাগ বলছি।'

যমুনা হাসতে হাসতে দৌড় দিল। যাবাব আগে বলে গেল, জগা, আমাব টাকা যেন ফাঁকি না যায়। তা হলে তোমাকে চিবিযে খাব।'

যমুনাব দৌড়ে চলে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে, সাবে সাবে বিকশাগুলো থেকে আওযাজ উঠল, 'উই উই উই।' 'ধব ধব ধব।' 'খা খা খা।' এবং অনেক গলাব হাসি।

'...অতএব বন্ধুগণ, স্থানীয জনসাধাবণেব কাছে আমাদেব আবেদন, এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত কবে তোলাব জন্য '

ত্যাবডা চাবদিকে একবাব দেখে নিযে জগাকে বলল, 'শোন, আমি জিনিসপত্তব সব নিয়ে আসি। পুনিযা কাট পুলেব ওখানে গেছে। ফিরে এসে যেন চেঁচামেচি না কবে, শালাকে বিশ্বাস নেই। গাড়ি রইল।'

জগা বলল, 'যা ওস্তাদ যা, আমি সব দেখছি।'

দেওযালেব ধাবে নর্দমা, নর্দমাব ধাবে পাতা চটেব থলেব ওপব, জগা এলিযে পড়ল দেওযালে হেলে। ওব ঢুলু ঢুলু চোখে খুশিব চকচকানি। বলল, 'যাক, অনেকদিন বাদে— '

ত্যাবডা সে কথাব কোন জবাব না দিযে চোখেব কোণে এদিক ওদিক দেখে বাজাবেব বাস্তায চলে গেল। ঠোঁট নেড়ে, বিড়বিড় কবে, আঙুলের কড় গুণে কী হিসাব কবল। তাবপব বাস্তাব ধাবেই একটা ছোট কাপড়েব দোকানে ঢুকে পড়ল। আবাব কী ভাবল। ভেবে, মাথা নাড়ল। মিটারেব হিসাবে, দু মিটাব সাদা কাপড় চাইল।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, 'কোবা না ধোলাই?'

'কোবা। সব থেকে সস্তাটা দিন বাবু।' কাপড়েব প্যাকেট নিযে, মুদি দোকানে গেল। সব থেকে সস্তা ধূপকাঠি কিনল এক বাক্‌সো। তাবপবে গেল ফুলের দোকানে। গাঁদা ফুলেব দিন চলে গিয়েছে, মালাব বাহার নেই। যে-সব মালা দেখে চোখ টানে, সে-সব পড়তায আসবে না।

এমনি বাজে ফুলেব দাম শুনে, ত্যাবড়ার মনে হল, ফুল না, সব আগুনের ফুলকি। দাম শুনলে ছ্যাঁকা লাগে। তবু পাঁচ পাপড়ি টগবেব একটা মালা কিনতে হল পনের পযসা দিযে। পাঁচ পযসা দিয়ে একটা জবাও তাব সঙ্গে গেঁথে নিল। মনে মনে বলল, 'যাক গে শালা, আফসোস বেখে লাভ কী?'

ফুলওয়ালা মালাগাছি কাগজে মুড়তে মুড়তে, এতক্ষণে যেন ত্যাবড়াকে চিনতে পারল। জিজ্ঞেস কবল, 'মালা দিযে কী হবে?'

ত্যাবড়া বলল, 'হবে।'

দোকানদাব হেসে জিজ্ঞেস কবল, 'বিয়ে করতে যাবি নাকি?'

ত্যাবড়া পযসা দিযে, মালা নিযে বলল, 'জমমো দিতে যাব।'

সব জোগাড় কবে ত্যাবড়া যখন ইস্টিশনের কাছে এসে দাঁড়াল, দেখল পুনিযা হাত পা নেড়ে জগাকে যেন কী বলেছে। জগাব সঙ্গে ত্যাবডাব চোখাচোখি হতেই, জগা একটা ইশারা কবল। পুনিয়া দৌড়ে এল ত্যাবডাব কাছে। ওব চোখে মুখে উত্তেজনা। ত্যাবড়াব কানেব কাছে মুখ নিযে বলল, 'ফিনিস্।'

ত্যাবড়া সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেব সেনাপতিব মত খাড়া হযে উঠল। যেন একটা কী ঘটে গেল। দৌড়ে জগাব কাছে গিযে প্যাকেটগুলো সব দিযে দিল। ফিবে, দৌড়ে ওব বিকশার সীটে লাফ দিযে উঠে বসল। চিৎকার কবে হুকুম কবল, 'পুনিযা, গাড়িতে ওঠ্।'

গণেশও এবাব চিৎকাব কবে উঠল, 'ফটকে, জল্‌দি। আমাব গাড়িতে উঠে বস।' ত্যাবড়া ততক্ষণে রিকশা চালাতে আবম্ভ কবেছে। পুনিযা লাফ দিযে উঠে বসল। বলল, 'মনা জোড়া তালাওযেব প্যাসেঞ্জাব ছেড়ে আসছিল। ওকে পুলেব ওখানে যেতে বলেছি।'

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'ফাস্‌কেলাস্। শালা এ না হলে বুদ্ধি। দ্যাখ তো গণেশ শালা আসছে নাকি?'

পুনিযা পিছন ফিরে দেখল, গণেশ ফটকেকে বিকশায চাপিযে নিয়ে চালিযে আসছে। বলল 'আসছে।'

ত্যাবড়া বলল, 'শালাকে এবাব একদিন এ্যাযসা ঝাড়ব, বাপেব নাম ভুলিযে দেব মাইবি। ও কি ভেবেছে, বেওযাবিশ মাল, ছিনিযে নেবে?'

পুনিযা বলল, 'আসতে দে না, চেযে দেখুক আব জ্বলে মরুক।'

কাট পুলের সিঁড়িব কাছে, বাস্তাব ধাবে, মনাব গাড়িটা দেখা গেল। তাব পিছনে ত্যাবড়া ব্রেক কষল। পুনিযা লাফিয়ে নেমে সিঁড়িব পাশ দিযে বেল লাইনেব দিকে গেল। ত্যাবড়াও গেল। বেল লাইনেব কাছাকাছি এক রাশ বুনো ঝাড়েবুনো কুল। পাশেই কয়েকটা খাড়া বাঁকা কাঁটামনসা। তাব পাশে খানিকটা খোলা জাযগা। সেই জাযগায, একটা লোক শোযা। কাছে পাশে মনা দাঁড়িযে।

ত্যাবড়া আসতেই মনা প্রায চমকে উঠে বলল, 'এসেছিস? ওই দ্যাখ মাইবি, আর উইদিকেও দ্যাখ্। আমি ভয পাচ্ছিলাম।'

দেখা গেল বেল লাইনেব ওধারে দুটো শকুন এসে বসেছে। মাথার ওপবে, বেশ নিচেব দিকেই, মাটিতে ছাযা ফেলে কযেকটা উড়ে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য, শোযা শবীবটার ওপবে। মরা শরীব।

এই সময়ে, ওদের পিছনে, গণেশের গলা শোনা গেল, 'দ্যাখ ফটকে, বলেছিলাম কী না, জরুব কোন মতলব আছে ওদেব।'

ত্যাবড়া মনা আর পুনিয়ার দিকে একবার তাকাল। তারপরে মনার দিকে ফিরে বলল, 'আরে তুই আমাকে এ-সব কী দেখাচ্ছিস? আসল শকুন দুটো তো আমাদের পিছনে।'

পুনিয়া খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। পিছনে ফিরে তাকাল। মনাও দেখল। গণেশ আর ফটকে, মরা শরীরটার দিকে চেয়ে রয়েছে, গণেশের চোখ দুটো দপদপ করছে। মার খেয়ে, রাগ হলে যেমন হয়, সেইরকম ওর মুখের ভাব। বাঁশচেরা গলায় বলল, 'শকুন কারা দেখাই যাচ্ছে। আমরা মড়া খুঁজে ফিরি না। চলে আয় ফটকে।'

মনা আর পুনিয়া হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। মনা বলে উঠল, 'শালা, ইমলি ইমলি, থুঃ।'

'আচ্ছা রে শালা, এর পরে আমরাও দেখে লেব, কোথা থেকে—'

গণেশের কথা শেষ হবার আগেই মনা বলে উঠল, যা 'হাসপাতাল থেকে মড়া লিয়ে আসবি।'

এবার ত্যাবড়া সুদ্ধ হেসে ফেলল। গণেশরা রাস্তার দিকে চলে গেল। ওরা তিনজনেই মরা মানুষটার আরো কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। কালো, রোগা একটি বুড়ো। মুখে কোন বিকার নেই। বয়স হয়ে গেলে, মানুষ যেমন ঘুমোয়, চোখ বুজে, মুখটা একটু হাঁ করে, তেমনি দেখাচ্ছে। মুখের ভিতর জিভটা দেখা যাচ্ছে। মুখে কিছু পাঁশুটে গোঁফ দাড়ি। মাথার পাতলা চুলও সেই রকম। এই বয়সে আর এ অবস্থায়, লোকের চুল দাড়ি আর তেমন গজায় না। তবে মরবার পরে যেন লোকটার মুখ বেশি চকচক করছে। নাকটা তো বটেই। গায়ে দু তিনটে ছেঁড়া-খোড়া জামা। হাঁটুর ওপর অবধি ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো। চিত হয়ে, প্রায় সোজা শুয়ে আছে। বাঁ পা-টা একটু বেঁকে রয়েছে, মাথাটা কাত করা। মাথার কাছে একটা পুঁটলি।

কাছে পিঠে লোকালয় তেমন নেই। রেল লাইনের ওপারে, খোলা মাঠের ওপারে কয়েকটা খোলার ঘর। এপারে, বড় রাস্তার দিকে মুখ করা বাড়িগুলোর পিছন দিক। রেল লাইনের দিকে কেউ আসে না।

ত্যাবড়া বলল, 'লোকটা মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে গেছে। এর আগেরটা যে রকম ছিল সে রকম না, চোখের পাতা খোলা, মুখটা রাক্ষসের মত হাঁ করা, যেন গিলতে আসছিল।'

পুনিয়া বলে উঠল, 'মাইরি।'

ওরা তিনজনে আবার মরা মানুষটাকে দেখতে লাগল। ত্যাবড়া ঝোপের নিচে, কাঁটামনসার গোড়ার কাছে পরিষ্কার জায়গাটার দিকে তাকাল। বলল, 'লোকটা ওখানে থাকত। আমি পয়লা একদিন মার্ক করেছিলাম, পুলের ওপর থেকে। তখনই ঠিক করে রেখেছিলাম।'

মনা বলল, 'তবে একটাই বাঁচোয়া, লোকটার গায়ে ঘা পাঁচড়া পুঁজ রক্ত নেই।'

পুনিয়া বলল, 'আর হেগে মুতে মাখামাখিও করে রাখে নি।'

ত্যাবড়া বলল, 'লোকটা বোধহয় কিছু পুণ্যি করেছিল।'

মনা বলল, 'আমাদেরও পুণ্যি বল্।'

ত্যাবড়া ঘাড় ঝাঁকাল। মরা মুখের দিকে চোখ রেখে বলল, 'লোকটা ভাল মানুষ ছিল মনে হয়, না?'

পুনিয়া বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছিল। কোথা থেকে এসেছিল লোকটা?'

ত্যাবড়া বলল, 'মানুষ আবার কোথা থেকে আসে। সবাই যেখান থেকে আসে, সেখানে থেকেই এসেছে।'

পুনিয়া অবাক্ হয়ে মনার দিকে তাকাল। মনা বলল, 'বাঃ, তা বলে একটা জায়গা, ঘরবাড়ি— '

ত্যাবড়া ভুরু তুলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথায় থাকিস, তোর বাড়ি-ঘর

কোথায় ?'

মনা বোকার মত শব্দ কবল, 'অ্যাঁ ?'

'বল্ না।'

মনা বলল, 'আমি তো ইস্টিশনেব এক দিকে-- '

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'অই বকম, সব অই বকম। এক জাযগা থেকে এলেই হল। তুই মরে যাবাব পরে যখন কেউ খোঁজ নেবে— '

মনা খেঁকিয়ে উঠল, 'খচ্চব, শালা, তোর খোঁজ নেবে লোকে।'

ত্যাবড়া শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হেসে উঠল। বলল, 'নে, বুড়োর হাঁ মুখটা বুজিয়ে দে তো।'

কিন্তু মনার কথাটা সেই মুহূর্তেই কানে গেল মনে হল না। মরা মুখটাব দিকে চেয়ে, ও কেমন যেন আনমনা। এ সময়ে শেষ মাঘেব দক্ষিণা বাতাস বইছিল। হঠাৎ একটা ছোট ঝাপটা মত এল, ধুলো আব পাতা উড়ে, একটা ঘূর্ণীব মত হল। দুটো ছাযা, মবা শবীরের ওপব দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। তিনজনেই দেখল, কযেকটা শকুন, উড়তে উড়তে আবো নিচে নেমে এসেছে। ওপারে লাইনেব ধাবে, আবো দুটো নেমে বসেছে।

ত্যাবড়া নিচু হয়ে, মবা মানুষটিব হাঁ মুখ বন্ধ করে দিল। কিন্তু পুবো বন্ধ হল না। আস্তে আস্তে খুলে, অল্প একটু ফাঁক হয়ে বইল। ওইটুকু আর বন্ধ কবাব চেষ্টা না কবে ত্যাবড়া পুঁটলিটা খুলল। একটু আধটু ছেঁড়া থাকলেও, প্রায ফরসা একটা জামা। একটা চশমা, একদিকে কাচ নেই। একটা চিরুনি। কযেক মুঠো শুকনো মুড়ি একটা ঠোঙায দলা পাকানো। কিছু শুকিয়ে যাওয়া ফুল বেলপাতা। ছোট রুদ্রাক্ষেব মালা। পুঁটলিতে আর কিছু নেই।

তিনজনেই মুখ চাওযাচাযি কবল। ত্যাবড়া মরা মানুষটিব কোমবেব কাছ থেকে জামা তুলে, হাত দিযে টিপে টিপে দেখল। ছেঁড়া-খোড়া জামার বুকেব কাছে, পিঠেব নিচে, সব জাযগায় হাতড়াল। ঠোঁট উলটে বলল, 'শালা, একটা ঘষা লোহাও নেই।'

মনা বলল, 'এবকম হয় না। ইস্টিশনেব কাছে সেই যে পাগলিটা পচে গলে মবেছিল, তার পুঁটলিতেও কিছু পয়সা ছিল।'

পুনিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময়ে পিছন থেকে মোটা আব ভবাট গলা শোনা গেল, 'কে বে তোরা, কী কবছিস ?'

ওরা তিনজনেই ফিরে দেখল। চিনতে পাবল, বড় রাস্তাব ধাবে বাবুর বাড়ি। ত্যাবড়া বলল, 'দেখুন না বাবু, বুড়ো মবে গেছে, ভাবছি পুড়িযে দেব।'

ভদ্রলোক মৃতদেহ দেখলেন। নাকে কাপড় চাপা দিলেন চোখে খুশিব ভাব ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'খুব ভাল, খুব ভাল। তোদেব চেনাশোনা ছিল বুঝি ?'

ত্যাবড়া বলল, 'না না, কে কার চেনাশোনা। দেখলাম মরে পড়ে আছে, আপনাদের ঘব-দোবের সামনে, ভাবলাম দিই গে পুড়িয়ে।'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বাহ্‌বা, এই তো চাই, এই তো— '

ত্যাবড়া ফিসফিসিযে বলল, 'শালা দাযে পড়ে বলছে।' গলা তুলে বলল 'কিছু সাহায্য করুন বাবু। খবচ-টবচ আছে তো।'

ভদ্রলোক ভাবতে পাবেন নি, কথা কত দিকে গড়াতে পাবে। বললেন, 'অ্যাঁ ?' তাবপবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে।'

পকেট থেকে গোটা একটি টাকার নোট তুলে ধরলেন। মনা এগিয়ে হাত বাড়িযে নিল। ভদ্রলোক যেন পালক ঝাড়া দিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, 'তা হলে, নিয়ে যাস বাবা।'

ত্যাবড়া শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হাসল। বলল, 'শালা বাঁশ কেন ঝাড়ে · খবরদারি করতে এসে একটা টাকা দণ্ড, বউনিটা ভাল, কী বলিস?'

পুনিয়া বলল, 'মাইরি মাইরি।'

'লে ধর, তুলে নিয়ে যাই। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করব না।'

ত্যাবড়া ধরল দুটো হাত। মনা ধরল দুটো পা। চ্যাংদোলা করে তুলে ধরতে, মাথাটা পড়ল ঝুলে। ত্যাবড়া পুনিয়াকে হুকুম করল, 'পুঁটলিটা নে, আর এক হাতে মাথাটা তুলে ধর।'

পুনিয়া হুকুম পালন করল। তিনজনে মিলে, মরা শরীর নিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। ত্যাবড়া মনার রিকশার ওপরে তুলতে যেতে মনা খেঁকিয়ে বলল, 'না, তোর গাড়িতে নে।'

ত্যাবড়া মড়াটাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'আরে ধ্যাৎ, তোল না।'

ও মনার রিকশায় অর্ধেকটা শরীর তুলে দিল। দিয়ে, আরো খানিকটা টেনে সীটের গায়ে ঠেকনো দিল। মনার চোখ দপদপিয়ে উঠল। 'শালা, নিজের বেলায় আঁটিসুটি···'

ত্যাবড়া বলল, 'লে, লে, হাঁটু দুটো একটু ভেঙে তুলে দে। আরে বাবা, একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেই হবে।'

'সে তো তোর গাড়িতেও দেওয়া যেত।'

ত্যাবড়া সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, মড়ার পা দুটোকে একটু ভেঙে, যতটা সম্ভব, রিকশার পা রাখবার জায়গায় তুলে দিল। আবার ছায়া উড়ে গেল মরা শরীরের ওপর দিয়ে। তিনজনেই আকাশের দিকে তাকাল। শকুনগুলো এখনো উড়ছে। পুনিয়া কাঁচকলা দেখিয়ে বলল, 'এই পাচ্ছ।'

ত্যাবড়া মরা লোকটির দিকে তাকিয়েছিল। ও যেন হঠাৎ খুব অবাক হয়েছে, চোখের পলক পড়ছে না। মনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী হল কী? যেন বাপের মুখ দেখছিস শালা।'

ত্যাবড়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমার বাপ? এরকম ভাল মানুষ হতে হলে আমার বাপকে আবার জন্মাতে হবে। সে শালার কথা ছেড়ে দে, কিন্তু মাইরি আমি এই লোকটার কথা ভাবছি। এ নির্ঘাত খুব পুণ্যি করেছে, চেহারা দেখেছিস। তাই তো বলি।'

বলে ঘাড় নাড়তে লাগল। মনা পুনিয়া চোখাচোখি করল। ত্যাবড়া ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'ভেবে দ্যাখ, মাসের এখন পয়লা হপ্তা যাচ্ছে, অ্যাঁ? কাল চটকলে হপ্তা হয়ে গেছে, কেমন? আর আজ-শনিবার-শনিবারের দুপুরে লোকটা মরল। উ রে শালা, কপাল কাকে বলে। এ নিশ্চয় কোন সাধক টাধক হবে। এর আগের দুটোর একটাও এ রকম হয়নি।'

মনা পুনিয়াও এবার অবাক হয়। মনা বলল, 'ঠিক বলেছিস তো।'

ত্যাবড়া আদরে ভঙ্গিতে, চুমকুড়ির শব্দ করে, মৃতের মরা চিবুকে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'বাবা, বরাবর যেন তোমার মত পাই।'

বলে ত্যাবড়া সীটের ওপর উঠে বসতে বসতে পুনিয়াকে বলল, 'তুই আমার গাড়িটা চালিয়ে চল্। পুঁটলিটা বুড়োর কোলে রেখে দে।'

এ সময়ে মনা গাড়িতে উঠতে গিয়ে টের পেল, তিনটে চাকায় হাওয়া নেই। ও চিৎকার করে উঠল, 'এ শালা নির্ঘাত গণশা আর ফটকের কাণ্ড।'

ত্যাবড়া বলল, 'তা ছাড়া? কিন্তু আগে চল্, গাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে চলে যাই, দু মিনিট লাগবে। ওরা স্বীকার যাবে না, তুই সবাইকে শুনিয়ে, আচ্ছা করে খিস্তি দিবি।'

দেবে না, দেওয়া শুরু হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ওরা যখন মড়া নিয়ে ইস্টিশনে এল, সোতে আর জগা বাকী ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাকী ব্যবস্থা আর কী, নতুন কোরা কাপড় দু-ফালি করে কেটে রেখেছে। ওরা আসতেই, সোতে ইস্টিশানের রোয়াকে ওঠবার সিঁড়ির এক ধারে এক টুকরো কাপড় পেতে দিল। ত্যাবড়া আগে পুঁটলিটা খুলে রুদ্রাক্ষের মালটা বুড়োর গলায় পরিয়ে দিল। পুঁটলিটা রাখল শিয়রের দিকে, বালিশের মত করে। তারপরে সবাই মিলে যখন মরা মানুষটাকে শুইয়ে দিল, চারপাশে তখন লোকের ভিড়।

সোতে বলে উঠল, 'ভিড় হটাও ভাই, ভিড় হটাও, মড়া কথা বলে না।'

জগা ওর জায়গায় বসেই, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল। ত্যাবড়া আর এক টুকরো নতুন কাপড় দিয়ে বুড়োর শরীর বুক অবধি ঢেকে দিল। পাঁচ পাপড়ির টগরের মালাটা বুকের ওপর ছড়িয়ে দিল। শুকনো জবাফুলটা একদলা বাসি রক্তের মত দেখাচ্ছে। মনা ততক্ষণে চিৎকার করে খিস্তি শুরু করে দিয়েছে। যে ওর চাকার হাওয়া খুলেছে, তার মা বোন কারোর বিষয়েই, ওর কোন বাছ বিচার নেই, এই কথাটাই, রাগে আর অনেক কথায় বলে চলেছে। আশেপাশের দোকানদারেরা ব্যাপার দেখে হাসাহাসি রাগারাগি করছে। 'শালারা যমের অরুচি।' 'এদের কি মশাই ধম্মোজ্ঞান নেই?' 'দেশটা রসাতলে গেল।' 'কীরকম মজার ব্যবসা দেখেছেন।' 'আজ শালাদের ফলার হবে।' কিন্তু পথচারীরা বা রেলের যাত্রীরা, রাস্তার ধারের দোকানদার না। তাদের কাছে, সব মিলিয়ে এটা একটা নিখুঁত দৃশ্য। একটি মৃতদেহ, নতুন কাপড়ে ঢাকা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুকে ফুল, ধূপকাঠি জ্বলছে।

পুনিয়া বলে উঠল, 'মড়া পোড়ানোর জন্য কিছু দিয়ে যাবেন দাদারা।'

সোতে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর শালা। স্‌সমরদা কী বলে দিয়েছিল মনে নেই? 'সসৎকারের জন্য কিছু স্‌সাহায্য করুন দাদা' একথা বলতে হবে।'

ত্যাবড়া পুনিয়াকে খিঁচিয়ে বলল, 'তা না শালা, মড়া পোড়াবার জন্য বলছে।'

মনা তখনো চাকার হাওয়া খুলে দেওয়ার রাগ সামলাতে পারে নি। নাগাড়ে খিস্তি করে যাচ্ছিল। গণেশ ফট্‌কেরা প্রথম প্রথম হাসছিল। খিস্তিগুলো শুনতে শুনতে ক্রমে ওদের মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল। মনা তা-ই চাইছিল। এই সময়ে ত্যাবড়া ধমকে বলল, 'এই মনা, এবার থাম, কুত্তাদের কামড়াতে যাসনে। শালারা কী জ্বালায় জ্বলছে, জানিস না? যা, চাকার হাওয়া দিয়ে নিয়ে আয়।'

ইতিমধ্যে জগাও চটের থলি ছেড়ে উঠে এল। ত্যাবড়া একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা মড়ার বুকের ওপরে রাখল। তা'ছাড়া পাঁচ দশ কুড়ির মুদ্রা দু চারটে পড়তে আরম্ভ করেছে। এই সময়ে সেপাই এসে দাঁড়াল। মড়ার দিকে তাকাল না, ত্যাবড়াদের দিকে তার নজর। বলল, 'কী হচ্ছে এসব?'

জগা বলল, 'ওই হচ্ছে, মড়ার ওপরে তো কথা নেই।'

সেপাই ভুরু কোঁচকাল, চোখ ছোট করল। বলল, 'খুব বেড়েছিস। যা খুশি তাই? মড়া পোড়াবার নামে টাকা তুলে মদ মাগীবাজী আর মাংস—?'

সোতে ওর কালো ঠোঁটের ফাঁকে সমস্ত সাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলল, 'ওটি বলবেন না সেপাই দাদা। নাম করে না, যা করি পুড়িয়ে করি।'

গণেশ কখন এসে দাঁড়িয়েছিল কারোর খেয়াল হয় নি। সে বলে উঠল, 'মিছে কথা বাবু, শালারা মিছে কথা বলছে।'

ওরা শক্ত মুখে ঝটিতি ফিরতে সেপাই নিজেই হাতের ডাণ্ডা তুলে খেঁকিয়ে উঠল 'শালা, তোকে মোড়লি মারতে কে বলেছে। তুই যখন এস্ আগে।'

পিঠে এক ঘা পড়ার আগেই, গণেশ হাত তুলে চাটুকারের মত হাসল। হাসতে হাসতে দৌড়ে চলে গেল।

ত্যাবড়া সেপাইকে বলল, 'যান না, যান না, নিজের কাজ করুনগে দাদা, দেবতার পুজো হবে।'

সেপাইটা এক গাল হাসল। জগার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'একটা সিগারেট দে।'

সোতে একটা সিগারেট দিল। সেপাই অন্যদিকে গেল। তিনজনেই মুখ বিকৃত করে বলল, 'শালা মড়া দেখলেই সব্বার নোলায় জল।'

ঠিক এ সময়েই শোনা গেল, হুঁ হুঁ হুঁ, হেঁ হেঁ হেঁ, কীরে ত্যাবড়া, ব্যালের জায়গায় হালায় মরা শোয়াইছিস?'

দেখা গেল, মড়ার মাথার কাছে, রোয়াকের ওপরে জি আর পি-এর সেপাই দাঁড়িয়ে। মুখের হাসিতে বোখপাক নেই বরং বেশ অমায়িক। সোতে বলে উঠল, 'আবার আর এক শালা।'

ত্যাবড়া বলল, 'আমরা নিমিত্ত দাদা, সব পাবলিকের ব্যাপার। ফেলে দিন, পাবলিককে বলুন।'

সেপাই হ্যা হ্যা করে হেসে বলল,আইসস্ আইসস্ আইজকাল পাবলিক দেখাইতে শিখছ হালায় তোমরা, অ্যাঁ।'

জগা যেন বিরক্ত অথচ মেজাজের মাথায় জঘন্য একরকম হাসি হেসে চোখ মারল, বলল, 'কেন দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন, অন্যদিকে যান না।'

সেপাই এবার হি হি করে হাসল। আশ্বস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে অনেকটা আদরের স্বরে বলল, 'খুব পাজী হইছস তোরা।'

পুনিয়া রেগে উঠে বলল, 'শালা মড়াখেকো সব।'

ভর দুপুরে রাস্তাটা একটু ফাঁকা হয়ে আসে। এ সময়ে ট্রেন কম, যাত্রীর আনাগোনা তেমন নেই। রিকশাচালকেরা কেউ কেউ খেতে গিয়েছে, যাচ্ছেও। মাঘের শেষের দুপুরটা অকালের উত্তাপে ঝাঁঝালো। রোদে বেশ তেজ। থেকে থেকে দক্ষিণা বাতাস দিচ্ছে। এ সময়েই মাছি ওড়ে, ভ্যানভ্যান করে, আর দুর্গন্ধ ছড়ায় সবখান থেকে। খোলা নর্দমাগুলো থেকে, আর প্রস্রাবের গন্ধ যেখানে সেখানে। বাতাসে গন্ধ ছড়ায়, ধুলো ওড়ে, আর কুকুরগুলো হঠাৎ হঠাৎ বাতাসে নাক তুলে শুঁকতে শুঁকতে যেন কোন মরার খবর পায়। শোকে মড়াকান্না জুড়ে দেয়।

ত্যাবড়া সোতে জগা আর পুনিয়া, মরা শরীরটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। মনা গিয়েছে চাকায় হাওয়া ভরতে। খাওয়ার কথা ওদের মনে নেই। ভাড়া খাটবার চিন্তাও মাথায় নেই। একটা মরা মানুষের শরীর ওদের চোখে মুখে নতুন ঝলক এনে দিয়েছে। থেকে থেকে ওদের চোখ পড়ছে মরা শরীরটার দিকে। আর চারজনেই কী করবে এখন ঠিক করতে পারছে না। অথচ কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছে না। কেউ দু পা হেঁটে চলে যাচ্ছে। রিকশা হাতড়াচ্ছে, না হয় তো হর্নটাই টিপে দিচ্ছে। পুনিয়া একবার বলেই উঠল, 'আজ শালা—

কথা শেষ হল না। বাকী তিনজনে ওর দিকে ফিরে তাকাল। পুনিয়া ঝোল টানার শব্দ করল। সোতের আবার ডান হাতে ঘড়ি। সেই হাতটা তুলে ও বলল, 'অনেক দিন শরীরের জ্যাম ছাড়ে নি। আজ একটু জাম ছাড়াতে হবে।'

জগা জিজ্ঞেস করল, 'ক বোতল টানবি?'

'তা জানি না। যতক্ষণ হুঁস থাকবে।'

ত্যাবড়া বলল, 'খাওযাব শালা। তারপবে,তিন দিন গাড়ি চালাতে পাববে না, তখন আমাব কাছে খালি টাকাব হিসাব চাইবে।'

'সে তো আগেই ভাগাভাগি হযে যাবে ওস্তাদ।'

'হলেও, শালা তোমাদেব চিনি না ? পবে বলবে, ত্যাবড়া শালা বেশি মেরে দিয়েছে।'

এই সমযে মনা চাকায হাওযা দিযে ফিবে এল। আব সোতেব নজব খাড়া হয়ে উঠল। ইস্টিশনেব বোযাক থেকে নেমে এল সাজগোজ কবা তিন যুবতী। সোতে এগিযে গিয়ে বলল, 'গাড়ি নিযে আসব দিদিমণি ?'

পুনিযা চিৎকার কবে বলল, 'আমি আনছি দিদিমণি।'

দিদিমণিদেব একজন সোতেকে বলল, 'তিনজনকে নিতে পাববে ?'

সোতে বলল, 'চাবজন হলেও পাবব দিদিমণি। কোথায় যাবেন ?'

'রুবি সিনেমা।'

কোন জবাব না দিযে, সোতে রিকশাটা তিনজনের সামনে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে এক দিদিমণি প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'ওমা, এটা কী ?'

ত্যাবড়া বলল, 'মিতদেহ দিদিমণি।'

সোতে বলল, 'সৎকাবেব জন্য কিছু সাহায্য কবে যান দিদিমণি।'

তিনজনেই খানিকটা সবে গেল। দুই দিদিমণি ব্যাগ খুলে পযসা ফেলল। একজন বলল 'মড়া দেখলে যাত্রা শুভ।' তাবপবে বিকশায কে কাব কোলে বসবে, তাই নিযে কথা আব হাসিব মধ্যে কোলে বসতে হল সব থেকে ছোটদিদিমণিকে। মাব পবনে আঁট পাযজামা আব পাঞ্জাবি। বিকশা চালাবাব আগে, সোতে একবাব সঙ্গীদেব দিকে আড়চোখে তাকাল। হাত তুলে নমস্কাব কবল মবা মানুষেব দিকে চেযে। দৌড় দিল রিকশা নিযে। পিছন থেকে ত্যাবড়া বলল, 'দুপুবেব খাওয়া মিটিযে আসিস।

এই মুহূর্তে সবাই সোতেব চলে যাওযা বিকশাব দিকেই তাকিযেছিল। মনা বলল, 'শালাব কপালটা সত্যি দিদিমণি ছাপা।'

পুনিয়া বলল, 'তাও এই ভব দুপুবে। এখনো ম্যাটিনি শোর কত দেবি।'

ত্যাবড়া বলল, 'কেন বল তো ?'

'কেন ?' সবাই ওব দিকে তাকাল।

ত্যাবড়া আঙুল তুলে মবা মানুষটাকে দেখিযে বলল, 'এব জন্যে। মুখখানা দেখেছিস। সেই যাদেব ফটো দেখে লোকে পুজো কবে, সেই বকম দেখাচ্ছে, তাই না ?'

সবাই মরা মুখেব দিকে তাকাল। সকলেই যেন অবাক, আবিষ্ট হযে কয়েক মুহূর্ত সেই মুখেব দিকে চেযে বইল। কালো চোখ বোজা শান্ত লম্বাটে একটা মুখ। অল্প অল্প ধূসর গোঁফ দাড়ি। ই মুখটা সামান্য একটু ফাঁক। গলায রুদ্রাক্ষের মালা।

জগা বলে উঠল, 'সত্যি। লোকটাব কী নাম ছিল কে জানে।'

ত্যাবড়া বলল, 'নাম ছিল জগাব বাপ।'

জগা ত্যাবড়ার দিকে তাকাল। মনা আব পুনিযা হেসে উঠল। মনা বলল, 'ত্যাবড়াব বাপ।'

ত্যাবড়া বলল, 'মনাব বাপ।'

জগা বলল, 'পুনিযাব বাপটা আব বাদ যায কেন ?'

পুনিয়া বলল, 'তা হলে সোতেব বাপও নাম হতে পাবে।'

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের সকলের বাপ, বাপ চোদ্দপুরুষ। এখন সব তো এখান থেকে, একটু ফারাকে থাক। লোকজন যাবে, দেখবে, তবে তো পয়সা দেবে।'

পয়সা ইতিমধ্যে কিছু পড়েছে। পড়ছেও। ওরা সবাই একটু সরে গেল। জগা বলল, 'তোর চোখ বটে ত্যাবড়া। পুলের ওপর থেকে দেখতে পেয়েছিলি।'

ত্যাবড়া বলল, 'দেখেই আমার কেমন খটকা লাগল। তখখুনি নেমে কাছে গেলাম। যা ভেবেছি, সনসারের মায়া কাটাবার তালে আছে। তবে এমন জায়গা, যদি বাত্তিরে পটল তুলত তা হলে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। শেয়ালকুকুরে খেয়ে ফেলত।'

মনা বলল, 'আর ভাব, কাল থেকে খাবি খেতে খেতে মরল আজ দুপুরে। শালা টাইম জ্ঞান দেখেছিস, রেলগাড়ির মতন।'

'রেলগাড়ি?' বিটকেল মুখ করে জগা বলল, 'রেলগাড়ির মতন টাইমে মরলে আর দেখতে হত না। কোন গাড়িটা শালা টাইমে চলে রে?'

ত্যাবড়া বলল, 'যা বলেছিস। আমাদের বাবার টাইম অন্য জিনিস। মুখ দেখছিস না?'

আবার সবাই মরা মুখটার দিকে ফিরে তাকাল। খানিকক্ষণ পরে সেই দিকে চোখ রেখেই জগা বলল, 'এর আগেরটা প্রায় চার মাস হয়ে গেল, না?'

ত্যাবড়া বলল, 'তা হবে।'

'চার মাস পরে, আবার আজ।'

পুনিয়া গান গেয়ে উঠল, 'কহাঁ গয়ে হো—

ত্যাবড়া খেঁকিয়ে উঠল, 'চুপ কর, গিলে আয় না; মনাও খেয়ে আয়। তোরা এলে আমি আর জগা খেতে যাব।'

পুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'চল্ দোস্ত।'

ও আর মনা চলে গেল। জগা তখনো মরা মুখের দিকে চেয়ে। ডাকল, 'ত্যাবড়া শোন।'

'কী।'

'আট আনা পয়সা দে তো, এ মুখটার ওপরে একবার ঝোঁকে আসি।'

ত্যাবড়া একটা খিস্তি করে বলল, 'এই দেব। খাটবার নাম নেই, তুমি এখন জুয়া মারতে যাবে।'

জগা বলল, 'দে না, দে না। ওবেলা খাটব। এ মুখ আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তুই আট আনা দে, আধঘণ্টা বাদে তোকে ফেরত দেব।'

মুখের কথায় ত্যাবড়া একটু দুর্বল হল। তবু বলল, 'কেন, তোর সেই ছুঁড়ি কোথায় গেল।'

'সে এখন কোথায় জোড় হয়ে বসে আছে কে জানে। তুই দে না।'

ত্যাবড়া প্যান্টের পাছার পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে দিয়ে বলল, 'আধ ঘণ্টা বাদে ফেরত না দিলে কিন্তু দোস্তি থাকবে না বলে দিলাম।'

জগা কথা না বলে আধুলিটা নিয়ে ইস্টিশনের রোয়াকের ওপর উঠে গেল। রোয়াকের শেষ প্রান্তে পান বিড়ি সিগারেটের গুমটি ঘরের পিছনে গেল। সেখানে তখন জমজমাটি আসর। সামনের দিক থেকে কিছুই দেখা যায় না। পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে। রিকশাচালকদের খেলার জায়গা এটা। এখন দুটো দলে খেলা হচ্ছে। একদল খেলা দেখছে। জগা দেখল, যমুনা এক পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হীরা তার ঘাড়ের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে খেলা দেখছে।

জগা মনে মনে বলল, 'তা-ই। না হলে এতক্ষণ যমুনার দেখা পাওয়া যেত।' ও গিয়ে হীরার পাশে বসল।

এক পাত্র, দু পাত্র, তিন পাত্র। তারপরে মাতাল যেমন তার নিজস্ব মূর্তি পায়, ছোট মফস্বল শহরটা তেমনি পেতে আরম্ভ করে। বিশেষ করে ইস্টিশনের সামনে, শহরের এই সদর অংশে। যতই বেলা গড়িয়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ভিড় ততই বাড়তে আরম্ভ করে। ট্রেন মোটরবাসের যাত্রী ছাড়াও কলকারখানার ছুটির ভিড়। সন্ধ্যার ঝোঁকে পতাকা ফেস্টুন সহ মিছিলটা চলে যাবার পরে ভিড়টা যেন নতুন করে বেড়ে উঠল। বাতিগুলোও জ্বলতে আরম্ভ করল।

সোতে ইতিমধ্যে দুটো দিদিমণি ট্রিপ দিয়েছে। পুনিয়া একটা ট্রিপ দিয়েছে। মনা যাত্রী পায় নি।

জগা ত্যাবড়াকে আট আনা পয়সা ফেরত দিয়ে আবার সেখানেই ফিরে গিয়েছে। ত্যাবড়ার নড়াচড়া নেই। ওর লক্ষ্য, মরা মানুষ। মরা মানুষ শোয়ানো, নতুন কাপড়ের আর মরা শরীরের দিকে। অজস্র পয়সা পড়েছে। ত্যাবড়া কয়েকবার কাপড় তুলে তুলে পয়সাগুলো এক জায়গায় জড়ো করে দিয়েছে। কিছু কিছু তুলে টাকার নোট করে নিয়েছে। চোখে দেখা গুনতি যদি ঠিক থেকে থাকে, তবে প্রায় সত্তর টাকার মত উঠেছে। রাত্রি দশটার আগে মড়া গোটানো হবে না। শনিবারের বাজার, মাসের প্রথম সপ্তাহ। ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, 'বাবা, আজ তোমার দিন, আমাদেরও দিন।

এ সময়েই ঘটনাটা ঘটল। গণেশের দল অনেকক্ষণ থেকেই অনেক রকম টীকাটিপ্পনি কাটছিল। এরা বিশেষ কিছু জবাব দেয় নি। এ বেলার দিকে প্রথম মনার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার জুটল, স্বামী-স্ত্রী। দুজনে উঠতে যাবে, গণেশ চেঁচিয়ে বলল, 'ও গাড়িতে উঠবেন না বাবু, ওই মড়াটা ওতে বই করেছে।'

স্বামী-স্ত্রী একবার মড়ার দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ পেছিয়ে গেল। মনার গলায় একটা গর্জন শোনা গেল, 'তবে রে শুয়োরের বাচ্চা।'

তারপরেই ও একটা উড়ন তুবড়ির মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গণেশের ওপর। গণেশকে নিয়ে একেবারে মাটির ওপরে আছাড়, আর একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুষি চোয়ালে, 'শালা, সেই থেকে পেছুতে লেগে আছ, এখন প্যাসেঞ্জার ভাগাচ্ছ?'

গণেশও সমানে খিস্তি চালাচ্ছে আর ওঠবার চেষ্টা করছে। একটা দল হাত দিয়ে সবাইকে আগলে রাখছে আর চেঁচাচ্ছে, 'চালাও হারকিলিস্—এস্‌পার কি উস্‌পার।'

হাততালি আর কান-ফাটানো শিস্ বাজল। গণেশ কায়দা করে মনাকে কাত করে পেটে একটা ঘুষি কষাল। মনা গণেশের চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ঠুকে চেপে ধরল।

ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'মনাকে অসুরের শক্তি দাও বাবা।'

ঠিক এ সময়েই ফটকে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে মনার ঘাড়ের ওপর। দেখেই পুনিয়া গিয়ে পড়ল ফটকের ওপর। জগারা গুমটির পেছন থেকে খেলা ছেড়ে এসে পড়ল। চারটে মানুষ দলা পাকিয়ে আছাড়িপিছাড়ি মারামারি করছে। হার জিত বোঝার উপায় নেই, আর ওদের ঘিরে এক দলের চিৎকার শিস্ হাসি।

জগা বলল, 'ত্যাবড়া, হুঁশিয়ার, তাল বুঝে সব এখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।'

ত্যাবড়া বলল, 'জানি, সে মতলবও কয়েকজনের আছে।এদিকে দঙ্গল এলেই গুটিয়ে ফেলব।

তারপরেই রিকশার ওপরে ঝপাঝাপ লাঠি পেটাবার শব্দ শোনা গেল। চিৎকার শোনা গেল, 'হঠাও শালা, ভাগো হিঁয়াসে।'

সেপাই ছুটে এসে চারজনের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাঠি চালাল অন্ধের মত, বাছবিচার না

করে। নিজেদের মারামারি এক রকম, রাগে আর জেদে সেটা চালিয়ে যাওয়া যায়। বাইরের থেকে লাঠি পড়লেই মুশকিল। প্রথমে দু দিকে ছিটকে গেল পুনিয়া আর ফটকে। তারপরে মুখোমুখি দাঁড়াল গণেশ আর মনা। দুজনেরই গাল কপাল ফোলা, ঠোঁটের কষে রক্ত। দুজনে দুটো মোষের মত রক্ত চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে।

ত্যাবড়ার পাশে জগা বলল, 'গণেশটা খুব বাড়িয়ে তুলেছে।'

ত্যাবড়া বলল, 'জ্বালায়। এখন কিছু বলিস না। দেখিস, সোতেটা না ক্ষেপে যায়। তুই পুনিয়ার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এই তালে কেটে পড়।'

জগা তা-ই করল। পুনিয়ার গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে এসে দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন বাবু, আপনাদের আমি পৌঁছে দিচ্ছি। ও শালারা ছোটলোক।'

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ চল, সব ডাকাত আর গুণ্ডা।'

স্ত্রীকে নিয়ে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

সেপাই প্রথমেই গণেশকে ধাক্কা মারল, 'যা শালা ভাগ, এই তল্লাটে থাকবি না।'

গণেশ বলল, 'আমি কি মিছে বলেছি, ওর গাড়িতে— '

সেপাই ওকে জোরে ধাক্কা মারল, 'চুপ, রাত নেই মাংতা, যা এখান থেকে।'

বলেই পাশে ফটকেকে দেখে ওকেও ধাক্কা মারল। দুজনকেই ধাক্কাতে ধাক্কাতে দূরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে মনাকেও ধাক্কা মারল, 'যা, সরে যা এখান থেকে।'

মনা ঠোঁটের কষ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলল, 'আপনি জানেন না সেপাইদা— '

'আমি জানতে চাই না। বড়বাবু দেখতে পেলে সব কটাকে হাজতে পুরে দেবে।'

পুনিয়া আগেই সরে গিয়েছে, মনা ওর রিকশার গদিতে উঠে বসল। সোতে এসে ওর মুখের দিকে দেখল। বলল, 'মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে আয়। কপালটায় লাগল কী করে?'

মনা কপালে হাত দিয়ে বলল, 'কী জানি, সেপাইটার লাঠি হবে বোধ হয়। একটু মাল টানতে হবে।'

সোতে বলল, 'হবে। আজ আর আমরা কেউ গাড়ি চালাব না। যা, মুখ ধুয়ে আয়।'

মনা ইস্টিশনের দিকে চলে গেল। সোতে ত্যাবড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কাল আমি গণশা শালাকে একবার দেখব।'

ত্যাবড়া বলল, 'ওর প্যাসেঞ্জার জগাকে দিয়ে পুনিয়ার গাড়িতে তুলে দিয়েছি।'

সোতে হেসে বলল, ফাসকিলাস। তবে গণেশ শালাই বেশি প্যাঁদানি খেয়েছে। ঠোঁট কপাল দু জায়গায় ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। মাথার সামনের দিকে সব চুল তুলে নিয়েছে।'

'শালা।'

দুজনেই হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে মরা মুখের দিকে তাকাল। মুখ থেকে, কাপড়ে আর সারা শরীরে ছড়ানো পয়সা-গুলোর দিকে। ত্যাবড়া বলল, 'সব এর জন্য। মড়া হলেই হয় না, এ শালা মড়া দেখেছিস। এখনো মনে হচ্ছে বেঁচে থেকে ঘুমোচ্ছে। আমার মনে হয়, লোকটা বোধ হয় সব জানত।'

'কী?'

'ওকে দিয়ে আমাদের একদিন হবে।'

'কী করে বুঝলি?'

'মুখের দিকে চেয়ে দ্যাখ্ না।'

সোতে মরা মুখের দিকে আবার তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে ও হঠাৎ সরে

গেল। বলল, 'দূব, ওসব কথা আমার ভাল লাগছে না'। টাকা দে, একটা পাঁট নিয়ে আসি, মনা খাবে।'

ত্যাবড়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'এখন যে যাব পকেট থেকে নিয়ে আয়, পবে শোধ হবে।'

সোতে চলে যাচ্ছিল। ত্যাবড়া ডাকল, 'শোন্, কমলা কেবিনের ব্যাচাদাকে বলবি আড়াই কেজি মাংস বান্না কবে দিতে হবে, আব ভাত।'

'আগাম টাকা দিতে হবে না?'

'তুই আমাব নাম কবে বলবি। আব বলবি নাড়িভুঁড়ি যেন না দেয।'

'আব মিষ্টি?'

'বাজভোগ কেনা হবে।'

'আব মাল?'

'সে হবে এখন।'

সোতে মুখ শক্ত কবে বলল, 'অই শালা তোব দোয, সব তাতে কত্তানো কববি।'

ত্যাবড়া ওব লাল দাঁত বেব কবে হাসল, বলল, 'শালা, যত খুশি টেনো, টেনে পড়ে থেকো, চিতেয় তুলে দিযে আসব। আগে সব টাকাটার হিসাব হোক না।'

সোতে আব কথা না বাড়িযে চলে গেল। ত্যাবড়া মবা মুখের দিকে ফিবে তাকাল। পযসা না গুণেও আধুলি, সিকি, কুড়ি, দশ, পাঁচ, তিন, দুই-এব ঘিঞ্জি, পাযের ওপবে, গাযে ছড়ানো চেহাবা দেখেই ও অনুমান কবতে পারে, আশিব ওপবে দাঁড়িযেছে। এব মধ্যে হিসাবে তিনটে দশ আব একটা পাঁচ টাকাব নোট, ওব নিজেব পকেটেই আছে। এখন প্রায সাতটা বাজে। আবো ঘণ্টা তিনেক কম কবে সময় হাতে আছে। এখনো বাইবেব প্যাসেঞ্জাব বিস্তব। দুটো সিনেমা হলে দুটো শো ভাঙবে, আবাব শুরু হবে। শনিবাব মাসেব প্রথম আর এ যা মুখ, এমন নিপাট ভাল অঘোব ঘুমে নিবীহ মানুষেব মত, এ আব দেখতে হবে না। একশো ছাড়িযে কুড়ি পঁচিশে নির্ঘাৎ দাঁড়াবে। ত্যাবড়ার বিশ্বাস, লোকটা ওকে ডেকেছিল। না হলে পোলেব ওপব দিযে যেতে যেতে নিচে পিছনেব দিকে ঝোপেব পাশে লাইনেব ধারে হঠাৎ কাবোব নজব টানে। 'অনেক দিন তো আধপেটা ছাড়া ভাল-মন্দ খাস নি, প্রাণভবে মাল টানিস নি। আমাকে দিযে খাস, জানিযে দিযে গেলাম।' প্রথম দেখে এ কথাই ওব মনে হযেছিল। গোটা শীতকাল ধবে প্রতিটা ছুটিব দিনে গাড়িতে লবিতে কত ভদ্রলোকেব ছেলেমেযেবা ফিসটি কবতে যায। গান কবতে কবতে, টুইস্ট নাচতে নাচতে যায, মাইকে গান বাজাতে বাজাতে যায, বাস্তায মেযে দেখলে শিস্ দেয়, ইশাবা করে। এই শহবেব ছেলেমেযেবাই কতবকম কবে। কী ফুর্তি।

ত্যাবড়া ভাবে, তা এও একবকমেব ফিস্টি। এও একবকমেব চাঁদা। সব জাতেব মানুষদের তো আব একরকমেব হয না। খাওযা ফুর্তি হলেই হল, ওটা সবাই বোঝে।

এই সমযে পুনিয়া এল একদিক থেকে। আর এক দিক থেকে যমুনা। পুনিযাব মুখটা একদিকে খামচানো। ত্যাবড়া ওব মুখেব দিকে চেযে বলল, 'ওখানে কী হয়েছে?'

পুনিযাব মুখে এখনো খামচানো আব বাগেব জ্বালা। বলল, 'ফটকে শালা, খামচে দিযেছে শুযোবের বাচ্চাকে কাল আমি দেখাব।'

যমনা মবা মানুষেব ধাব ঘেঁষে ত্যাবড়াব প্রায গাযেব কাছে গিযে দাঁড়াল। ত্যাবড়া রুক্ষ মুখে ভুরু কুঁচকে তাকাল। যমুনা দেখছে মবা মুখ আব একটু একটু কোমব দুলিয়ে মিটি মিটি হাসছে কোমব নাচানো মেযেটাব একটা অভ্যাস। মরা মুখের দিকে চোখ বেখেই বলল, 'আগেই বলেছিলাম তোমাদেব মতলব ঠিক জানতে পাবব। বতন আমাকে দুকুবেই বলেছে।'

ত্যাবড়া মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'বেশ করেছে। কোথা থেকে তেতে এলি?'

'তেতে আবার আসব কোত্থেকে? আমি তো গুমটির পেছনে সারা দিন শুয়ে কাটালাম গো।'

'কেন, পেট বাঁধিয়েছিস নাকি?'

যমুনা সারা গায়ে ঢেউ দিয়ে খিলখিল করে হাসল। অন্যান্য রিকশাচালকদের শিস্ আর রকমারি আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন ডাকল, 'এই যমুনা, ইদিকে আয়।'

যমুনা সেদিকে তাকাল না। হাসতে হাসতে প্রায় ত্যাবড়ার গায়ে ঢলে পড়ার যোগাড় করল। মরা মানুষের আরো কাছে সরে গেল। ত্যাবড়া খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে, আরে, তুই ও মড়া ছুঁস্নি, কাট এখান থেকে।'

যমুনা হাসি থামিয়ে ঘাড় কাত করে ত্যাবড়ার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, আমি এ-মড়া ছুঁলে মড়ার জাত যাবে?'

'তা যাবে না? কোত্থেকে কী করে এসেছিস, যা এখান থেকে।'

এবার পুনিয়া হেসে উঠল। ও সরে এসে যমুনার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। যমুনাও হাসল। বলল, 'ত্যাওড়াদাদার যে কথা। মাইরি বলছি, কিছু করে আসিনি, পেটও বাঁধে নি। আমার শালা বাঁজা পেট, দেখলে না, ইসটিশনের খুঁড়িটা, পেট বাঁধিয়ে মরে গেল অ্যাদ্দিনে। বেঁচেছি বাবা। রতনটা কোথা গেল?'

ত্যাবড়া বলল, 'সেই খোঁজেই এসেছিল। সেজন্যই তো বলেছিলাম, কোথা থেকে তেতে এলি।'

এই সময়ে যমুনা পুনিয়ার দিকে ফিরল। পুনিয়ার খামচানো মুখে হাসি। নজর যমুনার জামার বোতামছাড়া অনেকখানি খোলা বুকের দিকে। অন্যদিকে যমুনার দিকে কথা ছোড়াছুড়ি শিস চলছিল। যমুনা পুনিয়াকে বলল, 'কী রে মড়া, তুই কী দেখছিস?'

পুনিয়া হেসে বলল, 'মড়া।

যমুনা বলল, 'শালা, শকুন কমনেকার।'

তারপর ত্যাবড়ার দিকে ফিরে বলল, 'একটা টাকা দিয়েছি — '

কথা শেষ করবার আগেই, ত্যাবড়া বলে উঠল, 'রতনের কাছ থেকে বাগ্রেই নিয়ে নিস।'

যমুনা মাথা নেড়ে বলল, 'টাকা আমি নেব না, তোমাদের দলে থাকব।'

ভাগ্, মেয়েমানুষটানুস আমাদের দলে নিই না!'

'আমি ঠিক থাকব।'

বলেই যমুনা মরা মানুষের মাথার কাছে বসে পড়ল। বলল, 'ই কী গো, ধূপকাঠি নিবে গেছে কখন, দ্যাখ নি। দাও, সালাইটা দাও।'

বলে, ধূপকাঠির বাকসোটা হাতে তুলে নিল। ত্যাবড়া হুমকে উঠল, 'অ্যাই, অ্যাই, মড়া ছুঁসনি বলছি।'

যমুনা বলল, 'মড়া ছুঁচছিনা বাবা, সালাইটা দাও না, ধূপকাঠি জ্বেলে দিচ্ছি।'

ত্যাবড়া দেশলাইটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'শালা, আচ্ছা আপদ জুটেছে তো।'

যমুনা হাসতে হাসতে দেশলাই জ্বালিয়ে জোড়া কাঠি ধরাল। কাদা মাটির ড্যালায় পুঁতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ত্যাবড়াকে দেশলাই ফিরিয়ে দিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'যে কথা বলতে এয়েছিলাম শোন। তোমরা যখন মড়া নিয়ে বেরোবে তখন রাস্তায় তোমাদের আটকাবে।'

'কারা ?'

গণশা ফটকেবা তো থাকবেই, শিবে লাট্টুবাও ওদের সঙ্গে থাকবে, ছিনতাই করবে টাকা।'

ত্যাবড়াব মুখ শক্ত হয়ে উঠল। পুনিযাব সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। পুনিয়ার চোখ ছোট হল, রাগ ফুটে উঠল। ত্যাবডা মরা মুখেব দিকে তাকাল, তাবপরে হিপ পকেট থেকে টেনে বেব করল একটা ছুরি। ছুরিব ফলাটা খুলে বোতাম টিপে আটকে যেন মরা মানুষটাকে দেখাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমাব জন্য আজ জ্যান্ত খাব, কিন্তু তোমাব দিন আমাদেব দিন পাক্কা, পাই পযসা কাউকে ভাগ দেব না।'

পুনিযা বলল, 'শালাদেব ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখব।'

যমুনা বলল, 'আমি বলেছি ওদের, তোবা যখন মডাব পযসায খেযেছিলি বতনদেব ভাগ দিয়েছিলি ? আমাকে গণশা শালা বললে, 'চোপডা ভেঙে দেব।' আমি বলেছি, 'তোব ইযে মুচড়ে দেব।'

এই সময়ে মনা আব সোতে এক সঙ্গে এল। সোতেব প্যাণ্টেব পকেট দেখেই বোঝা যায একটা পাঁট নিযে এসেছে। দুজনেই ওদের পাশ ঘেঁষে যাবাব সময় সোতে যমুনাব পাছায একটা চাঁটি মারল। যমুনা প্রতিবাদে কোমবটা দুলিযে দিল। ওবা দুজনে বিকশা সাবিব পেছনে নর্দমাব ধাবে দেওযাল ঘেঁষে চটেব ওপব গিযে বসল।

যমুনা আবাব ত্যাবডাকে বলল, 'আমি কিন্তু দলে বইলাম।'

ত্যাবডা ধমক দিল, 'ভাগ।'

যমুনা হাসতে হাসতে ইস্টিশনেব দিকে চলে গেল। সোতে মনাব দিকে একবাব তাকিযে পুনিযাকে বলল, 'শোন পুনিয়া, একবাব গুযেব ডিপোব কাছে যাস। একটু এগিযে গেলে দেখবি, বেললাইনে ঢোকবাব গলিব মধ্যে একটা বাঁশ পড়ে আছে। ওটা নিযে চলে আয।'

পুনিযাব চোখে মুখে অনিচ্ছা। বলল, 'হ্যাঁ, শালা কাব বাঁশ, দেখবে তাবপবে তাডা কববে।'

'আবে কেউ দেখবে না, তুই যা না।'

'আমাব সঙ্গে কেউ চলুক।'

'সঙ্গে আবাব যাবে কি, তুই দ্যাখ না যেযে।'

পুনিয়া যাবাব আগে বলল, 'তুমি শালা আমাকে দিযে বেশি খাটাচ্ছ।'

ত্যাবডা হেসে বলল, 'দু টুকবো মাংস বেশি খাস।'

পুনিযা হাসল না, চলে গেল।

বাত যত বাডতে লাগল, ইস্টিশনেব সামনেটা একটু ফাঁকা হতে লাগল। তবে শনিবাবেব বাত। অন্যান্য দিনেব তুলনায এখনো ভিড় কম না। আইন আছে, বাত আটটাব পবে দোকান বন্ধ। এ শহবে আইন নেই। দশটা বাজছে, দোকান সবই হাট কবে খোলা, আলোয ফটফট কবছে। পকেট যাদেব ভববাব তাদেব ঠিকই ভরছে।

মাঘেব শেষ, কিন্তু দিনেব বেলাব মতনই এখনো দক্ষিণা বাতাস ছাড়ছে। শীত তেমন নেই বসন্তকালেব মত আবহাওযা। পুনিযা বাঁশটা ঠিক আনতে পেবেছে। সেটাকে দু টুকবো কবে কেটে মোটামুটি একটা চালি বানানো হযেছে। সোতে মনা আব জগাই কবেছে। তবে ইতিমধ্যে পাঁচজনে দু পাঁট খেযেছে। কিন্তু যে কারণে ওবা খায, খেয়ে বলে, 'শবীবের জাম ছাড়াচ্ছি,' এখন সে অবস্থা নয। যমুনাব সংবাদেব পবে ভিতবে ভিতবে ওদেব এখন লডাইযের প্রস্তুতি সকলেরই শক্ত মুখ, চোখে চোখে নজব হানা। গণশাদেব দলটাকে কাছে পিঠে দেখা যাচ্ছে না। তবে মদ খাওযাব পবে সবাই একবাব মবা মানুষের গাযে হাত বুলিয়েছে। ত্যাবড়া মডার ঠ্যাং

কনকনে চিবুক হাত দিয়ে চুমকুড়ি শব্দ করে বলছে, আসিববাদ কব, নিজেব বাপকে যেন তোমার মতন এখানে এনে শোয়াতে পারি।'

জগা বলেছে, 'নিজেব বাপকে শোযাবি ?'

'শোযাব না? ওটাই তো একমাত্তব হকেব ধন। বাপ পুড়িযে আবার একদিন আশ পুবে খাব।'

সোতে বলেছে, 'আব সেইসব ছেবাদ্দটেবাদ্দ কী সব বলে, সেসব কববি না ?'

'ধূ-শালা, ছেরাদ্দ আবার কী। চিতেয গঙ্গাজল ঢেলে দেব, ওতেই ছেবাদ্দ হযে যাবে।'

বাকি চাবজন চুপ করে ছিল খানিকক্ষণ। তাবপবে জগা বলেছে, 'আমাব তো বাপই মরে গেছে।'

মনা সোতেও তাই বলেছে, ওদেব বাপও মবে গেছে। পুনিযা বলেছে, 'আমাকে সেই বাচ্চা বযসে ছেড়ে দিযে বাপটা যে কোথায ভেগে গেল, কোনদিন জানতে পাবলাম না।'

ত্যাবড়া বলেছে, 'কোথায যেযে মবে গেছে, কাবা হযতো পুড়িযে আমাদের মতন খেযেছে।'

পুনিযা সামনেব মবা মানুষেব মুখেব দিকে ফিবে তাকিযেছে। ওব আনমনা চোখে বাবাব ঝাপসা মুখটা ভেসে উঠেছিল। গালেব খামচানো ক্ষতেব জাযগাটা কেমন যেন কুঁচকে উঠেছিল।

দু পাঁট মদ খাবার পবে এইসব কথা ওবা বলাবলি কবছে। তাবপবে কাবখানায রাত্রি দশটাব ভোঁ বেজে যাবাব পবে ত্যাবড়া মরা মানুষেব শবীর আব কাপড় থেকে সব পযসা তুলে নিযে গুনল। যা ভেবেছিল তা-ই, প্রায একশো পনব টাকা উঠেছে। সোতে আব মনাকে ডেকে বলল 'ভাত আব মাংসেব আগাম টাকা দিযে আয। বাজভোগেব হাঁড়িটা ওখানেই জমা কবে দিস। মালেব বোতলেব কথা বলে বেখেছিস ?'

সোতে বলল, 'পাঁচ বোতল পুবো।'

ত্যাবড়া বলল, 'খেযে যদি পড়ে থাকিস কোন শালাকে টেনে তোলা হবে না।'

মনা বলল, 'তোকেও শালা তুলব না।'

ত্যাবড়া টাকা দিযে বলল, 'যা, মিটিযে আয, এবাব বেরুব। আমবা মড়াটা বেঁধে ফেলছি।'

জগা বলল, 'সাড়ে দশটার মধ্যে। আবো দুটো গাড়ি দেখে নে।'

ত্যাবড়া বলল, 'যোগাড় যন্তব কবতে কবতে হযে যাবে।'

সোতে মনা চলে গেল। ত্যাবড়া মড়াব কাছে উপুড় হযে খাঁজে ভাঁজে অগলে বগলে হাটকে দেখল, পযসা আবো পড়ে আছে কী না। তিনটে দশ পযসা পাওযা গেল আবো। এ সময়েই একটা হাসিব বোল আব মার মার শব্দ শোনা গেল। কোথায কী ঘটছে বোঝবার আগেই নর্দমায় বড় বড় ইঁট পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে একটা জন্তুব গলা ফাটানো চিৎকাব। তাবপবেই নর্দমা থেকে শব্দ দিযে উঠল নোংবা মাখা একটা শুয়োব। মবা মানুষটাব ওপব দিযে মাড়িযে চলে গেল। ত্যাবড়া ছিটকে সবে যাবাব আগেই ওব গায়েও নর্দমাব দুর্গন্ধ ময়লা লেগে গেল!

কযেকজনেব একটা দল খ্যাল খ্যাল কবে হাসতে লাগল।

ত্যাবড়া চিৎকাব কবে উঠল, 'জগা, মড়াটা আগলে দাঁড়া তো। একটা কুত্তার বাচ্চা এদিকে এলে মাথা দু ফাঁক কবে দিব।'

হাসিটা তাতে আবো জোব হল। জগা চেঁচিযে বলল, 'কুত্তাব বাচ্চা দেখছিস কোথায, সব তো শোবেব বাচ্চা। শালাদের জম্মের ঠিক থাকলে সামনে আসুক।'

পুনিয়া ততক্ষণে ওর রিকশায যাত্রী বসবাব সীট তুলে ভিতর থেকে একটা সাইকেলেব চেন বের করে নিযেছে। চাবুকের মত ধবে চিৎকাব কবল, 'সব বেজম্মাব চামড়া খুলে নেব।'

এ সময়ে যমুনা এসে দাঁড়াল। আবার হাততালি, হাসির বোল, শিস্ বেজে উঠল। সেই সঙ্গে খিস্তি। যমুনাও কোমর দুলিয়ে কাঁপিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল. 'কী রে মড়ারা, হল কী তোদের, তোরাও চালিতে উঠবি নাকি।'

ফটকের গলা শোনা গেল, 'না, তোর ওপরে।'

যমুনা বলল, 'মুরোদ জানা আছে রে। রিকশা চালিয়ে চালিয়ে তো শালা তোদের মাজা ভেঙে গেছে।'

সেপাইটা আবার এগিয়ে এল। এতক্ষণ ছিল না। ডিউটি শেষ করে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। এসেই হাঁক দিল. 'অ্যাই, গোলমাল কিসের, ঝামেলা হটাও।'

বলতে বলতে সে মারমুখী হয়ে লাঠি উঁচিয়ে গণেশদের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা সব এদিক ওদিক দৌড় দিল। ত্যাবড়া নিজের গায়ের ময়লা মোছার আগে, ন্যাকড়া দিয়ে মড়ার শরীর পরিষ্কার করতে লাগল। মরা মানুষটার মুখের ওপর ময়লার ধ্যাবড়া শুয়োরের পায়ের আঁচড়ে গালের খানিকটা চামড়া খসে গিয়েছে।

সেপাইটা ওদের দিকে এগিয়ে এসে সিঁড়ির ধারে যমুনাকে দেখল। দেখলেই বোঝা যায়, নজরের ঠেক কোথায়। দাঁতচাপা স্বরে বলল, 'তুই এখন এখানে কেন, তোর জায়গায় যা।'

যমুনা হেসে বলল, 'আমার আবার জায়গা কোথায় গো সেপাইদা?'

সেপাই আবার লাঠি তুলে এগোল, 'তোমার জায়গা চেন না হারামজাদি।'

যমুনা 'বাবা গো' বলে ঢঙ করে হেসে দৌড় দিল। আর তখুনি ওর ডানা মুচড়ে ধরল রেলের সেই সেপাই, 'গায়ের উপার পড়স ক্যান ডেকরি, গতরে পোকা পড়ছে নাকি?'

যমুনা ব্যথার শব্দ করল, 'উঃ উঃ লাগে।'

রিকশাচালক, ভিখিরি আর একশ্রেণীর যাত্রীরা হেসে উঠল। ত্যাবড়ার সামনে থানার সেপাই নিচু হয়ে বলল, 'অনেক রাত হল রে ত্যাবড়া, এবার বাড়ি যাব।'

ত্যাবড়া তখন মড়ার গালের উঠে যাওয়া চামড়াটা লেপটে দেবার চেষ্টায় ছিল। পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করে, সেপাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। সেপাই খেঁকিয়ে বলল, 'ভাগ হারামজাদা, আর দুটো টাকা দে। দেড়শো টাকা তো তুলেছিস।'

'মাইরি না সেপাইদা, একশোও পুরো হয়নি।'

'ভাগ, পাঁচটা টাকা ছাড়।'

ত্যাবড়া মনে মনে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা।'

আরো দুটো টাকা দিয়ে দিল। জগা বলল, 'আর এক শালা তাকিয়ে আছে রে।'

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, জলের কুমিরটা গেল, এখন ডাঙার বাঘ। রেল সেপাই দেখতে পেয়েছে কত দিলাম?'

'শালা যমুনার গায়ে খুমচে ধরে খপিসের মত এদিকে নজর রেখেছিল। ওকে যা দিয়েছিস একেও তাই দিতে হবে। বুড়ো মানুষটার দেনা মিটছে।'

ত্যাবড়া মাথা ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত দিল। বলল, 'আমাদের দেনা বল। মানুষটাকে দিয়ে নিজেদের দেনা মেটাচ্ছি।'

ভুরু আর ঠোঁট ফোলা মনা বলল, 'হ্যাঁ, রিকশাওয়ালা হলেই পুলিসের কাছে চোদ্দ পুরুষের দেনা থাকে। আর ইস্টিশনের ধারে হলে রেল পুলিসের কাছেও। মিটিয়ে দে শালা।'

ত্যাবড়া রতনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল। রতন ইস্টিশনের রোয়াকে উঠে রেল সেপাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। সেপাই প্যান্টের পকেটে হাত গুঁজে তৃপ্ত হেসে বলল, 'এই

মরা লইয়া যা গিয়া, গন্ধ ছাড়ব।'

সোতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'এখন যা, পাঁচ টাকা নিয়ে বুড়ি মাগের কাছে শুতে যা শালা।'

যমুনা ছাড়া পেয়ে একদিকে পালিয়েছে। বাতাসটা কমের দিকে, না, বাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যেন। কয়েকটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি কামড়াকামড়ি খেলা জুড়ে দিয়েছে, আর এমন ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করছে, যেন চুপিচুপি কিছু কথা বলছে। পুনিয়া ইঁট নিয়ে তৈরি, মড়ার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে। বলল, 'শালারা হঠাৎ খেলা জুড়ে দিল কেন বল তো?'

সোতে বলল, 'কুত্তার মর্জি, কে বুঝবে।'

যে দুটো গাড়ির অপেক্ষা ছিল, তাও এসে গেল। মড়ার চাদরে আরো কিছু পয়সা পড়ল। দোকানপাটও কয়েকটা বন্ধ হতে আরম্ভ করল। আর দু একটা আপ ডাউন গাড়ি আছে। তার অনেক দেরি। ত্যাবড়া বলল, 'নে, এবার চালিটা আন, বেঁধে ফেলা যাক।'

সোতে মনা পিছনের দেওয়ালের কাছ থেকে চালিটা নিয়ে এল। সবাই মিলে মরা মানুষটাকে চালিতে তুলল। মুখটা বের করে রেখে, জড়িয়ে বাঁধবার সময় গণেশরা চিৎকার করে 'হরিবোল' দিল, তারপরে লাটুর গলা শোনা গেল, 'পাঁচ ব্যাটার বাপ মরেছে।'

ওরা কেউ সে সবে কান দিল না। ত্যাবড়া বলল, 'পুনিয়া, তোর গাড়িটা নিয়ে চল্। সীটের নিচে, মালের বোতলগুলো নে। আড়াই শো চানাচুর নিবি, খালি মুখে চলবে না।'

সোতে বলল, 'তোকে বলতে হবে না, নেওয়া হয়েছে।'

পুনিয়া বলল, 'গাড়ি চালাবে কে?'

'তুই।'

'না, আমি মড়া বইব।'

'আচ্ছা চল, গাড়ি আমি চালিয়ে যাব।'

গলা শুনে সবাই ফিরে তাকাল। যমুনা কোমর দুলিয়ে হাসছে। ত্যাবড়া জগার মুখের দিকে তাকাল। শক্ত মুখে খেঁকিয়ে উঠল, 'না, মেয়েমানুষ-টানুষ যাবে না।'

জগা সোতে আর মনার দিকে তাকাল। সোতে বলে উঠল, 'যেতে চায়, চলুক না।'

মনা বলল, 'চলুক। একটা টাকা দিয়েছিস তো?'

ও যমুনার দিকে তাকাল। ত্যাবড়া খিঁচিয়ে উঠল, 'অ শালা, তোমরা মাল খেয়ে মেয়ে নিয়ে ব্যালা করতে যাচ্ছ? আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

জগা বলল, 'আরে, ব্যালা করার কী আছে? আমরা থাকব আমাদের মনে, ও থাকবে ওর মনে।'

ত্যাবড়া মুখ বিকৃত করে বলল, 'যা খুশি করগে শালা। একটা ভাল মানুষের মড়া, কার সঙ্গে দিন ভর কী না কী করছে ছুঁড়ি।'

যমুনা ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'মাইরি আজ সারাদিন কিছু—।'

'চোপ, আমার সামনে থেকে যা।'

যমুনা যেন ভয় পেয়েই একটু সরে গেল। আর পুনিয়া যমুনার দিকে চেয়ে, হেসে বলে উঠল, 'তা হলে আমিই গাড়ি চালাব।'

কথাটা শেষ হবার আগেই ত্যাবড়া ওর কোমরে একটা লাথি কষিয়ে দিল, 'শালা।

পুনিয়া হেসে, লাফ দিয়ে সরে গেল। নান্টা এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। নান্টাকে দেখেই, ওরা পাঁচজনে নান্টার দিকে ফিরে তাকাল। নান্টা একবার চালির দিকে দেখল, আর একবার ওদের দিকে।

সোতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল রে নাণ্টা তুই আবার কেন এখানে?'

নাণ্টা বলল, 'তখন থেকে দেখছি, কেউ কিছু বলছিস না। এখন কেটে পড়বার তালে আছিস। একি সেপাইয়ের পাওয়ানা? যেচে দিতে পারিস না?'

ওরা পাঁচজন চোখাচোখি করল। মনা বলল, 'ইউনিয়নের চাঁদা চাইছিস?'

নাণ্টা বলল, 'তবে কি মাল খাব বলে?'

নাণ্টা ইউনিয়নের লিডার। ত্যাবড়া বলল, 'এর আগে তো মড়ার টাকা থেকে চাঁদা নেওয়া হয় নি।'

নাণ্টা বলল, 'সে হয় নি, হয় নি। ফোকটে পেয়েছ, ইউনিয়নকেও দিতে হবে।'

ত্যাবড়া বলল, 'ফোকটে বলিস না। চাঁদা দিতে বলছিস দিচ্ছি। কিন্তু কার নামে বিল লিখবি? পাঁচজনের নামে?'

নাণ্টা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোদের নামে লিখব কেন? মড়ার চাঁদা বলে লিখব।'

ত্যাবড়া বলল, 'সেই ভাল।'

ও পাঁচটা টাকা এগিয়ে দিল। নাণ্টা খেঁকিয়ে উঠল, 'ভাগ শালা, সেপাইদের পাঁচ টাকা করে ঘুষ দিতে পার, ইউনিয়নকে দশটা টাকা দিতে পার না? নিজেরা তো সালা ডেডেমুষে মাল আর মাংস মারবে।'

মনা হাত তুলে বলল, 'একটা তো দিন, ওসব খোঁটা দিস না নাণ্টা। ত্যাবড়া কথা বাড়াস নি, মিটিয়ে দে।'

ত্যাবড়া দশটা টাকা নাণ্টার হাতে তুলে দিল। আর তখনই দক্ষিণ দিকে, একটু দূরে রাস্তার ওপরে দুম করে একটা শব্দ হল। আগুন ঝলকে উঠল। তারপরেই একসঙ্গে কতগুলো গলার চিৎকার। নাণ্টা ছুটে গেল। ওরা পাঁচজন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। জগা বলে উঠল, 'রেজাদের ছিনতাই পার্টির মধ্যে লাগল বোধহয়।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, আবার দুটো পর পর বোম ফাটল। একদল ভয় পাওয়া লোক ইস্টিশনের দিকে ছুটে এল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হতে লাগল। দক্ষিণদিকের রাস্তাটা হঠাৎ একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। রাস্তার আলোগুলো নিবে গেল। জগা বলে উঠল, 'যা বলেছিলাম, তা-ই।'

একটু দূরেই অন্ধকারের মধ্যে, কিছু লোকের ছোটাছুটি মারামারি দাঙ্গা হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। ব্যাপারটা এদিকে এগিয়ে আসবে কী না, বোঝা যাচ্ছে না। দোকানগুলো দু'মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। ফলে, ইস্টিশনের সামনেটাও অন্ধকার হয়ে এল। ইস্টিশনের রোয়াকের ওপর লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। বাজার রাস্তা আর সমস্ত পটি থেকে লোকজন এখানেই জড়ো হল। এখন ইস্টিশনই তাদের কাছে একমাত্র নিরাপদ জায়গা।

ত্যাবড়া ভয়ে আর উত্তেজনায় বলে উঠল, 'আমাদের এখুনি কেটে পড়া দরকার।'

সোতে বলল, কিন্তু যাবি কোন রাস্তা দিয়ে। আমাদের যাবার রাস্তার ওপরে তো লেগেছে টাকা আর মড়া সব ছিনতাই হয়ে যাবে।'

পুনিয়া বলে উঠল, 'চল মড়া নিয়ে রেল লাইন দিয়ে কেটে পড়ি।'

জগা ভেংচি কেটে বলল, 'কিন্তু বড় নর্দমার খালটা পেরোবি কী করে? গঙ্গায় জোয়ার থাকলে বুক সমান জল হবে।

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'সে তখন দেখা যাবে। তোল তাড়াতাড়ি।'

এ সময়েই দক্ষিণের অন্ধকার থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। তারপরেই

একজনের গলা শোনা গেল, 'ওবা হেবোর পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

তারপরেই অনেকগুলো গলার চিৎকার। পরপর কয়েকটা বোম ফাটাতে ফাটাতে ইস্টিশনের দিকে একটা দল, আর একটা দলকে হটিয়ে নিয়ে এল। ইস্টিশনের সামনে রাস্তা রোয়াক সব ফাঁকা।

ত্যাবড়া চিৎকার করে বলল, 'শালারা তোল না মড়াটা।'

সোতে মনা জগা ত্যাবড়া মড়া তুলে ঘাড়ে ফেলে উল্টোদিকে দৌড় দিল। যমুনা পুনিযার রিকশায় লাফ দিয়ে উঠল। পুনিয়া রিকশা চালিয়ে দিল। এ সময়ে একটা পুলিসের জীপ আর ভ্যান আলো জ্বালিয়ে, উত্তর দিক থেকে ছুটে এল। পুনিয়া বলল, 'যাক, এসে গেছে।'

॥৩॥

মড়া নিয়ে, প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই, ওরা গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। পিছনে পিছনে, যমুনাকে নিয়ে পুনিয়া, রিকশা চালিয়ে। কিন্তু গঙ্গার ধারে এসেও ওরা থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় আলো নেই, অন্ধকার। এমন থাকবার কথা নয়। গঙ্গার বুকে, স্রোতের বাঁকা ঘূর্ণিতে কয়েকটা লম্বা ঝিলিক মাত্র। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায়, হঠাৎ যেন এক আধটা জোনাকির জ্বলে ওঠা। আর সবই অন্ধকার, উঁচু রাস্তা, নিচের পাড, নদী। দক্ষিণের দূর বাঁক পর্যন্ত অন্ধকার। ওপারের আলো কিছু দেখা যায়। সব যেন কেমন থমথম করছে।

ত্যাবড়া নিচু স্বরে বলল, 'রাস্তায় একটাও বাতি নেই কেন?'

মনা বলল, 'কেমন যেন লাগছে। কিছু হয়েছে নাকি?'

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ইস্টিশনের ওদিক থেকে আর একবার একটা বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল। দু'-একটা গাড়ির গর্জন, একটা ট্রেন আসার শব্দ। তা ছাড়া শহরটা নিঝুম, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ, চুপ করে এক কোণে লুকিয়ে আছে।

সোতে বলল, 'আমরা তো মড়া নিয়ে বেরিয়েছি। চল না, হরিবোল দিতে দিতে চলে যাই।'

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, তারপরে যখন চিনতে পারবে মড়াশুদ্ধ সব ছিনিয়ে নেবে।'

জগা বলে উঠল, 'তা'লে এক কাজ কর।'

'কী?'

'ঝামেলায় যেয়ে দরকার কী, চল গঙ্গায় ভাসিয়ে দিই।'

ত্যাবড়া নিচু স্বরে গর্জে উঠল, 'শালা বেইমান! তারপরে তুমি মদ মাংস খেয়ে, ছুঁড়িটাকে নিয়ে কোথাও পড়ে থাকবে।'

মনাও অনেকটা গর্জনের স্বরে বলল, 'শালা। খালি আমাদের ফিসটি গেলাবার জন্য লোকটা মরেছে, না?'

সোতে বলল, 'হ্যাঁ, না পোড়ালে মাইরি শাপ লাগবে।'

জগা বলল, 'যা বাবা, আমি ভালোর জন্য বললাম, আর— '

যমুনা রিকশা থেকে বলে উঠল, 'সব ভাল ভাল না জগা। তোমার মনে অধর্মো আছে। লোকটা চিতেয় পুড়বে বলেই না ত্যাওড়াদাদার নজর টেনেছিল।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। মনে হল মরা মানুষটার মুখটা ওদের সকলের চোখের সামনে জেগে উঠল। পুনিয়া পিছন ফিরে যমুনাকে একবার দেখতে চেষ্টা করল। সোতের গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, পুড়িয়ে যাব, ভাসিয়ে যাব না। পুনিয়া, একটা কাজ কর তো। একটা বোতল বের কর, এক ঢোক করে মাল টেনে নিই।'

মনার গলা, 'মাইরি।'

পুনিয়া রিকশা থেকে নামল। যমুনার গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'নাম।'

যমুনা ওকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই যা, আমি দিচ্ছি।'

যমুনা নিজেই, সীটের তলা থেকে একটা দেশী মদের বোতল বের করল। গালার সীল ভেঙে ছিপি খুলে, আগে ত্যাবড়ার হাতে দিল। ত্যাবড়া প্রথমটা একটু থমকে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মরা মুখটা একবার দেখবার চেষ্টা করল। তারপরে বোতল উপুড় করে গলায় ঢালল, দমবন্ধ গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, বেরিয়ে যাই।'

যমুনা তারপরে সোতেকে বোতল দিল। যমুনার গলা শোনা গেল, 'আঃ, ছাড়।'

গলায় মদ ঢালার শব্দ হল। মনা বলল, 'সোতেটা শালা মড়া কাঁধেও খচড়ামি করছে।'

সোতে মদ গিলে নিয়ে বলল, 'একটা কথা হঠাৎ মনে হল মাইরি। আমরা পাঁচ জন পাণ্ডব, আর যমুনা দুরুপদী।'

পুনিয়ার হাসি শোনা গেল। যমুনা বলল, 'ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ারকি ভাল না।'

ত্যাবড়া হঠাৎ অনেকটা চিন্তিত সুরে বলল, 'হ্যাঁ, এবার বুঝেছি, গঙ্গার ধারটা কেন অন্ধকার করে রেখেছে। শালারা লড়াইয়ের ময়দান সাজিয়ে রেখে গেছে, বুঝলি? বড় রাস্তায় ফয়সালা না হলে, এখানে আসবে।'

সোতে বলল, 'তা হলে তাড়াতাড়ি চল।'

জগা বলল, দাঁড়া বাবা, ঢোকটা মেরে নিই।'

বাহকদের পরে, যমুনা পুনিয়াকে বলল, 'হাঁ কর, তোর গলায় ঢেলে দিচ্ছি।'

পুনিয়া বলল, 'তুই খাবি না?'

'না।'

'কেন, খাস না নাকি?'

'তা বলে, তোদের মতন? মড়া নিয়ে যেতে যেতে খাব? নে নে, হাঁ কর।'

পুনিয়া হাঁ করল। যমুনা মদ ঢেলে দিল। আর পুনিয়ার হাতটা উঠে এল যমুনার কাঁধে। যমুনা বলল, 'নে হয়েছে, চালা।'

ওরা চারজন আগে আগে মড়া নিয়ে, নিঃশব্দে চলেছে। হরিধ্বনি উচ্চারণ করতে পারছে না। পিছনে পিছনে, রিকশার ঝন্-ঝন শব্দটা সকলেরই খারাপ লাগছে, ভয় পাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার, একটা লোক নেই। গাছের ঘন ঝোপ থেকে ভয় পাওয়া পাখি, হঠাৎ এক-আধবার ডেকে উঠছে। থমথমে অন্ধকারের মধ্যে, প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা কিছু ঘটবার আশঙ্কা। একটা বোমা ঝটিতি এসে ফাটা, বা একটা দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়া। হলও তাই। দূর থেকে, ওদের ওপর একটা চড়া আলো এসে পড়ল। আলোটা ছুটে ওদের দিকে আসতে লাগল।

ত্যাবড়া উত্তেজিত হয়ে, হিপ পকেট থেকে ছোরাটা বের করে খুলে ফেলল, 'যা থাকে বরাতে, লড়ে যাব।'

মনাও ছোরা বের করে বলল, 'আমারও আছে।'

পুনিয়া বলল, 'যমুনা, শীগগির সীটের নীচে থেকে সাইকেলের চেনটা দে।'

আলোর পিছনে কী আছে, কে আছে, প্রথমে বোঝা গেল না। আরো খানিকটা কাছে আসতেই বোঝা গেল, প্রাণপণে কেউ সাইকেল চালিয়ে আসছে। সামনে ডায়নামোর আলো। কাছাকাছি আসতেও যখন সাইকেলের গতি কমল না, তখন ওরা একটু নিশ্চিন্ত হল। কাছাকাছি হতে, ওরা দেখল, সামনের রডের ওপর আর একজন ঝুঁকে বসে আছে। তার মাথা মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছে। ওদের গা ঘেঁষে, সাইকেলটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'যা বলেছিলাম, এবার সব এদিকে আসবে। দৌড়ো।

ওরা মড়া কাঁধে দৌড়তে লাগল। সোতে বলল, 'কোন রকমে একবার খাল নর্দমার ধারে পৌঁছুতে পারলে হয়, তারপরে সব ঠাণ্ডা।'

পৌঁছল তা-ই, ধুক ধুক প্রাণে, কিন্তু নিরাপদেই। কেবল অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠল। খাল নর্দমা মানে, শহরের একমাত্র আউট-লেট' গঙ্গায় এসে মিশেছে। আসশ্যাওড়া আর কালকাসুন্দের জঙ্গল পায়ের নিচে। খালের দিকে ঢালু জমি নেমে গিয়েছে।

পুনিয়া বলল, 'রিকশা পার করা যাবে না। মালপত্তর সব বের করে খোলায় নে, গাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে দে, কেউ দেখতে পাবে না।'

পুনিয়া বলল, 'হ্যাঁ, কেউ দেখতে পাবে না। যদি কেউ দেখতে পায়, মার মেরে নিয়ে যায়, গাড়ির মালিক শালা আমাকে ফাটকে পাঠিয়ে দেবে।'

মনা বলল, 'তুই আমার ওপর ছেড়ে দে। এমন জায়গায় ঢোকাব, কাকপক্ষীও দেখতে পাবে না।

মড়াটা ওরা আর একবার নামাল। যমুনা সীটের তলা থেকে মদের বোতলগুলো, চানাচুরের ঠোঙা নামিয়ে নিল। মনা ঢালু জমির ঘন জঙ্গলের একদিকে তিন চাকার গাড়িটা নামিয়ে নিয়ে গেল। মড়মড় করে কয়েকটা আসশ্যাওড়া গাছ ভেঙে গাড়িটাকে ঢেকে দিল। ত্যাবড়া নর্দমার ধার থেকে উঠে এসে বলল, 'জোয়ারটা নেমে গেছে, কিন্তু হাঁটু ডোবা পাঁক জমেছে। সাবধানে যেতে হবে। চল বেরিয়ে যাই।'

চারজনেই আবার মড়া কাঁধে তুলে নিল। পুনিয়া বোতলের ঝোলা কাঁধে নিল। যমুনা ওর পাশে পাশে। নর্দমার ময়লার ওপরে, পলিমাটির আস্তরণের ওপর দিয়ে সবাই সাবধানে পা টিপে টিপে নামতে লাগল। ময়লায় পা পড়তেই, এমন দুর্গন্ধ বেরোল নাড়িভুঁড়ি উঠে আসবার যোগাড়। যমুনাই প্রথম শব্দ করে নাকে আঁচল চাপা দিল। নর্দমার মাঝামাঝি আসতে, হাঁটুর বেশি ডুবে গেল।

ত্যাবড়ার গলা শোনা গেল, 'হুঁশিয়ার।'

যমুনা পুনিয়ার ঘাড়ে হাত রাখল। পুনিয়ার এখন মজা নেই। পাঁকের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ভয় করছে। তথাপি যমুনার ছোঁয়া পেয়ে, একটু যেন ভরসাও পেল। কিন্তু ওর গায়ে হাত দেবার সাহস পেল না। একটা ঝুঁকে পড়া গাছের ডালের সঙ্গে, মড়ার ধাক্কা লাগল। ওরা খুব আস্তে আস্তে পার হল। নর্দমার পাঁক ওদের উরুত ছাড়িয়ে উঠতে লাগল। যমুনার গলা শোনা গেল, আমার কোমর ধরেছে।'

সোতে শব্দ করল, 'স্‌সস্, উঁম।'

সকলেই প্রায় কোমর অবধি ময়লা আর দুর্গন্ধ মাখামাখি করে পার হয়ে এল। ওপারে উঠে বাঁ দিকে ফিরে খানিকটা যাবার পরে গঙ্গার ধারের রাস্তা পেল। আলোও পাওয়া গেল। নিজেদের দিকে সবাই তাকিয়ে দেখল। কোমর অবধি রঙ বদলে গিয়েছে।'

জগা এতক্ষণে কথা বলল, 'একেবারে পুড়িয়ে চান করব।'

এক দিকে গঙ্গা, আর এক দিকে চটকলের লম্বা পাঁচিল। তারপরে একটা গরীবদের পাড়া। সেই পাড়াটা পেরিয়ে গেলেই শ্মশান। মনা বলল, 'হরিবোল দেব?'

ত্যাবড়া বলল, 'থাক্ শালা, যা দিন আজ, বলা যায় না। চুপচাপ চলে যাই।'

সোতে বলল, 'লোকটা বোধহয় চুপচাপ থাকতে ভালবাসত।'

অর্থাৎ মরা মানুষটি। পুনিয়া বলল, 'আস্তে আস্তে একটা গান গাইব?'

কেউ জবাব দিল না। পুনিয়া সকলের সম্মতি আছে ভেবে নিচু গলায় গান ধরল, 'আমরা রিকশা চালাই, আমরা রিকশা · '

সোতে বলল, 'ভাগ্ শালা, আব গান খুঁজে পেল না। শুনলে শালা আমার চিত্তির জ্বলে যায়।'

মনা বলল, 'আমারও মাইরি। গাড়ি চালাই আমরা, আর শালা ওরা গান করে, তাল মারে।'

সোতে বলল. 'শালা মাক্ষীচুষ জাত। সবখানে চুষে খায়।'

পুনিযার আব গান গাওযা হল না। ও মুখ ফিবিযে যমুনাব দিকে তাকাল। যমুনা এসব কথা শুনছিল না। ও গঙ্গাব দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। বাতাসে ওব চুল উডছে। পা থেকে কোমব পর্যন্ত মাটি দিযে গডা প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। কালো ময়লা আর পলিমাটিব জন্যে ওদেব সবাইকেই একবকম দেখাচ্ছে। যমুনা মেযে বলে অন্য রকম।

ত্যাবড়া হঠাৎ মোটা গলায, নিচু সবে গেযে উঠল, 'মবিব মবিব সখি, নিশ্চয মবিব '

সোতে হেসে উঠল, তাবপবে সবাই হেসে উঠল। সোতে বলল, 'শালা আব গান খুঁজে পেল না। মড়া বইছে কী না!'

যমুনা বলল, 'তোমাব আবাব সখি কে গো ত্যাওড়া দাদা।'

ত্যাবড়া ধমক দিয়ে বলল, 'তুই চুপ কব।'

বোঝা গেল, ত্যাবডাব মনটা এখন বেশ খুশি আব নিশ্চিন্ত, এবং সকলেবই।

গরীবপাড়াব পবে, ছোট একটা মাঠ। তাবপবে শ্মশান। শ্মশানে ঢোকবাব আগে, ওবা এবাব গলা ফাটিযে হবিধ্বনি দিল। যমুনাব গলাটা ওদেব সঙ্গে মিশে হবিবোল ধ্বনিটা কেমন একটা নতুন সুরে বাজল।

শ্মশানটা ফাঁকা, একটাও চিতা জ্বলছে না। মনা বলল, 'সত্যি, লোকটা ঝামেলা পছন্দ কবে না। আজ মড়াব ভিড নেই।'

কাঠের চালাটাব পাশে টিমটিমে বিজলি আলোব নিচে চণ্ডী এসে খালি গাযে দাঁড়াল। পাশেই তার নিজেব থাকবাব ঘুব। সেখানে তার বউ ছেলেমেযেরা আছে। চণ্ডী শ্মশানেব ডোম। সে এসে দাঁড়াতে, গঙ্গাব ধাবেব ছাইগাদা থেকে তিনটে কুকুবও তার পাশে এসে দাঁড়াল। কান খাড়া, ল্যাজ ঝোলা, লাল ঢুলুঢুলু চোখ কুকুবগুলো যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য কবে কাঁধের মড়াটা দেখল। ওবা চাবজন শ্মশানের কাঁচা উঠোনে মড়া নামাল।

উঠোনেব একপাশে কযেকটা দরজাবিহীন চালা ঘর। একটাতে টিমটিম কবে কুপি জ্বলছে। গায়ে গেরুযা জামা পবে, চুল দাড়িওযালা এক বুড়ো গালে হাত দিযে বসে বয়েছে। আর একটা ঘরে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, দু'তিনজন ঢাকাঢুকি দিযে শুযে আছে।

চণ্ডী এসে মড়ার সামনে দাঁড়াল, দেখল, তাবপবে সকলেব দিকে ফিবে তাকাল। বোগা লম্বা কালো চণ্ডী কলসীতে জল ভবাব মত বগবগ কবে হেসে উঠল। বলল, 'কাব মড়া? নিজেদেব কারোর? নাকি জুটল?'

ত্যাবডা বলল, 'জুটল'।

চণ্ডী বলল, 'বাহ্, তোমাদেব কপালটা বেশ ভাল। তা কেমন পেলে?'

'মন্দ না, মাখো মাখো কবে ভালই।'

'মাখো মাখো? গড়িয়ে পড়বে না?'

চণ্ডী বগ্‌বগ্ কবে হাসল। যমুনার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস কবল, 'আর ইটি?'

সোতে বলল, 'জুটে গেল।'

চণ্ডী আবার হাসল। ত্যাবড়া বলল, 'নাও দাদা, সাজিয়ে ফেল, জিনিস তৈবি।' বলে পকেট

থেকে টাকা বের করে গুণে দিল। চণ্ডী বলল, 'চার মাস আগের হিসাবে দিলে। আরো দেড় টাকা দাও, লকড়ির দাম বেড়েছে।'

ত্যাবড়া মুখটা বিকৃত করল। মনা বলল, 'কমছেটা কী, তা তো বুঝি না।'

চণ্ডী বলল, 'মড়া। মাইরি, বড্ড কমে গেছে।'

ত্যাবড়া আরো দেড় টাকা দিল। চণ্ডী এবার পুনিয়ার হাতের ঝোলার দিকে তাকাল। বলল, 'চিতের কাছে নিয়ে যেয়ে মড়ার ধরাচূড়া খোল। আমি সাজিয়ে ফেলছি।'

চারটি চিতা, পাঁচিল ঘেরা। চিতার ঘেরাও থেকে জমি ঢালুতে নেমে গঙ্গায় গিয়েছে। ওরা একটা চিতার সামনে মড়াটা নামাল। ত্যাবড়া বলল, 'এখন ধরাচূড়া খোলার দরকার নেই। আগে কাঠ ফেলুক।'

জগা বলল, 'তা হলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই। ট্যাড লাগছে।'

সোতে মনাও সায় দিল। জগা বলল, 'যমুনা, তুই মড়ার কাছে থাক, আমরা ঢালুতে নেমে যাচ্ছি।'

যমুনা বলে উঠল, 'না না, আমি একলা মড়া আগলাতে পারব না।'

জগা হঠাৎ ধমকে উঠল 'পারবি। আমরা তো পাঁচ হাত দূরেই থাকছি। ন্যাকামো হচ্ছে।'

যমুনার ভুরু কুঁচকে উঠল। হঠাৎ ওর শরীরটা বেঁকে যেন ধারালো হয়ে উঠল; বলল, 'বড় যে মেজাজ দেখাচ্ছ?'

জগা হাত তুলে, খেঁকিয়ে উঠল, 'এক থাপ্পড় মারব বেশি কথা বললে, খালি কচর কচর।'

জগার ব্যবহারে সবাই অবাক হল। যমুনাও। কিন্তু যমুনার চোখ ধকধক করে উঠল। কিছু বলবার আগেই ত্যাবড়া বলে উঠল, 'শালা মাগভাতারি ঝগড়া।'

জগা তেমনি গর্জে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবি ত্যাবড়া।'

ত্যাবড়াও একইভাবে বলল, 'এক থাপ্পড়ে দাঁত তুলে নেব।'

দু'জনেই মারমুখী হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। বাকীরা ওদের ঘিরে। মনা বলল, 'আ রে, আপসে লড়ছে দেখ। কী হল রে জগা?'

জগা চেঁচিয়ে বলল, 'ত্যাবড়াকেন সব সময়ে লিডারি মারবে? তখন দেখতাম, গঙ্গার ধারে বোমবাজী হলে, মড়া গঙ্গায় না ফেলে কী উপায় ছিল? তা শালা আমাকে শোনালে, আমি মদ খেয়ে মাগীবাজী করতে যাব আর এই মাগী— '

যমুনার দিকে তাকাল ও, 'বলে কী না, আমার মনে অধম্মো। শালী আমার ধমমের বকনা গাই।'

বলেই ও গঙ্গার ধারে নেমে গেল। বাকীরা সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করল যমুনা ছাড়া। যমুনা ঠোঁট বাঁকিয়ে জ্বলন্ত চোখে জগাকে দেখছিল। সোতে হেসে বলল, 'সেই থেকে শালা মনে মনে ফুঁসছে। ত্যাবড়া তুইও খচ্চর আছিস। খালি খোঁটা দিয়ে কথা বলিস কেন?'

যমুনা বলল, 'না না তোমাদের ওপর চটেনি, আমার ওপর গরম হয়েছে। অই যে, ত্যাওড়াদাদাকে সাপোটি দিয়ে, অধম্মো বলেছি?'

বলেই, ও গঙ্গার ধারের চেয়ে, কোমরে একটা হ্যাঁচকা দোলা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ইস্টিশনের ভিক্ষে করে খাই, যমুনা কারোর তোয়াক্কা করে না।'

সোতে বলল, 'লে লে, তুই আর শুরু করিস না।'

এ সময়ে চণ্ডী কাঠের বোঝা এনে চিতার পাশে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

ত্যাবড়া বলল, 'কিছু না। চণ্ডী তো এখন কাঠ সাজাবে, যমুনাকে একলা থাকতে হবে না।'

চণ্ডী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আছি, তোমরা চালাও গে।'

ওরা সবাই নেমে গেল। গঙ্গার ধারে ছাইয়ে ভরতি। ছাইগাদার পরে, পলি পড়া ভিজে পাড়। ছাইয়ের ওপরেই ওরা চেপে বসল। বাতাসে ছাই উড়ল। চুপচাপ সবাই, খোলা বোতলটা হাতে হাতে নিয়ে শেষ করে দিল। তারপরে চানাচুর চিবোতে লাগল।

পুনিয়া হঠাৎ বলল, 'আমি চিতা সাজানো দেখিগে।'

মনা বলল, 'হ্যাঁ, পোড় গে শালা।'

পুনিয়া চলে গেল। সোতে বলল, 'যমুনার কাছ থেকে নড়তে চাইছে না।'

ত্যাবড়া হাসল। আর একটা নতুন বোতল বের করে ছিপি খুলে গলায় ঢালল। একে একে সবাই ঢালল। ত্যাবড়ার গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'লোকটার মুখটা আমার মনে পড়ছে।'

মনা বলল, 'আমার মাংস দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।'

সোতে বললো, 'ধ্—। দে, মাল খাই। আমার বাবা এই ভাল।'

জগা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, দিদিমণি তো আর কোনোদিন জুটবে না, খালি বয়েই বেড়াতে হবে।'

সোতে বলল, 'দিদিমণি জুটে আমার দরকার নেই। মেয়েমানুষ সব এক, কোন সুখ নেই।'

জগা বলল, সুখ নেই?'

'না। আমার শালা কোন কিছুতে সুখ নেই, আমি বুঝতে পারি না মাইরি।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। কেবল মনার চানাচুর চিবানোর মচমচ শব্দ শোনা গেল।

জগা বলল 'মাল খেলে আমার এরকম মনে হয়'

সোতে বলল, 'তুই তো যমুনাকে নিয়ে বেশ আছিস।'

'যমুনা কি আমার একলার?'

'একলার হলে খুশি হতিস?'

জগা জবাব দিল না। মনা বলল, 'রিকশাওয়ালারা সবার খুশি। খেটে খেটে মরে যাব, ফিনিস্।'

ত্যাবড়ার গোঙানো স্বর আবার শোনা গেল, 'এই দ্যাখ, আমি মরলে তোরা ফিসটি করবি তো?'

সবাই ওর দিকে ফিরে তাকাল। ত্যাবড়া আবার বলল, 'আমি নিশ্চয়ই ইস্টিশনেই মরব।

জগা বলল, 'আমরা সবাই ইস্টিশনে মরব।' আমাদের আর ঘর আছে?'

ত্যাবড়া বলল, 'কিন্তু দেখিস, আমাদের মড়া নিয়ে যেন শালা গণেশ মুটকেরা না যায়।'

মনা বলে উঠল, 'তাহলে শালাদের কাঁচা খেয়ে ফেলব।'

এই সময়ে চণ্ডীর গলা শোনা গেল, 'কই গো, এস সব, চাপাতে হবে।'

বোতলের ঝোলা রেখেই ওরা সবাই উঠে গেল। ত্যাবড়া নিজের হাতে মড়ার গায়ের কাপড় খুলতে গিয়ে দেখল নতুন কাপড়ের টুকরো নেই। জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কাপড় কোথায় গেল?'

চণ্ডী বগবগ করে হাসল। যমুনা বলল, 'এক টুকরো এ নিয়েছে। আর এক টুকরো ওই সাধু নিয়েছে।'

সবাই তাকিয়ে দেখল, গেরুয়া জামা গায়ে, চুল দাড়িওয়ালা সাধু একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাড় নেড়ে হেসে বলল, 'এমন একটা লোক মরল, সবারেই তো কিছু পাওয়া চাই।'

চণ্ডী সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি কথা। নাও, বাকী জামা কাপড়গুলো খুলে দাও। ঘি এনেছ?'

ত্যাবড়া বলল,'কী হবে?'

'মড়ার গায়ে মাখাতে হয়।'

'ওসব ছাড়।'

'নিদেন একটু দাল্‌দা আনলেও পারতে। যাক গে, আন নি যখন '

ত্যাবড়া মরা মানুষটির গা থেকে জামা কাপড় খুলতে খুলতে বলল, 'সব খুলে নেব?'

'না, কোমরের কানিটুকু রাখ, বাকী খুলে দাও।'

তা-ই করা হল। তারপর চারজনে ধরে চিতার কাঠের ওপরে মড়া শুইয়ে দিল। হাত দুটো গুটিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল, ভীষণ শক্ত হয়ে গিয়েছে। শরীরের একটা জায়গাও বাঁকাবার উপায় নেই। চণ্ডী বলল, 'ছেড়ে দাও, এমনি থাকুক।'

সে মড়ার ওপরে কাঠ সাজিয়ে দিতে লাগল। ওরা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। ত্যাবড়া মড়ার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখো বাবা, কোন দোষ নিও না। এই চেয়েছিলে তো?'

বুড়ো সাধুটা ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'আর আবার কী চাইবে। মরার পরে চিতায় উঠে পুড়তে যাচ্ছে, মানুষের আর কী চাইবার আছে।'

কথাটা সবাই শুনল, কেউ ফিরে তাকাল না। কাঠ সাজাবার পরে চণ্ডী নিজের হাতে কয়েকটা প্যাকাটি জ্বালিয়ে বলল, 'নাও, কে মুখে দেবে, দাও।'

ত্যাবড়া বলল, 'আমিই দেব।'

জগা বলল, 'তোর না বাপ বেঁচে আছে, তুই মুখে আগুন দিবি কি?'

ত্যাবড়া বলল, 'এ বাপ বাপের থেকে বেশি।'

জগা বলল, 'তবে আমিও দেব।'

সোতে মনা পুনিয়া সবাই বলল দেবে। সবাই একসঙ্গে বুড়ো মানুষটার মুখে আগুন ঠেকিয়ে দিল। যমুনা পলকহীন চোখে দেখছিল। চণ্ডী হেসে বলল, 'মন্দ না, নতুন এক রকম হল।'

সে চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল। বাতাস থাকায়, একটু পরেই ভালভাবে আগুন জ্বলে উঠল। সোতে বলল, 'যাই, ছাইগাদায় বসি গে।'

জগা যমুনার দিকে ফিরে ডাকল, 'আয়, ওখানে যেয়ে বসি।'

যমুনা আগুনের দিকে চোখ রেখে বলল, যাও, যাচ্ছি।

ওরা সবাই গিয়ে আবার ছাইগাদায় বসল। যমুনাও আস্তে আস্তে এসে বসল। চণ্ডীও এল। বগ্‌বগ্‌ করে হেসে ত্যাবড়ার পাশ ঘেঁষে বসল। বোতল হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, গলায় ঢালা চলল।

চণ্ডীও হাতে বোতল তুলে নিয়ে বলল, 'মাগীটা ঘুমোচ্ছে।'

অর্থাৎ তার বউ। না ঘুমোলে, মদ খেতে পারত? সোতে বলল, 'যমুনা একটু খা না।'

যমুনা বলল 'না, ভাল লাগছে না।'

যমুনার একদিকে জগা আর একদিকে পুনিয়া। হাঁটুর কাছে সোতে, একটা পা ঢুকিয়ে দিয়েছে যমুনার ঠ্যাঙের তলায়। পুনিয়া বলল, 'তোর কোলে একটু মাথা রাখতে দিবি যমুনা?'

যমুনা বলল, 'রাখ, তোমার মরণ ধরেছে জানি।'

চণ্ডী বগ্‌বগ করে হাসল, বলল, 'সেই কথা, মরণ না ধরলে চলবে কেন।'

পুনিয়া যমুনার কোলে মাথা রাখল। যমুনা পুনিয়ার মাথার চুলে হাত দিল। সোতে একবার যমুনার ঘাড়ে আস্তে টিপে দিয়ে, পুনিয়াকে চোখের ইশারায় দেখাল। মনা এগিয়ে এসে যমুনার পিঠে আস্তে হেলান দিয়ে বসল।

নতুন বোতল খোলা হল। এমন সময়, সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল,

'কী, কাবণ পান হচ্ছে? এ তো বড় ভাল জিনিস।'

ত্যাবড়া বলল, 'চলবে?'

বুড়ো বলল, 'তা আব না চলবে কেন। অমন মানুষেব মড়া। লোকটা পুণ্যিমন্ত ছিল।'

সে কাছে এসে বসল। ত্যাবড়া বলল, 'কিন্তু খাবে কিসে বাবা?'

'আমাদের পাত্তর টাত্তব নেই, বোতল থেকে চুমুক মাবতে হবে।'

বুড়ো হে হে করে হেসে বলল, 'এখানে আবাব এঁটোকাঁটা কী আছে। বোতল ধরেই খাব।'

বড়ো গাঁজার কলকেটিও এনেছে। সেটা বাঁ হাতে নিয়ে, ডান হাতে বোতল ধবে চুমুক দিল। দাড়ি বেযে কযেক ফোঁটা পড়ল। তারপবে কলকেব ভিতরে আঙুল টিপতে লাগল। এখন সকলেই চুপচাপ। কেউ কাবোর দিকে তাকিযে নেই। সকলেবই চেহাবাগুলো যেন কেমন বদলে গিযেছে। সেই দুপুরের মানুষগুলোকে আব চেনা যায় না। পুনিয়াব একটা হাত মায়ের কোলে শিশুব মত যমুনাব বুকেব কাছে নড়ছে। যমুনা নির্বিকাব, গঙ্গার দিকে তাকিযে আছে। বাতাস বইছে। কয়েকটা কুকুর ওদেব আশেপাশে এলিযে শুয়ে আছে।

ত্যাবড়া হঠাৎ বলে উঠল, 'মানুস যে কী, তা বুঝলাম না।'

কেন কথাটা বলল, বোঝা গেল না। কেবল সোতে সায় দিতে গিয়ে, শুধু উচ্চাবণ কবল, 'হ্যাঁ, শালা মানুষ-- '

দাড়িওয়ালা সাধু বুড়ো, গাঁজাব কলকে টিপতে টিপতে, ঘাড় নেড়ে হাসল। তাবপবে কেশো ঘড়ঘড়ে গলায সুব করে গাইল,

'মানুষ মানুষ কবলি—মানুষ
বতন চিনলি না।'

তাবপবে বলল, 'মান চাই, হুঁস চাই, মানে হুঁসে মানুষ।'

তার এসব কথাব কেউ কোন জবাব দিল না।

আবার নতুন বোতল খোলা হল। তাব থেকে দু'ঢোক খেযে চণ্ডী উঠে বলল, 'যাই, একটু খুঁচিয়ে দিযে আসি।'

ত্যাবড়া বলল, 'চল, আমিও যাই।

সবাই উঠল। সবাই গেল। মড়া পুড়ছে, মুখটা পুড়ছে, আব ঠোঁট পুড়ে গিয়ে, দাঁতগুলো বেবিযে পড়ছে। মাথার চুল পুড়ে, চামড়া উঠে, সাদা খুলি দেখা যাচ্ছে।

ত্যাবড়া বলল, 'আমাব মনে হচ্ছে, হাসছে।'

চণ্ডী বলল, 'হ্যাঁ, এখনই তো যত বঙ্গ।'

বলে বগ্‌বগ্ কবে হাসল। মনা বলল, 'ধুর, ছাইগাদাতে যেয়ে বসি।'

সোতেও সায দিল। সবাই সায় দিল। আবার সবাই ছাইগাদায গেল। বুড়ো সাধুও গেল। গিয়ে কলকেয আগুন দিল।

জগা বলল, 'সব হল, কিন্তু মানুষটাব জন্য কাঁদা হল না।'

সোতে হেসে বলল, 'ঠিক বলেছিস। এব আগেববার বেগা শালা কী রকম কেঁদেছিল মড়াটার জন্যে?'

মনা বলল, 'যমুনা, তুই মেয়েমানুষ, তুই কাঁদ।'

যমুনা ঝংকাব দিল, 'আমাব বয়ে গেছে।'

সোতেও বলল, 'কাঁদ না যমুনা, তুই একটু কাঁদ।'

যমুনা গায়ে মোচড় দিয়ে বলল, 'ভাগ্, কাঁদবো না হাতি।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'কাঁদ না যমুনা, কাঁদ কাঁদ, তুই কাঁদ।'

ওরা যেন যমুনাকে সবাই পাগল পেল। যমুনা হাসতে লাগল। কিন্তু ওরা যেন কেমন ক্ষেপে উঠতে লাগল, জেদ করতে লাগল, 'কাঁদ না, কাঁদ যমুনা, তুই কাঁদ।'

ওরা যমুনাকে ধাক্কা মারতে লাগল, আর ওদের কেমন ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা দেখাতে লাগল। যমুনা ছিটকে উঠে দাঁড়াল, চেঁচিয়ে উঠল, 'না না না।'

বলে ও গঙ্গাধারের দিকে চলে গেল। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল, তারপরেই হঠাৎ সবাই শুনতে পেল, যমুনা হা হা করে কাঁদছে, আর বলছে, 'অ গো বাবা গো, বাবা গো বাবা. আমার বাবা, সেই রাস্তার ধারে তুমি মরে পড়ে রইলে গো. বাবা গো। তোমার টেঁপিকে দেখলে না— আঁ আঁ আঁ ...।'

ওরা সবাই শুনল, আর সকলেরই যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ওরা নিজেদের দিকে কেউ তাকাল না। তারপরেই হঠাৎ ত্যাবড়া ফুঁপিয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ ওরা এ ওর দিকে একবার তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন ওরা কেউ কারোকে আর চিনতে পারছে না। তারপরে পুনিয়াও তেমনি হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল।

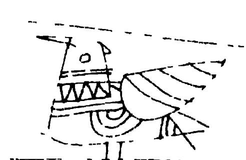
মনা বলল, 'ধ্যাত্, ভাল লাগে না। খাটব খাব·

ওর কথা শেষ হল না, গলার কাছে শব্দটা আটকে গেল, যেন স্বরটা ভেঙে গেল। সোতে দাতে দাঁত টিপে, চোখের জল মুছতে লাগল। ওর নিচু চাপা স্বর শোনা গেল, সুখ নেই শালা— '

যেন পাথর সরে গেল, বানের জল ভাসল কলকলিয়ে।

চণ্ডী বোতল তুলে চুমুক দিল। যমুনা তখনো কাঁদছে। চণ্ডী বলল, 'কাদ, সবাই কাঁদ। কাঁদলে জ্বালা জুড়োয়। যাই, আবার একটু খুঁচিয়ে দিয়ে আসি।'

চণ্ডী চিতার দিকে এগিয়ে গেল।



বালির ঝড়



ট্রেন এসে পৌঁছুলো প্রায় এক ঘন্টা দেরিতে।

সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। কিন্তু দিকে দিকে প্রসারিত তার লেলিহান জিহ্বা এখনো গুটিয়ে নেওয়া হয়নি। এখনো গরম বাতাসের ঝাপ্‌টা! পায়ের তলায় আদিম পাথুরে-মাটিতে এখনো জ্বলন্ত অঙ্গারের উত্তাপ।

গাড়ির জানলা দিয়ে আগেই লক্ষ্য পড়েছিলো দগ্ধ-ধূসর তিন-পাহাড়ের পিঠ। এই পশ্চিমা সূর্যের জ্বলন্ত থাবায় যেন একটি অতিকায় পশুর মতো ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে পাহাড়টা। পশুটা মৃতপ্রায়।

কিন্তু গাড়ি যতই সামনে এগোচ্ছিলো, ততই একটা জিনিস বুঝে ওঠা যাচ্ছিলো না। দূরে ওগুলো কী? ওই ধোঁয়া ধূসর যেন মাটি থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আকাশব্যাপী অন্ধকার করে দিচ্ছে? যেন ওই অতিকায় পশুটা পা ছুঁড়ছে এখনো মরার যন্ত্রণায়। খাবি খাওয়ার মতো। বালি উড়ছে যেন তারই অন্তিম নখরাঘাতে—তার শেষ দাপাদাপিতে।

তারপর গাড়ি আরো এগিয়েছে। টের পাওয়া গেছে, বালি-ই উড়ছে। দিগন্তব্যাপী অন্ধকার করে দিয়ে যেন একটা কাপালিক খ্যাপা হয়ে ফিরছে। হাসছে অট্টরোলে। আদিম মানবের জাদু-বিশ্বাসের একটা খেলা দেখাচ্ছে যেন সে।

সামনে মাঠ কি ঘাট কিছু বোঝার উপায় নেই। সম্ভবত খোলা চরভূমি। তারপরে গঙ্গা। কারণ, দূরে স্টীমারের একটি অস্পষ্ট ছায়া যেন দেখা যাচ্ছে। আরো দেখা যায়, যেন কতকগুলো প্রেতছায়া ছুটে আসছে। দেখা যেতে যেতেই ছায়াগুলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ট্রেনের কামরায়। ওরা যে কুলি, তা আর চেনবার উপায় নেই। ততক্ষণে খোলা জানলা দরজা দিয়ে গরম বালুকারাশি কামরাগুলো ভরে তুলতে আরম্ভ করেছে।

মুহূর্তে একটা বীভৎস তান্ডব শুরু হলো। ঝোড়ো বাতাস আর বালু যেন তপ্ত খোলার মুড়ি-ভাজা বালি তার সঙ্গে মানুষের হাঁক-ডাক চীৎকার। মানুষের চেয়ে বেশী কুলির ধস্তাধস্তি।

সুলতা-শিবনাথদের কামরাতেও তান্ডবটা শুরু হয়েছে। সুলতা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেই পারে নি। কিছুটা বুঝি বেলা শেষের আমেজে আর গাড়ির দোলানিতে ওর চোখ জড়িয়ে আসছিলো। তারপর সহসা বালুর আক্রমণে রুমাল চেপে ধরেছিলো মুখে। এবার বোম্বাই-সিল্‌কের গোটা আঁচলটাই মুখে মাথায় টেনে এনে বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি হচ্ছে?'

অবস্থাটা শিবনাথের খুব সুবিধের নয়। দম চাপতে গিয়ে, প্রায় দৈববাণীর মতো কড়া আর

মোটা শোনালো তার গলা, 'বালির ঝড়!'

এই সহসা-দুর্যোগের ওপর যেন রেগে উঠে, প্রায় শাসিয়ে উঠলো সুলতা, 'বালিব ঝড়? কী বিশ্রী!'

পশ্চিম গঙ্গার খেয়ালী ঢালু পাড়ে, দূরবিশারী এই ধুধু বালুচরে কোনো এক অজানা দিগন্ত থেকে ঝড় উঠে এসেছে কে জানে। মানুষের মন-রাখা সুশ্রী-বিশ্রীর চৈতন্য তার নেই। না মানে শাসন, না মানে কর্ষণ। গাড়িটা থেমেও না থেমে যতই চাকা ঘষে ঘষে ইঞ্চি ইঞ্চি এগোয়, ততই ঝড়ের দস্যিপনা বাড়ে।

এবার বিরক্তির চেয়ে কষ্টটাই টের পাওয়া গেল সুলতার, 'উঃ, গেলুম। এ আমরা কোথায় এসেছি?'

যেন অনেক দূর থেকে জবাব দিলো শিবনাথ, 'শকরিগলি ঘাট।'

—তারপর?

এখানেই নামতে হবে আমাদের। নেমে স্টীমারে উঠতে হবে।

—ওরে বাবা!

বুঝি ভয় পেয়েই সুলতা দু'হাত বাড়িয়ে শিবনাথকে ধরে তার পিঠে মুখ গুজলো। শিবনাথেরও দু'চোখের কোল বালুকণায় ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। সে সস্নেহে বললো, একটু সামলে নাও সুলতা। স্টীমারে গিয়ে উঠলে আর লাগবে না।'

সুলতা প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'কী করে সামলাব। সব তছনছ করে দিচ্ছে যে।'

শিবনাথ হাসলো একটু। মুখ নামিয়ে এনে বললো, 'তা বেড়াতে গেলে একটু কষ্ট সইতে হয় না বুঝি। কষ্ট করলেই কেষ্ট মিলবে।'

—যাও। তোমার সান্ত্বনাতেই ফাজলামি। আমি বলে কানা হয়ে যাচ্ছি। আর গায়ে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে গরম বালি, ইস্!

রক্তের মতো লাল তরল শাড়িটার আঁচল তখন লুটিয়ে পড়েছে। অতলস্পর্শ জলের মতো নীল নাইলনের জামাটা শাড়ি পরিত্যক্ত। তেইশ চব্বিশ বর্ষণের অনেকটাই অনাবৃষ্টির লক্ষণাক্রান্ত শরীরে, অন্ধকারে নিওন-আলোর বিজ্ঞাপনের মতো অন্তর্বাস সুস্পষ্ট। প্রসাধন অনেক আগেই ধুয়ে মুছে গেছে ট্রেনের গরমে ও ঘামে। এখন চোখ ঘষে ঘষে কাজল হয়েছে চোখের কালি। বালি ইতিমধ্যেই সাদা স্তর ফেলেছে চুলে—বালি খোঁপার ভাঁজে ভাঁজে।

শিবনাথের অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। তবে পুরুষ হওয়ার সুযোগটাই একমাত্র সুযোগ। সে কোঁচাকে মালকোঁচা করে নিয়েছে। রিস্টওয়াচে বেঁধেছে রুমাল।

এদিকে কুলিদের ডাকাতে-হাত পড়েছে তাদের মালের ওপর। কামরার অন্যদুটি পরিবার তখন কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে নামতে উদ্যত। সুলতার আঁকড়ে-ধরা হাত এবার কোমর থেকে না সরালে নয় শিবনাথের।

এমন সময়ে সুলতার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শোনা গেল, 'ও কি, ও কি করছেন আপনি? ওটা আমার, আমাদের ওটা।'

দরজার দিকে যেতে গিয়ে ভদ্রমহিলা হকচকিয়ে থমকে গেলেন। যাকে অন্তত বারকয়েক নীলা বলে ডাকতে শোনা গেছে কামরায়, সেই ভদ্রমহিলাই। আর এই বালির ঝড়ে যখন সুলতার চোখ যাচ্ছে তখন সে এ জিনিসটা ঠিকই লক্ষ্য করেছে, তাদের ছোট হ্যান্ডব্যাগটি ভদ্রমহিলার হাতে!

বালির ঝড়ের মধ্যেও ভদ্রমহিলার দুটি আয়ত চোখ লজ্জায় ও বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত হলো। নিজের

হাতের দিকে তাকিয়ে থতিয়ে গেলেন একেবারে। যদিও রং নেই ঠোঁটে, স্বাভাবিক রক্তাভাটা ছিলো। ঈষৎ পুরু ঠোঁট দুটি চকিতে একবার দংশে তাড়াতাড়ি সুলতাদের বেডিংএর ওপর হ্যান্ডব্যাগটা রেখে বলে উঠলেন, 'ছি ছি, আমি একেবারে জানতে পারি নি। কিছু মনে করবেন না। কিন্তু—'

চোখে আর মুখে হাত চাপা দিলেন উনি। ঝড়ের কামাই নেই। বালি ঢুকছে। মাথায় সুলতার মতনই হবে। বয়সটা কম হতে পারে, বেশী হতে পারে। ধরবার উপায় নেই। কারণ এখন শিবনাথই দেখছে কি না। তবে সব মিলিয়ে, ভদ্রমহিলার শ্যাম-চিক্কণ মুখে কিছু একটা বিশেষত্ব ছিলো। সেটা কী, বলা মুশকিল। বোধ হয় আকাশ নীল মানেই যে এক নয়, নানান রূপ অরূপের বিশেষত্ব থাকে, প্রায় সেই-ই রকম। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আর বোধ হয় সুন্দর। সে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিতে গেল। ততক্ষণে দরজার প্রায় বাইরে থেকে পুরুষ গলায় প্রশ্ন এল, 'কি হয়েছে লীলা?'

লীলা বললেন, 'কিছু নয়। আমাদের হ্যান্ডব্যাগটা নিয়েছ?'

জবাব এল, 'নিয়েছি।'

লজ্জায় ও বালির ঝড়ে যদিও রুদ্ধশ্বাস, তবু হাসলেন লীলা। বললেন, 'ছি ছি, কী যে কান্ড!'

সুলতা কোনোরকমে আঁচলের বাইরে মুখ এনে বললো, 'তাতে কি? ওরকম হয়ে যায়।'

মুক্তি পেলেন ভদ্রমহিলা। সুলতার ও-কথাকটি যেন জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুক্তির আদেশের মতো শোনাল। উনি নেমে গেলেন বালির ঝড়ের মধ্যে। শিবনাথ ততক্ষণে কুলিকে মাল তোলবার আদেশ দিয়েছে। তাড়া দিল সুলতাকে, 'চল চল, আর দেরি নয়। ওদিকে স্টীমার ছেড়ে দেবে আবার।'

নামতে নামতে সুলতা মুখে কাপড় চাপা অবস্থায় বলে নিলো, 'পরের জিনিসের হাত দিতে গেলে সবাই ওরকম না-জানার ভান করে। ওসব আমার ঢের জানা আছে।'

শিবনাথ যেন জানতো একথাটা সুলতা বলবেই। সে বললো, 'যাগকে। এবার সামনের দিকে তাকাও। ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার বোধ হচ্ছে। এই, এই কুলি, আস্তে যাও।'

কিন্তু সুলতা শিবনাথের কথারই খেই টানল, 'না, ইয়ার্কি নয়, ওসব আমি জানি। ওটা আমার কত সাধের শৌখিন জিনিস জান? হাতিয়ে তো নিয়েছিলো প্রায়। অমন সুন্দর ফুটফাট জিনিসটি দেখলে সকলেরই ভুল হয়ে যায়। আঃ! উঃ! গেলুম গেলুম।'

শিবনাথ বললো, 'বলছি তখন থেকে চুপ করো। মুখে বালি ঢুকে গেছে তো?'

সুলতার মুখ তখন শিবনাথের কুক্ষিতলে। সেখান থেকেই কাঁদো কাঁদো স্বরে জবাব এলো, 'শুধু মুখে নাকি? চোখ নাক কান সব বালিতে ভরতি হয়ে গেল। কী জঘন্য। আর কতদূর?'

—'আর একটুখানি।'

শিবনাথও বেজায় রকম বেসামাল। তপ্তবালু তারও স্যান্ডেল পরা পা পোড়াচ্ছে। মুখে ও গায়ের খোলা অংশে যেন কোটি কোটি বিষ-পিঁপড়ে হুল ফোটাচ্ছে ছুটে এসে। যেন রাস-ভাঙা-রোষে, ফুঁসে ফুঁসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এসে ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারও নেমেছে। বুঝি একটা যোগ-সাজস করেই নেমেছে এই বালির ঝড়ের সঙ্গে। একা বালির অন্ধকারেই রেহাই নেই, তার ওপরে সন্ধ্যার কালিমা। আর অবস্থা সকলেরই সমান। কে যে কার ঘাড়ে পড়ছে। পা মাড়িয়ে দিচ্ছে, সে সব দেখবার বিচার করবার অবসর নেই। একটা গড্ডলিকা প্রবাহের মতো চলেছে সবাই লাইন ধরে। সামনের লোকটা ভুল করলে, পেছনের সব লোকেরই বিপথগামী হবার সম্ভাবনা।

তবু এ দুর্দৈবটা যেন শিবনাথের কাছে ধরাবাঁধা জীবনের একটি ব্যতিক্রমের উল্লাসে উচ্চকিত

হয়ে উঠছে। কাজের চাপে পর্যুদস্ত সাব-এডিটরের বেসামাল অবস্থা তো নয় এটা। নিতান্ত বউ নিয়ে বেরিয়ে পড়া পথের খেলা একটা। আসুক না যত খুশি। কতক্ষণ আর। তবু তো জানা গেল বালির ঝড়ের লীলা। মরুভূমিতেও কি এমনি হয় নাকি? কী একটা কবিতা যেন তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো; মুখে এলো না। তার আগেই সুলতাব রুদ্ধ গলা শোনা গেল, কী সর্বনেশে ঝড়। আর কর কতদূর গো?'

—এসে পড়েছি।'

সুলতার অবস্থা দেখে কষ্ট হলো, হাসিও পেলো শিবনাথেব। সে দেখলো আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে, সুলতা প্রায় একটি বোম্বাই সিলকেব বস্তায় পবিণত হয়েছে। প্রায় ঝুলে পড়েছে শিবনাথেব বলিষ্ঠ কাঁধ ধবে।

শিবনাথ বললো, 'একটু সোজা হও, একটু সোজা হও, এইবাব আমবা ঢালুতে নামছি।'

সন্ত্রস্ত গলা শোনা গেল সুলতাব, 'পড়ে যাব নাকি?'

—না।'

স্টীমাবে পা দিতে না দিতেই বালিব প্রকোপটা একেবাবে শেষ হযে গেল। হাওযাটা সম্ভবত পূর্ব-দক্ষিণাগামী। কিংবা পাগলা বেসামাল বাতাস। দিক ঠিক নেই। আপাতত নদীর বুক ঠেলেই বাতাস বহমান। তাতে জলকণা আছে। বালি নেই।

দোতলাব ডেকে এসে শিবনাথ মালেব তদারকি আব কুলি বিদায় কবতে ব্যস্ত হলো। সুলতা সর্বাঙ্গেব বালি ঝাড়তে ব্যস্ত। সান্ত্বনা একটিই, সুলতাব চেয়ে অবস্থা কাকবই ভালো নয়।

দোতলাব প্রথম আর দ্বিতীয়শ্রেণীব অবস্থাও খুব সুখকর নয। শুধু যে রুদ্র বৈশাখের তাপ দগ্ধ সমতলবাসীদেব পাহাড়-ভ্রমণের টান, তা নয। উত্তরবঙ্গ আব আসাম-গামী তাবৎ লোকের ভিড় একটি স্টীমাবেই।

সুলতা কোনোরকমে একটু জাযগা করে নিযে শিবনাথকেও ডাকলো। তারপব হেসে ফেললো শিবনাথেব ধবধবে সাদা ভ্রূ দেখে তাড়াতাড়ি নিজেবই রুমাল দিযে শিবনাথের ভ্রূ চোখ, মুখ মুছে দিতে গেল।

শিবনাথ বললো, 'এ বালি এত সহজে যাবে না সুলতা। এখন থাক।'

সুলতা ভ্রূ কুঁচকে একটু শাসন করলো শিবনাথকে, 'ধুলো বালিতে তোমার একটু ঘেন্না নেই আমি দেখছি। মুখটা অন্তত মুছবে তো।'

শিবনাথ দেখলো, সুলতা মুখ মুছে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সুতরাং তারও মুক্তি নেই। রুমালটা নিযে শিবনাথও মুখ মুছলো। তারপর হ্যান্ডব্যাগটা খুলে, আর একটি রুমাল বার করতে করতে, মুগ্ধ চোখে আর একবার ব্যাগটি দেখলো সুলতা। বললো. 'গেছলো একটু হলেই।

তারপরই তার ঠোঁটদুটি বেঁকে উঠলো শ্লেষে, 'এদিকে তো সারাটি পথ টেনে স্বামীর সেবা আর বই পড়ে পড়েই কেটে গেল। যেন ভাজাব মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না। কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঠিক দেখছিলো।'

শিবনাথ ভয় ভয় চোখে তাকালো আশেপাশে। কী জানি, যাব উদ্দেশে কথাগুলি বলা হচ্ছে, তিনি হয়তো আশেপাশেই আছেন। আর সুলতার কথাগুলিও প্রায় সেই রেল কর্তৃপক্ষের নোটিসের মতো, ...জুয়াচোর চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।' শিবনাথ হেসে গলা নামিয়ে বললো, 'আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমাদের ব্যাগটার দিকে নয় তো?'

সুলতা হাসলেও, ঠাট্টা করলো না। বললো, 'তা কি বলা যায়?'

শিবনাথ উঠে পড়লো।

—কোথায় যাচ্ছো ?

—বস, খাবারের ব্যবস্থা দেখি। ওপারে গিয়ে আর খাওয়া যাবেনা শুনছি। সেই একেবারে কাল দুপুরে দার্জিলিং গিয়ে।

স্টীমার তখন ছেড়েছে। সকলেরই ছুটোছুটি পড়েছে ডাইনিং রুমের দিকে।

সুলতা ভ্রূ কুঁচকে, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো শিবনাথের চলে যাওয়ার দিকে। এই নোংরা হাতে পায়ে, ভিড়ের মধ্যে কেউ খেতে পারে ?

পারে। না পাবলে এত লোক ছুটোছুটি করছে কেন। আব শিবনাথ লোকের হাতে প্লেট চাপিয়ে এভাবে ভাত মাংস একেবাবে কোলের ওপব এনে উপস্থিত করতে পারে নাকি ?

অগত্যা গ্লাসেব জলে হাত ধুয়েই আরম্ভ করতে হলো। খোঁপাটা ভেঙেছে সুলতার আগেই। আঁচলটা লুটোচ্ছে এখনো। বালির ঝাপটায় নাইলনের প্রাণও মূর্ছা গেছে প্রায়। কেবল শিবনাথ একবার কানে কানে না বলে পাবলো না, 'তোমাব জামার একটা বোতাম কিন্তু অনেকক্ষণ ঘব ছেড়েছে। আঁটবে কখন ?'

সুলতার মুখ পাংশু দেখালো। সে একবার চোরাচোখে তাকিয়ে দেখলে সত্যি তাই। ফিস্‌ফিস্ কবে বললো, 'অসভ্য। এতক্ষণ বলোনি কেন? বাঁ হাতে আঁচলটা তুলে দাও শীগ্‌গির।'

আঁচলটা তুলে দিতে দিতে বললো শিবনাথ, 'যা ঝড়!'

যদিও সুলতাব শবীবের লক্ষ্যটা ঔদ্ধত্যেব দিকেই, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়। অতি দূবন্ত বিজ্ঞাপনেব সাহায্য বোধ হয় সেজন্যই তাকে নিতে হয়েছে। গোটা শবীবেব কাঠামোটা নিখুঁত ছিলো সুলতাব, সৌন্দর্যটুকু ধবা দেয় নি প্রায় কোথাও। সর্বত্র একটা কাঠিন্যেব স্পর্শ। এমন কি চোখেব কোণে, ঠোঁটেব কুঞ্চনেও। ফর্সা বংটুকু বোধ হয় সেইজন্যেই কোনো দীপ্তি দেয় নি। দিয়েছে বক্তহীন রুক্ষতা।

তাব পাশে শিবনাথকে মোটামুটি দেখাচ্ছে কালো. সাধাবণ মাপেব বলিষ্ঠ চেহাবা। সহসা দেখলে ক্লান্ত আব চিন্তাশীল মনে হতে পাবে। কিন্তু তিরিশ পেরিযেও তাব আপাত শান্ত চোখে, আলোছাযার দ্যুতিতে, একটু স্বপ্ন দেখাব ইচ্ছে যেন ঠেকে আছে কোথায।

সাত বছবের চাকবি আব আড়াই বছরেব বিয়ে, এই নিয়ে ঘবে বাইবেব লেনদেন। বিধবা মা আর দিদি আছেন। এক-ই সংসারেব তাঁবা ভিন্ন লোকবাসী। সাব-এডিটরেব টেবিল থেকে সুলতাব খাটে, জীবনটাকে এবকম ভাগ কবে দেখলেও ক্ষতি নেই।

প্রেমেব ফাঁদ নাকি পাতা ভুবনে। তাই এক আধবাব যে পা আটকায নি তা নয়। জীবনধাবণেব মাঝে সেগুলি আপনি খুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত সুলতা, রীতিমত দর-কষাকষি কবে। নিশ্বাসেব ওপবে একটু বাতাস, এবকম একটি অবস্থার বাড়ির মেয়ে কিছু নগদ টাকা, কিছু গহনা, খাট আব ড্রেসিং টেবিল নিয়ে ও এসেছিলো। আর কিছু ঘব আর দম্পতিব সাজবার মতো অনেক উপকবণ।

বিযেব পর প্রথম গিয়েছিলো মধুপুবে। সেটা ছিলো সুলতাদেব এক আত্মীয়েব বাড়িতে যাওয়া। তাবপরে এই দ্বিতীয যাত্রা একেবারে হিমালযে, ববফ-বাতাস এখন যেখানে শীত ধবাচ্ছে।

খাওযা-দাওয়াব পাট চুকিযে সেই কথাটাই বললো সুলতা, 'মনে আছে সেই মধুপুরেব কথা ?'

একটু যেন ভযেই হেসে বললো শিবনাথ, 'খুব।'

অমনি সুলতা অভিমানাহত কটাক্ষ হেনে, কনুই দিয়ে খোঁচা দিলো শিবনাথকে। বললো

তাতো খুব হবেই। আমার সেই মাসতুতো বোন মিলিটা তো ডাইনীর মতো পেয়ে বসেছিলো তোমাকে।'

হেসে ফেললো শিবনাথ। 'আরে, কী আশ্চর্য! কী যে বলো!'

—না বাপু, তুমিও মেয়েন্যাকড়া কম নও।

—আমার তো ধারণা মেয়েরাই ছেলেনেকড়ি।

—ইস্!

তা বটে। আর সব বিবাহিতা মেয়েদের মতোই, সুলতারও স্বামী ছাড়া সব পুরুষ ছার। পাপের মধ্যে মিলি একটু জামাইবাবুর ভক্ত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু সুলতা নিশ্চয় মরে গেলেও বিয়ের আগে অমন জামাইবাবুর ভক্ত হতে পারতো না। পারতো না বলেই তার বচিত সংসারটা প্রেমের সংসার বলে ঘোষিত। শিবনাথ সেইটুকু জেনেই শান্ত।

কিন্তু চোখগুলো জ্বালা করছে কেন? যাত্রীদের সকলের মধ্যেই যেন একটু চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে।

শিবনাথ সামনে তাকালো। দূরের বিন্দু আলোগুলো তখন একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আলোগুলো যতটা দূরে ভাবা গিয়েছিলো, ততটা দূরে নেই। বোঝা গেল, স্টীমারের হুইস্‌সেল আর সুলতার প্রায় ডুকরে ওঠা, 'ওগো আবার বালি। আবার বালির ঝড়।'

ততক্ষণে শিবনাথও চোখ ঢেকেছে। বাতাসটা যে এপার থেকেই ওপারে যাচ্ছিলো, তা বোঝা গেল। বালির ঝড়ের তান্ডবেই বাতিগুলোকে আরো দূরে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু যে মুহূর্তে বালি তার সীমার মধ্যে পেয়েছে স্টীমারটাকে, সেই মুহূর্তে চমকে উঠেছে সবাই। এবার শিবনাথও যেন একটু মুষড়ে পড়েছে। কারণ এবার ভিড় বেশী। তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে না উঠতে পারলে, জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। যদিও সীট রিজার্ভ আছে তাদের।

তবু সে বললো, 'আরে তুমি ভাবছ কেন? যাওয়া হবেই। না হয় পরের প্যাসেঞ্জারে যাব। আমি তো ডিউটিতে যাচ্ছিনে। তুমি হ্যান্ডব্যাগটা হাতে নাও, নইলে এবারও কেউ টানাটানি করবে হয়তো।'

বলতে বলতেই মুখে রুমাল চাপা দিলো শিবনাথ। বালির তাত কমেছে বটে, ঝাপ্‌টার দাপট এপারে দ্বিগুণ। বাশি বাশি ছুঁচ ছুঁড়ে মারার মতো। বাতাসের বেগ আরো প্রবল। খ্যাপাটা যে এপার থেকেই ডাক ছাড়ছিলো, বোঝা গেল এবার তীব্র গর্জনে। এপারে যেন সে সত্যি একটা সর্বনাশের ফাঁদ-ই পেতেছে। বাতিগুলো শুধু ছায়াময়ী কুয়াশার মতো কী এক রহস্যে যেন হাসছে।

সুলতা প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মতো, বললো, 'কী হবে? এ যে আরো ভয়ংকর।'

হেসে ফেললো শিবনাথ। বললো, 'কী আবার হবে। তখন যেমন করে এসেছ, এখনো তেমন করেই যাবে। গাড়িতে উঠলেই সব শেষ। তারপরে হিমালয়ে গিয়ে যখন উঠবে—'

—থাক।

ধমক দিলো সুলতা। আঁচল চাপা মুখ থেকে তার স্বর ভেসে এলো, এরকম অবস্থায় অনেক গোলমাল হতে পারে। কেন যে মরতে হার-চুড়িগুলি পরে রেখেছিলুম। টাকা পয়সা খুব সাবধান, কিছু হারিও না যেন।

—আরে না না, কিছু হারাবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শিবনাথ সান্ত্বনা দিলো হেসে। সুলতা বললো, 'কি করে নিশ্চিন্ত থাকবো। এসব আপদের কথা তো তুমি কিছুই বলো নি।'

শিবনাথ বললো, 'আমি কি জানতুম নাকি ?'

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাশ থেকে বলে উঠলেন, 'রোজ বোজ কি আর এমন ঝড় ওঠে এখানে। মাঝে মধ্যে হয। আজ আমাদের কপালে জুটে গেছে।'

স্টীমারটা একটা দীর্ঘ বাঁক নিয়ে জেটির গায়ে ঠেকলো। পবমুহূর্তেই ডাকাত পড়াব মতো, আবার সেই প্রেতছায়া কুলিবা। এবাব ঝড়টা যত বেগে, কোলাহল তাব চেয়ে বেশী। নিচের ডেকে হুড়োহুড়ি মারামারি লেগে গেছে। কুলিবা ওপরে এসেও মালপত্র ধরে টানাটানি শুরু করেছে। ওপরের লোকও হুড়মুড় কবে নিচে নামতে চাইছে তাড়াতাড়ি। শিশুর কান্না, মেয়েদেব চীৎকাব, আর কুলিরা যেন এবই সঙ্গে তাল বাখছে হৈ-হৈ শব্দে।

আব এবাব স্টীমাবে থাকতে থাকতেই মনে হলো, যেন কেউ মুঠো মুঠো বালি চোখে মুখে ছুঁড়ে মাবছে। এখন আব লু বইছে না বটে। পশ্চিমেব এই দিগন্ত উন্মুক্ত রুক্ষ চবাব বাতাসে এখনো উত্তাপেব আভাস। মেঘ কিংবা নক্ষত্র, কিছুই নেই সামনে। আকাশটা উধাও হযে গেছে কোথায। আছে শুধু কতকগুলো এক-চোখো ভুতুড়ে আলো। যেগুলো কোনো নিশানই দেয় না।

শিবনাথ ছটফটিযে উঠলো। অনেকেই নেমে পড়ছে তাব সামনে দিযে। সে আব কিছুতেই স্থির থাকতে পাবছে না। কুলিকে মাল তুলতে বললো।

সুলতা তাকে কঠিন বাহুপাশে আঁকড়ে ধবেছে। শিবনাথেব সামনে লোক, পিছনে লোক। তাকে কে ঠেলছে আব সে কাকে ঠেলছে, কিছুই বলা যায না। সবাই সবাইকে ঠেলছে। তাব মনে হলো সিঁড়ি না ভেঙেই সে হুস কবে নেমে এলো নিচে। সুলতা বাবে বাবে আর্তনাদ করে উঠছে। কিন্তু এখন আব কান দিতে গেলে চলবে না। ববং শিবনাথেব মনে হলো, লোকেব মধ্যে থাকলে বালিব আক্রমণেব সামনে থেকে অনেকখানি বেহাই পাওযা যায।

সিঁডিটাব নিচে নামতেই সুলতা ককিযে উঠলো, 'উঃ, কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।'

—দেখতে হবে না তোমাকে। কথা বলো না, আবাব বালি ঢুকে যাবে মুখে।

এবার বোধ হয সত্যি কাঁদছে সুলতা। বললো, 'বাকী আছে নাকি ! বালি তো খাচ্ছিই।

শিবনাথ দম বন্ধ করে বললো, 'জোবে ধব সুলতা। এখানটায কাঠের সিঁডিটা। খুব ভিড় এখানে।'

—কোথায যে কম।

বাগে এবং দুঃখে সুলতা বললো শিবনাথেবই শবীবেব কোনো একটা অংশ থেকে।

কিন্তু সিঁড়িটা পার হতে হতে শিবনাথের মনে হলো, সুলতাব বন্ধন যেন শিথিল হযে যাচ্ছে।

—কি হলো !

—কিছু না।

সুলতাব প্রায় অস্ফুট গলা শোনা গেল।

সিঁড়ির বাইরে আসতে আসতে সুলতা ছিঁড়ে গেল শিবনাথেব গা থেকে। আব সিঁডির কাছে আসামাত্রই প্রচন্ড বালিব ঝাপ্টা চাবুক কষালে চোখে মুখে। চোখে একবাশ পিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দিলো। চোখ বন্ধ কবে, হাত বাড়িযে ডাকলো শিবনাথ, 'সুলতা।'

কাছের ভিড় থেকে জবাব এলো, 'এই যে।'

শিবনাথ লোকের ধাক্কায সরে গেল একপাশে। সে ডাকলো 'এস ! এই, এই কুলি।'

কুলিটা দাঁড়িয়ে পড়েছিলো আগেই।

চোখ ঘষে শিবনাথ সামনে তাকালো কোনোরকমে। দেখলো, সামনেই সুলতার চুড়ি-পবা

প্রসারিত হাত। শিবনাথ ধরলো হাতটা, একেবারে টেনে নিয়ে এলো বুকের কাছে। রুমাল কামড়ে ধরে মুখে কোনোরকমে বললো, 'কথা বলো না।'

সুলতা খালি বললো, 'উঃ!'

সে শিবনাথের কাঁধ না ধরে, দু'হাতে সর্বাঙ্গ বেষ্টন করলো।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। শিবনাথের সহসা সুলতাকে বড় বেশী ভালো লাগতে লাগলো। শুধু আপন প্রাণ বাঁচানো নয়। যেন শিবনাথকে বাঁচাবার জন্য তার বুক দিয়ে আলিঙ্গন করেছে। এবার সে ঝুলে পড়ে নি। যেন শিবনাথ হোঁচট খেলে, সেও ধরে ফেলবে।

শিবনাথ বাঁ-হাত দিয়ে তাকে আর ঘনিষ্ট করে নিলো। এতো ভালো লাগলো, মনে হলো, এ দুর্দৈবের মধ্যে সুলতাকে সে যেন নতুন করে পেলো। আর অবাক হলো শিবনাথ, ঝড়ের দোলাটা যেন তার রক্তেই লেগেছে। সে দ্রুত এগুতে লাগলো অস্পষ্ট ছায়া ট্রেনটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু বালির ঝড়টা এগুতে দিতে চায় না। সামনের মাটিই যেন চৌচির হয়ে ছিটকে লাগছে চোখে মুখে। বাতাস শাসাচ্ছে, ফুঁসছে, পরমুহূর্তেই দূরে সরে গিয়ে হাহা করে হাততালি দিয়ে হাসছে।

গাড়িটা কতদূর? লোকের ধাক্কা, ছুটোছুটি, চিৎকার। তারই সঙ্গে কতকগুলো হুমড়িখেয়ে পড়া উটের মতো ঘরের ছায়া থেকে গরম চা আর খাবারের ডাকাডাকি চলছে।

শিবনাথের মনে হলো সুলতা হাসছে। শিবনাথ মুখ নামিয়ে প্রায় বন্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'হাসছ নাকি?'

চকিত মুহূর্তের একটি আড়ষ্টতায় যেন সুলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সহজ হয়ে বললো, 'হ্যাঁ। তোমার গায়ে হঠাৎ এত শক্তি এলোকোথথেকে তাই ভাবছি। আমাকে পিষে ফেললে যে।'

হেসে উঠতে গিয়ে শিবনাথের সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎচমক লাগলো। সে তখনো হাঁটছিলো সামনের দিকে। সামনের আলোটার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি দুটি হাতের আলিঙ্গনের ঘন স্পর্শে বোমার মতো দাপাতে লাগলো। বালিতে ভরে যেতে লাগলো তার উদ্দীপ্ত চোখ। সে ডাকতে গেল। ঝড় যেন থাবা মারলো তার মুখে। সে আবার মুখ খুললো। ডাকলো, 'সুলতা।'

আর একটি চকিত মুহূর্তে স্তব্ধতা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে সরে গেল শিবনাথের দেহসংলগ্ন ছায়া। ঝড়ের শাসানির মধ্যেও শোনা গেল অস্ফুট আর্তস্বর। শিবনাথ দেখলো, লাল বোম্বাই সিল্ক নয়, হালকা আসমানি জর্জেট। ফর্সা নয়, শ্যাম চিকন বর্ণ। সুলতা নয়, লীলা। আশ্চর্য!

ঝড়টা, যেন থমকে গেল। বালি সরে গেল। দপদপিয়ে উঠলো বিশ্বের সব আলো। ক্ষোভে ও বিস্ময়ে প্রায় অস্ফুট কান্নার মতো শোনা গেল, 'আপনি?' আপনি কেন? আপনি কেন?'

শিবনাথের মনে হলো তার কান বন্ধ হয়ে গেল বালিতে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। চোখ অন্ধ হয়ে গেল। সে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'মাপ করবেন, আমি, আমি জানতে পারি নি।'

বলেই সে চিৎকার করে উঠলো, 'কুলি! কুলি দাঁড়াও এখানে।'

আবার সে ভদ্রমহিলার দিকেই ফিরলো। বললো, 'আমি এখুনি দেখছি আপনার স্বামী কোথায়। আপনি দাঁড়ান একটু দয়া করে। মাপ করবেন, আমি সুলতাকে—'

কথা শেষ না করেই, পিছনদিকে ছুটলো। ঝড়টা এবার তাকে তাড়া করলো পেছনে থেকে। মনে হলো সে উড়ে যাচ্ছে! আর খ্যাপা ঝড়টা হাসছে তার পেছনে হাততালি দিয়ে। কাঠের

সিঁড়ির কাছে এসে সে চিৎকাব করে ডাকলো, 'সুলতা ' সুলতা !'

কয়েকটি লোকেব ভিড়েব মধ্যে, সুলতাব বোরুদ্যমান গলা শোনা গেল, 'এসেছ , এসেছ তুমি ? এই যে, এই যে আমি। এই যে।'

ভিড় ঠেলে প্রায় ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো সুলতা শিবনাথের বুকে। বোঝা গেল, সুলতার চিৎকারেই লোক জমে গেছে। চারদিক থেকে শুধু শোনা গেল, 'যাক, পাওযা গেছে।'

সুলতা তখন সমূহ আতঙ্কটা পাব হয, না কেঁদে পাবছে না। কিন্তু খানিকটা অমনোযোগীভাবেই শিবনাথ তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, 'কেঁদ না সুলতা। কাঁদবাব কি আছে এখানে কি মানুয হাবায নাকি ? ওই তো স্টেশন, ওখানেই থাকতুম নিশ্চয। তোমাকে ফেলে তো আর চলে যেতুম না গাড়িতে কবে।'

কান্নার মধ্যেও সুলতাব অভিমান ফুটে উঠলো, 'কি কবে আমাকে ফেলে চলে গেলে তুমি ?'

—কি আশ্চর্য!

বলছে, কিন্তু শিবনাথেব দৃষ্টি ছায়াদেব ভিড়ে। বললো, 'তোমাকে কি আমি ইচ্ছে কবে ফেলে গেছি নাকি ? আমি মনে কবেছি, তুমি আমাব সঙ্গে আছ।'

বালি খেযেও সুলতা এবার মুখ না ঢেকে বললো, 'কি কবে মনে কবলে ? আমি তো তোমার গায়ের সঙ্গে লেপটে ছিলাম।'

শিবনাথ যেন সচেতন হলো একটু। একটু চুপ কবে বইলো। বলতে গেল, কিন্তু পাবলো না। মনে হলো, সুলতা ব্যাপারটাকে তাব নিজের প্রতি অবিচার ভেবে নেবে। বললো, 'আবে। সবাই তো সবাব সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। এব আবাব—'

থেমে গেল। সেই লাইটপোস্টটা। চোখেব উপব থেকে রুমালটা একটু সরালো শিবনাথ। দেখলো, ভদ্রমহিলা একটি বেডিং-এব ওপব মুখে হাত চাপা দিযে বসে আছেন। পাশে ভদ্রমহিলাব স্বামী। কাছে যাবে নাকি শিবনাথ ?

সুলতা বললো, 'দাঁড়ালে কেন ?'

—না, কুলিটাকে দেখছি। এখানেই ছিলো।

তার গলাব স্বব শুনেই যেন ভদ্রমহিলা চোখ তুললেন। বালিব ঝড়, মানুষগুলো সব ছায়া। তবু মনে হলো শিবনাথেব ভদ্রমহিলা তাব দিকেই তাকালেন। তারপবে দৃষ্টিটা অনুসবণ করেই নিজের কুলিটাকে চোখে পড়লো শিবনাথেব। সুলতাকে নিয়ে সে এগিযে গেল।

তাবপর গাড়িতে ওঠাব পালা। সেখানেও ধস্তাধস্তি মাবামাবি। রিজার্ভেশন ক্লার্ক ভদ্রলোকটি প্রায় দয়া করে তাদের তুলে দিলেন। কিন্তু গোটা কামবাটা ভবতি শুধু বালি আর বালি। সবুজ রং চামড়ার সীটগুলি সাদা বালিতে ভরা। মানুষগুলো সব বালিব পুতুল। সুলতা চিনতে পাবে না শিবনাথকে। শিবনাথ পাবে না সুলতাকে! সবাই ঝপ্‌ঝপ্ করে কাঁচের শার্সি ফেলতে লাগলো। ফেলতে না ফেলতে বালিব স্তব পড়তে লাগলো কাঁচের গায়ে। এ ঝড়ের এই জেদ, যতই সে বাধা পাবে রুদ্র হবে ততই। শার্সিব তলায় সামান্য যে পিঁপড়ে ঢোকার মত ফাঁক, সেখান দিয়েও বালি ঢুকছে বাতাসের ঝাপটায়। যেন বালি নয, চাক ভাঙা বোলতাবা গর্জন করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সুলতা বসলো। শিবনাথ বসতে গেল, পাবলো না। বাইরে যাবে মনে করে দবজার দিকে এগুতে গেল। তার পা সরলো না। এখনো সে হতচকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তবু তাব দু' চোখ ভরে একটি অদ্ভুত শূন্যতা।

সুলতা শিবনাথকে এই অবস্থায দেখে, মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠলো। ছোট কামরাটার সবাইকে

চমকে দিয়ে সে প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলো, 'হয়েছে! সর্বনাশ হয়েছে।'

শিবনাথ ফিরলো, কিন্তু তার শূন্যতা ঘুচলো না চোখের। গলার স্বরে কোন সুর নেই যেন। বললো, 'অ্যা ?'

সুলতা শিবনাথের পাঞ্জাবি ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বললো, গেছে, মানিব্যাগটা গেছে?' বলতে বলতে সে নিজেই হাত ঢুকিয়ে দিলো পকেটে। শিবনাথ বললো, 'না তো। মানিব্যাগ আছে।' সুলতার হাতে উঠে এলো মানিব্যাগটা। দু'চোখে তার দ্যুতি ফিরে এলো। বললো, 'তবে তুমি ওরকম করে আছে কেন?'

সচেতন হতে চাইলো শিবনাথ। বললো, 'কেমন ?'

—কেমন যেন। কি যেন একটা হয়েছে তোমার। এখনো তোমার ভয় করছে? কেন,আমাকে তো পেয়ে গেছ।

সবই তো ঠিক আছে। কিছু তো হারায় নি।

হারিয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই সুলতা আর একবার তার সমস্ত মালপত্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো।

শিবনাথের সারা মুখে ঘামের ওপর বালি পড়ে পড়ে পুরনো ঘরের ভাঙা খসা পলেস্তারার মতো দেখাচ্ছে। শুকনো ঠোঁট দুটিতে জমে গেছে বালি। মাথার চুল সাদা। সে প্রায় একটা ক্লাউনের মতো পেশার দায়ে জোর করে হেসে বললো, 'হারায় নি কিছু। মনে কিরকম একটা অব্যবস্থা, হট্টগোল '

সুলতা মুখ মুছতে মুছতে বললো, 'জঘন্য!'

গাড়িটা কখন চলতে শুরু করেছে। বোঝা যাচ্ছে, ঝড়টা এখনো গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখনো নানান ফাঁকে ফাঁকে সোঁ সোঁ করে ঢুকছে বালি। এখনো সেই খ্যাপাটা হাসছে অট্টরোলে। হাততালি দিচ্ছে নেচে নেচে।

শিবনাথ বাথরুমে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই আয়নার বুকে নিজের মুখোমুখি হলো সে। আর তৎক্ষণাৎ সেই আলিঙ্গনের অনুভূতিটা পিলপিল করে, বেয়ে বেয়ে বেড়াতে লাগলো তার সারা গায়ে। শিবনাথ ধিক্কার দিলো নিজেকে। ছি ছি করলো। মুখ ফিরিয়ে নিলো নিজের ছায়ার দিক থেকে। তবু তার সারা গায়ে বিস্মিত বোবা তীব্র অনুভূতিটা দপদপ্ করতে লাগলো। তার দু' চোখের শূন্যতা ভরাট হতে চাইলো না কিছুতেই। সে যেন সভয়ে দেখলো, কত অব্যর্থভাবে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটি তুলে নিয়েছিলো মেয়েটি। কিন্তু ব্যাগ সে নেয় নি। শেষ পর্যন্ত যা সে নিয়েছে তার কোনো মূল্য নেই সংসারে। কোনো কৈফিয়ত নেই সমাজের কাছে, নীতির কাছে, যুক্তির কাছে। একজন বিবাহিত পুরুষ, একজন সাধারণ সাব-এডিটরের লজ্জাকর ধিক্কৃত তৃষ্ণার গ্লানি, মৌমাছির মত নিজেরই গায়ে হুল ফুটিয়ে একটি আস্বাদ খুঁজবে।

আর একজন, দেখে মনে হয়েছে, স্বামীকে সে বলতে পারে নি। কেবল কুটমনা অবিশ্বাসী এক পুরুষের জেনে শুনে স্বেচ্ছাকৃত আলিঙ্গনের গ্লানি সে অনুভব করবে। এবং সেও দার্জিলিং যাচ্ছে। হয়তো দেখা হবে। তীব্র সন্দেহে ঝলকে উঠবে আয়ত চোখ দুটি। রুদ্ধ তীক্ষ্ণ স্বরের ভর্ৎসনা হানবে পাহাড়ের বাতাসে, আপনি কেন? আপনি কেন?

জবাব দূরের কথা: শিবনাথের অনুভূতির পিঞ্জরে বোবাটা তবু মরবে দাপিয়ে দাপিয়ে। বিশ্বের এক ভয়ংকর বিস্ময়ে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকবে তার স্ত্রী সুলতার স্নেহে ও ভালোবাসায় রচা সংসারের দিকে।

ট্যাপ খুলে দিলো শিবনাথ। জল গরম আর বালি মেশানো। এ বালি কোনো বস্তুই বাদ দেয়

নি দেখা যাচ্ছে। বালি মেশানো গরম জল শিবনাথ আঁজলা মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলো।

বাইরে যখন এলো, তখনো বালি উড়ছে সারা কামরায়।

সুলতা ডাকলো, 'এই। এই, ওঠ না।'

শিবনাথের সর্বাঙ্গ তখনো লেপের তলায়। সুলতা রীতিমতো প্রসাধন করে উলেন ক্লোক চাপিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। ওরা দশদিন হলো দার্জিলিং এসেছে।

শিবনাথ ক্লান্ত সুরে বললো, 'উঠতে ইচ্ছে করছে না। উত্তরে জানলাটা খুলে দাও না সুলতা'

সুলতা জানলা খুলে দিতে দিতে বললো, 'কী হবে ছাই খুলে দিয়ে। ওই ছিঁচকেপোড়া রোদ কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা নেই।'

জানলাটা খুলে দিতেই এক ঝলক রোদ ঢুকলো ঘরে। সামনে ধূসর আকাশ। পুব ঘেঁষে দূরে কালিম্পং-এর ইশারা। সামনে ভুটিয়া বস্তির ধাপে ধাপে নেমে-পড়া বনস্পতির শীর্ষ। তারপরের শূন্যতাটা যেন লেবং মালভূমির মাথার ওপরে। ভুটিয়া বস্তির পুব উঁচুতে—ভাড়াটে বাংলোর একটি ঘর নিয়েছে ওরা। খাবার আসে হোটেল থেকে। চায়ের সরঞ্জামটাই শুধু রেখেছে সুলতা নিজের হাতে।

ঘুম-জড়ানো মোটা স্বরে বললো শিবনাথ, 'ও কি অত সহজে দেখা দেয়। কত সাধ্য সাধনা করতে হয়, তবেই না আবির্ভাব।'

সুলতা এসে বসলো শিবনাথের শিয়রে। বললো, 'তা তো বুঝলুম,কিন্তু তোমার কি হয়েছে বলছ না কেন, বলো তো? তুমিও যে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো মেঘে ঢাকা হয়ে রইলে।'

শিবনাথ হাসবার ভান করে বললো, 'কি আবার হবে।'

—সেইটাই তো শুনতে চাই। সেই যে মণিহারিঘাট থেকে কি হলো, তারপরে আর ঠিক সে মানুষটাকে তো খুঁজে পাচ্ছিনে।

— কী খুজে পাচ্ছ না?

—সেটা হাতে করে তুলে দেখাতে পারছিনে। ওরকমভাবে দেখানো যায় না, না হলে দেখাতুম।

—তা হলে চেখে দেখাও।

সুলতা পা দাপিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'না সত্যি, ফাজলামো নয়।'

শিবনাথ যেন কথা বাড়াবার ভয়েই তাড়াতাড়ি সুলতাকে টেনে এনে চুমু খেলো। তারপরে বললো, 'বোকা কোথাকার।'

সুলতা বললে, 'হ্যাঁ, ভোলানো হচ্ছে আমাকে।

বলেও কিন্তু সুলতা উঠে পড়ে বললো, 'আমি তাহলে যাচ্ছি। ফ্লাস্কে চা আছে, খেয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

চলে গেল সুলতা। ম্যালে গেল, বেড়াবে, বসে থাকবে বলে। প্রথম প্রথম দু'দিন শিবনাথের সঙ্গে এখানে সেখানে হেঁটে হেঁটে গেছে। কিন্তু পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে চাপ লাগে। রক্তহীন রুক্ষতাটা কৃশতায় পর্যবসিত হয়। ভিতরটা ওর অনেকখানি শূন্য।

তাই সুলতা ম্যালে বেড়ায়, বসে থাকে। শিবনাথ তাকে বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়ায় অরণ্যে খাদে, ঢালুতে পাহাড়ী জনপদে।

আর শিবনাথ দেখেছে, ওরাও এসেছে। ও আর ওর স্বামী। ও কেন, নামটাই বলা যাক লীলা আর ওর স্বামী। লীলার স্বামীও বসে থাকেন ম্যালের বেঞ্চে। শান্ত, চিন্তিত। মোটা লেন্সের চশমায় একটা ঝকঝকে তীক্ষ্ণতা নিয়ে চারদিকে তাকান। বোধহয় ভদ্রলোক অসুস্থ। হেঁটে ফিরে বেড়াবার উপায় নেই হয়তো। তাই তন্ময় হয়ে দেখেন চারদিক। লীলা যেন পা টিপে টিপে

কাছে কাছেই ঘোরাফেরা করে। তার বুড়ি ছোঁয়া দৌড়ের পাল্লা বেশী দূর নয়। অবজারভেটারির একটু এপাশে, নয়তো একটু ওপাশে। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীর কাছাকাছি, নয়তো দেশবন্ধুর স্মৃতি-মন্দিরটার সীমানায়। এদিকে শহর আর হ্যাপিভ্যালীর সীমানায় চোখ যায়। ওদিকে ভুটিয়া বস্তি আর সর্পিল প্রক্ষেপ পাকে জড়ানো লেবং।

ফিরে আসে আবার। মুখোমুখি হয় স্বামীর। দু'জনেই হাসেন। তারপর ভদ্রলোকের প্রসারিত হাতটা লীলাকে অনেক দূর যাবার নিশানা দেখিয়ে, তাঁর জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে বলেন।

লীলা হেসে তাকায় সেই দূরের দিকে। পায়ে পায়ে এগোয়। টিপে টিপে, আস্তে আস্তে, সভয়ে। যেন কেউ তাকে অনুসরণ করছে, সেই ভয়ংকর পায়ের শব্দ তার কানে যায়। সেই শব্দ পায় সে, সন্ত্রস্ত হৃৎপিণ্ডের তালে। কিংবা হয়তো, শিবনাথই শুধু এমনটা ভাবে। লীলা কিছুই ভাবে না।

শিবনাথ জানে, লীলা টের পেয়েছে তার উপস্থিতি। শুধু উপস্থিতি নয়, শিবনাথের সঙ্গে তার সহসা দৃষ্টিবিনিময় হয়েছে দু' একবার। লীলা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়েছে। শিবনাথও চোখ ফিরিয়েছে। লীলা ওর আয়ত চোখ তুলে, ঈষৎ স্থূল ঠোঁটে বিচিত্র হেসে, কী বিচিত্র কথা না জানি বলেছে তখন স্বামীকে।

সুলতা তখন শুধু ধমকেছে হয়তো শিবনাথকে, 'কী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যালের শো-কেস্ দেখছো? কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না? আচ্ছা চলো, আমি গভর্নর হাউস পর্যন্ত হেঁটে আসি।' ও রাস্তা তো উঁচু নিচু নয়।

আশ্চর্য। লীলাকে আর চিনতেও পারে না সুলতা।

শিবনাথ চলে যায় সুলতার সঙ্গে। হয়তো গভর্নর হাউস পর্যন্ত। কিংবা সিনেমা হল অবধি।

তারপর সুলতা ফিরে যায়। শিবনাথ চলে যায় দূরে। কোনো পাহাড়ে, চা বাগানে কিংবা শহরেরই অলিতে গলিতে।

এর মধ্যে এরা গাড়িতে ঘুম মনস্টারিতে গেছে, দেখে এসেছে লেবং-এর ছোট্ট মালভূমিকে। আর পাঁচদিনের মেয়াদ আছে ওদের তারপরে নেমে যেতে হবে।

কিন্তু অনুভূতির পিঞ্জরে বোবাটার দাপানি গেল না। মুখও খুলল না। কী একটা ব্যক্ত করার আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল তবু। কেউ ধরে রাখে নি, বেঁধেও রাখে নি, এমনি একটা ছুতো তবু খেলা, খাওয়া, বেড়ানো আর পাহাড়ী জনপদের পায়ের তলায় বইলো পড়ে।

বিছানা ছেড়ে উঠলো শিবনাথ। দাড়ি কামালো আগে। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেয়ে, জানলায় উঁকি দিলো। গড়িয়ে গড়িয়ে এঁকেবেঁকে নেমেছে ভুটিয়া বস্তি। কোথাও কতকগুলো বিচিত্রবেশিনী মেয়ের দল, কোথাও কতকগুলো বিচিত্রবেশ পুরুষের ঝিমুনো জটলা। লোক নামে, লোক ওঠে, পায়ে পায়ে খেলে বেড়াচ্ছে বাচ্চারা। গাছের মাথা পেরিয়ে লেবং এর সামান্য সমতল উঁকি দিচ্ছে।

চপ্পল পরে, সার্জের পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো শিবনাথ। পাঁচ মিনিটেই ম্যাল। মরশুমী ফুলের মতো আগন্তুক জনতার ভিড়। ভিড় করেছে পাহাড়ীরা। ওরাও গালে হাত দিয়ে এই সমতলবাসী মানুষদের দেখতে থাকে।

কী দেখে, কে জানে!

—এই যে!

সুলতার চড়া গলা ভেসে এলো দূরের বেঞ্চি থেকে। সেই ডাকে অনেকেই ফিরে তাকালো ওদের দুজনের দিকে।

সুলতাই এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। বললো, 'উঃ, অপেক্ষা করে করে আর পারিনে। নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিলে আবার।'

শিবনাথ বললো, 'একটুখানি।'

—কুম্ভকর্ণ কোথাকার।

তারপরেই বললো, 'আচ্ছা, তুমি তো একদিনও ঘোড়ায় চাপলে না?'

—আমি?

হোহো করে হেসে উঠলো শিবনাথ। আব ওব হাসিব শব্দে চমকেই বুঝি লীলা ফিরে তাকালো। চোখাচোখি হয়ে গেল দু'জনেব। শিবনাথ দেখলো, লীলা তাব স্বামীব পাশে বসে ওর স্বামীর ঘাডেব পাশ দিয়ে, মুখটা একেবাবে উল্টোদিকে ঘুরিযেছে।

—না সত্যি, তুমি একবার ঘোড়ায চাপ না?

—আমার ভয় কবে। তুমি চাপবে তো বলো।

সুলতা বললো, 'অসভ্য!'

—অসভ্য কেন? কত মেযেবা তো চাপে।

—বাব্বা আমি মবেই যাব।

অতএব ইতি। শিবনাথ বললো, 'আজ তুমি অবজাবভেটবি বাউন্ড দিযে এস, আমি বসি।'

সুলতা বললো, 'প্যাচাব মতো?'

—প্যাঁচাব মতো কেন? আমি ততক্ষণ খববের কাগজটা পড়ি।

—বেশ।

সুলতা সত্যি হাঁটতে আরম্ভ কবলো। শিবনাথ ফিবতে গিযে দেখলো, লীলা উঠে দাঁডিযেছে। শিবনাথ ফোযাবাটা পর্যন্ত গেল। আবাব ফিবলো। দেখলো লীলা সুলতাব পথটাই ধবেছে।

শিবনাথ দোকানে গিযে একটা বাসি খববেব কাগজ কিনলো। মুডে বাখলো পকেটে এলোমেলোভাবে। ছবি দেখলো শো-কেসে, তাবপবে আবার এলো ম্যালের সমতলে। লীলা নেই। কিন্তু ও পথে পা বাড়াতে তাব ভয কবতে লাগলো। সে অবজাবভেটরিব উল্টোদিকের পথটা ধবে হাঁটতে লাগলো। এ পাথবেব স্তূপটাব ওপিঠেই, সুলতা আব লীলাব অস্তিত্বটা সে যেন টের পাচ্ছে। ঘুবে এলো, ওবা এ পথেই আসবে।

শিবনাথ এগুতে লাগলো। কতক্ষণ এগিযেছে, খেযাল নেই। সহসা দূবে একটি লালের ইশাবা পেযে থেমে গেলো সে। লীলাব গাযে একটা লাল স্কার্ফ ছিলো না? ছিলো। কিন্তু সামনের লালটা সুলতাব লাল ক্লোক। তাবই হাই হিলেব ঘাযে চকিত হচ্ছে—এই নির্জন পাহাডেব গা।

শিবনাথ বললো, 'এসে পডেছ?'

সুলতা তখনো হাফাচ্ছে। —'উঃ, কী নির্জন বাস্তা! এত ভয করছিলো একলা একলা। কিন্তু তুমি কোথায যাচ্ছ?'

শিবনাথ বললো, 'এমনি এগুচ্ছিলাম। জানি তুমি এ পথেই ফিববে। তবে ভযেব কিছু নেই।'

সুলতা হাত ধবলো শিবনাথেব। শিবনাথ বললো, 'এস এই গাছতলাটায বসি।'

ওবা বসলো। বাস্তাটা একটু জেগেছিলো। আবাব যেন পাশ ফিবে ঘুমিযে পড়লো একেবাবে নিঃশব্দ, শুধু ঝিঁঝিব ডাক। কুযাশা ঘনাতে লাগলো।

তাবপরে দুদিন শিবনাথ অনেক দূব-দূবান্তে বেডালো পায়ে হেঁটে। তৃতীয দিন ঘোষণা করলো, 'বিছানাপত্র বাঁধা যাক।'

—এর মধ্যেই ?

—আর কি, পরশু তো যেতে হবে।

—তা বলে এখুনি বিছানা বাঁধতে হবে ?

—ওই আর কি কথার কথা বললুম। আর কি, পুরনো লাগছে দার্জিলিং।

তোমাদের সবই তাড়াতাড়ি পুরনো লেগে যায়। একদিন তো ভালো করে কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখলুম না।

সে তো কাঞ্চনজঙ্ঘার মর্জি।

একথা হচ্ছিলো রাত্রে। পরদিন সুলতার চিৎকার ও দাপাদাপিতে ঘুম ভাঙলো শিবনাথের। গা থেকে লেপটা খুলে নিলো সে।

শিবনাথ বললো, 'কী হয়েছে ?'

সুলতা জানলার দিকে দেখিয়ে বললো, 'দেখ দেখ, আজ একটু দেখ।'

শিবনাথ দেখলো, সুনীল আকাশের বুকে রুপোর মুকুট মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। ধূসর বক্ররেখা তার মুখের রেখা। গরাদহীন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আরো দেখলো, উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে তুষার ধবল হাসি গলে গলে পড়ছে নীল আকাশে। আর ভুটিয়া বস্তি থেকে ভেসে আসছে ব্যাগপাইপের বিচিত্র এক আদিম পাহাড়ী রাগিণী। বস্তিতে আজ দলা পাকানো জটলা নেই, ঝর্ণার মতো চলমান। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে।

নীল আকাশ, তুষার শৃঙ্গের উদয়, ঝকঝকে রোদ আজ যেন কিসের উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে পাহাড়ে! শুধু বাইরের নয়, পাহাড়ের ঘরের মানুষেরাও যেন আজ আমন্ত্রিত।

সুলতা ছুটে গেল দরজার কাছে। থেমে বললো, আমি যাচ্ছি বাইরে তুমি এস।

চলে গেল ও। শিবনাথ বসতে যাচ্ছিলো, পারলো না। হাত মুখ ধুতে হলো তাকে। চা খেয়ে জামা চাপাতে হলো। ম্যালে এসে উঠলো সে। চেনা বেঞ্চিটার দিকে তাকিয়ে দেখলো। লীলা নেই, স্বামী আছেন। কিন্তু আজ বসে নেই। উত্তরে দক্ষিণে পায়চারি করছেন অলেস্টার পরে।

সুলতা ছুটে এলো কোত্থেকে। বললো, 'তুমি কোথাও যাবে ?'

—তুমি যাবে ?

—না। আমি বসে বসে খালি দেখব। আজ হয়তো আর কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকবে না, না ?

—বোধ হয়। তুমি তবে বস, আমি একটা চক্কর দিয়ে আসি।

শিবনাথ ভুটিয়া বস্তিরই পাশ দিয়ে, নেমে চললো বার্চহিল রোডের সর্পিল ঢালুতে। যে-পথে চললে, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সঙ্গী বলে মনে হবে। আজ বুঝি কোন ভুটিয়া জোয়ান সকাল থেকেই মাতাল হয়ে গেছে। কিংবা কোনো ধর্মীয় উৎসব আছে। ব্যাগপাইপটা নামবে না ওর মুখ থেকে আজ। তুষার শৃঙ্গে পাঠাবে ওর সুর।

বার্চহিল রোডের একটা সীমান্ত, গভর্নরের বাড়ির পশ্চিম দরজার কাছে এসে উঠলো শিবনাথ। সামনেই অবজারভেটারি পাশেই উত্তর দিকের নির্জন রাস্তাটা।

উত্তর দিকে নির্জন রাস্তাটায় বেঁকতে গিয়ে দাঁড়ালো সে। লীলা। লীলা দক্ষিণের পথ দিয়ে এসে উত্তরের বাঁকে থমকে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো, পিছন ফিরে তাকালো একবার। তারপর শিবনাথের কয়েক হাত দূর দিয়ে, উত্তরের ঘুমন্ত রাস্তাটাকে জাগিয়ে দিলো।

যেন পথরোধ হলো শিবনাথের। সে দাঁড়িয়ে রইলো তেমনি। লীলা চলেছে ধীরে, অতি ধীরে। অনেকক্ষণ পর পর তার ছোট হিলের একটি একটি শব্দ, যেন একটু একটু করে ঘুম ভাঙাচ্ছে রাস্তাটার। শিবনাথ দু'পা সরে, রাস্তার রেলিংটা চেপে ধরলো। লীলাও দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে ফিরে সেও রেলিংটা ধরলো। একই রেলিং, পনের হাত দূরে। শিবনাথের মনে হলো লীলার হাতটা যেন তারই হাতের ওপর এসে পড়লো।

কে একটি লোক চলে গেল আপন মনে। উত্তরে বার্চহিল রোডের পাড়াগুলি নেমে গেছে নিচে। রোদে চকচক্ করছে লেবং-এর সমতল। আর গোটা আকাশব্যাপী তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার বিস্তৃত বাহু। লাল, নীল, সবুজ বুনো ফুলের ছড়াছড়ি ঘাসে ঘাসে। পাথরে পাথরে পাথরের গোলাপেরা রোদে চলকাচ্ছে। সবুজসোনা গলে পড়ছে দেবদারুর পাতায় পাতায়। প্রজাপতিরা হারিয়ে যাচ্ছে ফুলের রঙে রঙে। বাতাস বইছে। পাতা ঝরছে দু' একটি। আর পাগলা ভুটিয়াটার ব্যাগপাইপের আদিম সুর থামবে না।

এত আয়োজন কি আজই হলো। কি করবে শিবনাথ? তার মনে হলো তার পিঞ্জরাবদ্ধ বোবা অনুভূতিটারই এতো প্রকাশ সমারোহ। তাই ওর বুকের রক্তধারা যেন নাচতে লাগলো। ফিরে তাকালো লীলার দিকে। দেখলো, লীলা, ঠিক ওর দিকে নয়, ওরই দেহের সীমায় তাকিয়ে আছে। ওর শ্যামচিকন মুখে রোদ লেগে কচি পাতার মতো দেখাচ্ছে। আয়ত চোখ দুটিতে রৌদ্রচকিত তুষারশৃঙ্গের ছায়া।

শিবনাথ রেলিং ধরে ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেল। লীলা চোখ তুললো। তুলে, হাসল সলজ্জভাবে।

শিবনাথ অনেক কষ্টে বললো, 'আপনার স্বামী ভালো আছেন?'

—আছেন।

লীলা বললো নিচু গলায়। কপাল থেকে তুলে দিলো কয়েক গোছা রুক্ষ চুল। বললো আপনার স্ত্রীকে নিয়ে বেরোন না কেন?'

শিবনাথ বললো, 'ও উঁচু নিচু করতে পারে না।'

একটু চুপ। আবার বললো, 'আপনার স্বামীর কি শরীর ভালো নেই?'

লীলার স্বাভাবিক রক্তাভ ঠোঁটে অতি সাধারণ হাসি একটি অসাধারণ মায়ায় উজ্জ্বল। বললো, 'না। ওঁর ধারণা, ওঁর শরীর মোটেই ভালো নেই। দিন-রাত্রি ফার্মের ব্যবসার হিসেবে সব সময় টায়ার্ড থাকেন।'

কে দু'জন লোক চলে গেল দুদিকে। ওরা দু'জনে তাকিয়ে রইলো কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। শুকনো পাতা পড়লো খসে একটা। দু'জনেই পাতাটার দিকে তাকিয়েছিলো। চোখাচোখি হলো আবার। হাসলো দু'জনেই। শিবনাথ আরো এগিয়ে এলো কাছে। বললো, 'দেখুন সেদিন সেই বালির ঝড়ে—'

লীলাও বলে উঠলো, 'আমিও সেই কথা বলবো ভাবছিলুম, বালির ঝড়—'

শিবনাথ প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'বলুন।'

লীলার দু'চোখে যেন সহসা একটি নতুন হাসি লজ্জায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বললো, 'কী আর বলবো। বালির ঝড় বলেই এমন হয়েছিলো নিশ্চয়।'

—তাতে আপনার মনে কোনো গ্লানি—?

শিবনাথ কথাটা শেষ করতে পারলো না। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলো লীলার নত মুখের দিকে। রেলিং-এ আঙুল ঘষতে গিয়ে লীলার সোনার বালাটা লোহায় লেগে বাজতে লাগলো ঠুন্‌ঠুন্ করে।

মাথা নিচু করেই, ঘাড় নেড়ে বললো, 'নেই। আপনার?'

লীলা তাকালো শিবনাথের দিকে। শিবনাথের মুখে সেই বোবা অসহায় অনুভূতিটা যেন

ফিবে এলো। পবমুহূর্তেই নিশ্বাস ফেলে বললো, আপনাব গ্লানি না থাকাব আনন্দটাই আমাব ভাগে বয়েছে।

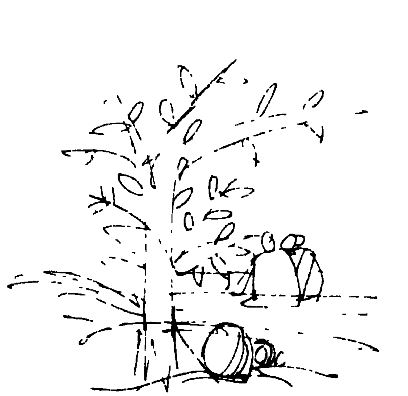
লীলা তাড়াতাড়ি চোখ নামালো। অস্ফুটে বললো, 'কী বিচিত্র!' আবাব চোখ তুললো। তাবপব দুজনেই হেসে ফেললো। বালির ঝড়েব ঝাপসা বোবা কথাগুলি যেন বিশ্বেব ওই সকল আলোব মাঝখানে হাসির ছটায় ঝলকে উঠলো। পাতা হাসছে, ফুল হাসছে, কনক কিরীট মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘাও হাসছে। ওই আদিম বাঁশটাব বন্ধ্রে বন্ধ্রে একটা হাসিবই উচ্ছ্বাস যেন সুব হয়ে ভাসছে।

আব হাসি দিয়ে এই শেষ কথাব পব, ববযলেহী বাতাস যেন সহসা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ব্যাকুল বাতাসে ওবা আবাব চুপ কবে অনেকক্ষণ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বইলো। আবো অনেক ক'টা পাতা ঝবলো। বাঁশীটা বাজতে লাগলো। কাঞ্চনজঙ্ঘা আজ কিছুতেই বিদায় নিচ্ছে না।

তাবপবে আবাব ওরা দু'জনে চোখাচোখি কবে হাসলো। লীলা বললো, 'যাই এবাবে।'

শিবনাথ বললো, 'আসুন।'

লীলা চলে গেল বাস্তাটাব ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে। শিবনাথ আবাব নেমে গেলো বার্চহিল বোডে, যে-পথে এসেছিলো। দূবেব উঁচুতে একবাব যেন দেখা গেল লীলাকে। তাবপবেই ঘন জঙ্গল।





একটি বেদনাদায়ক প্রতিবাদ

মান্যবরেষু,

আমার এই পত্রের বাচনিক যদি আপনাব কাছে ধৃষ্টতা মনে হয়, তবে আমাকে ক্ষমা কববেন। আমাব এত বড পত্রটি পাঠ শেষ করে, নিচে ইতি-ব পবে আমার নাম পড়বার মতো ধৈর্য হয়তো আপনাদেব থাকবে না, তাই আগেই নিবেদন কবি, আমাব নাম ত্রৈলোক্যকান্ত সেন। আমি একজন সামান্য কম্পোজিটব। আপনি একজন প্রথিতযশা প্রবীণ এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক। পৃথিবীতে এমন ঘটনা বিরল যে, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুবিখ্যাত সাহিত্যিককে এক অখ্যাত কম্পোজিটর পত্র লিখেছে, এবং সে-পত্রও আবাব সাহিত্য বিষয়ে, উপরন্তু সেই সাহিত্যিক মহাশয়েবই বচনা সম্পর্কে। যদি বা এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তা কখনো নিশ্চয়ই কম্পোজিটরের প্রায়ান্ধকাব ঘর, চারিদিকে কালিব ছোপ, সীসাব রাশি রাশি অক্ষবের স্তূপ, এবং স্যাঁতস্যাঁতে ঘবেব (আপনি যদি লক্ষ্য কবে থাকেন, তাহলে নিশ্চযই দেখেছেন, অধিকাংশ প্রেসের চেহারাই তাই।) ভ্যাপসা গন্ধেব সঙ্গে সীসারই একটা ধাতব গন্ধ মেশা পরিবেশ ছেড়ে কখনোই বাইরে যায় নি। শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্ত ক'জন সাহিত্যিক ক'জন কম্পোজিটবকে চোখেই বা দেখেছেন। পাঠক তো দূবেব কথা, সত্যেব খাতিরে আমি না বলে পাবছি না, স্বয়ং আপনাবাই যখন পত্রিকায় বা পুস্তকে আপনাদেব বচনাগুলো বেশ ঝবঝরে মুদ্রিত অবস্থায় দেখতে পান, তখন ক'জনেব কাছেই বা কম্পোজিটরেব অস্তিত্ব মনে পড়ে? বোধহয় একজনেব কাছেও না। আব আমাদেব সঙ্গে সাহিত্যিকদের সাক্ষাতেব কখনো প্রযোজনও হয় না। আপনার হাতে তো প্রকাশক অথবা সম্পাদক মহাশয় গ্যালিপ্রুফ পৌঁছে দেন। আপনি সাবধানে লক্ষ্য করে দেখে দেন, কম্পোজে কি পরিমাণ ভুল আছে। বেশি ভুল থাকলে বিবক্ত হন, কম থাকলে একটু স্বস্তি বোধ করেন, এই পর্যন্ত। তখনো আমার অস্তিত্ব আপনার কাছে থাকে না। তখন কোন মানুষের অস্তিত্ব অনুভূত হলে, তা সম্পাদক বা প্রকাশকেবই। আমবা অনেক, অনেক দূবে।

কিন্তু আপনাকে আগেই জোড হস্তে অনুরোধ কবি, এসব কথাকে যেন অনুযোগ মনে কববেন না। আমি একটা বাস্তব চিত্রই আপনাব কাছে উপস্থিত করলাম। এর থেকে তুলনায় আমার অবস্থা এবং দূবত্বটুকুই মাত্র ব্যক্ত কবতে চেযেছি।

অতএব বুঝতে পাবছেন, আপনাকে এই পত্র লেখবাব আগে আমাকে কত ভাবতে হযেছে, কত আগু পাছু কবতে হযেছে। কত সঙ্কোচ কাটিয়ে সাহস সঞ্চয় করে তবে এই পত্র লিখতেই

হয়েছে। লিখলেই তো খালি হয় না, আসল সাহস তো পাঠানো। বিশেষ করে, যে-পত্রিকায় অধুনা আপনার এই গল্পটি বেরিয়েছে, যে-পত্রিকাটি, আমি যে-প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করি, সে প্রেসেই ছাপা হয়েছে, এবং আমিই সেই কম্পোজিটর, যার হাতে আপনার হাতে লেখা পুরো পাণ্ডুলিপিটা কম্পোজ করবার ভার পড়েছিল। স্বভাবতই সমস্ত ব্যাপারটা খুবই জটিল হয়ে ওঠে। কোনোরকমে যদি এ পত্র আপনাকে রুষ্ট করে, আপনি সম্পাদক মহাশয়কে অভিযোগ করেন, সম্পাদক আবার প্রেসের ম্যানেজারকে রিপোর্ট করেন, এবং ম্যানেজার আবার আমাদের বড়বাবুকে হুমকে কিছু বলেন, তা হলে, এমনও হতে পারে যে, আমার চাকরিটি যাবে। চাকরি যাওয়াটা বড় কথা নয়, আজকাল প্রেসগুলোতে বেশ কাজের চাপ, অন্য কোথাও হয়তো জুটে যাবে। কিন্তু মর্মান্তিক হবে উপহাস বিদ্রূপ ও ঠাট্টা। হয়তো শুনতে হবে,আদার ব্যাপারীর যতো জাহাজের খবরে নাক গলানো। তাঁতীর আবার এঁড়ে গরু কিনতে যাওয়া কেন?

তাই আপনাকে অনুরোধ, এ চিঠির সংবাদ আপনার আমার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। অবিশ্যি, আমিও একজন পাঠক, এ ক্ষেত্রে আমাকে পাঠক হিসেবে চিন্তা করলেই, সব গোলমাল মিটে যায়। পাঠক হিসেবে আমারও একটা অধিকার আছে লেখকের সঙ্গে পত্র বিনিময়ের। এবং এই পত্র লিখতে গিয়ে আপনাকে আমার পরিচয় নাম ধাম না দিলে, এত কথা বলবারই দরকার হত না। কিন্তু আমার বক্তব্য বলবার জন্যে পরিচয় না দিলে অসুবিধা হবে।

আশাকরি, এতক্ষণে আপনি কিছুটা অনুমান করে নিয়েছেন, এ পত্র লেখার উদ্দেশ্য কী! পুরোপুরি না হোক, প্রাথমিক কারণটা বোধ হয় আঁচ করতে পারছেন। আঁজ্ঞে হ্যাঁ ঠিক তাই, আপনার এই সাম্প্রতিকতম গল্পের নায়ক, একজন কম্পোজিটর বলেই, আমাকে লিখতে হচ্ছে। একজন কম্পোজিটরের পারিবারিক জীবনের গল্প লিখেছেন, বলেই, আমি চিঠিটা লিখছি।

কিন্তু না, এটাও সঠিক কথা হল না। যে কোনো একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ আপনার গল্পের যা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, সে গল্পের নায়ক তো একজন দুস্থ কেরানীও হতে পারতো। কিংবা একজন বাস বা ট্রাম কন্ডাকটর, যে-কোন অল্প মাইনের দরিদ্র একজন মানুষের জীবন নিয়েই এমনি একটি কাহিনী লেখা যেতে পারতো। আর তাহলে আমার তো পত্র লেখার কোন কারণই ঘটতো না। এই ধরনের মানুষদের জীবন নিয়ে কতো অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পই তো লেখা হয়ে থাকে, যা সত্যের ধারে কাছেও যায় না, অথচ এমন সব মন মাতানো রসে জারিয়ে তোলা হয় যে, পড়তে বেশ ভাল লাগে। তখন আমরা কেউ সত্যি মিথ্যে সম্ভব অসম্ভবের বিচার করি না। অধিকাংশ পাঠক তো তাই, সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও তাই। দেশ কাল আচার ইত্যাদি আমাদের মাথায় কখনো থাকে না। গল্প শুনতে বা পড়তে যেহেতু আমাদের ভাল লাগে, আর তা যদি বেশ একটু নৈতিকতার দিক থেকে আঁশটে গন্ধওয়ালা হয়, যা সম্ভাব্য হোক বা না হোক, একটু সুড়সুড়িও লাগে, তা হলেই অনেক সময় খুশি হয়ে যাই। শুধু যে আঁশটে নৈতিকতার কথাই বলছি, তাও নয়, এই ধরুন এমন সিচুয়েশন লেখা হল যে, চোখের জলই ফেলতে লাগলাম, কিংবা অন্যত্র হেসে কুটিপাটি হলাম। অথচ, একটু যদি ভেবে দেখতাম, পাঠক হিসেবে একটু যদি চিন্তাশীল হতাম, তাহলে দেখতাম, সমস্ত ব্যাপারটাই ফানুস। শুধু ভাষার যাদু ও ঘটনাকে সাজিয়ে লেখবার গুণেই কাণ্ডটা ঘটেছে। এতে অবশ্য লেখকের একটা গুণকে অস্বীকার করবার উপায় নেই কিছুতেই যে, তাঁরা মাঝে মাঝে ম্যাজিকের সৃষ্টি করতে পারেন। এটা তাঁদের একটা বিরাট শক্তিও বটে। আমার কাছে এ শক্তি প্রায় অপার্থিব শক্তি বলেই মনে হয়, অমূল্য অতুলনীয় এই শক্তি দিয়ে আপনারা কী না করতে পারেন? কিন্তু (আমাকে ক্ষমা

করবেন, এসব কথা আমাকে লিখতে হচ্ছে বলে। আমি কতটুকুই বা বুঝি। ' যা বুঝি বা ভাবি তাকে মূলধন করেই এ সব লেখার সাহস করছি।) শক্তিকে স্থাপনের জন্যে ঠাঁই দরকার। ঠিক নয় কি? ঠাঁই বলতে আমি প্রকাশের কথাই বলছি, ব্যবহারের কথাই বলছি। স্বভাবতই ব্যক্তিত্বহীন শক্তিকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারলে, তা খুব তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায় না কি?

কিন্তু এসব বিশ্লেষণের মধ্যে, আমি বোধহয় এবার সত্যি সত্যি আমার সীমানা লঙ্ঘন করছি। আমি সাহিত্যের সমালোচক হয়ে উঠছি। আমার তা মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনার সাম্প্রতিকতম বিষয়েই শুধু বলতে চাইছিলাম।

বলছিলাম, এ গল্প সম্পর্কে আমার কিছুই বলার থাকতো না, যদি না আমি জানতে পারতাম, আপনি আমাদের একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর জীবনকে কেন্দ্র করে এই গল্পটি লিখেছেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আমাকে সুহৃদবাবুই বলেছেন যে, আমাদের দুর্ভাগা এক সহকর্মী বন্ধু সীতানাথের পারিবারিক জীবনের কাহিনী ওঁর কাছে শুনেই লিখেছেন। সুহৃদবাবু প্রুফরীডার বলে ওঁর সঙ্গে আপনার মাঝে মধ্যে কথাবার্তা হয়ে থাকে। কথায় কথায় উনিই আপনাকে সীতানাথের দুর্ভাগ্যের বিষয় আদ্যোপান্ত বলেছেন, আপনি নাকি তাতে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং সুহৃদবাবু আপনাকে যা যা বলেছেন, তা এক বর্ণও মিথ্যে বলেন নি, সে কথাও ওঁর মুখ থেকে জানলাম।

গল্পটা যখন প্রথম পড়ি, অর্থাৎ কম্পোজ করতে শুরু করি, তখনই আমার একটা ক্ষীণ সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু খানিকটা পড়বার পরেই, আমার সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল। কারণ আপনার গল্প আর সীতানাথের জীবন, দুটিই একেবারে ভিন্ন। প্রথম থেকেই আপনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে, যখন দেখি নায়িকা অনসূয়ার প্রতি (সীতানাথের স্ত্রীর আসল নাম শিবানী। আপনি অবশ্য নায়িকার নাম রেখেছেন অনসূয়া।) আপনার আকর্ষণ বেশি, স্বভাবতই পাঠকের দৃষ্টিও সেইদিকেই চলে যায়। আপনার গল্পটি প্রকাশিত হবার পর যখন সবাই খুব প্রশংসা করতে আরম্ভ করলে, তখন সুহৃদবাবু জানালেন, আপনি নাকি সীতানাথের জীবন নিয়ে গল্পটি লিখেছেন। তাই আমি আবার গল্পটি পড়লাম। কারণ সীতানাথ আমাদের শুধু ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধুই ছিল না, ওর পারিবারিক দাম্পত্য জীবনটা আমাদের কাছে আদর্শস্থল ও শিক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনার গল্প, এক নৈতিক অধঃপতনের প্রতি সমবেদনা জাগাবার চেষ্টা করে, কী বিপুল আর ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে গেল। অবশ্যই নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে একটা করুণ ব্যথা ও যন্ত্রণা সৃষ্টি করবার খুবই চেষ্টা আপনি করেছেন, সেই সঙ্গে অনসূয়ার মহানুভবতাও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

কাহিনী যখন সীতানাথ ও শিবানীকে নিয়ে তখন স্বীকার করতেই হবে, গল্পের অনেকখানিই, পরিণতিসহ, আপনার স্বকপোলকল্পিত। সে অধিকারও আপনার আছে, কারণ হুবহু সীতানাথ শিবানীর কাহিনীই আপনাকে লিখতে হবে, লেখকের এরকম কোনো দায়িত্ব মানবার দিকি থাকতে পারে না। শুনছি যে-লেখকের কল্পনা গুণ নেই, তিনি কখনো সার্থক লেখক হতে পারেন না। কিন্তু বুঝতে পারি না, সে-কল্পনা গুণটির 'রকম' কী? তার কী কোনো নিয়ম নীতি আছে? যদি থাকে, তা কি লেখকের চরিত্র ও মনোবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল? আমি এসব কিছুই জানি না।

কিন্তু ধরুন, হিমালয়ের কথা লিখতে গিয়ে, কাব্য কল্পনায় আপনি অনেক উপমা দিয়ে সৌন্দর্যবৃদ্ধি করতে পারেন, কিংবা গঙ্গা নদীকে নিয়ে আপনি বহুবিধ কল্পনার জাল বুনতে পারেন। তবু বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয়ের অবস্থান বদলানো যায় না এবং গঙ্গা যে শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে গিয়েই মিশেছে, এটাকেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সীতানাথের সম্পর্কে লিখতে গেলে এই নীতিই বোধহয় মানা উচিত ছিল, অন্যথায় লেখকের কল্পনা মিথ্যায় পরিণত হয়, সত্যের প্রতি অমর্যাদা করা হয়। এবং আপনি তাই করেছেন। তাতে সৌন্দর্য ও মর্যাদা, দুইয়ের-ই হানি হয়েছে।

লাঞ্ছিত সীতানাথ পরিবারের যা ঘটনা, ঠিক তার ওপরেই আপনার ভাষা ও ভঙ্গি কারুমিতি যুক্ত হলে সবদিকই রক্ষা পেত। দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। আপনার গল্পের শুরুটা পড়ে আমার রীতিমতো বুক দুরদুরু করে উঠেছিল। আমি যেন পরিষ্কার সীতানাথকে দেখতে পাচ্ছিলাম, যখন আপনি শুরু করলেন,

'রাত্রি ন'টার ঘন্টা বাজলো দেয়াল ঘড়িতে। অতনু (আপনি নায়কের তাই নাম রেখেছেন।) তার প্রকাণ্ড অক্ষরের খুপরিওয়ালা কেস থেকে মাথাটা তুলতে গেল, পারল না। মনে হল, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। ঘড়ির ঘন্টায় অন্যমনস্ক হওয়ার দরুন, তার চোখের সামনে শুধু কতকগুলি কালো কালো অক্ষর হিজিবিজি কাটছে। কিছুদিন আগেই চোখ দিয়ে রীতিমতো জল কাটছিল। মাথাটাও সব সময় ধরা ধরা লাগছিল। কিন্তু বেলা দশটা থেকে রাত ন'টা অবধি, এই সুদীর্ঘ সময় ধরে, অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে, কম্পোজ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। কয়েকদিন আগে ডাক্তার তাকে বলেছিল, 'ওভারটাইম কাজ করা ছেড়ে দিতে হবে।' ডাক্তারের কথা শুনে মনে মনে হেসেছিল অতনু। অসহায় ব্যথিত সে হাসি। ওভারটাইম কাজ বন্ধ করবে অতনু? যার রাত্রি বারোটা অবধি কাজ করে, সংসারের আয় বাড়াতে পারলেই ভাল হয়। সে ডাক্তারকে কিছুই বলে নি। বাড়িতেও না। কারণ বাড়িতে বললে, সকলেই ভয় পেয়ে যাবে।

চিন্তিত হয়ে পড়বে। ডাক্তার যে-দুটি কথা বলেছে, তার একটি ক্ষয় রোগ, অন্যটি অন্ধত্ব। একথা কেমন করে সে তার বিধবা মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে? বড় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে, এই কয়েক বছর মাত্র যে মনে মনে একটু স্থিতিলাভের শান্তি বোধ করছে। মাকে বললে, ছোট ভাইবোন তিনটি ভয়ে বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে থাকবে। আর অনসূয়া। যার দুটি আয়ত কালো চোখে এখনো অনেক আশা, অনেক আলো, অনেক না পাওয়ার দূর দিগন্তে যার স্বপ্নিল দৃষ্টি নিবদ্ধ, যার অমৃতমন্থিত বুকে অতনুর এক বছর বয়সের নবীন বংশধর, যার সান্নিধ্য অতনু অমৃতপায়ী বিশ্বজয়ী দেবতার মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, সেই অনসূয়াকে এসব কথা কেমন করে বলবে। বলতে পারে নি, পারবেও না। অথচ কত স্বপ্নই না দেখেছিল।

আস্তে আস্তে মাথা তুলল অতনু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, ন'টা পাঁচ হয়ে গেছে। ঘরের অন্যান্য টেবিলে কেউ নেই, সন্ধ্যাবেলার মধ্যে সবাই বাড়ি চলে গেছে। স্বভাবতই, প্রেসের এই কম্পোজ রুমের আর সব আলোই নেভানো, শুধু তার টেবিলের ওপরেই আলো জ্বলছে। যে-পাণ্ডুলিপি দেখে সে কম্পোজ করছিল, সেটি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিল। দু-হাত তার সীসার কালি। অন্য মনস্ক হয়ে গায়ে মুখে কখন হাত দিয়েছে, তাই তার সর্বাঙ্গেই কালি। এমন কি চশমার মোটা লেন্সেও কী ভাবে কালির ছাপ পড়েছে।

অতনু উঠে দাঁড়ালো। কপালের সামনেই, একশো পাওয়ারের আলোটা প্রখর সূর্যের মতো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। চোখ সরিয়ে কয়েক মুহূর্ত যেন কিছুই দেখতে পেল না। সে চোখ বন্ধ করে রইল খানিকক্ষণ। আবার আস্তে আস্তে তাকালো। চোখে একটু জলের ছিটা দিতে পারলে ভাল হত। কাজ কর্ম শেষ করে সবাই ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। অতনুরও তাই ইচ্ছে করছে। কিন্তু উঠোনের একপাশে দারোয়ানের ঘর পেরিয়ে অন্ধকার কলঘর। এখন আর সেখানে জল নেই। সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। দারোয়ান পায়ের শব্দ পেয়ে, তার ঘর থেকেই জিজ্ঞেস করলো, 'কাম হো গিয়া আপকো?' অতনু বলল, 'হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ করে দাও।' দারোয়ান বললো, 'ঠিক হ্যায়, আপ যাইয়ে।'

অতনু রাস্তায় দাঁড়ালো। শীতের রাত, কলকাতার পথ ইতিমধ্যেই জনহীন হয়ে এসেছে। তবু যেন প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারলো অতনু। কিন্তু এক বছর আগেও রাতের কলকাতার আলো সে অনেক স্পষ্ট দেখতে পেত। বহুদূর পর্যন্ত আলোর সারি চোখে ভাসতো। এখনো তেমনি আলোই আছে। অথচ অতনুর চোখে সবই অন্ধকার লাগে। মনে হয়, বাতিগুলোর তেমন জোর নেই, অনেক নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। আরো আলো দরকার, আরো আলো।।

এইভাবে আপনার নায়ক অতনু বাড়ি এল। তিন ভাড়াটের সেই এঁদো অন্ধকার পুরনো বাড়িটায়, যেখানে ইলেকট্রিক আলো নেই। মা অনসূয়া তার জন্যে বসেছিল। আর সবাই ইতিমধ্যে শুয়ে পড়েছিল। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে, অতনু হাত মুখ ধুয়ে এল। তারপর মা শুতে চলে যায় ভাইবোনদের ঘরে। অনসূয়া খেতে দেয় অতনুকে। এখান থেকে আপনার গল্পের মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠল অনসূয়া। যার চোখ দিয়ে এবার আমরা সব দেখছি। এখানে আপনি শিবানীর (অনসূয়া) একটি চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন। আপনার নায়িকার রূপ তাতে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীর সঙ্গে মিলে যায়। পরে আপনার কাজে লাগবে বলেই এ-রকম সুন্দরী রূপসীর সৃষ্টি করতে হয়েছে আপনাকে। স্বামীর জন্যে অনসূয়ার অনুরাগ ব্যথা, ভবিষ্যতের জন্যে দুশ্চিন্তা ইত্যাদি এখানে ব্যক্ত করেছেন। কিছুদিন থেকেই সে বুঝতে পারছিল, অতনুর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, এবং আজ আর একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করলো, ভাতের থালায় প্রত্যেকবারই অতনুর হাত ঠিক জায়গায় পড়ছে না। অথচ সে চোখ মেলেই, তাকিয়ে খাচ্ছে। স্বভাবতই অনসূয়া শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠায় চিন্তা করছে, 'হে ভগবান, ও কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।' কিন্তু অতনু স্বাভাবিক থাকবারই চেষ্টা করছে অনসূয়ার সামনে। (আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, পরিবেশ চরিত্র সব মিলিয়ে সীতানাথ আর শিবানীকে অনসূয়া আর অতনু বললে বেমানান লাগে? যাই হোক,) অনসূয়া সবই বুঝতে পারে, কিছু বলে না, কারণ সে অতনুর মন জানে। জানে যে সমূহ দুর্যোগের কথা বলে সংসারের সবাইকে অতনু ভাবিয়ে তুলতে চায় না। ইত্যাদি · · ইত্যাদি।

তারপরে শয্যায়। অতনুর আদর স্নেহ, দুঃখ প্রকাশ, 'অনু তোমাকে আমি কোনদিক থেকেই সুখী করতে পারলাম না।' অনসূয়ার প্রতিবাদ, স্বামীর প্রতি ভালবাসা, আবেগ, আত্মসমর্পণ এবং 'তনিমা বউদি'র উল্লেখ। যে-তনিমা বউদি পাশের দোতলা বাড়িতে থাকেন, বড়লোক ফ্যাশানেবল সোসাইটিচারিণী, অনসূয়াকে সবিশেষ স্নেহ করেন। চাকরি করে দিতে চান অনসূয়াকে। অনসূয়ার সেকেন্ড ক্লাস অবধি বিদ্যায় সে চাকরি স্বর্গ হাতে পাবার মতো। সে চাকরির কথা শুনে, অতনু বলে, 'তোমার তনিমা বউদি যদি আমাকে এরকম একটা চাকরি দিতেন তো বর্তে যেতাম।'

অনসূয়া জানায়, তনিমা বউদির দেওয়া চাকরি শুধু মেয়েদের জন্যেই। মহিলারা নাকি সেখানকার সর্বেসর্বা। সেই সঙ্গে একথাও অনসূয়া ঘোষণা করতে ভোলে না, তনিমা বউদির দেওয়া চাকরি নিতে তার সঙ্কোচ হয়। শত হলেও অজানা অচেনা জায়গা।

আপনি আসলে এ কথাই বলেছেন, অতনুর মন জানবার জন্যেই অনসূয়া সঙ্কোচের কথা বলেছে। কারণ, পাড়ায় এই মহিলাটির সম্পর্কে কারুর ধারণাই ভাল নয়। ভাল না হওয়ার কারণও অনেক। ইতিমধ্যেই তনিমা বউদির পাল্লায় যে ক'টি মেয়ে পড়েছে, তাদের সকলের ভাব ভঙ্গি গতিবিধিই সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। কিংবা কেউ কেউ সন্দেহের উর্ধ্বেই চলে গিয়েছে।

'অতনু স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। অসহায়ও বটে। অনসূয়া তাকে সান্ত্বনা দেয়। দিলেও অনসূয়া চিন্তিত না হয়ে পারে না। ফলে অতনুকে ব্যক্তিত্বহীন মনে হতে থাকে। অসহায় উৎকণ্ঠিত মানুষ মাত্রেই কি ব্যক্তিত্ব হারায়?

এরপর আপনার গল্পে, অনসূয়ার চোখের সামনে অতনু ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে। অনসূয়াকে প্রতিদিনই তনিমা বউদি বোঝাতে থাকেন। সেই সব বোঝানোর মধ্যে অনসূয়ার রূপ ও স্বাস্থ্যের স্তুতি ও প্রশংসা তো আছেই। এমন কথাও তনিমা বউদি বলেন, 'আমার অমন রূপ থাকলে, আমি জগৎ জয় করতে পারতাম।' ইঙ্গিতে বলেন, দেখ অনসূয়া স্বামীর জন্যে ত্যাগ স্বীকারের একটা প্রশ্নও তো আছে। চোখের সামনে দেখছ, তিল তিল করে ভদ্রলোক মরছেন। দেখেও কেমন করে নিশ্চিত আছ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তনিমা বউদির এসব কথার মধ্যে যে-ইশারাটা অন্ধকারে দুলে ওঠে, তা চাকরি ঠিক নয়, অন্য কিছু, যা একাধারে আনন্দ ও রাশি রাশি টাকা। অনসূয়ার মনে মনে ঘৃণা হয়, তবু তনিমা বউদিকে মুখের ওপর সে কিছু বলে দিতেও পারে না কারণ তনিমা বউদিকে একেবারে হাতছাড়া করতে তার সাহস হয় না। তাছাড়া শাশুড়ির মতিগতিও খুব বিচিত্র মনে হয় তার। শাশুড়ি এসবের কিছুই জানেন না, অথচ যেন জানেন এবং তাঁর সায় আছে।

দ্বিতীয়বার যখন গল্পটা পড়ি, তখন এ সব জায়গা পড়তে পড়তে রীতিমতো কষ্ট পেয়েছি, বিরক্তও বোধ করেছি। যদি কানে না শুনতাম যে সীতানাথ শিবানীর কাহিনী শুনে এ গল্প আপনি লিখেছেন, তা হলে কিছুই আসত যেত না। কিন্তু শোনার পর আর এ ধরনের কল্পনা মেনে নিতে পারছি নে। তাতে আপনার হাজার কল্পনা করার অধিকার থাকলেও।

আপনি নিশ্চয় সুহৃদবাবুর কাছে সবই শুনেছেন, তবু আপনাকে জানাই সীতানাথের স্ত্রী শিবানীকে তনিমা বউদির মতো মেয়েমানুষের পক্ষে কোনোরকম ইশারা ইঙ্গিতে ওই সব বলার সাধ্য কিছুতেই হবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আপনি শিবানীকে চেনেন না, তাকে দেখেন নি। তবু, এটুকু নিশ্চয় আশা করা যায়, শিবানীর মতো মেয়ে বাংলাদেশে অনেক আছে, আপনি তাদেরও অন্তত দেখেছেন। আপনি আমাদের বললে, শিবানীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতাম। তাহলে দেখতেন, দারিদ্র্যের মধ্যেও যতোটা শিরদাঁড়া ভাঙা অসহায় আপনি মনে করেছেন, তার কিছুই নয়, বরং বিপরীত। তা হলে দেখতেন, তনিমা বৌদির টোপ ফেলা একদিন গুটিয়ে যেত। আপনারও ওরকম তারিয়ে তারিয়ে বসিয়ে রসিয়ে টোপ ফেলার নিবিড় দুপুরের ঘটনাগুলো লেখার প্রবৃত্তিও হত না। শুধু তাই নয়, সীতানাথের মাকে ধরেও আপনি টান পেড়েছেন। কী ন্যাক্কারজনক বলুন তো!

সত্যি বলতে কি, আপনার গোটা গল্পের মূর্তিমান প্রতিবাদ হল সীতানাথের গোটা পরিবার। যদি বুঝতাম, ইওরোপের কোনো কোনো দেশে যুদ্ধকালীন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে আপনার পাত্র-পাত্রীদের জীবনে ঘটনা ঘটেছে, তা হলে একটা কথা ছিল। কিংবা বাংলার তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের অবস্থায়। তখন কেউ কাউকে দেখবার ছিল না।

অবিশ্যি এ কথা আমি মানি, বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থাও ভাল নয়। তার একদিকের চেহারাও ভয়াবহ। যে কারণে মনে হয়, আমরা একটা অবক্ষয়ের ভিতর দিয়ে চলেছি। অসততা, অবিশ্বাস লোভ বিদ্বেষ আর আত্মচিন্তায় মগ্ন এই দেশকে দেখলে হতাশা মনে আসা আশ্চর্য নয়। সেই জন্যেই, এক্ষেত্রে শিবানীদের মতো মেয়েদের জীবনের সত্য কথা, যতো বেশী পারা যায়, লেখা উচিত। অবিশ্বাস ও ক্ষয়ের মলমই তো শিবানীদের প্রকৃত জীবন। প্রকৃত নায়িকার এগুলোই লক্ষ্য, নয় কি? নায়ক নায়িকার চরিত্র প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়াই উচিত নয় কি?

আমার কি সংশয় হচ্ছে জানেন? আপনি সাহিত্যিক হিসেবেই অবক্ষয়বাদী হয়ে গিয়েছেন। আপনি নিজে অবক্ষয়বাদী বলেই, অনসূয়াকে তনিমা বউদির টোপ গিলিয়েছেন এবং সেই রাত্রির অবতারণা করেছেন।

তনিমা বউদির সঙ্গে কয়েকদিন বেরিয়েই, বিপদের গন্ধ পেল অনসূয়া। সেই উগ্র গন্ধের বাষ্প এমন গভীরভাবে ঘিরে ধরলো যে, অনসূয়ার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। তবু চোখের সামনে ভাসছে, তার প্রাণ-প্রিয়, প্রিয়তম পুরুষ অতনুর সেই প্রায় অন্ধ ... ক্ষয়রোগাক্রান্ত দেহ। অনসূয়া চাইল এই বিষবাষ্পের বাইরে গিয়ে প্রাণভরে পবিত্র নিশ্বাস নিতে, পারল না। তার চোখের সামনে অতনু, জীর্ণ, ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু চিকিৎসাহীন শাশুড়ির সেই মিনতিপূর্ণ মুখ।

[ভাবতে ভাবতেই অনসূয়া নিজেকে আবিষ্কার করল এক পুরুষের সান্নিধ্যে মদমত্ত পুরুষ কিন্তু যেন আর্ত ক্ষুধার্ত কিন্তু করুণ, যেন পথহারা মরু-পথিক সামনে জল দেখেছে, এমনিভাবে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করলো। (আর্ত, করুণ পথহারা মরু-পথিক, ইত্যাদি কেন লিখেছেন, তা জানি না। যারা অসহায় গৃহস্থবধূদের দেহ ক্রয় করে ভোগ করে, তাদের প্রাণের অবস্থা বুঝি এবম্বিধও হয়!) ঐশ্বর্য আর বিলাসে পরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে, পুরুষটির এই দেহের দোরে নতজানু-ভিক্ষাবৃত্তি দেখে, ঘৃণা ও ভয়ের মধ্যেও অনসূয়ার মনে বিস্ময়ের চিকুর খেলে গেল। সে দেখলো, মত্ততার ঘোরে, লোকটা যেন করুণ গলায় ফিসফিস করে কী বলছে এবং আলিঙ্গন শিথিল করে, অনসূয়ার পায়ের কাছে ভেঙে পড়েছে। অনসূয়া তখন আলিঙ্গনের ক্লেদে সঙ্কুচিত, দ্রুত নিশ্বাসে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু লোকটাকে তাঁর ভয়ঙ্কর মনে হল না (সাহিত্যিক মহাশয়, কিমাশ্চর্যম্!) তবু অনসূয়ার রুচি সংস্কার ও বিশ্বাস শিউরে উঠল। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো।]

কিন্তু আপনার গল্পে, অনসূয়া তা পারলো না। বেশ খানিকক্ষণ ধরে, মাতালের নানান বেদনাহত ব্যবহার কথা সে দেখল, শুনল। অথচ এদের মধ্যে আগে পরিচয় ছিল না, প্রেম ছিল না, নিতান্তই দেহবিক্রয়, তবু অনসূয়ার মনে আপনি একটা করুণা ও সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন। আবার যদিও অনসূয়া পেশাদার দেহোপজীবিনী নয়, তবু এক রাত্রেই এ করুণা আর সংশয়ই বা আসে কোত্থেকে, বুঝতে পারি না। এক হয় পরিচয়, ভাল লাগা, মুগ্ধতা এরকম কিছু ঘটলেও হতে পারে, যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, ক্রয় বিক্রয়ের প্রশ্ন তো এক্ষেত্রে একেবারেই ঘৃণার্হ। অন্যথায় বহু পুরুষ-অভিজ্ঞা দেহোপজীবিনীর পক্ষেই সম্ভব। আপনার গল্পে

এর কিছুই নেই।

তারপর যা ঘটবার, তাই ঘটল। নানান প্রতিবাদ প্রতিরোধ সত্ত্বেও অনসূয়া নিজেকে বাঁচাতে পারল না। সে তার দেহের মূল্যে, আপনার ভাষায়, 'তার প্রিয়তমের আয়ু কিনে নিয়ে এল আঁচল ভরে।' আপনার একেবারে শেষ লাইন কয়টি এই, 'আলোবাতাসহীন অন্ধকার ঘরে এসে অনসূয়া দাঁড়াল। দেখল অতনু ঘুমিয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে অতনুর পায়ে মাথা নুইয়ে দিল, চোখের জলে ভিজিয়ে দিল, চুম্বন করল পায়ে,' মনে মনে বলল, "এই পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করো না, শুধু তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ।"

'অতনু তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।'

এ নিদ্রা যে অনেকটা আফিম খাওয়ার নিদ্রার মতো। আপনার গল্প পড়ে মনে হয়, গোটা বাংলার পুরুষ জাতিই বর্তমানে এমনি নিদ্রায় মগ্ন। পড়তেও বেশ লাগে। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলি, সাহিত্যে জীবন যন্ত্রণা, জটিলতা ইত্যাদি থাকবেই, তবু মানুষের জয় সে চিরকালই ঘোষণা করবে। সেই জন্যেই আসলে যন্ত্রণা জটিলতা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যে কোনো ধরনের মনোবিশ্লেষণ আর তত্ত্ব ঘেঁটে, তাকে অন্ধকারের পরাজয়ে টেনে নিয়ে যান, মেঘ চাপা সূর্যের মতো সে তার অমরত্ব ঘোষণা করবেই। তাই নিচে সীতানাথ শিবানী পরিবারের সমস্ত জানা ঘটনাই আবার একবার সংক্ষেপে আপনাকে জানাই।

প্রথম কথা, আপনি যে পরিমাণ ব্যক্তিত্বহীন করে অতনুকে তৈরি করেছেন, সীতানাথ মোটেই তা নয়। সে ছিল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল কর্মঠ। একটু গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু সহৃদয়। ওর দায়িত্ববোধ ও ভালবাসা স্বভাবতই আমাদের ওপরে ওর স্থান করে দিয়েছিল। সমবয়সী বলে আমি ছিলাম ওর সব থেকে ঘনিষ্ঠ। ছ' বছর আগে সীতানাথের বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা শুরু করে, শিবানীকে পছন্দ করা, (শিবানীও দরিদ্র ঘরের মেয়ে!) বিয়ে, সংসার যাপন, সব কিছুর মধ্যেই মোটামুটি জড়িয়ে আছি। সেই হিসেবে শিবানীকে আপনি আমার বোন, তার থেকে বেশি, বন্ধুও ভাবতে পারেন। সত্যি বলতে কি, আমি সেই চিরকালের পুরুষের মতোই ভাবি, যদি কখনো বিবাহ করি, যেন শিবানীর মতো মেয়ে পাই। এ কথাটা সীতানাথকে এবং শিবানীকেও বলতে পেরেছি বলেই, আপনার কাছেও বলতে সঙ্কোচ করলাম না। এর দ্বারা আপনি যা খুশি তাই ভাবতে পারেন। আমাকে বুঝতে অসুবিধে হবে না আশা করি। আপনাকে চিঠি লেখার প্রয়োজন সেই জন্যেই আরো বেশি হয়ে পড়লো।

আপনার বর্ণনানুযায়ী রূপসী না হলেও শিবানী মোটামুটি বেশ সুন্দরী। গরীবের ঘরে একটু চোখ টাটানোর মতোই। কিন্তু রূপের থেকেও, সংসারের প্রতি কর্তব্য সহৃদয়তাই তার বেশি। শিবানীকে আমরা কখনো খুব গম্ভীর হতাশ ভেঙে পড়া দেখিনি। বরং ওর একটা স্বভাব হাসি ও সাহস ছিল, যেটা মানুষকে দমায় না।

অর্থাভাব এমন একটা কুৎসিত অভিশাপ, মানুষ অনেক সময় ভুল করে ফেলে। সীতানাথ তাই করতে লাগলো। নিজের ক্ষমতার অত্যধিক বিশ্বাসের বশে, ও ফুরনে কাজ করতে লাগলো বিয়ের পর থেকেই। জানেন তো, মাস মাইনের চাকরিতে তবু নিজের ক্ষমতার সঙ্গে তাল রেখে খাটা যায়। ফুরনে যতো বেশি কাজ করে দেওয়া যায়, ততোই লাভ। সীতানাথ সেই পথই ধরেছিল। স্বভাবতই মাসে আশী টাকার বদলে একশো ষাট টাকা রোজগার করার দিকেই ওর ঝোঁক গেল। আর এ এমন একটা কাজ, চোখ ও মন সজাগ রাখতেই হয়, অথচ যান্ত্রিক কাজ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে হয়। কাজের পরিবেশ মোটেই স্বাস্থ্যকর হয় না। এমন কখনো

দেখবেন না, যথেষ্ট আলো-বাতাসওয়ালা ঘরে কম্পোজিটর কাজ করছে।

সীতানাথকে যে এভাবে কাজ করতে হচ্ছিল, তার কারণ লোভ নয়। প্রযোজন। প্রযোজন মেটাতেই তাকে এ পন্থা নিতে হয়েছিল। আমরা অনেক বারণ করেছি। শিবানী বাগাবাগিও করেছে। কিন্তু সীতানাথ, আমবা এবং শিবানী, সবাই বুঝতাম, কোনো উপায়ও নেই। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসহায়তার বেগই কাজ কবছিল।

দু-বছরেব মধ্যেই সীতানাথেব স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। তিন বছর পরে স্থিব জানা গেল, এভাবে চালিযে গেলে, সীতানাথের চোখ তো যাবেই, অন্যান্য ব্যাধি থেকেও রেহাই পাবে না। এই সময থেকেই শিবানী অস্থির হয়ে ওঠে। ও আর নির্বিকার দর্শক থাকতে পারছিল না। একটা কিছু করবাব জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু সামান্য সেকেণ্ডক্লাসেব বিদ্যে নিযে কোথাযই বা কী করতে যাবে!

আমার মনে আছে, যেদিন আমাকে শিবানী বললো, 'কিন্তু তিলকদা, (শিবানী ওই নামেই আমাকে ডাকতো, ত্রৈলোক্য—তিলক।) এ-ভাবেই বা কতদিন চলবে। আমি কি মানুষ নই আমার মুখে মন্দ কথা আটকায় না। তোমাদেব বন্ধুকে চোখেব সামনে শেষ হতে দেখে, তারপবে আব জ্ঞান হলে কী হবে? তোমবা একটু দেখ, আমাকে দিযে কিছু হয কি না। কত মেয়েকে তো দেখি নানান জাযগায কাজ কবতে যায়। সেলাই বোনাই তাঁদের কারখানায এনামেল ফ্যাক্টারীতে? আমিও কি পাবি না? তোমাদের সকলেবই সংসাব স্বজন আছে। তোমরাই বা কতদিন সাহায্য কবতে পাব?'

কিন্তু কোনো পথই দেখাতে পারছিলাম না শিবানীকে। সীতানাথও ঠিক এমনি কষ্টে বলতো। শিবানীব কথা ও কমই বলতো। একদিন বললো, 'আমি আব শিবানীর দিকে চোখ তুলে তাকাই না। তিলক, আমাব সংসাবে শিবানীকে দেখলে এখন আমাব ভয করে, দুশ্চিন্তা হয। আমি ভেতবে ভেতরে ভেঙে পড়ছি। শিবানী যদি একটা কিছু অন্যায করে ফেলে, ওকে আব কিছুই বলতে পাবব না।'

মনে মনে যে আমিও শিউরে উঠি নি, তা নয়। তবু ধমকে উঠেছিলাম সীতানাথকে। সীতানাথ তখন ফুবনেব কাজ ছেড়েছে কিন্তু ওব পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এবং তার সঙ্গে কিছুটা চিকিৎসাও। যাতে ও অল্পেই সামলে উঠতে পাবে।

ঠিক এসময়েই, শিবানীকে ঘিরে একদল মেয়ের আবির্ভাব হয়। পাড়াবই মেয়ে যাবা বাইরে নানান রকমের জীবিকা নিয়ে বেঁচে আছে। তাব মধ্যে আপনাব তনিমা বউদিও যে ছিলেন না, তা নয়, ছিলেন। তনিমা বউদিব মতো একজন ধনী, ফ্যাশানেবল সোসাইটিচারিণী হঠাৎ সীতানাথ কম্পোজিটরের বাড়ি আসেনই বা কেমন করে? তাঁব আড়কাটিরা বরং পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাফেরা করে। এত সহজে ধরা দিলে তাঁদের মুখোশ খুলে পড়ে যে!

আমরা কম্পোজিটর হই আব যাই হই, আমাদেব মনটা মধ্যবিত্তেব মানসিকতাতে পূর্ণ। কোনো কাজ করতে যাওযাব মধ্যে শিবানীব নিজেবও দ্বিধা ছিল। সীতানাথের আপত্তিই ছিল। তবু শিবানী যেতে চাইল, আব এই নিয়ে ওদেব দুজনেব মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পরিমাণ বাড়তে লাগলো। সন্দেহ অবিশ্বাস আব তিক্ততাব সৃষ্টি হতে লাগলো। এবং সত্যি বলতে কি আমিও সীতানাথের দলেই যোগ দিলাম। আমিও ওব মতোই ভাবতে লাগলাম।

আমি সীতানাথের বাড়ি গেলাম, কিন্তু শিবানীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম। এ অবস্থায় আমার মুখেব ওপবেই শিবানী একদিন বলে দিল, 'পুরুষেরা সত্যি বড় ছোট।'

আমিও জবাব দিয়ে ফেললাম, 'মেয়েদের স্বেচ্ছাচার তারা পছন্দ করে না, তাই।'

শিবানী এমনভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে হাসলো যে, আমার দৃষ্টি নত হয়ে গেল। শুধু উচ্চারণ করলো, 'পুরুষ নও তোমরা, বীরপুরুষ।'

তারপরে এক সময়ে সত্যি সত্যি শিবানী কাজের খোঁজে বাইরে ঘুরতে আরম্ভ করে দিল। এদিকে তখন সীতানাথ প্রায় শয্যাশায়ী।

কিন্তু শিবানীর বাইরে ঘোরাই সার হয়েছিল, কাজ কিছু জুটছিল না। শিবানীর চেহারাতেও ভাঙন দেখা দিল। অথচ মুখ টিপে রইলো, একটি কথাও বললো না। তবে আশ্চর্য, যে সব মেয়েরা ওর কাছে আসতো, তাদের সংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগলো। এটা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।

কিছুদিন পরে শিবানী বাড়ি থেকে বেরুনো একেবারেই বন্ধ করে দিল, কিন্তু লক্ষণীয় হয়ে উঠলো, খুব কষ্টের মধ্যেও সংসার তার নিজের গতিতেই চলেছে। সীতানাথ আর কাজে বেরুতে পারে না। সে শয্যাশায়ী। ডাক্তার ওষুধ আমরা চালাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওর ভাইবোনেরা খেয়ে স্কুলে যায়। সংসারও প্রতিদিন মোটামুটি চলে যাচ্ছে। যতদূর জানি সীতানাথের গচ্ছিতে টাকা কিছু ছিল না। শিবানী কি ধার করছে? কিন্তু কে ধার দেবে?

সীতানাথও কিছু বলতে পারে না। ওর কাছ থেকে খালি জানা গেল, শিবানী বিশেষ কোথাও যায় না। হঠাৎ কোনো কোনো দিন এক আধ ঘণ্টার জন্যে বেরোয়। সারাদিন বাড়িতেই থাকে। সারাদিন মায়ের ঘরে কাটায়। দরকার হলে সীতানাথকে দেখে যায়। কিন্তু একটি মেয়ে রোজ সকালে একবার আসে, রাত্রে একবার আসে। সেই মেয়েটিও বিবাহিতা, এবং এ পাড়ারই। আরো আশ্চর্য, সীতানাথের মায়ের সঙ্গে সেই মেয়েটির কথা হয়, বউমার সঙ্গেও তাঁর বিশেষ ভাব।

আমার সঙ্গে শিবানী নিজেই আর তেমন করে কথা বলে না। বড় জোর একটু চা দেয়, বলেও না, 'চা খাও।' তাকিয়ে দেখেছি চেহারার শত ভাঙনের মধ্যেও, ওকে যেন দীপ্তিহীন করতে পারে নি। বরং ছোট একখানি গুপ্তির মতোই ওর ধার বাড়ছিল।

সীতানাথ একদিন বললো, 'ও একটা কি করছে, বুঝতে পারছি না!'

আমি বললাম, 'জিজ্ঞেস কর না কেন?'

সীতানাথ প্রায় চুপিচুপি বললো, 'তিলক, ভয় পাই জিজ্ঞেস করতে।'

সত্যি, অবিশ্বাস কী মারাত্মক ব্যাপার। সীতানাথ তার মাকেও কিছু তেমন জিজ্ঞেস করতে পারতো না। ভয়ঙ্কর একটা কিছু শোনবার ভয়ে, ও স্তব্ধ নির্বাক, আর সুস্থ হয়ে ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

এ-অবস্থার মধ্যেই, একটা ছুটির দিনের দুপুরে আমি সীতানাথের বাড়িতে গেলাম। দেখলাম, বাইরের দরজাটা ভেজানো। উঠোন পেরিয়ে সীতানাথের ঘরের দিকে গেলাম। ওর দরজাটা ভেজানো। হয়তো সীতানাথ ঘুমোচ্ছে। তাই আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে আমি থমকে দাঁড়ালাম। বিস্ময়ে এবং কিছুটা সঙ্কোচেও স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সরে আসব কি না ভাবতে ভাবতেই দেখলাম, সীতানাথের বিছানায় শিবানী বসে রয়েছে। ওর কোলের ওপর সীতানাথ উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে যেন ফুলে ফুলে কাঁদছে। শিবানীও কাঁদছে, তবু সীতানাথের মাথায় হাত বোলাচ্ছে, এবং ফিসফিস করে বলছে, 'ওঠ, ওঠ না।'

আমি হয় তো সরেই যেতাম। শিবানীই বলে উঠল, 'যেও না।'

সীতানাথকে বললো, 'তিলকদা এসেছে, উঠে বস।'

বলে ও একটু কাপড় গুছিয়ে নিল। সীতানাথ তাড়াতাড়ি উঠে চোখ মুছে বললো, 'আয় তিলক, এখানে আয়।'

একটু অবাক হয়ে ঘরে ঢুকে দেখলাম, এক রাশ গ্যালিপ্রুফ, সংশোধিত অবস্থায় তক্তপোশের নিচে মেঝেয় পড়ে আছে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ওদের দুজনার দিকেই অবাক হয়ে তাকালাম।

সীতানাথ বললো, 'প্রুফের পাঁজাটা তোল্ তিলক।'

গ্যালিগুলো হাতে তুলে নিলাম। সীতানাথ বললো, 'তুই তো কম্পোজিটর, দেখতো প্রুফ রীডিং কেমন হয়েছে?

প্রুফের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, 'ভালই। কেন কী ব্যাপার?'

সীতানাথ শিবানীর একটা হাত ধরে বললো, 'আজ দু'মাস ধরে শিবানী এই কাজ করে যাচ্ছে। এখন ও রোজ চার টাকা করে আয় করে।'

শিবানী ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে সীতানাথের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে। তিন টাকার বেশি এখনো পাবি না।'

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে এবং শিবানীর সেই মুখখানি দেখে, মনে হল, আমিও চোখের জল রোধ করতে পারব না। আমি শিবানীর মুখের দিকেই হতবাক মূঢ় হাসি নিয়ে তাকিয়েছিলাম। ও প্রুফ দেখার কাজ শিখলো কবে? আরম্ভই বা করলো কবে থেকে? শিবানী চকিতে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঘণ্টাখানেক একটু বন্ধুর সেবা কর, কাজ সেরে আসছি।'

বলেই ও চলে গেল। তারপরে সীতানাথকেই বলতে শুনলাম, 'ও কিরে তিলক, চোখ মোছ, বোস।'

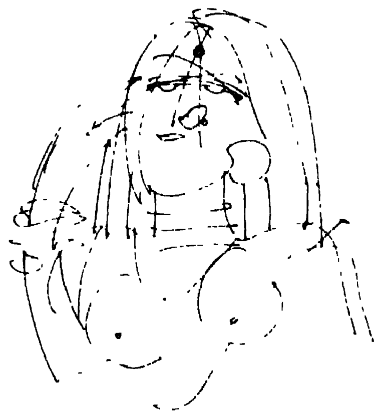
এর বেশি আমি আপনাকে লিখতে চাই না। এখন শিবানী প্রতিদিন চার টাকাই রোজগার করে। আমাদের প্রেস থেকেও আমরা ওকে কাজ এনে দিই। আর ও খুব সুন্দর প্রুফ দেখতে পারে। প্রেসের কর্তৃপক্ষ ওর ওপর খুব খুশি। সীতানাথ মোটামুটি আরোগ্যের পথে।

আপনার অবগতির জন্যে জানাই, আপনার গল্পের তনিমা বউদিদের জগতের চৌকাঠ অবধিও শিবানী গিয়েছিল, উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। একেবারে শেষ খবরটা আপনাকে জানাই। আপনার বহু প্রশংসিত গল্পটির প্রুফও শিবানীই দেখেছে।

ইতি,

নমস্কারান্তে—





সোনাটরবাবু

আড়ে-আড়ে চেয়ে-চেয়ে শিবির টেপা ঠোঁটের হাসিটা যেন গজলের প্রথম বিস্তারের মত ব্যাপারটাকে লহরার দিকে টেনে নিয়ে গেল। আর বিষ্টুপদ না-হাসি না-রাগ গোছের মুখে অপ্রতিভ তবলচির ডুগিতে একটা শব্দ করে থেমে যাওয়ার মত জিজ্ঞেস করল, 'মাইরি?'

শুনে শিবি সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তার মিঠে গলায় খিলখিল ক'রে হেসে উঠল যেন তালফেরতা পেরিয়ে তবলায় বাজল দ্রুত বেলার বোল।

বলল, 'মাইরি আবার কি। মিছে বলছি বুঝিন?'

মনে হল বিষ্টুপদর মুখে একটা ঘুষি মেরেছে কেউ। সে প্রায় খ্যাঁক ক'রে উঠল, 'তাহ'লে সাত নম্বর?'

শিবি অমনি ঘোমটা একটু সরিয়ে ছোট মেয়ের মত মুখখানি বেজার ক'রে বলল, আমার দোষ নাকি? এই নিয়ে তো আট হ'ত, একটা চলে গেল, তাই ।'

বিষ্টুপদ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। সে অবাক হ'য়ে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শিবির দিকে।

তার বউ শিবি। লম্বা চওড়ায় দোহারা শরীর, মাজা মাজা রং, সাধারণ দুটো চোখ। বয়স প্রায় তিরিশ। বিচার করলে রূপ তার কিছুই হয়তো নেই। কিন্তু তার এ সাদাসিধে চেহারাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অপরূপের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যে, পিছন ফিরলে আবার ফিরে দেখতে হয়। তার বয়স হয়েছে, বয়সের দাগটা পড়ে নি। যেন পাতি হাঁসটার হাজারবার জলে ডোবানো, তবু ঝরঝরে শরীরটার মত। মুখটা কাঁচাটে অর্থাৎ রূপের যদি কোন কাঁচামিঠে স্বাদ থাকে, তবে তাই। ওই মুখে তার নিয়ত হাসির কারণ বোঝা দায়।

বিষ্টুপদর সাতসকালে এ বিস্ময় ও ক্ষুব্ধতা এখানে নয়, অন্যত্র। সে ভাবছে, এই মেয়ে ন' বছর বয়সে তার ঘরে এসেছে, তেরো বছর বয়স থেকে যথানিয়মে সন্তান প্রসব ক'রে চলেছে। শরীর একটু টসা দূরে থাক, বিষ্টুপদ যখন জ্বালা যন্ত্রণায় রোজই বলছে, 'এবার শালা কেটেই পড়ব, ঠিক তখনই শিবি সোহাগ করে, হেসে খাপ্‌চি কেটে-কেটে বললে কিনা, 'মিটুর দোকান থেকে এট্টুস নক্কার আচার এনে দেবে?' এই সামান্য কথাটাই একটা মস্ত সর্বনাশের মহাইঙ্গিতপূর্ণ বিষ্টুপদর কাছে। এই কথাটা যতবার সে শুনেছে শিবির মুখ থেকে, ততবারই তার পিতৃত্বের খঞ্জনি বেজে উঠেছে আঁতুড়ঘরে। যেন মৃত্যু ঘোষণা করেছে বিষ্টুপদর। তাই সে খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়েই জিজ্ঞেস করেছে, 'মাইরি?' যেন তাহলে সে শুনতে পাবে, 'না।'

কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মত শিবি হেসে উঠেছে খিলখিল ক'রে। উপরন্তু মুখ বেজার ক'রে বলেছে, এই নিয়ে তার আট হ'ত। বোঝ, যেন গাছের ফল।

এক মুহূর্ত সে শিবির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল যেন শিবি তার কোন নিষ্ঠুর আততায়ী। পরমুহূর্তেই মোটা ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'নক্কার আচার না, এবার আমার মুণ্ডুটা এনে দেব। রইল শালার সমসার আর ঘর আর রোজগার।'

বলেই ঘটঘট ক'রে বেরিয়ে যেতে-যেতে তার সেই স্বভাবসিদ্ধ ইংরেজী কথা ক'টি শোনা গেল, 'অল শালা ব্লাডি বোগাস।'

কাদের দুড়দাড় ক'রে ছুটে পালাবার শব্দ শোনা গেল। আর কেউ নয়, বিষ্টুপদর ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়ের দল পালাচ্ছে বাপের খ্যাঁকানি শুনে, আর ছ'টি সন্তানের মা শিবি প্রায় একটি বালিকার মত অভিমানক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর বালিকার মতই ঠোঁট কেঁপে চোখ ফেটে তার জল এল। কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। শিবির ধন নেই কিন্তু পুত্র দিয়ে লক্ষ্মী লাভের সৌভাগ্য যে সংসারে এত বিড়ম্বনা, তা কে জানত।

বিষ্টুপদ চলেছে হনহন ক'রে। চলা না ব'লে তাকে ছোটা বলাই ভাল। লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের উপর, গায়ের রং ক্ষয়-পাওয়া রোদে পোড়া ন্যাড়া গাছের মত। তেমনি শুকনো শক্ত হাড়কাঠি সার শরীর। খোঁচা-খোঁচা গোঁ-মারা চুলগুলিকে তেল জলের সার দিয়ে যেন পেড়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চুল ভাঙে তো মচকায় না। মোটা ঠোঁট আর যাকে বলে অশ্বনাসিকা। গুলিভাটা গোল চোখ। আর খাকী ফুলশার্টের ... ... বোতামটি পর্যন্ত আটকানো। দশ হাত কাপড় হাঁটুর বেশি নামে নি। তার তলা ... ... বেরিয়েছে আগুনে সেঁকা বাঁশের মত শিরাবহুল সরু পা। পায়ে পরেছে পুরানো ফাটা ... ... সাইজের স্যাণ্ডেল।

এই হল বিষ্টুপদর চেহারা। বংশমর্যাদায় কুলীন কায়েত। কোন অজানা যুগে নাকি বাপ ঠাকুরদা প্রজা শাসনও করত। আর সে এখন কাজ করে মিউনিসিপ্যালিটিতে। ডেজিগনেশন লেখা আছে, কন্‌সার্ভেন্সি সুপারভাইজার ১ নং ওয়ার্ড। বিষ্টুপদ নিজে বলে, এ এস আই অর্থাৎ অ্যাসিস্টান্ট স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ডোম মেথর ধাঙড়ধাঙড়িরা বলে, ছোট সোনাটরবাবু। মানে স্যানিটারিবাবু। পাড়ার ছোঁড়ারা আড়ালে বলে, শালা ধাওড়ার ভূত, ধাঙড়সর্দার।

সত্যি, চলেছে যেন তেঙে-ঢিঙে লম্বা একটা একরোখা ভূতের মত। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, কোনদিকে হেলে না। মোটা ঠোঁট কুঁচকে রয়েছে অসহ্য তিক্ততায় ও যেন কিসের প্রতিজ্ঞায় ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা আর কেঁচকান চোখ জোড়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ অপলক চাউনিটা হ'য়ে উঠেছে শিকারসন্ধানী হন্যে শ্বাপদের মত।

ফাল্গুন মাস, আকাশ নির্মেঘ। হাওয়া পাগল। সকালবেলাটা যেন গোলাপী নেশার আমেজে দুলছে। রোদে তাত নেই। পাতা নেই গাছে গাছে। ধুলো উড়ছে, শুকনো পাতা উড়ছে, উড়ছে কাগজের টুকরো আর শুকনো নারিকেলের ডাঁই।

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকতে না ঢুকতেই ফ্যালা ডোম হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে তাকে অভ্যর্থনা করল, 'এই যে সোনাটরবাবু, এসে পড়েছ?'

বিষ্টুপদ থমকে দাঁড়াল। তার চোখ মুখ আরও বিকৃত হয়ে উঠল রাগে। ক্ষেপে উঠে ভেঙচি কেটে বলল, তা' পথের মাঝে কেন, অফিস থেকে ঘুরে এলে হ'ত না। কানা ডোম কোথাকার!

ব'লে সে যেন বাতাসে ধাক্কা মেরে চ'লে গেল অফিসে। ফ্যালা আবার হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে আপন মনে বলল, 'যাও অর্ডারটা নিয়ে এস।'

সত্যি, ফ্যালা একে ডোম, তায় কানা। চেহারাটা এমনিতে মন্দ ছিল না। কালো মাংসালো মাঝারি শরীব, ঘাড়ের কাছে বেয়েপড়া ঝাঁকড়া চুল, গলাব কালো সুতোয বাঁধা মাদুলি। কিন্তু এক-চোখো। একটা চোখ তার ভাল, এমন কি টানা সুন্দরও বলা যায। আব একটা চোখে মণি নেই। সাদা ক্ষেত্রটা সাদানীলে মেশানো ঘসা কাচেব আবরণ ব'লে মনে হয। হাসলে কিংবা রাগলে তাব ভাল চোখটা বুজে যায, আব কানা চোখটা বড় হয়ে ঠেলে ড্যালা পাকিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে গজ-দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে ভয়ঙ্কব হযে ওঠে তার মুখটা!

ফ্যালা বিষ্টুপদর সাবাদিনেব কাজেব সঙ্গী হলেও সকালবেলা ওই এক-চোখো ডোমের মুখ দেখতে সে রাজী নয়। কিন্তু কপাল গুণে দোষ। বোধ কবি ফ্যালার মুখটা দেখাব দোষেই অফিসে ঢুকতে না ঢুকতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টব ছেঁড়া শোলার টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তাকে এক বিদঘুটে নতুন হুকুম শুনিযে দিল। নতুন নয়, এব আগে অবশ্য আরও দু' একবার তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। তাকে কুকুর মারতে যেতে হবে। কিন্তু লাঠি দিয়ে কুকুর মারা সাম্প্রতিক আইনে নিষিদ্ধ। তা'ছাড়া খাবারে বিষ দিযে মারলে হয়রানিও কম। ইন্সপেক্টব স্টির্কনিযা বিষের শিশিটা আব ক'টা টাকা বাড়িযে দিয়ে বলল, 'বেরিয়ে পড বাবা বিষ্টুচাঁদ। তোমাদের এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাঁড়ি-কাঁড়ি দরখাস্ত এসেছে। গাদা-গাদা গাড়ুতি কুকুরে নাকি এলাকা ছেয়ে গেছে। তার উপরে একটা নাকি পাগলা খেপী, দু'জনকে কামড়েছে। টাকা দিযে মেঠাই মণ্ডা যা কিনবে, ভাল দেখে কিনো আব কুলো্য এক কুড়ি না হোক, ডজন খানেক সাবড়ে এস, বুঝলে?'

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হযে রইল বিষ্টুপদ। এখন তার দাঁত চাপা মুখটা ভযাবহ হযে উঠেছে। তার চোখের সামনে ভাসছিল ফ্যালা ডোমের মুখটা। পরমুহূর্তেই সে মুখটা চাপা দিযে দেখা দিল শিবির টেপা হাসির সোহাগী মুখ। আসলে ঐ অশুভক্ষণটি থেকেই আজকের এই অভিশপ্ত দিনটার শুরু।

ভেবেই গোঁ-ধরা ভূতের মত কাঁকড়ার দাঁড়ার মত শক্ত হাতে বিষের শিশিটা তুলে নিল। মনে মনে বলল, 'সেই ভাল, আজকের থেকে সকলের মুখে আমার বিষ দেওযার পালাই শুরু হোক।'

তারপর কি মনে ক'রে খ্যাপা শিম্পাঞ্জীর মত দাঁতগুলি বের ক'রে খ্যাক ক'রে উঠল, 'তা এবার আমার ওই ডেকিজনেশন না ডেক্‌চিনেশনে সোনার ভাইজারটা কেটে ডোম করেই দেওয়া হোক।'

স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হি-হি করে হেসে বলল, 'আরে ছ্যা, ডোম তো তোমার শাগরেদী করবে। তোমার পোস্টটা তা'হলে বিষ্টুচাঁদ ডগ্‌কিলার করতে হয।'

'ডগ্‌কিলার?'

'হ্যাঁ, ডগ্‌ মানে কুকুর, আর কিলার মানে খুনী।' ব'লে ময়লা হাফপ্যান্টের পকেটে হাত দিযে আবার হি-হি করে হেসে উঠল ইন্সপেক্টর।

নাকের পাটা ফুলিয়ে, চোখ ঘোঁচ ক'রে বিষ্টু বলল চাপা গলায়, 'তার চে' মানুষ খুনী পোস্টই ভাল।'

জবাব দিতে গিয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের জিভে কামড় পড়ে চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল।

বিষ্টুপদ ততক্ষণে টাকা ক'টা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে একেবারে রাস্তায় গিযে পড়েছে। পিছনে তার ফ্যালা ডোম।

খানিকটা গিয়ে ঘাড়ের থেকে লোহা-বাঁধানো লাঠিটা নামিয়ে বলল ফ্যালা, 'আচ্ছা সোনাটরবাবু, আগে তো শালা ডাণ্ডা হেঁকেই কাজ হ'ত আজকাল এ নিয়ম কেন?'

'আইন নেই।'

কেশো গলায় খ্যালখ্যাল ক'রে হেসে বলল ফ্যালা, 'শালা এ্যাইনটা বড় মজার। মারো, তবে পিটে লয়, বিষ দিয়ে। ·· অল শালা বেলাডি বোগাস্।'

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে চোখের কোণ দিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হেসে বিষ্টু বলল, 'খচাসনি ফ্যালা, টুঁটি চেপে এই বিষ ঢেলে দেব গলায়।'

ফ্যালার কানা চোখের সাদা ড্যালাটা বেরিয়ে এসে তার চাপা হাসির মত কাঁপতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে তারা দুজনে যখন আধা শহর, আধা গ্রামাঞ্চলটার সীমানার নিবালা মাঠের ধারে, বাজ পড়া মাথা মুড়নো তালগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল, তখন মনে হল যেন যমালয়ের দুটো গুপ্তচর নেমে এসেছে মারণ-যন্ত্র নিয়ে।

ইতিমধ্যে ফাল্গুনের রোদে একটু-একটু তাত ফুটতে আরম্ভ করেছে। হাওয়াটা উদাস বৈরাগীর দীর্ঘশ্বাসের মত একটা চাপা হাহাকার তুলে যাচ্ছে মাঠের মাঝে। ফ্যালা ট্যাঁক থেকে একটা কলা পাতার পুরিয়া বের ক'রে ভেতর থেকে কালো মত একটা ছোট ড্যালা বাড়িয়ে দিল বিষ্টুর দিকে। জিনিসটা বাটা সিদ্ধি। বলল, 'ইচ্ছাপূরণের গুলিটা খেয়ে লাও সোনাটরবাবু। যেটাকে ধরবে আর প্রাণ নিয়ে সেটাকে ফিরতে হবে না।'

বস্তুটির দিকে এমনভাবে তাকাল বিষ্টু যেন এতেও তার মেজাজ খচে যাচ্ছে। দাঁত চেপে বলল, 'শালা মাতাল. কোথাকার।' বলেই ছোঁ মেরে সিদ্ধিটুকু মুখে দিয়ে কোঁত করে গিলে ফেলল।

ফ্যালাও একটা গুলি মুখে পুরে, ভাল চোখটাবুজিয়ে কানা চোখটা দিয়ে বিষ্টুর হাতের হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে বোগড়া দাঁত বের করে ফেলল। সুড়ুত ক'রে মুখের নালটা গিলে নিয়ে বলল, 'ওই বস্তু একখান বার কর সোনাটরবাবু। লইলে ইচ্ছা শালা আধখ্যাচড়া থাকবে।'

'মাইরি ?' বলেই জ্বলন্ত চোখ দুটো ফিরিয়ে বিষ্টু সোজা হাঁটতে আরম্ভ করল। অনুপায় বুঝে পিছন ধরল ফ্যালা।

খানিকটা গিয়েই বিষ্টুই হাত চেপে ধরল ফ্যালা। দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। আঙুল বাড়িয়ে হাত কুড়ি দূরে একটা কুকুর দেখাল। একেই বলে ডোমের চোখ। তাও কানা। যেন দুটো গুপ্তঘাতক শিকার পেয়েছে।

বিষ্টু দেখল. কুকুরটাও.থমকে দাঁড়িয়েছে। সাদা কালো মেশানো বেশ বড়-সড় কিন্তু হাড় বের করা ক্ষীণজীবী জানোয়ারটার হলদে চোখের ভাবটা, এ লোক দুটোকে দেখে খ্যাঁক ক'রে উঠবে কি। বিষ্টুর নজরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'মনে হচ্ছে দোআঁশলা মদ্দা। এক নম্বর ওয়ার্ডের মাল তো ?'

ঠোঁট উল্টে বলল ফ্যালা, 'না-ই বা হল। এলাকাটা তো তোমার ?'

'যা বলেছিস। তুই ব্যাটা ডান্ডা নিয়ে একটু তফাত যা।' ব'লে সে হাঁড়ির শালপাতার ঢাকনা খুলে বের করল একটা রসগোল্লা। ছুরি দিয়ে রসগোল্লাটা একটু ফুটো ক'রে তার মধ্যে পুরে দিল এক টিপ বিষ। তারপর ফুটোটা বন্ধ ক'রে সে ফিরে তাকাল কুকুরটার দিকে। এবার তার গুলিভাটা চোখে খুনীর হিংস্রতা। যেন সে কাউকে পিছন থেকে ছুরি মারতে উদ্যত হয়েছে।

কুকুরটা চাপা গলায় গর্জাচ্ছে। অর্থাৎ এদের মতলবটা কি। কিন্তু সেই সঙ্গেই ল্যাজ নেড়ে. জিভ দিয়ে গাল চেটে লুব্ধ চোখে দেখছে রসগোল্লাটা।

বিষ্টু জিভ দিয়ে তু তু করতেই কুকুরটা কয়েক পা পিছিয়ে ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠল। কিন্তু পালাল না। বিষ্টু এবার কয়েক পা এগিয়ে গেল। কুকুরটাও পিছুল। কিন্তু লোভ আর সন্দেহের

দো-টানায় পড়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক করছে।

বিষ্টু হঠাৎ দাঁড়িয়ে, একটি পরিষ্কার জায়গায় রসগোল্লাটি রেখে সটান পেছন ফিরে একেবারে সেই ন্যাড়া তালগাছটার তলায় ফ্যালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কুকুরটা কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল। তারপর আড়চোখে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল রসগোল্লাটার কাছে।

উত্তেজনায় বিষ্টুর দাঁতগুলি চেপে বসেছে ঠোঁটের উপর। চাপা গলায় বলল, 'খা খা শালা।' ফ্যালার সাদা চোখটা বড় হ'য়ে হাঁ করা মুখের কস দিয়ে লাল গড়িয়ে এল খানিকটা আর নিশপিশ ক'রে উঠল লাঠিধরা হাতটা।

কুকুরটা আর একবার তাদের দিকে দেখেই কপ ক'রে রসগোল্লাটা মুখে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা ছুটে গেল। কিন্তু লোক দুটোকে না আসতে দেখে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে খেল। খেয়ে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

'খেয়েছে শালা, খেয়েছে।' সাফল্যের উল্লাসে বিষ্টুর বেজীর মত চোখ দুটো যেন আরও জ্বলে উঠল। বলল, 'চ দেখি টেঁস ক'রে ম'ল কিনা।'

ফ্যালারও গজ দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়েছে খ্যাপা কুকুরের মত। বলল, 'মরবে না আবার। তবে এট্টা রসগোল্লা খেয়ে ম'ল মাইরি।'

বলে সে লালার দরানি জিভ দিয়ে চেটে নিল। তারপর দুজনেই মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

কুকুরটা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছিল একটা আসশেওড়া ঝোপের তলায়, লোক দেখেই ছুটে পালাল। কিন্তু বেশী দূরে যেতে পারল না। খানিকটা গিয়েই টলতে লাগল আফিমখেগো আড-মাতলার মত।

তীরবিদ্ধ শিকারের পিছনে-পিছনে ক্ষিপ্ত ব্যাধের মত ফ্যালা আর বিষ্টু ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল পাড়ায়।

কুকুরটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঝিম ধরা মাতালের মত।

চোখ দুটো আধবোজা রক্তবর্ণ। ঘং-ঘং ক'রে কাশছে, কেঁপে-কেঁপে উঠছে বুকের পাজরা। ঠিক যেন মুমূর্ষু বুড়ো। উগরে ফেলতে চাইছে পেটের বিষ।

বিষ্টু এক নজরে মুখ বিকৃত ক'রে এ মরণলীলা দেখছিল, ফ্যালা হঠাৎ খ্যালখ্যাল ক'রে হেসে হেঁড়ে গলায় চিৎকার ক'রে গান ধরে দিলঃ—

'ও তোর ভবের খেলা সাঙ্গ হল
যম দাদাকে যেয়ে বলো,
খেয়েছি মন্ডা মেঠাই,
সোনাটরবাবুর হাতে।'

আবার হাসতে গিয়ে থেমে বলল, 'সোনাটরবাবু, ঠাউরের নাম লেও।'

'কেন?'

'এট্টা পাণী হত্যে ক'রলে, পাপ লাবাতে হবে না?'

পাপ? বিষ্টুর প্রাণের কোথাও চাপা পড়া আগুন যেন উসকে উঠল পাপ কথাটায়। তীব্র চাপা গলায় বলল, 'দাঁড়া! ঘর বার সব সাবড়াই প্রাণ খুলে, তারপর দেখা যাবে তোর ঠাকুরের নাম।'

বলে সে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। কুকুরটা সামনের দিকে বাড়ানো পায়ের মাঝখানে হাঁটুতে মাথা গোঁজার মত এলিয়ে পড়েছে, আর ঠেলে বেরিয়ে

আসা নিষ্পলক চোখ দুটো তাকিয়ে আছে বিষ্টুব দিকে। মরে গেছে কুকুবটা।

বিষ্টু মুখটা ফিরিয়ে এগুতে-এগুতে বলল, 'ফ্যালা বিকেলে গাড়ি কবে ভাগাড়ে নিয়ে ফেলে দিস। তাবপব হঠাৎ নাকটা কুঁচকে বলল, 'অল শালা ব্লাডি বোগাস।'

তারপর চলল সারা এলাকা জুড়ে কুকুর মারাব পালা। কখনো গঙ্গার ধাব'থেকে পুবেব রেল লাইন পর্যন্ত, কখনো লাইনেব উপব উত্তব দক্ষিণেব এক নং ওযার্ডের দুই সীমানা পর্যন্ত।

কি বকম একটা নেশায় পেয়ে বসেছে বিষ্টুপদকে। ক্ষিপ্ত হিংস্র, একবোখা ' যেন কোন খুনী হত্যালীলায় মেতেছে।

ফ্যালাব হাতেব লাঠি ঠান্ডা তো ফ্যালাও ঠান্ডা। তাব কোন উত্তেজনা নেই। সে খালি লুব্ধ কুকুবগুলির মতই জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে বিষ্টুব হাতেব হাঁড়িটা আব জিভ দিযে ঠোঁট চাটছে।

কিন্তু সোনাটরবাবুব খ্যাপামি দেখে চাইতে ভবসা পাচ্ছে না। যা হয ওই দেখে-দেখেই। আশা আছে শেষেব বেলায়। বোধ হয শেষেব বেলাব কথা ভেবেই কানা চোখটা নাচিয়ে নাচিয়ে হাতেব লাঠিতে তাল ঠুকে গুনগুন কবছে সে।

কিন্তু বিষ্টুব নজব শুধু একদিকে, কুকুব। যেমনি দেখা, অমনি বসগোল্লা. ছুবি আব বিষ। তাবপর, 'খা শালা জন্মেব মত।' বলে আব জিজ্ঞেস কবে, 'ক' নম্বব হল ফ্যাল্যা ?'

ফ্যালা 'আধ ডজন লম্বব দাঁড়াল।'

পেছনে-পেছনে ভিড় কবে পাড়াব বাচ্চা ছেলেব দল। বিষ্টু খেঁকোয, 'দোব বসগোল্লা ?' ফ্যালা তাড়া দেয বাচ্চাগুলোকে।

কেউ বলল, 'অমুক কুকুবটা মেবে দিও তো। বোজ শালা বাত ডিউটি থেকে ফেরবাব পথে কামড়াতে আসে।'

কেউ বা বলল আবাব, 'অমুক কুকুবটা মেবো না হে বিষ্টুপদ। ওটা সাবাবাত খেঁকোয, আমি তাই জেগে থাকি। যা চোব ডাকাতেব ভয বাবা।'

বিষ্টু ওসব কমই শোনে। যেটাই সামনে পড়ুক, গলায দড়ি, বেল্ট বাঁধা না থাকলেই হল। কিন্তু সেই খেপী কুকুবটা কোথায় গেল ? খেঁকি খেপীটা ?

যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ায বিষ্টু। বলে, 'ফ্যালা, ওই যে একটা শুযে আছে।'

ফ্যালা কানা চোখ বড় কবে হেসে বলে, ওটা শোযা নয, মবা।'

'মবা ? কে মাবল ?'

'কেন, তুমি, সোনাটববাবু।'

তা বটে। খেযাল নেই বিষ্টুব। প্রায সব পাড়াতেই গাদা গাদা কুকুব দেখে তাব মাথাটা গন্ডগোল হযে গেছে। জিজ্ঞেস কবে, 'ফ্যালা, এত কুকুব এল কোত্থেকে ?'

ফ্যালা বলে, 'কেন, ভাদ্দব মাস গেছে, হাবামজাদীবা বিইযেছে কাঁড়ি-কাঁড়ি।'

বিষ্টু খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে মাথা নেড়ে বলে 'হুঁ' কি খেযে বাঁচে এগুলো ?'

'কি আবাব, পচা-পাতকুড বিষ্টা।'

খ্যাক-খ্যাক শব্দ কবে বোধ হয বিষ্টু হেসেই ফেলে। বলে ঠিক মানুষেব বাচ্চাব মত, না ? বলেই বিকৃত মুখটা ফিবিযে আবাব হনহন কবে এগোয। আবাব চলতে থাকে কুকুব নিধন অভিযান। আব ফ্যালা আবাব বাড়িয়ে দেয ইচ্ছাপূবণেব গুলী। শুধু তাব ইচ্ছা পূরণ হয না।

ফাল্গুনেব হাওয়া থেকে-থেকে অনাগত চৈত্রেব ঘূর্ণিতে মেতে উঠছে। বেলা বাড়ছে চড়চড় কবে। নীল আকাশটা ধুলোয-ধুলোয ফ্যালা ডোমেব ঘষা চোখটাব মত বং ধবেছে। হঠাৎ ফ্যালা বলে, 'আচ্ছা সোনাটববাবু, মানুষও কি শালা বাড়তি হযে গেছে ?'

বিষ্টু বলে, 'নইলে এত মরে? খাবে কি। খায় তো সব পচা বিষ।'

ফ্যালা ভাল চোখটা বুজিয়ে বলে, 'তা'হলে মনুষ্যেব মাথা'ন' পরেও শালা সোনাটববাবু আছে বল! সে ব্যাটা কে?'

হঠাৎ বিষ্টুব অপ্রতিভ মুখে কোন কথা যোগায় না। তাবা দুজনেই তিনটে নেশাচ্ছন্ন চোখে পবস্পবেব দিকে এক মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে। দু'জনেই তাবা কি এক ভাবনায় যেন তলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তেব জন্য। বোধ হয়, সত্যিই ভাববাব চেষ্টা করে, মানুষের নিধবাই, সেই জীবটা কে।

পবমুহূর্তেই বউ শিবিব সকালবেলাব মুখটা মনে হতেই বিষ্টু বেগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'দ্যাখ কানা ডোম, কাজেব সময় বকিস নি। নিকুচি কবেছে [illegible] সোনাটবেব! শালা মরুক সব। [illegible] যাক, সেই ভাল। এবাব হিসেব দে [illegible]।'

ফ্যালা ভাবে, কুকুব মাবাব মত মানুষেব [illegible], তা কুল্যে আটটা হল।'

'মস্তুব।'

আবাব শুরু। আবাব সন্ধান। বিষেব শিশি যেমন তেমনিই [illegible]? সেই খেপীটা কোথায়, যেটা কামড়ায়? ঘোর দুপুব নিঝুম! ফাঁকা পথ, [illegible] নেই। ঘরে-ঘরে দবজা জানালা সব বন্ধ। এখানে ওখানে মবা কুকুব। চাবিদিকে [illegible]। হয়তো আকাশে উড়ে চলেছে শকুনকে সংবাদ দিতে। আব [illegible] করে উড়ে চলেছে বিষ্টুব সঙ্গে [illegible] গায়ে গায়ে।

আব এ বসন্ত দুপুরে, বিষ্টু ও ফ্যালাকে মনে হয়, সত্যিই বুঝি দুটো হন্যে হওয়া যমেবর অনুচব।

হঠাৎ দূব থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই ফ্যালা, শীগগিব যাও, এখেনে আছে সেই খেপীটা।' দুজনেই তাবা সেদিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটা দূব থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েই পালাল।

দেখা গেল [illegible] নর্দমাতে মুখ নিচু করে কি যেন খাচ্ছে একটা কুকুব। [illegible] এক মাদী কুকুব। সমস্ত শরীরের [illegible] নিচের দিকে [illegible]। [illegible] বঙেব চোখা মুখ।

[illegible]

ফ্যালা বলল, 'ওই জন্যই বোধ হয় খেপি হয়েছে [illegible] হয়?'

'হুঁ। এটাকে মাবলে একটা বিউনী কমবে। তবে শালা আমি [illegible]' বলে সে দুটো বসগোল্লা বেব করে কেটে বিষ পুবে দিল।

কুকুবটা হঠাৎ নর্দমা থেকে মাথা তুলল। এদের দেখে আবও খানিকটা গলাটা টান করে ঘাড় বাঁকিয়ে বিষ্টুব হাতেব বস্তুটিব দিকে তাকাল। হলদে মণি আব লাল চোখে সামান্য একটু কৌতূহল ফুটল। কিন্তু একটা শাণিত খ্যাপামি ও সন্দেহে চকচক্ করছে চোখ দুটো।

বিষ্টু বসগোল্লা দুটো নামিয়ে ফ্যালাকে নিয়ে সবে গেল দূবে।

কুকুবটা বসগোল্লা দুটোব কাছে এসে এক মুহূর্ত মাথা নিচু করে দাঁড়াল। আবাব মুখ তুলে একবাব বিষ্টুকে দেখে, হঠাৎ পিছন ফিরে দুধের বাঁট দুলিয়ে দুলিয়ে চলে গেল।

বিষ্টু আব ফ্যালা অবাক হয়ে পবস্পবেব মুখ চাওয়াচাওয়ি করে এগিয়ে এসে দেখল, কুকুব বসগোল্লা ছোয় নি পর্যন্ত। আশ্চর্য! আশাতীত।

রাগে বিস্ময়ে বিষ্টু জ্বলন্ত চোখে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরে শালা, হারামজাদী যে মানুষের বাড়া দেখছি।'

ফ্যালা বলল, 'সেয়ানা হয়ে গেছে। হবে না, ও যে মাদী। পেটের বাচ্ছা পালতে হবে যে!'

দৃঢ় চাপা ক্রুদ্ধ গলায় গর্জে উঠল বিষ্টু, 'পালাচ্ছি বাচ্চা। যাওযাচ্ছি ওর মাই দুলিয়ে দুলিযে।'

খপ্ করে সে রসগোল্লা দুটো তুলে নিয়ে পলকে দেখে নিল, বাঁদিকের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। বলল, 'চ' ফ্যালা, বিষ, না হয় তোর ডান্ডা দিয়েই ওকে সাবাড় করতে হবে।'

ফ্যালার ওতে কিছু যায় আসে না। বলল, 'চল। কিন্তু দুটো মিষ্টি নষ্ট করলে তো সোনাটরবাবু।'

বিষ্টু খেঁকিয়ে উঠল, 'তবে কি তোকে দেব?'

ফ্যালা কানা চোখের ড্যালা কাঁপিয়ে হেসে বলল, 'আমাকে না হয়, আমার ডোমনিটাকে তো দিতে পারতে?' বলে হ্যা হ্যা করে হাসে। 'জানলে বাবু বউটা ওই হাঁড়ির জিলিসট' এখন খালি খেতে চায। মানে, পোয়াতি কি না।'

বিষ্টুর গায়ে যেন আগুন লাগে কথাটা শুনে। বলে, 'ও' তাই সক্কাল থেকে মিষ্টি দেখে তোমার এত ফুর্তি। বলি, ক'বিউনী হল তোর বউ?'

'তা' তোমার এবার লিয়ে পাঁচবার।'

মনে হল বিষ্টু এবার ঘুষি কশাবে ফ্যালার ওই চোখটাতে। ভেংচে বলে, 'আরও চাই?'

ফ্যালার হাসিটা অদৃশ্য হয়ে যায। ভাল আর কানা দুটো চোখই মেলে ধরে চাপা গলায় বলল, 'তবে আর তোমাকে বলছি কি। পাইখানা-ঘাটা ধাওড়ার মায়ের পেটের ছেলে যে বাঁচে না। এও জান না। চারটে তো শালা মরেই গেছে।'

বিষ্টু তেমনি ভেংচে খেঁকিয়ে বলে, 'তবে বিষ পুরে দোব'খনি, সবশুদ্ধ গায়েব হয়ে যাবে।'

কিন্তু ফ্যালা ডোমের প্রাণ তাতে রাগ মানে না। ওই ভবদুপুরে বেসুরো গলায গেয়ে ওঠে,

'ভালবেসেছিলুম বলে
মালাটি দিলে গলে
সোহাগ করে কোলে দিলে
নাদাপেটা ছে-লে।'

বিষ্টু আচমকা মুখ চেপে ধরে ফ্যালার! বলে, 'থাম্ শালা, ওই দ্যাখ।'

দেখা গেল সেই মাদী কুকুরটা একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঠিক মানুষের মত উঁকি মেরে তাদের দেখছে।

দুজনেই একটু দাঁড়াল। ফ্যালা বলল, 'সরে এস, পেছু দিয়ে যাব।'

বলে তারা পিছন ফিরে একটা বাগানের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগুলো। এদিকটা এলাকার শেষ, তাই জাযগাটা গাছে, জঙ্গলে, বাঁশঝাড়ে ছাওয়া গ্রাম্য নিঝুমতায় আচ্ছন্ন।

বাগানের পিছন দিয়ে, খুব ধীরে সেই ঝোপটার কাছে এসেই তারা হতাশ ভরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেই কুকুরটা। কোথায় গেল?

হঠাৎ খড়খড় শব্দে চমকে ফিরে দেখল, বাগানের মাঝখান দিয়ে কুকুরটা ছুটছে। তারাও দুজনে ছুটল। কিন্তু খানিকটা ছুটেই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। নিঃশব্দ। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত কান পেতে রইল। শুধুই হাওয়ার সড়সড, পাতার মড়্মড। দুজনেই থেমে গেছে।

বিষ্টুর চোখ দুটো আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেই ছোঁয়াটা লেগেছে এবার ফ্যালারও। ঠেলে

উঠছে তার কানা চোখটা। বলল, 'হারামজাদী আমাদেব চেযেও সেযানা। চল দেখি ওই বাঁশঝাড়ের দিকে।'

দু'জনেই পা টিপে-টিপে বাঁশ বাগানের মাঝখান দিযে চলল। খানিকটা গিযেই বিষ্টু ফ্যালাব হাত ধবে দাঁড়াল। বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাদেব ডানদিকেব বাঁশঝাড়টা দিযে কে যেন যাচ্ছে।'

দু'জনেই কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই।

কিন্তু আবাব তাবা পা বাড়াতেই প্রতিধ্বনিব মত ডানদিক থেকে শব্দ শোনা গেল। তাবা থামলেই ওই শব্দটাও থেমে পড়ে। তাবা তিন চোখে বোকাব মত পবস্পবেব মুখ চাওযাচাযি কবে। ভূত নাকি? তবে তাবা দুজনে কি?

বাঁশ বাগানটা শেষ হওযাব মুহূর্তেই তাদের চমকে হতাশ ক'বে দেখা গেল কুকুবটা তাদেব চোখেব সামনে দিযে সড়সড় ক'বে মাঠেব দিকে ছুটল। তাব ছোটাব দোলায যেন ছিটকে পড়াব উপক্রম কবল পেটেব তলার স্তনগুলি।

এবাব দুজনেবই বোখ চেপে গেল। দু'জনেই ছুটল মাঠেব দিকে মাথা নিচু কবে। দেখল, মাঠেব উপব দিযে ছুটে চলেছে কুকুরটা। ছুটে একেবাবে পুবেব সড়কটাব উপব গিযে ফিবে দাঁড়াল। কিন্তু এবা দু'জনেই মাথা নিচু কবে বইল।

তবু কুকুবটা উত্তব দিকে ছুটে হঠাৎ বাস্তাব নাবিতে অদৃশ্য হযে গেল।

সূর্য ঢলে পড়েছে। দুপুব শেষ হতে চলেছে। এই নিস্তব্ধতাব সুযোগে হাওযা যেন আবও দুর্বাব হযে উঠেছে।

হাঁপাচ্ছে বিষ্টু আব ফ্যালা ডোম। ফ্যালা বলল, 'আজ ছেড়েই দেও, কাল হবে।'

বিষ্টু খ্যাপাব মত উঠে দাঁড়াল—'না, আজই ওকে নিকেশ কবব, চ পা চালিযে।' তাবা যখন ছুটতে-ছুটতে সড়কে এল, তখন দেখা গেল কুকুবটা বেল লাইন দিযে ছুটছে। আবও উত্তব দিকে খানিকটা ছুটে পুবেব নাবিতে আবাব অদৃশ্য হযে গেল।

বিষ্টু হতাশ হযে দাঁড়িযে পড়ল, 'যাঃ ইউনিযনবোর্ডেব এলাকায চলে গেল।'

দুজনেই খানিকক্ষণ দাঁড়িযে বইল তাবপব হাঁপাতে হাঁপাতে ফিবে চলল আবাব মাঠ ভেঙে। বিষ্টুব চোখ ধক ধক কবে জ্বলছে শিকাব ফসকানো নিষ্ফল আক্রোশে। ফ্যালাব ভাল চোখটা বন্ধ থাকায ভাবটা ঠিক ঠাওব কবা গেল না।

ক্লান্ত পাযে মাঠ পেবিযে বাগান পেবিযে ঠাকুবপাড়া ঘুবে মুচি পাড়াব ঝোপে ছাওযা সব গলি দিযে তাবা এগিযে চলল।

মুচিপাড়াব শেষ সীমানায বিষ্টু আবাব থমকে দাঁড়াল। দেখল এব মধ্যেই ফিবে এসেছে সেই মাদী কুকুবটা। শুযে পড়েছে একটা মানকচু গাছেব পাতাব ছাযায। মেলে দিযেছে ঠ্যাং, ছড়িযে দিযেছে বুক পেট। আব তাব পুষ্ট স্তনগুলোব উপব ঝাঁপিযে পড়েছে কতকগুলো নধব তুলতুলে ছোট ছোট বাচ্চা। চকচক শব্দে মাই খাচ্ছে, আব আবামে কুঁই কুঁই কবছে।

ফ্যালা দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে ডাণ্ডাটা তুলতেই বিষ্টু চেপে ধবল তাব হাতটা। ফ্যালা অবাক হযে লাঠিটা নামিযে নিল।

ক্লান্ত কুকুবটা টেবও পেল না তাব দুশমনেবা এসে দাঁড়িযেছে। দুধেব ভাবে তাব টনটনে স্তন হালকা হযে যাচ্ছে, বাচ্চাঠাসা বুকে আরামে ঘুমিযে পড়েছে। হাওযা বইছে আব কোথা থেকে একটা বসন্ত পাখি উল্লাসভবে ডাকছে।

বিষ্টুপদর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত বিকট মুখটাব সমস্ত আঁকাবাঁকা বেখাগুলো জাদুবলে কোথায অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের ক্ষিপ্ততা কেটে গিয়ে একটা চাপা বেদনায় ছায়াচ্ছন্ন হযে উঠল দৃষ্টিটা।

বারবার তোর চোখেব সামনে ভাসছে এমনি একটা ছবি। এমনি, তবে সেটা গাছতলা নয়, ঘবেব নিরালা কোলে একটা মানুষীর, দুপুরে অথবা মধ্যরাত্রে শুয়ে থাকার ছবি। এমনি, কিন্তু বাচ্চাগুলো মানুষের। এমনি, কিন্তু সে তার শিবি, খেপী নয়, তবু খেপী।

যেন ঘুম না ভাঙে, এমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল বিষ্টু 'শুধু এই জন্যে জানিস, হারামজাদী 'ছুটছিল। ছেড়ে দে এবারের মত।' বলে সে খানিকটা গিয়ে আবার দাঁড়াল। আবার মুখটা বিকৃত করে, চোখ কুঁচকে পকেট হাতাতে-হাতাতে বিড়বিড় করে বলল, 'অল্-শালা ব্লাডি বোগাস। ফ্যালা।'

ফ্যালা ভাবছিল শালা পাগলা সোনাটরবাবু। বলল, 'বল।'

'চারটে পয়সা দিবি?'

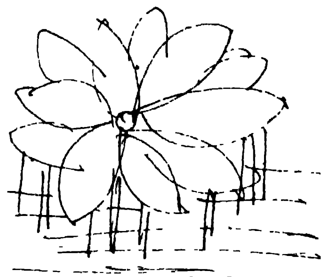
ফ্যালা ট্যাঁক হাতড়ে একটা আনি দিয়ে বলল, 'কেন, ওই হারামজাদীকে দেবে নাকি?'

বলে খ্যালখ্যাল ক'বে হেসে ফেলল।

বিষ্টু তখন ভাবছে, এতক্ষণে বোধ হয় মিঠুব লঙ্কাব আচাবেব দোকানটা বন্ধ হযে গেছে। আনিটা নিযে বসগোল্লাব হাঁড়িটা হাতে দিযে বলল, 'যাঃ শালা নিযে যা।' বলে উল্টো দিকে ফিরে হনহন কবে এগিয়ে গেল। তে-ঢিঙ্গে লম্বা, ভূতেব মত ঠ্যাং ফেলে ফেলে চলেছে যেন সেই মাথা মুড়নো তালগাছটা।

ফ্যালা একবাব হাঁড়ি আবএকবাব সোনাটববাবুর দিকে ভাল চোখটা বুজিযে বলল, 'অল শালা বেলাডি বোগাস।' বলে হাঁড়ি নিযে ডান্ডা কাঁধে ফেলে ধাওডার দিকে ছুটল।





মেঘলা ভাঙ্গা রোদ

সামনের সুদীর্ঘ পথটা গ্রাস করছে মেঘে। আকাশ মাটির ফারাকটুকু লেপালেপি হয়ে গেছে কালোয় কালোয়। মফস্বলের রাস্তা। দু পাশের শ্রীহীন দুর্দশাগ্রস্ত বাড়িগুলো হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। গাছগুলো মুখ ঢেকেছে মেঘে। আলো জ্বালার কথা। বিজলী আলো, কম পাওয়ারের স্বল্পালোক বাতিগুলো জ্বলে অন্যান্য দিন, অনেকখানি ফাঁকে ফাঁকে, চালচুলোহীন শহরটায় কিম্ভূত ছায়া ফেলে। বোধহয় প্রথম রাতের ঝড় বাদলেই গেছে বিজলী বিগড়ে। সারানো হয় নি এখনো।

মাঝে মাঝে দূর আকাশটা চমকে উঠছে বিদ্যুৎ-কশায়। ভেজা ভারী বাতাসের সাঁ-সাঁ ঝড়ো ভাবটা কাটেনি এখনোও। যেন খ্যাপা ক্লান্ত পশুটা ল্যাজ নাড়ছে আস্তে। যে কোনো মুহূর্তেই আবার রুষে-ফুঁসে রুদ্র হয়ে উঠতে পারে।

একসেলরেটারে চাপ দিল বিশু। পুরনো ইঞ্জিনটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে উঠলো। তারপর গীয়ারটাকে ঠেলে তুলে দিলো টপে।

দিলে কী হবে। রেতো ঘোড়াকে মার আর কষ। সে যা তা-ই। ওয়াগনের মতো মস্ত ঢাকা গাড়ী। অনেকটা কয়েদী গাড়ির মতো। তার চেয়েও উঁচু, যেন একটি কালো হাতী। স্পেশাল লাইসেন্সড্ ওয়াগন-লরি। একসেলরেটারে চাপ দিলেই বুড়ো এঞ্জিন ডাক ছেড়ে ওঠে কেঁদে ককিয়ে। একটা আলো অফ করে দিতে হয়েছে ব্যাটারি চার্জের জন্যে।

শুধু বাতাসের মাঝে আরও করুণ হয়ে উঠেছে শব্দটা। ওরও বর্ষা লেগেছে। ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে এক কোণে ফেলে রাখলেই ঝিমুতে পারে জড়োসড়ো হয়ে।

কিন্তু কোনো বিকৃতি নেই বিশুর মুখে। হাই তুলছে, শিথিল হাতে এদিক ওদিক করছে হুইল ধরে। রক্তাভ চোখ দুটি ভাবলেশহীন। নজরটা ঠেকে রয়েছে গাড়ীর আলোর সীমানায়, অন্ধকারে যেখানে জেগে উঠেছে খানা খাদ নর্দমা।

শেষবার মাল খালাস করে ফিরছে সাতান্ন মাইল দূর থেকে। প্রাইভেট কোম্পানির হরেক রকম মাল। তবে সবই প্লাস্টিক আর রবারের।

ভন্টা ডাকলো,'বিশুদা।'

জবাব দিলো না বিশু। কালো এবড়ো-খেবড়ো মুখের ভাঁজ কাঁপল না একটুও। কেবল বাতাসের ঝাপটায় চুল আছড়ে পড়লো কপালের উপর।

ভন্টা এ গাড়ির ক্লীনার। মাল খালাসের কুলি। হিসাবরক্ষক। যা খুশি তা-ই বলা যায়। বয়সে

ছোট নয় বিশুব চেযে। চাকরি কিংবা চেহাবাতেও নয়। মানুষ হিসেবেই কোথায একটু খাটো রয়ে গেছে। বিশুব পাশে বসেই যাওয়াব কথা তার। যা বাতাস। বৃষ্টি এলে রোখবার উপায় নেই। তার চেযে এই অন্ধকার কালো গহ্বরই ভালো।

বিশুকে ডাকলে জবাব পাওয়া যাবে না, জানতো। তবে শুনছে ঠিকই। বললো, 'রাত একটার মধ্যে পৌঁছুনো যাবে?'

বিশু ভাবলেশহীন মুখেই জবাব দিলো, 'গাড়িব মর্জি।'

ভন্টা অন্ধকার বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়েই বললো, 'মালিক আবাব গাড়িব কথায বলে, মবা হাতীব দাম লাখ টাকা।'

বিশু একটা কঙ্কালমার্কা কার্ভ বেঁকে জবাব দিলো, 'কিন্তু মবা এঞ্জিনেব দাম ফুটো পযসাও নয। খালি বাতিল লোহা লক্কব।'

জবাব দিলো না বিশু। খানিকক্ষণ শুধু পুবনো এঞ্জিনেব গর্জন। হাড় কাঁপানোব মত কাঁপছে বনেট। বাতাস আছড়ে পড়ছে ঢাকা লবিব ছাদে, কালো টিনেব দেযালে।

ভন্টা বললো, 'আজো যাবে নাকি সেখানে?'

ভ্রু কুঁচকে, চোয়াল শক্ত কবে বললো বিশু, 'না।'

—'হ্যাঁ মেয়েপাড়ায় ওই ন' মাস ছ' মাসেই একবাব ভালো। শত হলেও বাজাবেব ব্যাপাব।'

একটু চুপচাপ। আবার 'তবে এই সাবাদিন খেটেখুটে খালি ঘরে যিবে যেতে ভালো না। যা না মাইবি।'

বিশু বললো, 'তোমাব আবাব খালি ঘব কোথায়?'

—'আমাব নয, তোমাব কথা বলছি। আমাব তো ঘবে থেকেও বাইবে হাতড়ে ফিরি। তোমার তো একেবাবে সাফ। থাক কী কবে?'

'থাকে কী কবে!' রক্তাভ চোখ দুটি আলোব সীমানা পেবিযে গিযে পড়লো নিঃসীম অন্ধকারে। বললো, 'চিড়িযাখানায গেছ?'

'হ্যাঁ।'

—'ওখানকাব মত।'

ভন্টা খলখল কবে হেসে উঠলো কেশো গলায: 'খাঁচাব জন্তুব মতো।—হ্যা হ্যা ...'

বিশুব গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, ওই বকমই। মদ্দা সাপের মতো।'

মট করে ঘেঁটি ভাঙাব মত ভন্টাব হাসিটা থেমে গেল। শক্ত হযে রইল কযেক মুহূর্তে। মালখালি অন্ধকাব গহ্বরটা চোখেব সামনে কিলবিল কবতে লাগল সাপেব মতো। এমন কবে বলে!

কিন্তু ঠিক তাই। উল্টোডাঙাব সেই খালপাড়েব কুঁজো চালাটাব গর্তে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুযে থাকাকে আর কী বলে! রক্তের মধ্যে যেটা ঘোরাফেবা কবে, নিশ্বাসে যা বেরোয, সেটা বিষ ছাড়া আর কী!

আবাব একসেলবেটারে চাপ দিলো বিশু। গাড়িটা উঁচুতে উঠছে কিন্তু চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। আঁ....আঁ....আঁ....।

বাতাসটা ফুঁসতে শুরু কবেছে। আব এতক্ষণে মুখে নিযে এসেছে জলের ঝাপটা।

ভন্টা বললো, 'এসে গেলুম।'

রেল-ব্রিজের একেবারে উঁচুতে উঠে শবীর কাঁপিয়ে নামতে লাগলো প্রকাণ্ড কালো ওয়াগন। তারপর দেখতে দেখতে গাড়িটা ছোট হয়ে গেল আকাশ-ঠেকা হাওড়া ব্রীজের বুকে এসে।

বর্ষায় দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সারা কলকাতা। শুধু রাস্তার আলোগুলো নিরুপায়।

বিশু ডাকল, 'ভন্টা।'

—'বল।'

—'এদিকে আয়।'

—'কী হল?'

গাড়ির ভিতর থেকে ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগের ছোট জানালায় মুখ বাড়ালো ভন্টা। বিশুর মাথার পাশ দিয়ে সামনে দেখা যায় রাস্তা। বললে, 'কী বলছ?'

—'দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে লাইট পোস্টের তলায় দেখ তো।'

ভন্টা তাকালো। কোথায়? ডাইনে, না বাঁয়ে? হ্যাঁ, ডাইনে দেখা যাচ্ছে বটে। বললো, 'মানুষ।'

বিশু বললো, 'আমি যেন ভূতের কথা বলছি। মানুষ তো হাজারবার, মেয়েমানুষ না?'

'উঁ! অ্যাঁ, কোথায়?' লুব্ধ চোখ চকচকিয়ে উঠলো ভন্টার। মেয়েমানুষই তো! ওসব তো চেপে রাখবার উপায় নেই। ভিজে লেপটে যাওয়া কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে একটা পুরোপুরি মেয়েমানুষ। এত রাত্রে, এই বাতি জ্বালানো শ্মশানের মতো রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে একলা। হয় পালিয়ে এসেছে, নয় ভিখারী। আজকাল আবার পালানো আর ভিখারী. সবই এক গোত্র। একটু বেকায়দায় পড়ে হয়তো ছিটকে এসে পড়েছে। আজকের রাতটা আর জোটে নি কোথাও।

—'গাড়িটা বাঁধো বিশুদা।'

বিশুর নজরটাও ওই দিকেই। কোঁচকানো ভ্রূর তলায়, বক্তাভ চোখের দৃষ্টি শিকারীর মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। খোঁচা-খোঁচা হয়ে উঠেছে এবড়ো-খেবড়ো মুখটা। বললো,' বাঁধব?'

টগবগ করছে ভন্টার রক্ত। চাপা গলায় ঝোল টেনে বললো, 'বাঁধবে না? এমন সুযোগ ছাড়তে আছে? বলে, যে খায় চিনি, যোগায় চিন্তামণি। নইলে আর রাস্তায় পড়ে পাওয়া ষোল আনা।'

লাইট-পোষ্ট ঘেঁষে, মূর্তির সামনে ব্রেক কষলো বিশু। ঠিক ষোল আনাই কি? দুজনেই দেখলো কয়েক মিনিট খুঁটে খুঁটে। ঘোমটা থাকলেও মুখ দেখা যায়। সেখানেও বয়সের দাগ কি দুর্গতির ছাপ, ঠিক বোঝা যায় না। ধরা যাচ্ছে না, দেহে বয়সের পড়তি কিংবা দুর্ভোগের অপুষ্টতা। পাগলা কিনা, তা-ই বা কে জানে! মাটির দিকে চেয়ে শীতে কাঁপছে থরথর করে।

বিশু বললো, 'শালা জঞ্জাল!'

উত্তেজিত ভন্টা প্রায় শীত-কাঁপানো গলায় বললো, 'তা হোক ওই জ্বালিয়েই একটু গরম হওয়া যাবে। তুলে নিয়ে আসি।'

বিশু এদিকে ওদিক তাকিয়ে সংশয়ভরে বললো, 'তুলে আনবো। তারপর কোথায় যাবে?'

—'কোথায় আবার! যা কাজ আমাদের। মাল তোলা আর খালাস করা। রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যাবো আবার।'

—'তবে দেখ্ আর দেরি করিস নে। কে কোনখান দিয়ে এসে পড়বে।'

দম চাপা মোটা গলায় বললো বিশু।

পিছনের দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যেই নেমে গেল ভন্টা। কাছে গিয়ে বললো, 'যাবে?'

সাড়া পাওয়া গেল না। নিচু হয়ে উঁকি দিয়ে মুখ দেখলো ভন্টা। চোখ দুটো ডাগরই তো।

নাক বোঁচা, মুখখানি মন্দ নয়। কিন্তু—

—'এই বিশুদা, কাঁদছে।'

—'যা করবি তাড়াতাড়ি কর্।'

ভন্টা বললো আবার, 'যাবে আমাদের সঙ্গে?'

জবাব নেই, খালি কাঁপুনি। হাত ধরে টান দিলো ভন্টা মরা-শিকড়-লতার মত এক টানেই সরে এলো। নিয়ে হাঁটা দিলো। মেয়েটাও যন্ত্রচালিতের মত প্রায় ভেসে চললো। গাড়িতে তুলে ছিটকিনি বন্ধ করে দিয়ে ভন্টা বললো, 'চল।' বুড়ো এঞ্জিন উঠলো ককিয়ে। হাতীর মত প্রকান্ড গাড়িটা আস্তে আস্তে চলতে লাগলো রাস্তার মাঝখান দিয়ে। তারপরেই একটা দাপাদাপি শুনতে পেলো বিশু। শুনতে পেলো, দুম করে পড়ে গেল বেঞ্চিটা। চোখে রক্ত ছুটে এলো বিশুর কলকল করে। স্টিয়ারিং হুইলটা তার শক্ত থাবায় যেন দুমড়ে যাবে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো কী হল?

কোনও জবাব নেই মিনিটখানেক। তারপর ভন্টার কেশো হাঁপ-ধরা গলা শোনা গেল, বেয়াড়াগিরি করতে গিয়ে পড়ে মরেছে। মরে গেল কিনা কে জানে। বিশু ভিতরের লাইটটা জ্বেলে দিলো। তীব্র নয়, টিমটিমে আলোয় ভয়ংকর আর বীভৎস দেখাচ্ছে চলন্ত কালো গহ্বরটা। এলোমেলো ভন্টা। আর এলোচুলে ছেঁড়া কাপড় সামলে মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গাড়ির পাটাতনের দিকে।

এক মুহূর্তে দেখলো বিশু। তারপর স্টিয়ার তুললো।

ভন্টা বললো, 'এস বিশুদা।'

কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

—'আসবে না?'

'যেয়ে নিই।'

—'কোথায়? গ্যারেজে?'

—'হ্যাঁ।'

—'দারোয়ান থাকবে যে।'

বিশু হঠাৎ চাপা গলায় প্রায় শাসিয়ে উঠলো, 'থাক্। তুই গাড়ি চালাতে পারবি যে বলছিস?'

তা ঠিক। গাড়ি চালাতে পারবে না সে। কিন্তু গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিলেই হয়। সে কথা বলতে ভরসা হল না ভন্টার। মেজাজটা যেন একটু বিগড়েছে বিশুর, বেগড়াবেই তো। চুপ করে ঠান্ডা দেহে, লুব্ধ চোখে তাকালো মেয়েটার দিকে।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো কোম্পানির গ্যারেজের সামনে। বর্ষাতিঢাকা দারোয়ান গ্যারেজের দরজা খুলে দিলো। গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে এলো বিশু। ততক্ষণে মেয়েটাকে হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে, প্রায় চল্লিশ বছরের হ্যাফপ্যান্ট পরা ভন্টা।

দারোয়ান বললো, 'এ আবার কে?'

ভন্টা বললো, 'মেয়েমানুষ।'

দারোয়ান বললো, 'বাঃ তোফা! কী জাত?'

বিশু বললো, 'আর থাক্, গ্যারেজে তালা মারো দিকি গিয়ে।—' বলে ফিরে তাকালো মেয়েটার দিকে।

আবার কাঁপছে। নজর তেমনি মাটির দিকে। রাগ দুঃখ কিছু বোঝাবার উপায় নেই। তবে

ঠোঁট দুটি যেন কোন অদৃশ্য কুলুপে একেবারে এঁটে আছে।

হ্যাঁ, চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতোই মনে হচ্ছে বিশুকে। পরনে একটি কালিঝুলি মাখা নীল ফুলপ্যান্ট। জামার রঙ বোঝবার উপায় নেই। তার উপর আবার চড়িয়েছে একখানি গামছা। বোধহয় বৃষ্টির জন্যে। ভন্টা সঙ্গেও বটে, তবে হিংস্রতার চেয়ে বেবুনের মতো দাঁত-দেখানো লাফালাফিই বেশী।

বিশু ওর ভয়ংকর মুখটা তুলে, রক্ত চোখে তাকালো এদিক ওদিক। ভন্টা বুঝতে পেরে বললো, 'এদিকে কোথাও জায়গা নেই। বোললুম তখন,' কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'তোমার ঘরে নিয়ে যাও। কারুর তোয়াক্কা করতে হবে না। তা' পরে বিদেয় করে দিও। মিনিমাগনা যা পাওয়া গেল, শালা পয়সায় হয় না।'

দারোয়ানটি বিলক্ষণ ভয় পায় বিশুকে। কিছু না বলে কুতকুত করে দেখতে লাগলো বর্ষাতির ভিতর থেকে।

একটা নরক-ভয়ংকরতা নেমে এসেছে যেন এখানে। লাইটের স্বল্পালোকে তিনটে দানবীয় কিম্ভূতাকৃতি শাখার মধ্যে হারিয়ে গেছে মেয়েটার ছায়া। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিকণাগুলি পিসে মারতে চাইছে বাতাসের ঝাপটা।'

বিশু চাপা মোটা গলায় হুকুম করলো, 'তুই ছেড়ে দে ভন্টা।'

ভন্টা ছেড়ে দিলো। বিশু প্রায় ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে চললো মেয়েটাকে। এত জোরে টেনে নিয়ে চললো যে, মেয়েটার আপত্তি আছে কি বাধা দিতে চাচ্ছে সেটুকু অনুমান করার উপায় নেই।

পিছন থেকে কেশো গলায় আবার হেসে উঠলো ভন্টা। অস্পষ্ট শোনা গেল, মররে আজ।

খালধারে আসতে লাগে কয়েক মিনিট। ওপারে রেল-লাইন। এপারে এবড়ো খেবড়ো পিছল রাস্তা, কাদা থিকথিক করছে। আলো নেই, তবু চিকচিক করছে খালটা। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সাপের মত এঁকেবেঁকে, পুবের মেঘ-গড়ানো আকাশ গেছে হারিয়ে। রাস্তার ধারে ধারে ছিটে বেড়া আর মেটে দেয়ালের এলোমেলো বুক-চাপা কুঁজো ঘরের সারি কয়েকটা গোলা। কলকাতার হিসেবে এটা ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। খালে নোঙর করে আছে কিছু মাল-নৌকা। টালি বালি সুরকি। সময়ে ধান বিচুলিও।

এই রাস্তাটার মতোই বৃষ্টি ভেজা এবড়ো-খেবড়ো মুখ বিশুর। চোখ দুটিতে চিতাবাঘের হিংস্রতা। সারা দেহের রক্ত হাতের থাবায় এসে জমেছে। কাঁকড়ার মতো দাঁড়া চিপটে ধরেছে শিকার। তারপর একটি একটেরে চালার দরজা খুলে, অন্ধকারে আগে ঠেলে দিলো মেয়েটাকে। দরজা দিলো বন্ধ করে।

পকেট হাতড়ে দেশলাই খোঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, মেয়েটাকেই জাপটে ধরলো সে। থাক, বাতি জ্বালালে আবার কী চোখে পড়ে যাবে কে জানে! একজন থাকতে এ ঘরে সারারাতই বাতি জ্বলতো। তার ফেলে-যাওয়া ছোটখাটো, ছেঁড়াখোঁড়া দাগ কিছু রয়ে গেছে এখানে সেখানে।

আজকের সবটাই অন্ধকারের, অন্ধকারেই থাক। এটা মেয়েপাড়ার আলো-ঝলকানো, নগদ-দামে-কেনা বেলেল্লাপনাও নয়। নয় মাপা জলের তৃষ্ণা মেটানো। পথ থেকে কুড়িয়ে আনা, পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা নয়, ষোল আনা। সবটাই লাভের। পিঁপড়ের যেটা খাবে, সেটা মেয়েটাকেই খাবে। যতখানি খুশি, যা খুশি তাই করে, ফেলে দিলেই হবে। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা!

হুইল-কামড়ানো কাঁকড়া-দাঁড়া হাতটা মেয়েটার সর্বাঙ্গে হাতড়ে ফিরতে লাগলো। হ্যাঁ,

অভাবে অপুষ্ট, কিন্তু মেয়েমানুষ। আর ঠিক মেয়েমানুষের মতই। রক্তে ডাকলো ঘুঙরি বান।

কিন্তু শক্ত কেন, কাঠ কাঠ কঠিন নিশ্চল। ঝাঁকানি দিয়ে ঝেঁজে উঠলো বিশু চাপা গলায়, 'কী হল ?'

কোন্‌ও সাড়া নেই। যেন লজ্জবতী লতার মতো। ছুঁয়েছ কি বুকের দুপাশ মুড়ে ফেলেছে। তাতে সব মোড়া যায়। শরীর? বোঁটাসুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায় প্রতিটি পাতা। নখদন্তে ছিঁড়ে ফিলতে উদ্যত হয়েই বললো বিশু, ভন্টা পারে, আমি পারি না। ওসব ছাড়।'

ঘরের অন্ধকার আদিম ও ভয়ংকর হয়ে উঠলো নারীবিবর্জিত অন্ধ উন্মাদনায়।

বাইরের পৃথিবীটা যেন গলে গলে ধসছে বৃষ্টি-ছাটে। দিগন্ত খোলা পেয়ে, নোনা বিল থেকে উঠে আসা পুবের বাতাস মাটিসুদ্ধ চাইছে উপড়ে ফেলতে। নিশাচর ভূতের মতো দুলছে মাল-নৌকার মাস্তুলগুলি। খালের জলের কলকলানিতে বাজছে চাপা সর্বনাশী হাসি।

খানিকক্ষণ পব বাতি জ্বাললো বিশু। কযেক মুহূর্তে জোর করে তাকিয়ে বইলো চিমনি-আঁটা কেরোসিন ডিবেটাব দিকে। তার ভ‌য়ংকর মুখে রযেছে একটা উন্মাদ নেশার আচ্ছন্নতা। তারপব আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো মেয়েটাকে। বসে আছে বেড়ায় হেলান দিযে। তেমনি শক্ত হযে, নত মুখে, অপলক চোখে, তারই ছায়ায। এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস অন্ধকাবের কোনো দাগ নেই ওখানে। যেন এমনি কাঠ হয়েই ছিলো এতক্ষণ, চিরদিন ধবেই আছে।

তারপরে হঠাৎ নজবে পড়ে যায, ঘরেব সেই দাগগুলি। ওই কুলুঙ্গি, কোলে তার লক্ষ্মীর পট, সমুদ্রের কড়ি, সিন্দুরকৌটা একদিন ছিলো একজনের যাব মুখখানি ভাসছে কুলুঙ্গিব কাছে।

চকিতে চোখ ফিবিয়ে নিলো বিশু। দেখতে চায় নি, অন্ধকাবে পুবোপুরি ঢাকতে চেযেছিল আজকের বাতটা। কোনো রাত্রেই দেখে না। আজকের বাতটা মনেও করতে চায নি আর একটি মেয়েমানুষকে। যে মবে তাকে দিযে গেছে এই বাত।

আবার চোখ পড়ল মেযেটাব দিকে। ভযেব দাগ নেই মুখে, অথচ কাঠ। যন্ত্রণাব ছাপ নেই, কিন্তু নির্নিমেষ চোখ। প্রাণ আছে, কিন্তু মৃতের চেয়েও নিঝুম। আছে প্রতিবাদ, কিন্তু অক্ষম। গলায় নিশ্চয় কান্না আছে, তবু শব্দহীন। এটা কী? সহসা একটা ভয়ংকব আক্রোশে দলে দুমড়ে টিপে মেবে ফেলতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু পেছিয়ে এলো মন। থাক, আপদ বিদেয় কবা যাক। শিকে থেকে পাড়লো সকালবেলায় তৈরি করে বেখে যাওয়া রুটি তবকাবি। মেযেটাব কোলের উপর দুটি রুটি ফেলে দিয়ে বললো, 'নাও, মুখের রুটি দিয়ে শোধ করছি। গিলে কেটে পড়ো।'

বলে নিজে গিলতে লাগলো গোগ্রাসে। আব বেড়ার গাযে মস্তবড়ো চোযালেব ছাযাটাও খেতে লাগলো। ভেবেছিলো, নিশ্চিত মেয়েটা খাবে না। কিন্তু দেখলো, খাচ্ছে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে। একই ভাবে বসে বসে। এব নাম পেট। খাওযা শেষে জল খেয়ে দেখলো বিশু, মেযেটাব খাওয়া হয়ে গেছে। বললো, 'ওঠ, উঠে পড়।' বলে নিজেই হাত ধরে টেনে তুললো। দরজাটা খুলতে গিয়ে থেমে গেল।

বাইরে নিরন্তর ভাবী বাতাস ডাক ছাড়ছে। মডমড করছে টালিব চাল। খালেব ওপাবে সোঁ-সোঁ শব্দে স্টিম ছাডছে রেল-ইঞ্জিন।

সেজন্য থামে নি বিশু। ডাক ছেড়েছে আবাব রক্তকোষের ঘুঙবি বানে। ভাবছে, পড়ে পাওয়া ষোল আনাব কথা। অবাধ ও স্বাধীন। কিসেব বাধা পুরো একটা রাতে। অনড় নিশ্চল প্রতিবাদের মধ্যেও হাত ধরে আছে সে একটি মেয়েমানুষের।

ভিতর থেকে ঘরে তালা লাগিয়ে নিবিয়ে দিলো বাতিটা।

মেঘ যায় নি আকাশ ছেড়ে। কিন্তু চাপা থাকে নি দিন। সে এসেছে মুখ কালো করে। বিশু খাটিয়ায় জেগে বসে আছে, দেখলো মেঝের এক কোণে তেমনি বসে আছে মেয়েটা। কিছু বোঝবার জো নেই, ঘুমিয়েছিল কি না। তেমনি অনড় নিশ্চল নতচোখে, কিন্তু ভাবলেশহীন। শুধু ছেঁড়া কাপড়টা আর কিছুতেই সামলাতে পারছে না শরীরটাকে।

হঠাৎ মনে হলো, শোধ দিতে হবে কাল রাতের। কোনও কথা না বলে সে ঘরের বাইরের থেকে তালা লাগিয়ে খালে গিয়ে ডুব দিয়ে এলো ঝুপ ঝুপ করে। এ ঘরের দিকে বড়-একটা কেউ আসে না। এক সেই বস্তিবাসীর চিরকালের প্রাতঃকৃত্য সারা ছাড়া। তা ছাড়া বন্ধ ঘরে মেয়েটাকে দেখতে পাওয়ার কোনো উপায়ও নেই।

চান করে এসে উনুনে আগুন দিলো বিশু। তার প্রাত্যাহিক কাজ। রান্না করে খেয়ে যাবে কাজে। রাতের শোধ দেবে মেয়েটাকে খাইয়ে। তারপরে বিদায়।

হাঁড়ি চড়ায়, বাটনা বাটে, তরকারি কোটে বিশু ছুরি দিয়ে। দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েটাকে।

তারপরে চোখ পড়ে যায়, বেড়ায় বাঁধা তক্তার ওপরে জং-ধরা লোহার খুন্তি, ডালের কাঁটা, পেতলের হাতা। ওগুলি সে ছোঁয় না। যার জিনিস, সে গেছে। বিশু তার নিজের জিনিসে কাজ করে। ওইখানে আয়না চিরুনি, চুলের ফিতে, মান্ধাতা আমলের একটি হিমানীর কৌটো। যার ছিলো, তাকে লোকে বলে বউ। কিছু না নিয়ে যে পালিয়েছে দশ বছর ঘর করে।

সহসা একটা পাশবিক যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে যায় বিশু কয়েক মুহূর্তে। এই ঘরে আসে অন্ধকারে, কোনোরকম দুটি খেয়ে, থাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। আর একলা ঘরটা অন্ধকারে ওঠে তার নিজের লীলায় মেতে। সে লীলা ভয়ংকর খেলা করে শুধু বিশুর রক্তে রক্তে।

কিন্তু কালকের একটা রাত্রেই বিশু সব দিয়েছে ভেঙে তছনছ করে। এ ঘরটা আর সে ঘর নেই। এবার ফেলে দিতে হবে এগুলো।

বেঁধে নিজেরটা নিয়ে, মাটির শানকিতে দিলো মেয়েটাকে বেড়ে। বললো, 'জলদি, জলদি সাটো, সেঁটে আবার গিয়ে কোথাও দাঁড়াও, তুলে নেবে এখনও অনেকে।'

খায় মেয়েটা। দেখে দেখে, আবার একটা অন্ধ আক্রোশ ওঠে ক্রমে বিশুর মনে। যেন রাখলে থাকে, তাড়ালে যায়। গাছ, তুমি কার? যে যখন বসে, তখন তার। তবে চল হামুক দিকে।

কিন্তু এ আবার চলে না। কাঠ তো কাঠ। প্রাণ আছে, তবু প্রাণহীন। কিন্তু খায়। চোখ আছে, চায় না, তবু যেন দেখে। এ কেমন জীব! কুটে কুটে মেরে ফেললেও বোধ হয় এমনিই থাকবে।

খেয়ে উঠে বাসন মাজলো বিশু ঘরেই। ঘরের ভিতরের থেকেই ফুটো দিয়ে জল যায় বাইরে। মেয়েটাকে উঠলো খেকিয়ে, 'এঃ, আমার নববধূ এলেন, সব দিতে হবে বাড়িয়ে।'

বলে জল খাওয়ার ঘটিটা দিলো বাড়িয়ে। মেয়েটা জল খেয়ে এক মুহূর্ত বসে রইলো। তারপর শানকি নিয়ে উঠে এগোলো দরজার দিকে।

বিশু হেই হেই করে উঠলো ওই, ওই, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? আমার ইজ্জত নেই, লোকে দেখতে পাবে না তোকে? শানকি রাখ্। ধুয়ে নিই তো নেব, নইলে ফেলে দেব।'

বলে সে তার নীল কুর্তা পরলো। জামা গায়ে দিয়ে হাতে নিলো গামছাখানি। তালা চাবি দিয়ে থমকে দাঁড়ালো এক মুহূর্ত।

মুখটা মেয়েটার ক্লিষ্ট, কিন্তু কোমল। ছেঁড়া কাপড়টার ফুটিফাটায় উঁকি দিয়ে রয়েছে নারী-প্রত্যঙ্গ। কী হয়, আজকের রাতটা রেখে দিলে! কেউ বলবার নেই, বাধা নেই। পড়ে-পাওয়া জিনিস। দাবিদার নেই, দেহজীবীনীও নয়, আর কী-ই বা চুরি করতে পারে এ ঘর থেকে।

বললো, 'এই, এই, হাত ধুয়ে নে বসে থাক্ ঘরে।'

বলে বাইরে থেকে তালা মেরে চলে গেল বিশু।

কোম্পানির আড়তে এসে প্রথম দেখা দারোয়ানের সঙ্গে, টিপটিপে বৃষ্টিতে এখনও বর্ষাতিখানা জড়ানো। কুতকুতে চোখে হাসলো শুধু।

ভন্টা ততক্ষণের ওয়াগন ভর্তি করেছে। বিশুকে দেখে হেসে বললো, 'কেমন লাগল বিশুদা?'

বিশু নিঃশব্দে গিয়ে বসলো হুইল চেপে 'কোথায় যেতে হবে আজ?'

ভন্টা তেমনি হেসেই জবাব দিলো, 'বানাঘাট। যদি এই দুর্যোগে রাস্তা ঠিক থেকে থাকে। কিন্তু বিশুদা, বললে না, সারা রাত রেখেছিলে নাকি?'

বিশু শুধু বললো, 'না।'

তারপর ফিরে বললো, 'বাবুকে বলে আয়, আজ এক ট্রিপের বেশী মারতে পারব না. শরীর খারাপ।'

বলে সে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ব্যাক করলো। ভন্টা বললো, হি-হি করে, 'এক রাত্রেই?'

সেই একই কালো আকাশ, গুড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আর [illegible] বাতাস। কখন দুপুর, কখন বিকেল, কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ফেরবার পথে ভন্টা বললো, 'আজকেও যদি ও রকম একটা পাওয়া যেত মাইরি।'

ফিরে যখন এলো তখন প্রায় ছটা, কিন্তু রাত নেমেছে যেন এর মধ্যেই। বাতি জ্বলছে পথে পথে। বিশু এলো তার খালের ধারে অন্ধকারে। এলো যেন পৃথিবীর দুর্গম পাতালে।

এলো, তালা খুলে ঢুকলো ঘরে। নিকষ অন্ধকার, সাড়াশব্দ নেই। মরে গেল নাকি? পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে বাতি জ্বাললো। দেখলো, বসে আছে মেঝেয়ন আছে, তবে তেমনি অনড় নিশ্চল।

বিশুর এবড়ো-খেবড়ো কালো মুখে কিলবিল করে বেড়াতে লাগলো একটা অস্পষ্ট হাসি। ঘোর হল চোখের রক্তাভা। রক্তকোষে দাপাদাপি করেছে সারাদিন একটা আসুরিক উন্মাদনা। দরজা বন্ধ করে খাটিয়ায় বসে জিজ্ঞেস করলো বিশু, নাম কী! এই?'

শব্দ নেই। শুধু বেড়ার গায়ে বাতাসের চাবকানি।

—হুঁ। নাম নেই? কোত্থেকে আসা হয়েছে পথে?

সাড়া নেই। যেন মানুষ নেই এ ঘরে। টালির চালে বৃষ্টির টিপ টিপ। যেন মরার সঙ্গে কথা বলছে বিশু। বোবা নাকি। চালাকি হচ্ছে। গলা টিপে দিলে আপনি শব্দ বেরুবে।

খপ করে টেনে তুলে ধরলো সে মেয়েটাকে। গায়ে হাত দিতে গেল, কিন্তু তেমনি শক্ত কঞ্চির মত। শক্তি নেই আধ-কাঁচ্চা, তবু মচকাবে না। জোর করে হাত দিলো।

ভেঙে ফেলতে চাইলো ঝাঁকানি দিয়ে। তবু শক্ত, কালকের চেয়েও শক্ত। ও, পেটে পড়েছে বলে বুঝি?

প্রচন্ড আক্রোশ ও রক্তের এক অসহ্য তাড়নায় নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করলো সে মেয়েটাকে।

ভাবলো, এই আজব জীবকে সে কী করবে।

তার পরদিনও একই ভাবে তৈরী হলো বিশু। শোধ দিলো মেয়েটাকে খাইয়ে, একই ভাবে। তারপর বললো, 'এই, এই, তুই চলে যেতে চাইছিস না কেন, আঁ? তাকা, তাকা আমার দিকে।'

এই প্রথম পালিত হলো নির্দেশ। মেয়েটা তাকালো বিশুর দিকে। দেখেই বিশু প্রায় আগুন চাপা দেওয়ার মত হাত নেড়ে বলে উঠলো, চোখ নামা, চোখ নামা নামা। আরে বাবা, কিসের চোখ রে বাবা।'

উঠে বাইরে গিয়ে দেখলো,কেউ আছে কি না আশেপাশে। কেউ না। মেয়েটাকে কেউ দেখতে পায়। না, কেউ নেই। সবাই নৌকো থেকে মাল তুলছে বোধ হয়।

ফিরে মেয়েটাকে তুলতে গিয়ে থমকে গেল। তাকাচ্ছে বারে বারে চোখ তুলে। আলগা চোখ ভাসছে নাকি মেয়েটার। পড়ে যাবে না তো টুক করে। আচ্ছা আর-একটা রাত থাকলেই বা আমাকে মারে কে।

কে যেন বলে উঠলো, কেউ না। চমকে শুনলো বিশু, মন বলছে। বলছে সংসারের দুটি জায়গায় তোর পুরো স্বাধীনতা। একটা স্টিয়ারিং হুইল আর একটা এই মেয়েটা।

হঠাৎ নজরে পড়ে গেল রঙচটা পুরনো স্যুটকেসটা। খুলতে গেলে কেউ কি চেঁচিয়ে উঠবে? দেখা যাক। না বেশ নিঃশব্দেই খুলে গেল। হ্যাঁ, পথে ঘাটে তো নয় ছেঁড়া ন্যাকড়াটা থাক। একটা লাল শাড়ী আর একটি জামা ছুঁড়ে দিলো সে মেয়েটাকে। কাল আবার কেড়ে নিলেই হবে।

তারপর বেরিয়ে গেল তালা বন্ধ করে।

ফিরতে একটু দেরি হলো কালকের চেয়ে। একেবারে নেশা এলো বিশু। বৃষ্টি আজ আরও প্রবল। খালের জল পথে উঠব উঠব করছে, কাদা ভেঙে ভূতের মতো এল, যেন সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘরে রেখে গেছে চোলাই করা মদ। গিলবে আকণ্ঠ।

তালা খুলে বাতি জ্বালল।

গায়ে চুলে কি জল দিয়েছে, না আঁচড়েছে। কিছুই করে নি, কেবল সে দেখাচ্ছে ওই রকম।

ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে খাটিয়ায় বসলো বিশু। তাকাচ্ছে মেয়েটা থেকে থেকে। বাঙ্গাত্মক হাসিতে ভিতরে ভিতরে ফুলে উঠলো বিশু। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। এবার দেখলে সবাই ঘরে তুলে নেবে।'

মেয়েটা তেমনি নিঃশব্দ, নিঃস্পন্দ। আলো পড়ে শাড়িটায় রঙ লেগেছে ঠিক যেন

আবার বললে 'কেউ আছে-টাছে কোথাও?'

—'না।'

—চমকে উঠলো বিশু। কে কথা বললো। ঘরের চারপাশে তাকালো। যেন বিশ্বাস করতে পারে নি, মেয়েটা কথা বলেছে। এ ঘরে, মেয়েমানুষের গলা শুনলো নাকি সে। বোধ হয় পরখ করার জন্যই বললো, 'স্বামী নেই?'

—'না।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটে না বিশুর। করুণ আর শান্ত স্বরটা কি ওই মেয়েটারই।

—'কোথায়?'

—'জানি নে।'

এই তো, কথা ফুটেছে তা হলে। কিন্তু কেমন যেন আশ্চর্য রকম বিস্মিত ও অস্থির মনে হচ্ছে মেয়েমানুষের গলা শুনে। তবু বিদ্রূপ করে বললো, 'ফেলে পালিয়েছে বুঝি?'

—'হুঁ।'

—'কোত্থেকে আসা হয়েছিলো?'

—'দক্ষিণ থেকে।'

—'পেটে খেতে না পেয়ে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ছেলেপুলে নেই?'

—'মরে গেছে।'

—'আর তুমি কী করছিলে পথে পথে?'

আবার নিঃশব্দ। একটা-কিছু বাজে কথা বলার তালে নিশ্চয়ই। বিদ্রূপে ও রাগে অসমতল মুখটা বিশুর ভয়ংকর দেখালো। বললো, 'কী করছিলে বলো।'

একটু যেন নড়ল শাড়িটা। আবার শোনা গেল, 'কী আর করব! যার যা খুশি তাই করছিলো।'

খাটিয়াতে যেন জমে গেছে বিশু। বললো, 'মানে? মানে, এই আমার মত?'

—'হ্যাঁ, একরকমই।'

রাগে বিস্ময়ে, ঘৃণায় মস্তিকটা কয়েক মুহূর্তে একেবারে শূন্য বোধ হলো বিশুর। একেবারে সহসা ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলো মেয়েটার গালে। চাপা গলায় গর্জাতে লাগলো, 'অসৎ খারাপ মেয়েমানুষ কোথাকার!'

মেয়েটা তাকিয়ে রইলো হাঁ করে। কেন, মারলে কি যন্ত্রণাও হয় না নাকি। কাঁদেও না: চোখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো বিশু।

চোখ ফেরালো আবার। শাড়ি-পরা একটা মেয়েমানুষ। মুখে কি চুরি করে তেল মেখেছে নাকি! এত তেলতেলে দেখাচ্ছে যে! জামাটা ঢলঢলে, তাই নেমে গেছে বুকের অনেকখানি। হাতগুলি এত ঢলঢলে, কেমন যেন একটি অপুষ্ট করুণ ভাব ফুটে রয়েছে।

রক্তের মধ্যে উঠলো কলরব করে। আবার টেনে তুলে ধরলো মেয়েটাকে!

এ কী। আরও শক্ত কঠিন খুঁটির মত নিশ্চল। খেয়ে যা হয় নি, প'রে আরও বেশী হয়েছে। তেজ বাড়ছে যে! ভাঙা দোমড়ানো নিঃশেষের এত বাধা।

কিন্তু এদিকেও সবল ভয়ংকরতা। বাধা শুধু আক্রোশকেই বাড়াচ্ছে।

বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব গাছে গাছে বাধা পেয়ে শুধু মাথা মুচড়ে দিচ্ছে। তীব্র বুড়ো গলায় যেন হাঁক দিচ্ছে বাতাস। কোন বস্তিতে চেঁচাচ্ছে একটা শুয়োরী। খাল থেকে মাল-নৌকার মাঝি ভয়ার্ত ডাক দিল, 'হুঁশিয়ার।

এক কোণে পড়ে আছে বিধ্বস্ত মেয়েটা। আক্রোশ ও অবসাদ মিলিয়ে কেমন একটা গলায়-কাঁটা-ফোটা পশুর মতো দেখাচ্ছে বিশুকে।

পরদিন তাড়াতে গিয়েও মুখে কথা আটকে গেল বিশুর। কেন? আক্রমণ বিতাড়ন, সব-ছিল তার। পথ থেকেই। তারই ইচ্ছা। কিন্তু কোনখান দিয়ে সেটা কিছু বর্তেছে মেয়েটার ওপরে, টের পায় নি। মেয়েটা নিজে না গেলে কি সে তাড়াতেও পারবে না? বেরুবার আগে ঝেঁজে উঠল,

যাবি কি না তুই এ ঘর থেকে?

মেয়েটি নিঃশব্দে শুধু চোখ তুলে তাকালো।

—আচ্ছা, দাঁড়া, রাতে এনেছি, তোকে রাতেই দিয়ে আসবো ফেলে!

এলো রাত। বৃষ্টি নেই। বাতাসে লেগেছে মন্দা।

দরজা খুলে দাঁড়াল বিশু ঘরে। আলো জ্বেলে দেখল, বসে আছে মেয়েটা। ঘর-দোরে কোথাও কি হাত পড়েছে নাকি মেয়েটার? উনুনটা কি লেপা হয়েছে? ঘর মোছা কিংবা খাটিয়াটি সাজানো?

কিছু নয়, মেয়েমানুষ ঘরে থাকলেই ওরকম মনে হয়। যেমন মনে হচ্ছে, মেয়েটা আজ সত্যি সত্যি যেন চিরুনি চালিয়েছে মাথায়।

অসতের জাদু। খাসা। মুখে একটা দৃঢ় নিষ্ঠুরতা বিশুর। মেঘে মেঘে গেছে সময়, 'আর নয়। পথের জঞ্জাল এবার ফেলে আসতে হবে পথে। কাপড়টা? থাক্। বললো, 'ওঠ।'

উঠলো মেয়েটি। আশ্চর্য রকম কথার বাধ্য মেয়ে। বিশুর মাথায় এলো মর্মান্তিক বুদ্ধি। খপ করে সিঁদুরের কৌটোটা নিয়ে মেয়েটার কপালে তার ধ্যাবড়া আঙুলের একটা টিপ পরিয়ে দিলো। বললো, 'চলো এবার, রাস্তায় দাঁড়াবে।'

শুষ্ক কিন্তু প্রায় আলগা চোখ দুটি তুলে মেয়েটি তাকিয়ে রইলো বিশুর দিকে। বিশুর মুখে পড়েছে মেয়েটিরই ছায়া।

বিশু ঢোক গিলছে। চোখও ফেরাতে পারছে না, নড়তে চড়তে গেলেও কোথায় যেন ছুঁচ ফুটছে। তীব্র বিদ্রূপে হাসতে গিয়ে মোটা ঠোঁট দুটি ঝুলে পড়তে চাইছে। চিৎকার করে উঠতে চাইছে, বেরিয়ে যা, যা বলছি। কথা বলতে পারছে না।

চোখ ফেরালো অন্য দিকে। আবার তাকালো। ঘোমটা গেছে খসে মেয়েটার। বুকটা উঠছে নামছে নিশ্বাসে।

মনে হলো, বক্তের দাপাদাপিটাই আবার শুরু হচ্ছে। যাবার আগে আবার সেই ভয়ংকর পাগলামিটা আসছে।

দু হাত বাড়িয়ে সে ধরলো মেয়েটাকে। এই প্রথম, শুধু শক্ত নিশ্চল নয়, দু পা পেছিয়ে গেল মেয়েটা। মুখ নামিয়ে বললো, 'কেন?'

'কেন?' রাগের চেয়ে বিস্ময়ের মাত্রাই ছাড়িয়ে গেল। এবড়ো-খেবড়ো মুখের চামড়ায় গেল ঢেউ খেলে। সে প্রতিধ্বনি করলো, 'কেন?'

মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত চাপা গলায় বললো, 'হ্যাঁ, কেন, কেন?'

'কেন, কেন!' রাগ নয়, আক্রোশ নয়, একটা ভয়ংকর অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে, কী রকম যন্ত্রণা হতে লাগলো বিশুর। একটা ছোট কথা, চাপা স্বরে, 'কেন' সব ভয়ংকরতাকে গ্রাস করতে পারে এক এক সময়ে! সত্যি কেন? কোনো কারণ নেই তো।

তীব্র চাপা গলায় বললো দরজার দিকে হাত দেখিয়ে, 'যাও যাও, চলে যাও এখুনি চলে যা।'

মেয়েটি এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, পা বাড়ালো দরজার দিকে। সরে যাচ্ছে ছায়াটা। চলে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে বিশু ডাকলো, 'শোন!'

দাঁড়ালো মেয়েটি। কাছে গেল বিশু। প্রায় চোরের মত মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল।

মেয়েটির চোখে জল। গাল বেয়ে পড়ছে টপটপ করে। আর দপদপ করে জ্বলছে ধ্যাবড়া একটা সিঁদুরের টিপ, দুই ভ্রূর মাঝখানে।

বিশুর প্রকাণ্ড বুকটার পেশী আকুঞ্চিত হলো। আর মনে হলো, ফেটে ফেটে, তার চারপাশ দিয়ে কী তবল পদার্থ যেন উপছে ঝরে পড়ছে। মেয়েটির মুখ তুলে ধরে ফিসফিস কবে বললো, 'নামটা বলো নি তো তোমাব?'

ভাঙা সরু গলা শোনা গেল, 'ফুলমণি।'

বিশু রুদ্ধ গলায় বললো, 'তুমি কাঁদছ কেন ফুলমণি?'

ফুলমণি কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে, তাবপর উচ্ছ্বসিত হযে!

পরদিন সূর্য দেখা দিলো আকাশে, নোনা বিলেব ওপাব থেকে দুষ্টু ছেলেটি বাঙা মুখখানি তুললো। যেন এতদিন লুকিয়ে কী এক খেলা দেখছিলো বিশ্বের!





উজান

'শালাদের খালি গান, ফুর্তি, গল্প, ঝগড়া। নিকুচি করেছে তোর--'

ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরের নিরালা কোণের অন্ধকার ছেড়ে প্রায় একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত এসে নারাণ বেমালুম দুই থাপ্পড় কষালে গাইয়ে বেচনের গালে।

বেচনের সঙ্গে সমস্ত আসরটাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ক্ষ্যাপা নারাণের দিকে। একে শনিবারের সন্ধ্যা, তায় কাল কারখানায় রবিবারের ছুটি। আসরের আর দোষটা কি?

দোষ নারাণেরও বা কোথায়? একে লোকজনই সহ্য হয় না, তায় আবার গান, বাজনা, ঢলাঢলি, হাসাহাসি।

এই আধো অন্ধকারের নারাণকে একটা সাংঘাতিক কিছু মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা ভূতে পাওয়া মানুষ। চোখে তার ক্ষিপ্ততা নেই, আছে অসহ্য চাপা যন্ত্রণার ছাপ। গোঁফ জোড়া অনেক দিন কাটছাঁট না হওয়ায় অসমানভাবে ঝুলে পড়েছে। মুখের হাড় বেরিয়ে বাঁকাচোরা অনেকগুলো রেখা সুস্পষ্ট হয়ে তাকে একেবারে বুড়ো করে ফেলেছে এ বয়সেই।

সে চাপা গলায় প্রায় টেনে টেনে আর্তনাদ করে উঠল, 'শালার জগতে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, কল-কারখানা, গান, সোহাগ আর কাঁহাতক সওয়া যায়? পঙ্গপালের জাত এ মানুষগুলোন, শালা একদিনে সাবাড় হয় না কেন? অ্যাঁ, কেন হয় না?'

কিন্তু বেচনও ছেড়ে দিলে না। সে প্রায় লাফ দিয়ে সজোরে এক ঘুষি মারলে নারাণের মুখে।—'শালা, তবে যা না, সাধু হয়ে বনে বনে ঘোরগে। এখানে কেন?'

সবাই ভাবলে, এখনি একটা মারামারি শুরু হয়ে যাবে এবং একটা শোরগোল উঠল সেই রকমের। কিন্তু কিছুই হল না। কারণ, নারাণ একেবারে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল মুখে হাত দিয়ে।

আসলে সে তো মারামারি করতে আসে নি। এসেছে, আর চুপ করে থাকতে না পেরে। মানুষের কোন কিছুই যে তার সহ্য হয় না। কোন বন্ধুর দুটো কথা বল, মেয়েমানুষের একটু হাসি মস্করা বল, ছানা-পোনার একটু সোহাগ বল, মায় কারখানা, কাজ, বস্তি কিছুই তার ভালো লাগে না। মানুষের সমাজ তার কাছে বিষের মত লাগে। অথচ সে একটা কাজের মানুষ। বনস্পতি ঘিয়ের কারখানায় সে কাজ করে। হাঁকে, ডাকে, হাসিতে, গানে সেও কিছু কম ছিল না।

তবে হ্যাঁ, তখন তার বউ ছিল, তিনটে ছেলে-মেয়ে ছিল আর বউটা ছিল যেমনি চেহারায় শক্ত, তেমনি এক মুখেই কত কথা, ঝগড়া, হাসি, সোহাগ। তিনটে ছেলে-মেয়ে কাছে কাছে ঘুরত, যেন ধাড়ি শুয়োরের পায়ে পায়ে ফেরা বাচ্চাগুলো।

সেগুলো বছর ভরে ভুগল, পাকিয়ে-পাকিয়ে গেল। তারপর মরল একটা-একটা করে।

আগে যেমন রাগলে নারাণ বলত, 'তোরা মলে আমার হাড় জুড়োয়', ঠিক তেমনি করে মবল। কিন্তু একে ঠিক হাড় জুড়ানো বলে কিনা, সেটা ঠাউরে উঠতে পাবল না সে।

সেই থেকে মানুষই যেন তার কাছে বিষ হয়ে উঠল। মানুষকে সে ঘৃণা করে। গান বাজনা তো দূরেব কথা, কোন বউ-সোয়ামীকে এক রত্তি হাসতে দেখলে তাব ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করে। আসলে, এ সবই তার কাছে মিথ্যে, ভাঁড়ামি, শয়তানি।

কে নাবাণেব নাম ধবে ডাকতেই সে আসরের সকলেব দিকে তাকিয়ে দেখল। এব মধ্যে অনেকেই তার প্রাণেব বন্ধু, বেচনও তাই। আর সকলেই তাব দিকে করুণাভবে তাকিয়ে আছে যেন সে কেমন অসহায় অস্বাভাবিক একটা জীব। ঝি-বউরা এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন মরদ নাবাণেব সব শোক পাবলে ওবা তখন হবণ কবে নিত।

এতগুলো চোখকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘৃণায ও যন্ত্রণায বি-রি কবে উঠল তাব গায়ের মধ্যে। এখনই হয়তো সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে আসবে, যেন কতই ভালবাসে।

পিশাচ-তাড়িতের মত সে সেখান থেকে ছুটে বেবিয়ে গেল। কিন্তু সর্বত্রই মানুষেব ভিড় হাসি, গান, কান্না, মারধোব, হল্লা। যেন, প্রেতের তান্ডবলীলা, জানোয়ারেব সংসার।

শেষটায় সে গেল বাবুসাহেব দীনদযাল সাহুব কাছে তাব ধাপাব মাঠের কাজের জন্য। সে জানত, বাবুসাহেব এক জোড়া লোক খুঁজছে, স্বামী আব স্ত্রী। নাবাণ জোব দিয়ে বলল, সে একলাই সব কাজ কবতে পাববে, তবু মাঠের কাজটা তাব চাই-ই। যতই অল্প পযসা হোক, একটা পেট তো। দুনিযাতে সে কাব ধাব ধারে? দীনদয়াল ভাবী অবাক হলেও কাজটা তাকেই দিয়ে দিল।

পরদিনই নাবাণ তার খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে, ইযাব-বন্ধুদেব হাজাব অনুবোধ উপরোধ ঠেলে, অমন একটা ভাল কাজ ছেড়ে চলে গেল পুবেব জন-মানবহীন শূন্য মাঠে।

শহর ছাড়িয়ে বেল লাইন। এপাবে মযলা বিশুদ্ধীকবণের যন্ত্রঘর, ওপাবে চাবটে বড বড পুকুব, তাতে চালান যায় যন্ত্রেব ভেতরেব সব নির্দোষ শেষাংশটুকু। তাবপবই মাঠ, লোকে বলে ধাপা।

তারপব তার পূব সীমানায একখানি মেটে ঘর। আব খানিক পুবে মিউনিসিপ্যালিটিব সীমানা ধবে সুদীর্ঘ গভীব খাদ কাটা। তাব ধাবে কতগুলো মবকুটে খেজুব আব কুল গাছেব সারি ধান ক্ষেতেব সীমানায়। সেটাও পুবে আর উত্তব-দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত, তাব ওপারে ধু-ধু করে একটা গাঁযেব কালচে রেখা।

দীনদয়াল সাহু এবাব মাঠেব ডাক নিযেছে, উদ্দেশ্য তবকাবি ও পুকুবে মাছেব চাষ। চাষ বলতে বেগুন, কপি ইত্যাদি।

এখানে এসে বিস্ময়ে ও আনন্দে নারাণ যেন মাতাল হযে উঠল। তাব ছোট্ট ঘব, পাশে বিস্তৃত একটি মাত্র পিটুলি গাছ। তাবপব যেদিকে চাও শুধু মাঠ আব মাঠ। লোক নেই, জন নেই, নিঃশব্দ, বিস্তৃত, উদাব অসীম আকাশ। সেই শূন্যতাকে দু-হাতে সাপটে ধবে সে যেন শিশুব মত বিচিত্রভাবে হেসে উঠল, অসীমেব মাঝে সে একান্ত হয়ে গেল যেন নির্জনতাব মধ্যে একটানা ঝিঁঝিব ডাকেব মত।

কোন ভিড নেই, কোলাহল নেই, মানুষেব সামান্যতম চিহ্ন নেই, এখানে শুধুই সে। নিশ্বাসেব পব নিশ্বাসে বুকটা তাব খালি হয়ে গেল। ঝড়ের পব এক মহাপ্রশান্তির শব্দহীন

নিস্তব্ধতা। সেই শৈশবের কল্পনায় মনে হল, আকাশের অশরীরীরা এখানে এই ঘরেরই আনাচে-কানাচে চলাফেরা করেন। আহা ! জীবনটাকে যেন ফিরে পাওয়া গেল।

হেমন্তকাল। নারাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রথমে আরম্ভ হয় বেগুনের চারা রোনা, আর একদিকে ফুলকপির। আরো খানিক দীর্ঘ জায়গা তৈরি করে রাখল বাঁধাকপির জন্য। পশ্চিম ঘেঁষে দিল গাজরের বীজ ছড়িয়ে, ঘরের পাশে করল বিলিতি বেগুনের ক্ষেত।

কোনখান দিয়ে সময় কাটে, নারাণ যেন চোখের পলকে ঠাওর পায় না। সেই ভোর থেকে কাজ শুরু হয়। দেখতে দেখতে বেলা হয়। তখন সে রান্না করে। খেয়ে খানিকক্ষণ খাটিয়াটাতে শুয়ে মুখে গামছা চাপা দিয়ে থাকে। তারপরেই আবার কাজ। সন্ধ্যা নেমে আসে, তারই মাথার উপর দিয়ে নানান পাখির দল বাড়ি ফিরে যায়। সে রেললাইনের ওপারের কল থেকে জল নিয়ে আসে, রান্না করে। তারপর কোন কোনদিন বসে থাকে তার ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া পেতে.নয় তো 'তালা-চাবি-কারিগরি' বা 'স্বাধীন ব্যবসা' নামের বই, অথবা কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ খুলে বসে। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুমোয়। মাস-খানেক পরে কাজ একটু কমে এল তার। যা চাষ হয়েছে এখন তাকে বাঁচানোই সবচেয়ে বড় কাজ। পোকা মারা, আগাছা বাছা, জল নিকাশের পথটা পরিষ্কার করা। জায়গাটাই সারের জমি, তবুও সে নানা রকম সার নিজে তৈরি করে।

এই অখন্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কোন-কোন সময় সে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমন্তের আকাশে থেকে থেকে সাদা মেঘ কেমন করে আকৃতি বদলে ধীরে ধীরে উড়ে যায়, তাই দেখে তার সময় কেটে যায়। কখনো শালিকের ঝগড়া ও ঝুটোপুটি খেলা দেখে হেসে ওঠে। পায়রার ঝাঁক উড়ে আসে, ধাপার মাঠের পোকার লোভে আসে বকের দল। কাঠবেড়ালি এলে তাড়া করে, ওরা কচি পাতা পেলেই সাবড়ে দেয়।

রোজ ভোরবেলা ওই পিটুলি গাছটায় অসংখ্য পাখির কাকলীতে আগে তার ভারী বেজার লাগতো। ভেবেছিল, ওটার ডালপালাগুলো কেটে দেবে, যাতে আর পাখি বসতে না পারে। পরে সে পাখিদের এ দাবিটা মেনে নিয়েছে।

সকালবেলার দিকে পশ্চিমের ময়লা-বিশুদ্ধির যন্ত্রটার ওদিকে কিছু কথাবার্তা শোনা যায়, কোন-কোন সময় পুবের মাঠ থেকে ভেসে আসে হাঁকডাকের শব্দ, গোরু বাছুরের হাম্বা রব। তার ছোট ঘরটাকে কাঁপিয়ে এবেলা ওবেলা যায় অনেকগুলো রেলগাড়ি। তার এ জনহীন প্রান্তরে আগে এসব বিরক্তির কারণ হলেও এখন আর তার তেমন কোন কৌতূহল নেই, এসব কানেও তেমন যায় না।

এর মধ্যে বার দু-তিনেক দীনদয়াল এসেছিল। কিন্তু নারাণ এমনভাবে কোন কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকত যে, দীনদয়ালের বিস্ময় আর বিরক্তির সীমা থাকত না। তবু কিছু বলত না কারণ, সত্যি একলা মানুষটা কি করে মাটির বুকে এত সম্ভারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে ভাবলেও অবাক লাগে। নারাণের মাথাটা খারাপ বলে ধরে নেয়। কিন্তু লোকটার আগমনে নারাণের বিরক্তি আরও বাড়ে।

প্রায় রোজই একটা হলদে কুকুর কোত্থেকে সকালবেলা এসে তার গা শুঁকতে আরম্ভ করে, খেলার ভঙ্গি করে, ছুটে দাওয়ায় ওঠে। রাগে তার সর্বাঙ্গে জ্বলে যায়। মারলে ধরলেও আবার ঠিক আসে।

গৃহস্থের কোন পোষমানা প্রাণীও এখানে তার অসহ্য লাগে।

শুধু মনটা নয়, চেহারাটাও নারাণের কেমন বদলে গেছে। মুখটা যেন ভাবলেশহীন বোবার মত, সমস্ত নৈঃশব্দ্য যেন সেখানে এঁটে বসেছে। সে নিজে একটি কথাও বলে না, এমন কি একটু গুন্‌গুন্‌ও' করে না। তবু এ মাঠ ও আকাশের সঙ্গে যেন তার একটা নিয়ত বিচিত্র ধারার বিনিময় চলেছে, তার কোন শব্দ নেই।

কেবল ভর দুপুরবেলা যখন মাঠ ও আকাশ কেমন ঝিম মেরে থাকে তখন ওই আকাশের বুক থেকে চিলের তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ আর্তস্বরে বুকের মধ্যে কেমন ধক্ করে ওঠে। মনে হয় যেন কোন শিশু মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করছে।

এমনি রাতেও যখন কোন পাখি বিলম্বিত সুরে ডেকে ওঠে, তার বুকের মধ্যে যেন দম আটকে আসে। মনে হয়, বুঝি কোন বউ কাঁদছে ক্ষুধা ও রোগের যন্ত্রণায়। তখন সে একটা নিশাচর প্রেতের মত সারা মাঠে প্রায় দাপাদাপি করে ফেরে। মাঠটা যেন তাকে গিলতে আসে।

এই সঙ্গেই কতগুলো ছবি পর-পর তোর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার ফেলে আসা জীবন, তার পরিবেশ, সে জীবনের ঝড়ো বেগ, তার কলকোলাহল, তার কাজের উদ্দামতা। এক কথায় একটা বন্যার পাগলামি।

কিন্তু আবার তার মনটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সে নতুন করে সীম, লাউয়ের মাচা বাঁধতে আরম্ভ করে, তে-কোণ জমিটাকে তৈরি করে মটরশুঁটির জন্য।

হেমন্ত গিয়ে শীত এসে পড়ে।

পাতাল থেকে কচি শিশুর মুখের মত যেন একটু-একটু করে ফুলকপি তার পাতার আড়াল মেলে দেয়। বড় বড় নধর বেগুন উঁকি দেয় বড়-বড় পাতার আড়াল থেকে। অনুক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় ইঁদুর আর বেজীর জন্য। সোনার মত গাজরগুলোর জন্যে ওদের নোলা ছোঁক-ছোঁক করে।

তারপর কাজের শেষে সেই আকাশের মুখোমুখি বসে থাকা, এই প্রকৃতিরই একজনের মত মিশে যাওয়া। একি জীবনের মধ্যে গা মেলে দেওয়া, শূন্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়া বোঝা যায় না।

আরও একটা মাস কেটে গেল।

এমনি একদিন সকালবেলা বাঁধাকপির গোড়াগুলোতে সে মাটি তুলে দিচ্ছে। এমন সময় দেখল, ধাপা ও ধানক্ষেতের সীমানায়, যেখানটায় খাদ খুব সরু এবং ঝোপঝাড়শূন্য খানিকটা ফাঁকা, সেখান দিয়ে একটা মেয়েমানুষ কোলে একটা বছর দু-তিনেকের বাচ্চা ও মাথায় একটা শাকের চুবড়ি নিয়ে লাফ দিয়ে তার সীমানায় এসে পড়ল। নারাণের মনে হল, লাফটা যেন তার বুকেই পড়েছে। অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ চোখে সে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

মেয়েমানুষটি নারাণকে দেখতেই পায় নি। সে তার কালো শক্ত পুষ্ট শরীরে দৃঢ় পদক্ষেপে ডাগর-ডাগর চোখে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা কৌতূহল ও সংকোচ নিয়ে সোজা নারাণের উঠোনে গিয়ে প্রথমে ছেলেটাকে নামাল, তারপর শাকের চুবড়িটা। সেয়ানা বয়স, কপালে সিঁদুর নেই। সে কয়েকবার উঁকি-ঝুঁকি দিল, ভ্রূ টেনে আপন মনে বুঝি একটু হাসল, তারপর এই মাঠের সমস্ত নৈঃশব্দ্যকে যেন মুহূর্তে ঝংকৃত করে তার সরু মিষ্টি গলায় ডেকে উঠল, 'কই গো, কেউ নাই নাকি?'

সে শব্দে যেন মাঠটা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল।

নারাণ তো ক্ষেপে বারুদ। দীনদয়ালই যেখানে পাত্তা পায় না সেখানে কিনা একটা মেয়েমানুষ, একেবারে বাচ্চা নিয়ে। সে রাগে খ্যাঁকখ্যাঁক করতে-করতে একেবারে হামলে পড়ল

এসে, 'কেন, কেন ? কাউকে দিয়ে তোমার কি দরকার ?'

খ্যাকানি শুনে বাচ্চাটা চমকে মাকে জাপটে ধরল। মেয়েটিও একেবারে ভড়কে গিয়ে ডুকরে উঠল, 'ওমা। এ কেমন মিন্‌সে গো বাবা।'

নারাণও যেন স্বপ্নের ঘোরে এক যুগ পরে নিজের গলার স্বরে চমকে গেল। তবুও খিঁচিয়ে উঠল, 'যেমন হই। তোমার দরকারটা কি ?'

কিন্তু সেই ডাগর চোখে ও মিঠে গলায় ভয় ফুটল না যেন তেমন। বলল, 'দরকার আবার কি, বাজারে যাব এট্টু শাক-মাক বেচতে, এখান দিয়ে অল্পে হুস্ করে যাওয়া যায়, তাই।'

কর্কশ গলায় ভেংচে উঠল নারাণ, 'আর হুস্ করে যায় না, ওই ঘুর পথেই এট্টু ঠায়ে যেও।'

মেয়েটি ভ্রূ তুলে বাঁকা চোখে এক মুহূর্ত নারাণকে দেখে এক হ্যাঁচকায় চুবড়িটা মাথায় তুলে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'এঘরে একদিন আমিই ছিলুম, ছিলুম আমার সোয়ামীর সঙ্গে। তার আবার অত কথা কি ? মানুষটা মল, তাই, নইলে ..'

মনে হল ওর গলার স্বরটা যেন ভেঙে আসছে। 'এখন শাক, ঢেরোশ বেচে খাই .. '

'থাক্।' চেঁচিয়ে উঠল নারাণ,'এখন পথ দেখ। শালা যত ঝুট ঝামেলা ।'

মেয়েটি আর একবার তার ভেজা চোখে নারাণের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে ছেলে কোলে নিয়ে ফরফর করে চলে গেল পশ্চিমে।

নারাণের গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে ওই আপদটা, এমনি করে গা ঝাড়তে লাগল সে। মনে হল তার সমস্ত মাঠটা যেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে একেবারে, এমনি ভাবে সে ঘুরে ঘুরে তার বেগুন, কপি দেখতে থাকে। দীর্ঘদিন পরে তার নিঝুম শান্তিকে ছরকুটে দিয়ে গেল মেয়েমানুষটা।

কিন্তু একটু পরেই আবার তার সেই প্রশান্তি নেমে এল, নিস্তরঙ্গ হয়ে এল সমস্ত কিছু। দিনের শেষে সন্ধ্যা আকাশ নেমে এল হাতের কাছে। আর মৌন সন্ধ্যায় রোজকার সেই বিটলে পাখিটা ডিগবাজি খেয়ে ডেকে হেঁকে চলে গেল। ঝরে পড়ল পিটুলির পাতা।

আশ্চর্য! পরদিনও সকালে মেয়েটা এল এবং পুবপ্রান্তে সীমের মাচার কাছেই একেবারে নারাণের মুখোমুখি দেখা।

আর যায় কোথায়। নারাণ খ্যাঁক করে উঠল, 'ফের ?'

মেয়েটার চোখে প্রায় হাসিই ফুটে ওঠে বুঝি। বলে, 'এই মরেছে। তা চটো কেন ?'

নারাণ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'চটি কেন ?'

ছেলেটা মায়ের কোলে কুঁকড়ে যায়। মেয়েটাও হাঁপায়। পথের আলে শিশিরে ভেজা পা দুখানি ধুয়ে গিয়েছে। মুখ চোখও যেন ভেজা ভেজা। গায়ে জামা নেই, শাড়িটাই জড়ানো। তাতেই যেটুকু শীত মানে। গলায় আবার একটা পেতলের হার। বলে, 'তা অতটা ঘুরে যাওয়ার চেয়ে—'

'সবাই যায়।' ধমকে ওঠে নারাণ।

'তা বলে আমিও যাব ?' ভ্রূ তুলে কথাটা বলেই ছেলেকে নামিয়ে, মাথার বোঝাটা নামায়। কোমরে হাত দিয়ে বলে, 'বাব্বা। কম পথ ? কোমর ধরে যায়। পথে একটু জিরনোও হয়। আর .. এলে পরে এখানটায় না এলে মনটা কেমন করে।'

নারাণের বুকের মধ্যে কেমন যেন ধক-ধক করে। যেমন চিলের ডাকে করে ওঠে। কার কথা যেন তার বারবারই মনে আসতে থাকে আর রাগে বিরক্তিতে তার মেজাজ চড়ে যায়।

মেয়েটা বলেই চলে, 'তা-পরে জানো, মিন্‌সেটা ভারী বোকা ছেল। পশ্চিমে দিলে উনুনের জায়গা করে। তা সে বোশেখী রাত ঝড় জল মানবে কেন? আবার আমি উত্তুরে উনুন পাতি, তবে না তুমি ওখানে খুন্তি নাড়তে পার। তা তোমার বুঝি বউ টউ—'

'দুত্তেরি তোর বউয়ের নিকুচি করেছে।' রাগে চিৎকার করে ওঠে নারাণ, 'তুমি ভাগবে কি না! শালা যত আপদ এসে জুটবে এখানে।'

অমনি মেয়েটার চোখেমুখেও রাগ ফুটে ওঠে। বলে, 'অমন মান্‌সের মুখ দেখতে নেই।'

বলে সে ছেলে আর চুপড়ি নিয়ে ফরফর করে চলে যায়। খানিকটা গিয়ে কুঁদলে মেয়েমানুষের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'আমি রোজ যাব, দেখি কি কর তুমি।'

নারাণের ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে ঠেঙিয়ে দেয়। কিন্তু যায় না।

সকালের ছড়ানো সোনার রোদ যেন কালো হয়ে ওঠে, মেয়েটার গোমড়া মুখের মত মাঠটার সমস্ত নীরবতা ও সৌন্দর্য যেন কোথায় উবে যায়। আজ এ মাঠের সঙ্গে মনটাকেও তার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে, এমনিভাবে সে অনেকক্ষণ ছটফট করে ঘোরে। শহরের সেই ঘুপচি ঘরটায় একপাল ছেলেমেয়ে আর একটি বউয়ের কথা বারবার তার মনে আসে আর বলে, 'ভ্যালা আপদ এসে জুটেছে। টকের জ্বালায় পালিয়ে এলুম, তেঁতুল তলায় বাস! শালার দুনিয়ায় কি কোথাও শান্তি নেই?'

কিন্তু একটু পরেই আবার তার শান্তি নেমে আসে। সীমাহীন নৈঃশব্দ্যের মাঝে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজেকে ছড়িয়ে দেয় সারা মাঠে। দাঁড়ায় আকাশের মুখোমুখি, চুপচাপ রাঁধে খায়। পিটুলি ঝরা পাতাগুলো তুলে রাখে। গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে।

পুবের দিগন্তবিস্তৃত মাঠটা ফাঁকা, ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। সেখানে আর কাউকে দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে অনেক ফুলকপি আর বেগুন নিয়ে গিয়েছে দীনদয়ালের লোক। নারাণ যেন কোলের শিশুকে দেওয়ার মত করে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার সেখানে ভরে দিয়েছে নটে পালং।

এ মাঠের কোথাও শস্যহীন শূন্য থাকবে এটা যেন সে ভাবতেই পারে না। শরতের শুঁয়ো পোকার রুদ্ধশ্বাস বেদনায় ভেতর দিয়ে আদায় করেছে নবজন্ম। নতুন পালকে তারা প্রজাপতি হয়ে ভিড় করেছে সীম লাউয়ের মাচায়।

মৌন রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে নারাণ, সে ফুলের বাগান করবে এখানে. অজস্র সাদা আর লাল ফুল। তারপর তার ঘুমন্ত চোখের পাতায় কারা এসে যেন নাচানাচি করে। কয়েকটি শিশু, একটি সলজ্জ হাসিমুখ, ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বিয়ে, কারখানা, বস্তি, মৃত্যু আর শ্মশানের চিতার লেলিহান শিখা।

পরদিন সকালবেলা মেয়েটি আবার এল এবং রোজই আসতে থাকে। আর রোজই চলে সেই চেঁচামেচি, খেঁচাখেঁচি। যত না খিঁচোয় নারাণ, তত জবাব দেয় মেয়েটা।

মেয়েটি এ ধাপার মাঠে কিছুতেই তার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। আর নারাণের পক্ষে এ ঝামেলা প্রাণান্তকর।

কিন্তু মেয়েটির ভাব দেখে এখন মনে হয়, নারাণের তর্জন গর্জনকে সে যেন তেমন আমলই দিতে চায় না। শুনুক বা নাই শুনুক, সে নিত্য নতুন প্রসঙ্গ পেড়ে বসে। কোনদিন বলে, 'তা-পরে জানো, একে বর্ষার রাত,তায় ধাপা, মিন্‌সে আর রাতে ফিরল না। আমি তো ব্যথায়

উল্‌টি পাল্‌টি খাচ্ছি। ভোর রাতে বিয়োলুম এ ছেলে। তাই না এব নাম বেখেছি 'ধাপা'। ও যে ধাপার ছেলে।

কোনদিন বা কুকুরটাকে দেখিয়ে বলে, 'গাঁয়ের থেকে নিয়ে এসেছিল মিনসে, এই এতটুকুন। নাম ওর রাঙি।'আর কুকুরটারওআজকাল আসা বেড়ে গিয়েছে। ধাপা আর তাব মায়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে খেলা কবে। মেয়েটি সারা মাঠে চোখ বুলোয় আব বলে, 'তা বাপু সত্যি, তুমি একটা মিন্‌সে বটে! একলাই যা ফলিয়েছ, চাবজনে তা পাবে না।'

তারপর একটু বা উৎকণ্ঠাভবেই বলে, 'এ তোমাব কি ভূতুড়ে বাই বাপু, ঠাণ্ডাব মধ্যে খালি গায়ে কাজ কব! একটা কিছু জড়িয়ে নিতে পাব না?'

ধাপাব ভয়টাও আজকাল কমে গিয়েছে। সে বেমালুম টলতে টলতে গিয়ে কখনো নাবাণেব ঘবে ঢুকে পড়ে, কিংবা বড বড় রক্তহীবের মত বিলাতি বেগুনগুলো ছিঁড়তে যায়।

অমনি নারাণ তেড়ে গিয়ে শক্ত হাত ছেলেটাকে আছাড দিতে গিয়েও না দিয়ে ওব মায়ের কোলের কাছে বসিয়ে দিয়ে যায়, আব গালাগালি দিতে থাকে।

তাই দেখে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিতে এ নির্জন প্রান্তর যেন শিউরে ওঠে আচমকা। ফিরতি পথেও এখানে হয়ে যায়। আপন মনেই বলে, সেই কখন বেবিয়েছি। দুকুরে দুটো মুড়ি খেয়েছি, এখন গিয়ে বাঁধব, তবে খাব। মোড়লেব বাড়িতে ধান ভানা থাকলে তো কথাই নেই। সেই রাত দু-পহরে খাওয়া।

তাবপর পিটুলি তলায় শুকনো পাতাব উপব ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে এলো চুল আঁট করে বাঁধে। ঘুমন্ত ধাপাকে হয়তো মাটিতেই শুইয়ে দেয়। তখন যেন তাবও নীবব হওয়াব পালা আসে। নাবাণের বিবক্তি-বাগকে তুচ্ছ কবে হঠাৎ মিহি ভবাট গলায় বলে ওঠে, 'আব পাবিনে এ জীবনেব ভাব বইতে। মনে হয় এখেনে অমনি কবে সাবাটা বাত কাটিয়ে দিই। এই এখেনে।'

তাবপব হঠাৎ নাবাণেব কাছে ঝুঁকে পবে ফিসফিস কবে বলে, 'তা বাপু বলে বাখি, এ ধাপাব ব্যামো বড় বিদ্‌ঘুটে। কেমন হাত পাযেব শির টেনে, বেঁকে দুমড়ে মানুষ মবে যায়।' এক মুহূর্ত যেন সে মৃত্যুকে দেখে হুতোশে বলে ওঠে, 'এট্টো সাবধানে থেকো বাপু।'

নাবাণের মনে হয় কে যেন তাব শ্বাসনলিটা চেপে ধবেছে। মেয়েটিব গবম নিশ্বাস আব বিচিত্র ছবি ও কথার গোলমালে তাব মাথাটা ঘুবে ওঠে।

সে হঠাৎ আচমকা তেপান্তব কাঁপিয়ে চিৎকাব করে উঠে, 'যাও যাও · যাও এখানে থেকে।'

ধাপার মা চমকে ওঠে, 'আ মলো। এটা কে বে।' বলে তাড়াতাড়ি ধানকাটা মাঠেব ওপব দিয়ে চলে যায়।

উত্তবেব হিমেল চাপ ঠেলে হুস কবে বা একটু দক্ষিণে হাওয়া আসে। পিটুলিব পাতা উড়িয়ে লাউ-সীমের মাচা সরসবিয়ে, নটে পালং এব মাথা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

'তালা কাবিগবী' আব 'স্বাধীন ব্যবসাব' বই খোলাই থাকে কোলের উপব। প্রদীপেব শিখা পড়তেই থাকে। অসীম বাত্রি আর মহাকাশ, মাঠ আব ঘব সব একাকাব হয়ে যায়। সংসাব নিশ্চল, নিঃশব্দ। এই ভালো, এই শান্তি।

তবু, ধাপাব মা-ই বল, আব মেয়েই বল, সে রোজই যায় আব আসে। সেও যেন দক্ষিণ হাওযাব মত একটু-একটু করে উত্তবে চাপ ঠেলে আসছে। বোজ যেন একটা নতুন উপসর্গেব মত।

হয়তো ঠাট্টা করে বলেই ফেলে, 'আজকেব বাতটা থেকেই যাবো।' কিংবা 'তা পরে জানো,

তোমাকে এ ধাপায় দেখে আমার ভারী ভালো লাগে। তবে মানুষটা তুমি ঠিক নও।'

পুঁচকে ধাপাটাও কখন নিঃসাড়ে এসে কৌতূহলবশতঃ নারাণের পায়ের লোম ধরে টান দেয়।

নারাণ দাঁত খিঁচিয়ে ভাবল, শালা তেল দেও, সিঁদুর দেও, ভবি ভোলবার নয়। আচ্ছা। রাত করেই সে খাদটা যেখানে খুবই সরু, সেখানে হাত পাঁচেক লম্বা একটা খুঁটির বেড়া করে দিল। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমালো।

পরদিন মেয়েটি এসে বেড়া দেখে অবাক হয়ে গেল। যেন বিশ্বাসই করতে পারেনি, এমনি ভাবে বড় বড় চোখে মাঠের চারদিকে নারাণকে খুঁজতে লাগল।

নারাণ লাউ মাচাটার পেছনেই কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল কিছু ধনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। জেনেও সে ফিরে দেখল না।

মেয়েটি বার কয়েক ডেকে-ডেকে চেষ্টা করল ছেলেটাকে বেড়া টপকে এপাশে দিতে। না পেরে আপন মনেই হেসে ফেলল। আবার খানিকটা ডাকাডাকি করেও যখন কিছু ফল হল না, তখন নারাণকে যা-তা বলে গালাগালি দিতে লাগল।

নারাণ লাউ পাতার আড়াল থেকে দেখল, জলভরা দুই ডাগর চোখে মেয়েটা এদিকেই দেখছে কটমট করে, আর বলছে, 'ধাপার ভূত কম্‌নেকার, ওকে যেন চেরকাল মাঠে মুখ দিয়ে পড়ে থাকতে হয়।'

তারপর সে ছেলে আর চুবড়ি নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে হনহন করে চলে গেল ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে।

নারাণের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর নিজেই নিশ্বাসে চমকে উঠে দেখল, বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, ধান কাটা মাঠটা ফাঁকা।

যাক্! যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে নিজের কাজে মন দিল। সেই একই কাজ, একই রকম। কেবল নৈঃশব্দ্য যেন আরও ভারী হয়ে এল।

পরদিন নারাণ কাজে হাত দিতে যায় আর চমকে-চমকে ওঠে কেবলি। চোখ দুটো বার-বার গিয়ে পড়ে ওই বেড়ার গায়ে। ধেনো মাঠটা দুলে ওঠে চোখের সামনে।

তাকিয়ে দেখে বেলা কোনখান্ দিয়ে চলে যাচ্ছে, অথচ কাজ কিছুই হয় নি।

হঠাৎ হাওয়া আসে হু হু করে। পিটুলি গাছটায় আর একটাও পাতা নেই। রুক্ষ, রিক্ত।

মাঠটাও কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। দীনদয়ালের লোক এসে রোজই শাক, তরকারি, সীম, লাউ নিয়ে যায় বাজারে। এই নিয়ম—যত ফলন, তত বিক্রি।

রাত্রি আর আঁধার যেন বড় তাড়াতাড়ি নেমে এসে সব কিছু গ্রাস করে ফেলে। কেবল বোবা রাত্রির চোখে ঘুম নেই।

পরদিনও কাজের মাঝেই দিন কেটে যায়। মরশুম শেষ। মাঠ খালি হয়ে আসছে। কেবল অসহ্য যন্ত্রণাভরা একটা পরীক্ষার মধ্যে প্রাণটা দুমড়ে যেতে থাকে। ওই বেড়াটা যেন মাথার মধ্যে খাঁচার মত ঘুরতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা নারাণ নিঃসাড়ে গিয়ে বেড়াটাকে কেটে ভেঙে খুলে ফেলে দিল। দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে আবার শুয়ে পড়ল। যেন লুকিয়ে চুরিয়ে সে একটা বন্দীশালার দরজা ভেঙে দিয়ে এসেছে। এসে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

পরদিন পলে-পলে বেলা গেল। খাদের ধারে বেড়াহীন কুল-খেজুরের ফাঁকা জায়গাটা যেন খাঁ-খাঁ করতে লাগল। নিঃশব্দ, শূন্য। কেবল কুল-খেজুরের মাথা দুলল হাওয়ায়।

নারাণের চোখ দুটো টনটন করে উঠল। তবু কেউ এল না সেখানে চোখ জুড়োতে।

তেপান্তরের রাত্রি যেন দু'হাতে জাপটে ধরল নারাণকে। অসহ্য ছটফটানিতে একটা বোবা পশুর মত সে অন্ধকারে মাঠ আর ঘর করে বেড়ালো।

তার পরদিন দূর আকাশে লেপটানো চিমনির দিকে তাকিয়ে সে স্থির করে ফেলল, শহরে যাবে। শহরে · তার বন্ধু আর পড়শীদের কাছে।

তাড়াতাড়ি একটা চুবড়ি নিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটা ফুলকপি থেকে একটা তুলে নিল। একটা বাঁধাকপি, কয়েক সের বেগুন, মটরশুঁটি, কিছু সীম, একটা কচি লাউ, কিছু নটে পালং।

তারপর স্নান করে, কাপড় পরে, ধোয়া জামাটি গায়ে দিয়ে, মাথায় গামছা জড়িয়ে ঘরে শিকল তুলে দিল। তরকারির চুবড়িটা মাথায় নিয়ে উঠোনে এক মুহূর্তে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে পুবের খাদের মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু শহর যে পশ্চিমে। তা হোক।

ধাপার মা যেমন করে লাফ দিয়ে এপারে পড়ত, তেমনি করে মাথায় বোঝা নিয়ে নারাণ ওপারে লাফ দিয়ে পড়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মনে হল, কে যেন হেসে উঠল তার পিছনে। সন্তর্পণে চোখ ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে দেখল,—কেউ নেই।

দেখে সে হনহন করে ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে চলল পুবের গাঁয়ের রেখাটার দিকে। গাঁয়ে যখন পৌঁছুল তখন অনেক বেলা। ভাবল, কি করে ধাপার মা যেত এত পথ? কিন্তু কোথায় বা তার ঘর, গাঁয়ের কোন্ সীমানায়? অনেক ঘোরাঘুরির পর এক কিষাণ দেখিয়ে দিল, গাঁয়ের বাইরে মাঠের ধারে ধাপার মায়ের ঘর। নারাণ দেখল ঘর তো নয়। উঁচু ভিটেয় একটা বিচুলির ছাউনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। উঠোনের খুঁটোয় একটা রোগা ছাগল বাঁধা। কটা পায়রা যেন কি খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে। আর ধাপা, কালো ন্যাংটা ছেলেটা পায়রাগুলোর সঙ্গে আবোল তাবোল বক্ছে।

কিন্তু নারাণকে দেখেই তার চক্ষু চড়কগাছ। সে টলতে-টলতে হে মা হেই মা করতে-করতে ঘরে ঢুকে কি একটা কথা বার-বার বলতে লাগল।

তার মায়ের ভারী গলা শোনা গেল, 'কে-রে?'

নারাণ একেবারে দরজার কাছে এসে মাথার চুবড়িটা নামিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল। মেয়েটার দিকে একবার চোখ পড়তেই বলে ফেলল, 'এলুম।'

ধাপার মা কাঁথা ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল। এক মুহূর্ত নারাণের মুখের দিকে দেখে ঝাঁজ দিয়ে বলল, 'আদিখ্যেতা। কে বা আসতে বলেছে।'

নারাণ চুবড়ি হাতায়, মাটি খোঁটে। খালি বলে, 'এসে পড়লাম।'

কি বলতে গিয়ে আটকে গেল ধাপার মার গলায়। তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে ফেলে কাঁথার তলায়। কেবল কাঁথার সঙ্গে যেন শরীরটাও ফুলে-ফুলে ওঠে।

অনেক খানি সময় চলে যায়। ধাপা হাঁ করে বসে-বসে দু'জনকে দেখে।

হঠাৎ নারাণ জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে?'

জবাব আসে চাপা গলায়, 'জ্বর।'

'তা হলে—'

'থাক।' বাধা দেয় ধাপার মা। বলে, 'ওসব বারোমেসে, সেবে যায় আবার।'

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

থেকে-থেকে খাপ্‌চি কেটে-কেটে নারাণ বলে, 'এই···এট্টু সবজি। ধাপা খাবে। তা— তুমি···আর তো তুমি যাও-টাও না ··'

'থাক', রুদ্ধ গলায় কথাটা বলে মুখের ঢাকনাটা খুলতেই দেখা যায় মেয়েটার ডাগব-ডাগব জলভরা চোখ দুটো কান্নায় লাল হয়ে উঠেছে। বলে কান্নাভরা গলায়, 'কেন···কেন? এমন শেয়াল কুকুরের মতো তাড়ানোই বা কেন, আবাব···'

বলতে পারে না আব।

নারাণ বলল, তেমনি থেমে-থেমে, পারলুম না আব থাকতে। ····চলে এলুম।'

তেমনি ফুঁপিযে বলে মেয়েটি, 'কেন—কেন এ আদিখ্যেতা?'

নাবাণের ঠোঁট নড়ে, থুতনিটা কাঁপে। হঠাৎ ধাপাকে কোলের কাছে টেনে নিযে মোটা গলায বলে ওঠে, 'ফাঁকা মাঠ···আর কেউ নেই! লোক নেই···জন নেই··সাড়া শব্দ নেই···শুধু···শুধু····' থেমে গিযে আবাব বলে, 'কাঁহাতক পাবা যায়. বল?'

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস কবতে থাকে, 'কে বলেছে পাবতে··· কে বলেছে?'

নারাণ তবু বলতে থাকে, 'আমি··আমি যেন পালিযে আছি। ···হ্যাঁ· শুধু মাঠ··· ফাঁকা ···।'

বলতে বলতে একটা নিঃশব্দ অসহ্য গুমোট যন্ত্রটাকে ভেঙে চুরে, লেদ মেশিনেব বিবাট পালিশ করা চাকা যেন বনবন কবে তাব চোখেব সামনে ঘুরতে লাগল। যন্ত্রের ঘর্ ঘব্ শব্দ যেন চাপা পড়া প্রাণেব অসীম নৈঃশব্দ্য ও বোবা নিস্তব্ধতাকে খান্‌খান্ কবে হেসে উঠল। একটা বিচিত্র ঝোড়ো বেগে লোকজন, গাড়ি ঘোড়া, ধুলো ধোঁযা, হাসি গান,কান্না হল্লা তার লুকানো প্রাণটা উড়িযে নিযে গেল। সেখানে জীবনেব ঝড। বন্ধু, বস্তি, মহল্লা অষ্টপ্রহর—কেবলি বাঁচতে চাওযা।

নারাণ আপন মনেই বড়-বড চোখে ফিসফিস করে উঠল, 'যাব, চলে যাব সেখানে।'

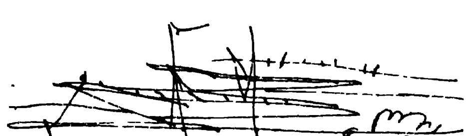
ধাপার মা গালে হাত দিযে বলল, 'কোথা?'

'শহবে ··কাজে।' বলে ধাপার মুখটা তুলে বলে, 'যাবি তো বে ধাপা?'

ধাপা জবাব দিল, 'মার চঙ্গে।'

ধাপার মা মুখ টিপে বলল, 'মরণ।'

বলে চুবড়িটা টেনে নিল কোলের কাছে। বিচুলির ছাউনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাওয়া।





কিছু নয়

বরের গাড়ি গেছে আগে; পিছনে বরযাত্রীদের রিজার্ভ বাস। বিবাহবাসর, অর্থাৎ মেয়ের পিত্রালয়, কলিকাতার বাইরে ত্রিশ মাইল দূরে। বাস এসে যখন বিয়ে-বাড়ির সামনে দাঁড়াল, তখন প্রায় আটটা বাজে।

সানাইয়ে বাজছিল তখন ভৈরবী সুর। সুরের মধ্যে যে বেদনাটুকু ছিল, সেটুকু বহু ভিড়ে, অনেক প্রাণে ভাগাভাগি হয়ে কেমন একটি উদাস প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। কান পেতে কেউ শুনছে না, অলক্ষ্যে সকলের প্রাণেই লেগেছে একটি নিশি-ঘোর। এ নিশি ঘোরে এক অকারণ পুলক, একটু বেশি কথা, বেশি ব্যস্ততা একটু, কিছু সাজ, কিছু রঙ্গ, অপরিচয়ের মাঝেও সহসা নির্বাক কটাক্ষে কী এক অস্পষ্ট পরিচয়ের ঝিলিক মানুষকে পেয়ে বসে। একটু কেশ-কুসুম গন্ধ, অঙ্গাবরণের সুগন্ধি যেন এক অশরীরী মায়ারূপিণী হয়ে ফেরে ওই নিশি-ঘোরে! সব মিলিয়ে কী যেন এক বিচিত্র পরিবেশ। এখানে সবচেয়ে বেশি ভিড়। কিন্তু সমস্ত ভিড়টা যেন এখানে ওখানে রেখেছে অনেক অন্তরাল সৃষ্টি করে। কেউ কাউকে দেখে না এখানে, তবু সবাই দেখে সবাইকে।

আষাঢ়-আকাশে প্রথম মেঘ। সানাইয়ের নিশি যেন পেয়েছে তাকেও। সুরের ঘায়ে সে এলোমেলো। ফাঁকে ফাঁকে তার সপ্তমীর কুহেলী জ্যোৎস্না।

মফস্বল শহরের ঘেঁষাঘেঁষি পেরিয়ে, একটু নির্জন পাড়ায় পড়েছে বিয়েবাড়িটা। সেকেলে নয়, একেলেও নয়, যখন যেমন যোগাড় হয়েছে তখন তেমন তৈরি হয়েছে বাড়িটা। একটি বড় উঠোন ঘিরে, সেকেলে নিচু কোঠা, একেলে উঁচু 'রুম'। শরিকানার ভাগ নেই, সেকেলে একেলে সিঁড়ি আছে দুটি ছাদে ওঠার। আপনি-গজানো কৃষ্ণকলির ঝাড়ের পাশে, সাধ্য-সাধনের বেলা জুঁই মাথা তুলেছে। সেখানে বাগান করার মাপজোখ নেই, আছে একটু শখের সঙ্কেত। বিজলী আলোয় সেজেছে যদিও বাড়ি, ছাদ-ঘেঁষে আকাশ-মুখো নারকেল গাছের বিলুলিত ঝালরে মন যেন নিশীথ-প্রান্তরে যায় ছুটে।

সাড়ে সাতটার লগ্ন গেছে ফসকে। পরের লগ্ন সাড়ে এগারোটার মধ্যরাত্রি ঘেঁষে। বরযাত্রীরা সব পিলপিল করে উঠল গিয়ে বরের ঘরে। সেখানে তখন মেয়েদের আসর উঠেছে জমে। ফাঁকা পেয়ে বরকে ঘিরে বসে ছিল তারাই। নিশি-ঘোরের এইটি প্রথম পালা। সবাই আসে বরকে ঘিরে। শালী-শালাজ-বান্ধবীর দল, হাসি ঠাট্টা কটাক্ষ গড়ে প্রথম আলাপচক্র।

কেউ বলে, মুখ তুলুন না মশাই, একটু দেখি।

সে-কথার সুতো টেনে আর-একজন ; এখন তো আর বিয়ে আটকাচ্ছে না, পছন্দ না হলেই বা কী!

একটু হাসি ও গায়ে ঢলাঢলি। তারপরে আর একজন ; না ভাই আমাদের সুধার বর বোধ হয় বোবা।

— হয়তো পাড়াগেঁয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই প্রাণ চাইছে না।

তখন হয়তো একজন বর্ষীয়সী একটু কড়াপাকের মিশেল দিয়ে বলেন, সে তোদের কাছেই প্রাণ চাইছে না। তোদের পাড়াগেঁয়ে সুধাকে প্রাণটি সঁপে দেওয়ার জন্যে তুলে রেখেছে।

বরযাত্রীরা আসার আগে এই প্রথম আলাপচক্র। নেতৃত্বটা ছিল যার হাতে, সে বসেছিল বরের পাশ-তাকিয়ায় কনুই রেখে। অনেক মেয়ের ভিড়ে সে একটি মেয়ে। কিন্তু সে একটি। রূপ তার ছিল না কোথাও। কিন্তু তার মত রূপ যেন ছিল না ঘরের কোথাও। সে একটি নাতিদীর্ঘ দোহারা মেয়ে। রঙ তার কালোই। কিন্তু অতবড়ো সুচিক্কণ খোঁপা নেই কারুর। নরম মার্জিত চাকচিকন কোথাও ঠাঁই নেই নি তার শরীরে। অমার্জিত আর সুঠাম স্বাস্থ্যোদ্ধত শরীরে খয়েরী-ডোরা শাড়িটা অতি আটপৌরে ঢঙে কিন্তু তীব্র পাকে জড়িয়ে ধরেছে ভাঁজে ভাঁজে। নাক তার সরু, কিন্তু চোখা নয়। চোখের দীপ্ত সচকিত অপাঙ্গ দৃষ্টি, যদিও চোখ তার বড় নয়। একটি অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তার সর্বাঙ্গ ঘিরে। বয়স তার বছর ছাব্বিশ, তিরিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। সীমন্তে সিঁদুর, কপালে তর্জনীর পূর্ণ বিন্দু কুমকুমের।

বরের সঙ্গে আলাপ বেশী জমেছে তার। দিদি হতো শালী সে বরের। পোশাকী নাম তার জানা যায় নি। সবাই ডাকছে সুরো বলে কিংবা সুরোদি। কিন্তু সে যে-ই হোক, বোঝা যাচ্ছে এ ভিড়ের বাড়িতে সে অনেকখানি। তার ডাক পড়ছে সব সময়েই, এদিকে ওদিকে।

—ও সুরো, দ্যাখ গে, সুধার নাকি এখন গা বমি-বমি করছে।

অর্থাৎ কনে সুধার। যেতে হবে সুরোকে।

—সুরোদি, মাসীমা জিজ্ঞেস করলে, বরণডালায় একটা পিদিম কম কেন?

তাও গিয়ে সুরোকে দেখতে হবে।

কনে-কর্তারা একটু বিমর্ষ। সাড়ে সাতটার লগ্নতে কিছুতেই বিয়ের অনুষ্ঠান করা গেল না।

সেই ফাঁকে জমে উঠেছিল আলাপচক্র। বিষ নেই, কিন্তু জ্যা-মুক্ত তীরের মত কটাক্ষ, সুতীক্ষ্ণ, কথার গুপ্তি আর হাসির তরঙ্গ। এর সবটুকু রস নিয়ে যে আকাশে বাতাসে মনে মনে রঙে রঙে দিচ্ছে লেপে সকলের অলক্ষ্যে, সে সানাইয়ের সুর। সে যে বাজছে, এ কথা কেউ জেনেও যেন জানে না। অথচ ঘরের এই ঠোঁটের চোখের, কেশ কবরীর, কথার হাসির সব কারসাজি নিয়ে, এক বিচিত্র মায়া নিয়ে সে বেঁধে রেখেছে দূরের মানুষকেও।

এমন সময়ে বরের ঘরে এল বরযাত্রীরা। সোরগোল পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে। যেন বর্গী এল দেশে। হঠাৎ এদিক ওদিক থেকে কয়েকটি টিপ্পনী , আরে, এই, সবাই পালাচ্ছে কেন?

আর একদিকে চুপিচুপি, চাপা স্বরে, ওমা, কী অসভ্য ভাই। ....কোন লোকটা? ও? ... কে? ... ওই যে! ওমা, কেমন প্যাটপ্যাট করে দেখছে। চল্ চল্। ...

অপর পক্ষে, বরের বন্ধুদের মধ্যে, কেমন?, বেশ। ...দেখিস বাবা। ...কী রে ছানু, চোখের তারা যে আইসক্রীম হয়ে গেল বাবা।—

বরও বন্ধুদের পেয়ে খুশি। একথা সেকথা জিজ্ঞাসা জবাব হতে লাগল। তারপর একজনকে দেখে বর বলে উঠল, ও তুই এসেছিস সুধীন! কেবলই ভাবছিলাম, শুধু তুই বোধ হয় আসতে

পারলি নে। যাক, তোর ছেলে কেমন আছে?

সুধীন বলল, ভাল। নইলে আসতাম কী করে?

বন্ধুদের মধ্যে আর-একজন বলল, ছেলেও বটে, বাপের মতই বহুরূপী। সকালবেলা দেখলাম কুকুর নিয়ে খেলা করছে। দুপুরবেলায় শুনলাম, ছেলে অচৈতন্য।

মেয়েরা ইতিমধ্যে সবাই প্রায় পলাতকা। ছিল শুধু সুরো। ছেলেরা সবাই কথা আর হাসির ফাঁকে দেখে নিচ্ছিল তাকে। কে একজন বলেও উঠেছিল, এ দেখছি ভয় পায় নি।

সুরোও বরের মুখের দিকে তাকিয়ে, হেসে জবাব দিয়েছিল, কেন, এখানে বাঘ ভালুক কিছু আছে?

সবাই একটু চমকে গেলেও হাসিটা বাধা মানে নি। ফলে, বরযাত্রীদের সঙ্গে সুরোর একটু ভাবই হয়ে গেছে এইটুকু সময়ের মধ্যে। এ কোন কথার ভাব নয়, নিষ্পাপ নির্ভয় নির্বাক মস্করার ভাব।

সুধীন দাঁড়িয়েছিল বরের কাছেই, তার সেই চওড়া বলিষ্ঠ শরীরে প্রায়-বোতাম-খোলা পাঞ্জাবি দুলিয়ে। সেই অবাধ্য এলোমেলো চুলে, স্বভাব-হাসি মুখে, দীপ্ত তবু করুণ চোখে কিছু দুর্ভাগ্যের ছাপ নিয়ে।

সুরো হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, কী হয়েছে আপনার ছেলের?

পরিচয় না থাকলেও সুরোর ব্যক্তিগত প্রশ্নটা অস্বাভাবিক মনে হল না। সুধীন তার দিকে ফিরে বলল, দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে।

বলে চোখ ফেরাতে গিয়ে সুধীন আবার তাকাল সুরোর দিকে। যেন ঠিক দেখে নেওয়া হয় নি কথা বলার সময়। আবার চোখ ফেরাতে গিয়ে, আবার তাকাল সুধীন। কী হল! নিজেকে মনে মনে বলে উঠল সুধীন, কী হল। কি যেন একটা হল কোথায়?

সুরোর ঈষৎ পুরু তাম্বুলারক্ত ঠোঁটের কোণ দুটি একটু বেঁকে গেল সুদূর হাসিতে। তার সচকিত দীপ্ত চোখের তারা দুটি স্থির হল একবার। তারপর মুখ ফিরিয়ে বরকে বলল, তোমার বন্ধুভাগ্য দেখছি ভাল, রুগ্ন ছেলে ফেলে চলে এসেছেন তোমার টানে। বলে একবার সুধীন, তারপরে সকলের দিকেই তাকিয়ে হাসল।

এমন সময়ে আবার ডাক পড়ল, ও সুরোদি শীগগির এসো, মাসীমা ডাকছে। সুরো জবাব দিল, এই যে যাচ্ছি। বরের দিকে ফিরে বলল, একটু বসো ভাই ধৈর্য ধরে।

উঠতে গিয়ে সুধীনের সঙ্গে তার-একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। আবার একটা বিদ্যুৎচকিত ঝিলিক খেলে গেল কোথায় সুধীনের। চোখ ফেরাতে গিয়েও ফেরাতে পারল না। সুরোর ঠোঁটের কোণে কেন যেন একটি স্থির বিদ্যুতের ঝিকিমিকি। মনে মনে বলল সুধীন আবার, কী হল! কী যেন হল!

সুরোর দীপ্ত গতিভঙ্গি দেখছিল সবাই। একজন মুখফোঁড় বন্ধু বলে উঠল এবার আমরা কি করব?

সুরো বলে উঠল, বন্ধুকে একটু দেখুন।

অর্থাৎ বরকে। কে একজন বলে উঠল, একটু চা হলে—

সুরো বলল, এখুনি পাঠিয়ে দিতে বলছি।

একটু পরেই বাইরে সুরোর গলার সুর শোনা গেল, ছোট মামা, ও-ঘরে ওদের সবাইকে চা পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।

জবাব শোনা গেল, এই যে মা, পাঠিয়ে দিচ্ছি। গুনে দেখেছিস, কজন আছেন?

সুরোর গলা শোনা গেল, বাবারে, অত কি গোনা যায়! কুড়ি-বাইশ কাপ পাঠিয়ে দাও। সুধীন মুখ ফেবাতে চায় নি। চায় নি, তবু মনে মনে যে ঘাড়টাকে সে শক্ত করে নামিয়ে রেখেছিল, সে কিছুতেই বাধা মানল না। দরজা দিয়ে বাইরেব দিকে ফিরে তাকাল সে। আর আশ্চর্য! যা তাব মন গাইছিল, বোধ হয় চাইছিলও, তাই হল। উঠোনে দাঁড়িয়েছিল সুরো এই দিকে তাকিয়েই। কে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু দূর থেকেও চোখাচোখি হয়ে গেল। আর সেই নাম-না-জানা, অর্থপূর্ণ অথচ অর্থহীন টেপা হাসিটুকু লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। চোখোচোখি হতেই অদৃশ্য হল সুবো। কী হল! কী যেন হল কোথায়!

নিজেদের মধ্যে কী একটি বিশেষ কথা নিয়ে বন্ধুদের একদল হেসে উঠল। দক্ষিণের বাতাস এল পুবের ঘা খেযে। প্রাণকে উজ্জীবিত কবা সব বিচিত্র গন্ধ বেড়াতে লাগল ভেসে। সিগারেটের ধোঁয়া, হঠাৎ কৌতূহলিত চোখের উঁকি, ব্যস্ততা, ছুটোছুটি, শাড়ি খসখস, অলঙ্কার-নিক্কণ, আব সানাইয়ের ব্যাকুল উদাস সুর, সব মিলিয়ে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে সমাজ সংসার। যেন কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই আজ এ-জীবনের।

সুধীনও তার প্রাণখোলা হাসি নিযে মেতে গেল বন্ধুদের মধ্যে। আর ভেতবে ভেতবে প্রাণটাও মেতে উঠল, ব্যাকুল হযে উঠল দুটি কালো চোখেব তির্যক তাবা, বক্তাভ দুটি ঠোঁট আর একটি দীপ্তোদ্ধত খযেরী-ডোরা কাটা শাড়ি-জড়ানো মূর্তিব প্রতীক্ষায়। মাথায় যাব ঘোমটা-খোলা নাগ-কুন্ডলিত খোঁপা, কপালে যাব তর্জনীডগাপূর্ণ ফোঁটা, ত্রিনয়নের মণিব মত। সীমন্তে যার আগুনেব মত সিঁদুর।

কী হল? কী যেন হয়ে গেল কোথায। যেন থাকে থাকে নিয়মে শৃঙ্খলে সাজানো সব পুতুলগুলি ছড়িযে গেল, হাবিয়ে গেল পরস্পরের কাছ থেকে, এলোমেলো হযে কে কোন্ জগতে গেল চলে।

—এখানে এক কাপ! হ্যাঁ ওঁকে দাও। এদিকে উনি পান নি।

কনের ঘর থেকে বেবিয়ে আসছিল সুরো। একটি মেযে জিজ্ঞাসা কবল, কোথায় যাচ্ছ সুরোদি?

ঘেমে উঠেছে সুবো। ঘাম লেগে কপালেব কুঙ্কুম চোখেব তরল মণিব মত দেখাচ্ছে। ভ্রূ কুঁচকে বলল, কেন?

আদুরে স্বব শোনা গেল, একটু দাঁড়াও!

বলে আ মাবি খুলে একটি সোনার চাঁদ হার এনে পরিযে দিল গলায। সুরো হাসল তার সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁতে—ওমা, আমি খুলে রেখেছি, ফাঁস লাগে।

মেয়েটি বলল, ফাঁস তো কবেই পরেছ গো, নতুন নাকি? তোমাব বর রাগ কববে না-পরলে। আমাদেব হবু জামাইবাবুই বা কী ভাববে। ভাববে যে, আমার এ শালীর দেখছি একটি হারও নেই।

পবিয়ে দিল। সুরো হেসে বেরুতে গেল। আবাব—কোথায় যাচ্ছো?

বড়মা ডাকছেন।

বলে, পাশের ঘরে গেল সুবো। চকিতে একবারি আয়নায় বোধ হয় নজরে পড়ল নিজেকে। তাবপর চাইলড নেট সরিয়ে দেখল, তার ছেলের ইজের ভিজেছে কি না! বেরিয়ে এল। এ কি, কোথায় যায় সুরো? ওদিকে যে বরযাত্রীদের ঘর।

হেসে বলল, চা পেয়েছেন সবাই?

সবাই প্রায় একযোগে বলে উঠল, নিশ্চয়।

কে একজন বলে উঠল, আপনি যখন নজর রেখেছেন।

সুরো তাকাল বরের দিকে। একদিনের সুলতান, ভাড়া করা মখমলের উপর বসে, সেও তাকিয়েছিল তার শালী সুরোদির দিকে। কপট করুণ মুখে বলল সুরো, তোমার তো ভাই উপায় নেই চা খাওয়ার।

বর হাসল। কে একজন বলে উঠল, একটা পান পেলে হত।

সুরো হেসে বলল, খাবার আগেই?

একটু সস্তা—যদিও এখানে সত্যি কিছুই সস্তা নয়—কথা বলল একজন, একটু পানাসক্ত আছি কিনা, বুঝলেন সুরোদি।

সুরো বলল, আচ্ছা দিচ্ছি।

বলে চোখ ফেরাতেই চোখোচোখি হল আবার সুধীনের সঙ্গে। সুরো মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলে ফেলল, আপনারও পান চাই নাকি একটা?

সুধীন বলল, পেলেই চাই।

ডাক পড়ল বাইরে থেকে, সুরো, তোর ছেলে উঠেছে।

—যাই।

বলেই আবার চোখ পড়ল। আর সেই মুহূর্তে দুজনেরই মনের কোণে একটি বিদ্যুৎপর্ণ বিস্মিত প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল।

সুরো চলে গেল। এক বাটা পান নিয়ে একটি ছেলে এল। সুধীনের মনেই পড়ল না, সে পান খেতে চেয়েছিল কি না। অনেকেই হাত বাড়িয়ে নিঃশেষ করল পানের বাটা। তারপরে এল সিগারেটের টিন।

একটু পরেই একটি মেয়ের গলা শোনা গেল উঠোনে, না সুরোদি, তুমি না এলে আমি পারব না।

শুধু কি সুধীনের কানেই ঢুকল কথাগুলি? সচকিত হয়ে ফিরে তাকাল সে। দেখল সুরোর আঁচল ধরে টানছে একটি মেয়ে। কিন্তু সুরোর দৃষ্টি এই ঘরে, আবার দৃষ্টি বিনিময়। মেয়েটির টানে কি কার টানে কে জানে, সুরো এল আবার। বিয়ের 'পদ্য' নিয়ে এসেছে মেয়েটি।

সুরো বলল, নে, দে সবাইকে।

মেয়েটি লজ্জিত হেসে সবাইকে 'পদ্য' দিতে লাগল। মেয়েটিকে দেখিয়ে সুরো বলল বরকে, তোমার আসলটির পরেই এটি সুদ, বুঝেছ। বলে হাসতে গিয়ে সুধীনের সঙ্গে আবার চোখোচোখি।

সুধীন বলে উঠল, কই দিন 'পদ্য'।

মেয়েটির হাত থেকে 'পদ্য' নিয়ে সুরো সুধীনের হাতে দিল। পদ্য সুধীন পড়ল না, সুরোর দিকেই তাকাল। নত হল সুরোর চোখ তবু সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞেস করে ফেলল পান খেয়েছেন?

সুধীন বলল, কে আর দিলে?

সরে এল সুরো। আর সুধীন মনে মনে বলল, বেহায়া হয়ে গেলাম নাকি। কী হল?

একে কী বলে?

সুরো বলল, পাঠিয়েছিলাম তো!

সুধীন বলল, কেন যেন চোখে পড়ে নি।

অপাঙ্গে হাসতে গিয়ে সহসা একটি কপট ভয়ের ছায়া যেন দেখা দিল সুরোর চোখে। বলল আচ্ছা, চোখে পড়ার মত করে দিয়ে যাব।

চলে গেল সুরো। 'পদ্য' বিলানো হয়ে গেল।

কনের বাবা এসে দাঁড়ালেন হাতজোড় করে। অনুগ্রহ করে বিয়ের আগেই আহারটা সেরে নিতে হবে। লগ্ন অনেক দেরিতে।

সেই ভাল। সবাই উঠে পড়ল। বয়স্ক আর যুবক মিলিয়ে বরযাত্রী কম নয়। বসেছে সবাই আলাদা। বিয়ে-বাড়ির নিমন্ত্রিত লোকেরাও আসন জুড়ে বসল। ছাদে আর উঠোনে জায়গা হয়েছে। ছাদে উঠেছে অনেকে। সুধীন দাঁড়িয়ে আছে নিচে। কোথায় যাবে সে। কোথায় বসবে। যেন পথ হারিয়েছে পথিক।

—এ কী, বসেন নি?

সুরো। আবার চার-চোখ মিলল। হেসে ফেলল দুজনেই। সুধীন বলল, তাই তো ভাবছি, কোথায় বসি?

সুরোর হাসি ও কটাক্ষ ক্রমেই সর্বনাশের রূপ ধরছে যেন। বলল, জায়গাই খুঁজে পাচ্ছেন না। দেখিয়ে দেব?

—দিন না। একটু অচেনা লাগছে কি না।

—সত্যি!

বলে চোখে চোখ রেখে হাসল আবার। বলল, আমিও কি ছাই সব চিনি? তবু, আসুন, আপনার জায়গাটা আমিই করে দেই।

নিচেই একটি খালি জায়গায় আলাদা আসন করে দিল সুরো, বসুন এখানে। সুধীন বসল, কিন্তু চোখ ফেরে না। কী ব্যাপার! সুরোও চোখ ফেরাতে পারে না। ঠোঁটের হাসি তার আরও উদ্দীপ্ত।

ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে বরযাত্রী বন্ধুরা বলে উঠল, কী রে সুধীন, নিচেই বসে গেলি যে!

সুধীন এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল, দেখিস কিছু ছুঁড়িস নে, যেন।

সানাই বাজছে, আলাপ ছেড়ে তালে পড়েছে সুর। কিন্তু সে যেন কোথায় বাজছে, কেউ জানে না। এত লোক। সবটাই একটা অন্তরাল যেন। এই অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে সুধীন আর-একজনের সঙ্গে। কোথায়, কোথায় গেল!

এদিকে ওদিকে সেদিকে, সব দিকে চোখ ফিরিয়েও হঠাৎ এক জায়গায় দেখা হয়ে গেল। দূরে, একটি ঘরের কোণে, খাটের ওপর বসে আছে সুরো। একা নয়; একদল মেয়ের মধ্যে। কিন্তু সুরোর চোখ। সচকিত দীপ্ত তারা এদিকেই, আবার দেখাদেখি।

বেরিয়ে এল সুরো। সুধীনের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল বরের ঘরে। সেখান থেকেও চোখোচোখি। তারপর চোখের উপর দিয়ে, এক অদ্ভুত রহস্যময়ী হাসি নিয়ে কেবলই যাওয়া-আসা।

খাওয়া হল। বরযাত্রীরা উঠোনেই-পাতা চেয়ার টেবিলে বসল এবার। বিয়ে আরম্ভ হল। লৌকিক আচার অনুষ্ঠান আর সাত-পাকের জন্য বর কনে এল বাইরে। সবাই ঘিরে এল সেই দিকে।

সুধীনও এল।

কে বলল, সুরো, তুই আয় এদিকে।

সুরো বলল, আমার কাজ আছে মাসীমা অন্য দিকে, বড বউদিকে ডাক।

—তবে তুই ডেকে দে।

ডাকতে গেল সুরো। সুধীনের বুক ঘেঁযে গেল। যাওযার সময় আবার, আবার চোখে চোখ পড়ল, আর হাসিটা সুবোব ঠোঁট পেবিযে সাবা অঙ্গে গেল ঢেউ দিযে। সুধীন বলে ফেলল, একটু জল দেবেন?

প্রায় যেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি সুবোর চোখে। ঠোঁট টিপে বেখেই, অপাঙ্গে চেযে বলল, তেষ্টা পাচ্ছে?

—বড্ডো!

ভিড়ের থেকে সবে এল সুধীন। তাকাল সুবোব যাওযাব পথের দিকে।

রাত হয়েছে। সানাইয়ে বাজছে বেহাগ। বেহাগেব সঙ্গে এই অবোধ ব্যাকুল দাযিত্বহীন সমাজ-সংসার-ছাড়া মনেব কোনও মিল আছে নাকি।

বারান্দায় দুটি ছেলে শুযে ঘুমিযে পডেছে। ঘবেব মধ্যে দেখা যাচ্ছে, খাটে শুযে আছে দুজন বিধবা প্রৌঢা।

সুরো জল নিয়ে এল। এখানে সেখানে লোক, মেযে পুরুষ, কেউ কী দেখছে! দুজনেরই ঠোঁটে হাসি। গেলাস নিযে ঠোঁটে ছোঁযাল সুধীন। কিন্তু দৃষ্টি সুবোর দিকে। সুবো হাসছে, কিন্তু দৃষ্টি আনত।

জল যেতে চায় না সুধীনের গলায। কিন্তু তৃষ্ণা তো পেযেছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা, ব্যাকুল তৃষ্ণা।

সুরো বলল, কী হল? জল খান।

সুধীন বলল, খেযেছি। বলে, ভরা গেলাসটা দিযে দিল সুবোর হাতে।

সুরো মুখের দিকে তাকিযে চলে গেল।

ওদিকে উল্লসিত কোলাহল উঠল, ভাল করে তাকাও দু'জনে, এই তাকানোই আসল তাকানো।

শুভদৃষ্টি হচ্ছে।

সুধীন দেখল, সুরো দূবে একটি ঘবের পাশে দাঁড়িযে আছে। একবাব তাকাল। আবাব মুখ ফিরিয়ে, ঘরেব পাশ দিযে এগিযে গেল কোল-আঁধাবে।

সুধীন হঠাৎ সিগারেট ফেলে দিল। তাবপব লোকজন, সমাজ সংসাব, সব ভুল অগ্রসর হল ওই দিকে। কেউ দেখছে? কিন্তু সুবো এদিকে তাকিযে ওদিকে গেল কেন? কিছু বলে গেল নাকি?

চলে এল ঘরের পাশে। দেখল, সামনে অনেকখানি পড়ো জমি। কযেকটা গাছ। বাড়িব আলো পডেছে ফাঁকে ফাঁকে। ছায়ায মত, তবু সুরোব বলিষ্ঠ সুস্পষ্ট মূর্তি ওদিকে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে! ডাকছে নাকি সুধীনকে? সুধীনকে, ছেলে যাব আজ পডে গিযেছিল ছাদ থেকে, বউ যাব অসুস্থ, আসতে যে পাববে না ভেবেছিল, এসে তাব এ কি হল! একে কী বলে! কী হল!

এগিয়ে গেল, এগিয়ে গেল পাযে পাযে, সুবোর দিকে। আশ্চর্য! কোথায যায সুরো!

দাঁড়াল সুরো। এঁটো পাতার ডাঁই, কুকুরেরা ভিড় কবেছে সেখানে। দুটি আমগাছেব

আলোছায়া। এখানে কেন!

সুধীনের রক্তধারা চঞ্চল হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে একটা প্রবল স্রোতের ঘূর্ণি উঠল পাক দিয়ে। সুরোর পাশে এসে দাঁড়াল। পাশে এসে, হাত বাড়াল আঁচলের দিকে। কেন এসেছে সুরো এখানে, কী করবে এবার সুধীন!

বিচিত্র! কেউ কিছু বলতে পারছে না।

তারপর হঠাৎ সুরো বলল, এখানে চলে এসেছেন?

সুধীনের গলাটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে যেতে চায়। হ্যাঁ ···মানে ··

সুরো হঠাৎ একটু হেসে মুখ নামিয়ে বলল, "কিন্তু অচেনা লাগল না রাস্তাটা?"

—হ্যাঁ। তাই না এসে পারলাম না কিছুতেই।

—সত্যি, সবই কী রকম আশ্চর্য অচেনা!

আলো-আঁধারে দুটি চোখ মিলল আবার, আর হঠাৎ যেন দুজনের গলার স্বরই অকারণে বুজে এল। জল চিকচিকিয়ে উঠল নাকি সুরোর চোখে! বলল, কেন যে এরকম হয়!

সুধীন বলল, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

সুরো বলল, কী জানি, কিছু নয় বলে।

সুধীনের মনে হল, এ যেন সেক্সপীয়রের সেই 'দ্বাদশ রজনী'র ভাঁড় মালভো-লিওর মত, সব-কিছুকেই উড়িয়ে দিয়ে কেবলই আপন যুক্তিতে বলা কিছু নয়, ও কিছু নয়।

সুরো বলল, ছেলেকে কেমন দেখে এসেছেন?

সুধীন বলল, ভাল। ডাক্তার বলেছেন—

সুরো চোখের তারায় দীপ্ত অভিমানে বলল, মনে পড়ে গেল বুঝি এবার?

বলে কেমন যেন একটু ঘন হয়ে এল সুধীনের কাছে। গলা আরও নামিয়ে বলল, যাই এবার। ছেলেটা বোধ হয় উঠল।

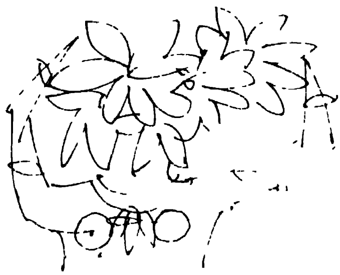
সুধীনের হাতের শিরা-উপশিরাগুলি উঠল দপদপিয়ে। আড়ষ্ট জিহ্বায় কী সব কথা উঠল ছটফট করে। কিন্তু হাত বাড়াতে পারল না, বলতেও পারল না কিছু।

আবার চোখে চোখ পড়ল। বলল সুরো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, আপনি ওদিক দিয়ে যান। যাচ্ছি—

সুধীন বলল, আচ্ছা!

চলে গেল দুজনেই। কেন এসেছিল, কেন গেল, কেউ বোধ হয় জানে না, জানতে চায় না। শুধু সানাইয়ের সুরটা আষাঢ়-আকাশে সুর করে চিৎকার করতে লাগল। সুরটা কত চেনা, অথচ কত অচেনা।





কাজ নেই

মেঘলা ভাঙ্গা বৌদ আকাশে।

ছাড়া ছাড়া উড়ন্ত কালো মেঘ, ধাবে ধাবে তাব ঝিকি-মিকি কবে বোদ। মেঘবতী গলায পরেছে ঝকমকে রূপোব হাঁসুলী। তাব ছটা চোখে বেঁধে। রূপো আবাব কখনো শ্যামল অঙ্গে সোনাব ধাধে ঝলমল কবে।

বোদেব পিছনে পাল্লা দিয়ে ছাযা দৌড়োয পূব থেকে পশ্চিমে। উত্তব দক্ষিণ লম্বালম্বি বেল লাইনেব উঁচু জমি, মাথায তাব সচল আকাশ। মেঘে নেই জল, বোদে আছে শুধু পোড়ানি। পূবেব নাবিতে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত যেন লক্ষ্মীছাড়ি। পোড়া পোড়া পাশুটে মবকুটে ধানেব ছড়া, সরু সরু গুছি, লম্বায হাত দেড়েকও নয়। পশ্চিমে শুকনো নযানজুলি হাঁ কবে বয়েছে। আশে পাশে ছড়িযে আছে বিস্তৃত ঘেসো জমি আব জলা। ঘেসো জমিতে ঘাস নেই। তবু পশ্চিমা রাখালটা ওইখানেই সমস্ত গোরু চবাতে নিযে আসে। বাদবাকি সমস্ত জমিই কোন না-কোন কোম্পানিব কবাযত্ত। গোরুগুলো ঘাস পায না, খালি মাঠ চযে বেড়ায।

সামনেই যে-গ্রামটা দেখা যায় পশ্চিমে, গোরুগুলো সেখানকাব গৃহস্থদেব। লোকে বলে গ্রাম, কিন্তু গ্রাম নয ওটা। আবাব পুবোপুবি শহবও নয। গ্রামটাব আবো পশ্চিমে গঙ্গাব ধাবে ভিড কবে আছে কলকারখানা। এটা একটা আধ খ্যাচড়া জাযগা।

দুপুরটাকে দুপুব বলে বোঝবার জো নেই মেঘেব জন্য। এমন সময বেললাইনেব উপবে পুবে ওই কিম্ভূতকিমাকাব কালো মেঘটাব আড়াল থেকে একটা চিতাবাঘেব মতো মুখ উঁকি মাবল। তাব লোলুপ দৃষ্টি এপারেব মাঠেব গোরুগুলোব দিকে। একটু একটু কবে সন্তর্পণে সে-মুখ পুরোটা বেবিযে এল যেন মেঘেব আড়াল ছেড়ে।

বসন্তেব কতগুলো বড় বড় ক্ষতেব দাগ সেই মুখে। চোযাল দুটো ছুঁচলো পাথবেব মতো। নাকেব মাঝখানটা বসা, সামনেটা তোলা। মাকুন্দ বলতে যা বোঝায তেমনি তাব মুখে গোঁফদাড়ির বদলে কয়েকগাছা পাতলা চুল। তাব ম্যালেবিযাগ্রস্ত হলদে চোখ বড় বড হযে উঠেছে। মনে হচ্ছে, চিতাবাঘটা বুঝি এখুনি ঝাঁপিযে পড়বে এপারেব গোরুগুলোব উপর। কিন্তু

মানুষটা অর্থাৎ ওই আধ-খ্যাঁচড়া জায়গার দুলেপাড়ার ফটিকচাঁদ নিঃশব্দে হেসে উঠল দাঁত বের করে। হাসল পশ্চিমা বাখালটাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘুমোতে দেখে।

তারপর যেন যাদু করছে এমনি করে ফটিক একটা অদ্ভুত শব্দ বের করে তার গলা দিয়ে: অ · অ··· ন্ন · ন্ন ·

অমনি কয়েকটা গোরু উৎসুক চোখে তাকায় তার দিকে!

সুযোগ বুঝে ফটিক পায়ের কাছ থেকে তুলে নেয় বিচুলির আঁটিটা। আঁটি সামনে বাড়িয়ে দোলায় আর মিহিমোটা গলায় অদ্ভুত শব্দ করে।

সারা তেপান্তর জনহীন। দূরের কারখানা থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে সোঁ সোঁ করে। টেলিগ্রাফের তারে কলর-বলর করছে কয়েকটা ল্যাজঝোলা পাখি।

লাইনের সামনের কয়েকটা গোরু আতুর চোখে ঘাড় তুলে তাকায় ওই সোনারঙ বিচুলির আঁটিটার দিকে। বার কয়েক ফোঁস ফোঁস করে নাকের পাটা ফুলিয়ে যেন এক মুহূর্ত গন্ধ শোঁকে খাবারের। পরমুহূর্তেই লেজ তুলে ছোটে বিচুলির আঁটি লক্ষ্য করে।

ফটিকের নজর রাখালের দিকে। সে টের পেলেই সব ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সে-রকম দুর্ঘটনা কিছু ঘটল না।

গোরুগুলো কাছে আসতেই বিচুলির আঁটি ফেলে দিয়ে কোমর থেকে পাটের দড়িটা খুলে ফটিক গোটা তিনেক গোরুকে লহমায় বেঁধে ফেলল। বিচুলিতে গোরু মুখ দেওয়ার আগেই সে আঁটিটা বগলদাবা করে বলল, "ডাঁবা বাপু, আবার কোথাও টোপ ফেলতে হবে তো।" বলে গোরু তিনটেকে নিয়ে মুহূর্তে সে পুবের নাবিতে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এপারের মাঠ থেকে একটা বক্‌না ডেকে উঠল—হাম্বা! রাখাল ঘুমচোখেই বলে উঠল হ্—হ্! তারপর মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে ঠোঁট উলটে থুক্ করে ফেলে দিল খৈনির ছিবড়ে। দেখল একবার এদিক-ওদিক। দেখে আবার নিশ্চিন্তে মুখ ঢাকল।

ফটিকচাঁদ ততক্ষণে নবগাঁয়ের সড়কে। সে কেবলি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর বেঁকে-বসা পোয়াতি গাইটার লেজ মলছে। বাকি দুটোর বিশেষ আপত্তি দেখা যাচ্ছে না। তাদের নজর ফটিকের বগলের দিকে। পেট বড় দায়। সে দুটোকে ফটিক বলছে, "ব, ব, একেবারে লক্ষ্মী কুণ্ডুর ঘরে গে খাবি।"

বাজার-ফেরতা এক তরকারী-চাষী ফিক করে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কার সব্বোনাশ করলে গো?"

এ বিষয়ে ফটিকচাঁদ চেনা যোগী। তবু হেসে বলল, "হি হি, সব্বোনাশ আর কি, নাইনে উঠে ছ্যালো তাই ধরে নে' এলুম। আইনের ব্যাপার কি না, হুঁ হুঁ · '

হাসল তরকারী-চাষীও। রেললাইনে রাজপথে পরের বাড়ি বা বাগানে পোষা গোরু গেলেই বে-আইনী।

ফটিক গোরু তিনটেকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসে তুলল নবগাঁয়ের খোঁয়াড়ে! এখন লক্ষ্মী কুণ্ডুর খোঁয়াড়। ইউনিয়ন বোর্ডের তিনটে খোঁয়াড়ের ডাক সে নিয়েছে।

খোঁয়াড়ের পাশের ছোট ঘরটাকে সবাই বলে আপিস। সেখান থেকে খালি গা নাদুসনুদুস গৌরবর্ণ লক্ষ্মী কুণ্ডু চাবির গোছাটা নিয়ে বেরিয়ে এল। গলায় এঁটে-বসা তুলসীর মালাটি একবার ঘুরিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। চাবি দিয়ে খোঁয়াড়ের দরজা খুলতে খুলতে বিমর্ষ ঠোঁট দুটো উলটে বলল, "এত ক্ষণে মাত্তর তিনটে।"

"নাঃ, তোমার জন্যে সবাই পথে-ঘাটে গোরু ছেড়ে রেখে দিয়েছে।" বলতে বলতে ফটিক

গোরু তিনটেকে খোঁয়াড়ে পুরে বাঁধন খুলে দিল।

নবাগতা গোরু তিনটে বাদে আর একটা ছাগী ছিল। সে একবার হুঁ হুঁ হুঁ করে ডেকে উঠল সরু গলায়। বোধহয় তার একাকিত্বের অবসানে।

ফটিকের গরম কথাতেই লক্ষ্মী কুণ্ডুর গাল ভরে ওঠে হাসিতে। তালা বন্ধ করতে করতে বলে, "তোর মতো কাজের লোকের যে কেন কাজ জোটে না, আমি তা-ই ভাবি।"

"তাহলে তোমার এ-কাজ কে করত, সেটাও ভাব", প্রায় কুণ্ডুর মতোই হাসতে গিয়ে বিকৃত মুখে বলে ফটিক : "এখন প'সা ছ আনা ছাড় দিকি চট্ করে।"

গোরু-পিছু তার দু আনা পাওনা। কুণ্ডু পাবে গোরুর মালিকের কাছ থেকে বারো আনা। আবার একদিন ছেড়ে দুদিন হলেই কুণ্ডুর পাওনা ডবল হয়ে যাবে। আইনত অবশ্য একটা খরচ আছে কুণ্ডুর, ওই পশুগুলোকে খাওয়ানো। কিন্তু কথায় বলে, সে-কথা জানে মা ভগা, আর জানে পশুগুলো। সেদিক থেকে বরং ফটিক, কুণ্ডুর সঙ্গে হাতাহাতি করে হলেও খোঁয়াড়ের প্রাণীগুলোকে কিছু দেয়। বলে, "কুণ্ডুবাবু, পুণ্যি করে করে তো সগ্গের সিঁড়ি সব ভেঙে ফেলে দিলে, নরকের দরজায় এট্টুসখানি থুথু ফেলে তো যাও।"

কুণ্ডু চিপটেন বোঝে, কিন্তু সেটা বুঝতে দেয় না। "তা যা বলেছিস। রাধাকৃষ্ণ বল।"

এখন ফটিকের কাছ থেকে পয়সার দাবি আসতেই কুণ্ডুর ফোলা গালের হাসিটুকু মিলিয়ে যায়। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "এ-ব্যবসা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর পোষাচ্ছে না।"

"আমারও না", ফটিক বলে আরও গম্ভীর হয়ে। "দু আনা রেটে আর চলে না।"

অমনি কুণ্ডু খ্যাঁক করে হেসে ওঠে। বোধহয় অস্বস্তিতে। বলে, "কী যে বলিস। তা পয়সা এখুনি নিয়ে যাবি? আর একটা চক্কর দিবি নে?"

"টাইম নেই।"

কুণ্ডু আর একটি কথাও না বলে গদীতে গিয়ে খতেন খুলে বসে। পিট পিটে চোখে হিসেব দেখতে দেখতে বলে, "সুদে সুদে কিন্তু তোর দেনাটা অনেক জমে যাচ্ছে ফটকে।"

"তা সে-কথা এখন কেন?" ফটিকের চোয়াল-উঁচোনো মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

"বলে রাখলুম।" বলে কুণ্ডু ছ আনা পয়সা বাক্স থেকে বের করে ছুঁড়ে দিল ফটিকের দিকে।

পয়সাগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে ফটিক প্রায় একদমে বলে ফেলল, 'পরশুকের তিন আনা, তার আগে পাঁচটা গোরু দুটো মোষ, চারটে ছাগল, জগাইয়ের এঁড়ে দুটো, এগুলোর দরুন পাওনা রয়েছে আমার। তা ছাড়া ...''

কুণ্ডু হাঁটু চাপড়ে হেসে উঠল। "তুই তো লেখাপড়া জানলে দিগ্‌গজ হতে পারতিস রে ব্যাটা।"

সে কথার জবাব না দিয়ে ফটিক বলল, "তা ছাড়া খুচরো আছে বারো আনা।"

কুণ্ডু চোখের মণি কোণে তুলে গাল ফুলিয়ে বলল, "বাঃ! সেদিনে যে তাড়িওয়ালাকে দিলুম সাত আনা, ক দিন গাঁজা নিলি ক পুরিয়া ?"

ফটিক একেবারে জল হয়ে গিয়ে চোখ বুজে হেসে উঠল, "তাই ব---লো। মাইরি, ও-শালার নেশাই আমাকে শেষ করেছে।" পরমুহূর্তেই চোখ ছোট করে হাসি টিপে আবার বলল, "তবু যে তিন আনা বাকি থাকে মশাই।"

শুনে কুণ্ডু খ্যালখ্যাল করে এমন হেসে উঠল যে মনে হল তার গলার শিরা ফুলে না আবার তুলসীমালা ছরকুটে যায়। "কেষ্ট কেষ্ট বল, বলিহারি তোর হিসেব। তোকে ঠকারে যে সে

এখনো জন্মায়নি।"

"বোঝ সেটা", বলতেই মনের মধ্যে কিসের ছটফটানিতে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যাকুলতা ফুটল তার হলদে চোখে, উঁচোনো চোয়ালের কোলে দেখা দিল বিচিত্র ব্যথার হাসি। বলল, "তিন আনা পয়সা দেও বাবু, আর দেরি করতে পারিনে। ঘরে আমার মেয়ে মরছে খিদেয়।"

"তা দিচ্ছি, কিন্তু আর একটা চক্কর দিস ফট্‌কে, নইলে মারা পড়ব।" বলে কুণ্ডু চারটে আনি নিয়ে একটা করে ফটিকের হাতে তিনটে দিয়ে পরে বলল, "আর এক আনা দিলুম তোর মেয়ের জলপানি।"

মুহূর্তে কী যেন ঘটে গেল। কুণ্ডুর চোখে ভয়, মুখে হাসির একটা অদ্ভুত ভাব ; আর ফটিকের হলদে চোখ জ্বলে উঠল ধবক্ ধবক্ করে। সে-ভাবও এক মুহূর্ত।

আনিটা কুণ্ডুর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ফটিক বলল, "আমার মেয়ে তোমার দেয়া সোনাও পায়ে মাড়াবে না। অমন প'সা আবার যদি কোনদিন দ্যাও—"

বাকিটা কুণ্ডু বুঝে নিল ফটিকের সর্বনেশে মুখটার দিকে তাকিয়ে। তবু হাঁফ ছেড়ে কুণ্ডু হাসল আর আনিটা রেখে দিল একটা কৌটোতে। এমনি ফিরিয়ে দেওয়া সব পয়সাই কুণ্ডু ওই কৌটোতে রাখে। উৎসর্গীকৃত বস্তু তো আর বাক্সে রাখা যায় না। শুধু মনের মধ্যে একটা গোপন হাসির ধার চকচকিয়ে ওঠে তার।

ফটিক ততক্ষণে কুণ্ডুর বিচুলির গাদা থেকে তিনটে আঁটি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল খোঁয়াড়ের মধ্যে।

কুণ্ডু হা-হা করে ছুটে এল। কে কার কথা শোনে। ফটিক ততক্ষণে আবার কুণ্ডুর ঝাঁপাল কাঁঠাল গাছে উঠে মট করে ভেঙে ফেলল একটা পাতাভরা বড়সড় ডাল, তারপর ছুঁড়ে দিল ছাগীটার দিকে।

কুণ্ডু তো খেপে মরে। খেঁকিয়ে উঠল, "শালা দিচ্ছিস, এর দাম দেবে কে?"

ফটিক হাসে হি হি করে, "ওরা আইনের মারপ্যাঁচে তোমার খোঁয়াড়ে আসে, তা বলে আইন তো আমার পরেও আছে গো", বলে সে সোজা ঘরের পথ ধরে।

ফোলা-গালে একটু থমকে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কুণ্ডু, "আর একটা পাক কিন্তু দি—স।"

ফটিকের কোন জবাব শোনা গেল না। কুণ্ডু তখন মনে মনে হিসেব করছে, তিন আঁটি বিচুলি ছ-আনা আর কাঁঠালপাতা আট আনা, একুনে চোদ্দ আনা। ঐ হরেদরে এক টাকা। ঘরে গিয়ে খতেন খুলে ফটিকের ধারের পাতায় এক জায়গায় লিখে রাখল—দফায় এক টাকা।

ফটিক এসে পড়েছে প্রায় রেললাইনের উপরে। পশ্চিম দিকে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা, এদিকটা ইউনিয়ন বোর্ডের। ফটিকের কারবার সর্বত্রই।

লাইন পেরিয়ে সে দেখল পশ্চিমা রাখাল বহাল তবিয়তে গান ধরেছে। মনে মনে হেসে ভাবল, ব্যাটা এখনো টের পায়নি। আর একটু এগোতেই চোখে পড়ল, ঝোপের পাশে একটা গাই একলা ঘাস খাচ্ছে। অমনি থেমে পড়ল সে। মুহূর্তে তার চোখে ফুটে উঠল মতলব হাসিলের চিহ্ন। কিন্তু চকিতে মনে পড়ে মেয়েটার কথা। আপন মনে মাথা ঝেঁকে আবার সে বাড়ির পথ ধরে। বলে, "যা বেটি, ছেড়ে দিলুম।"

এটা তার অভ্যাস হয়ে গেছে, এই পথে-ঘাটে, ঝোপে-ঝাড়ে আনকা গোরু-ছাগল দেখলেই থেমে যাওয়া। অমনি তার চোখে-মুখে ফোটে ধূর্তের সতর্কতা। ফস্ করে কোমর থেকে দড়ি নিয়ে বেঁধেই পথ ধরে খোঁয়াড়ের। এজন্য অনেকবার তাড়া খেতে হয়েছে তাকে লোকের।

গালাগাল-খিস্তির তো কথাই নেই। ঘুম থেকে উঠে তার মুখ দেখলে লোকে প্রমাদ গনে। ছোটখাট বিপত্তি ঘটলে বলে, "এঃ ফট্‌কে শালার মুখ দেখেছি আজ।" তা ছাড়া লাঠি তো উঁচিয়েই আছে তার মাথার উপর। কেবল হাতেনাতে ধরা যাচ্ছে না বলেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ফটিক পথের পরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দাঁড়ায় মনের ভাবে। নিজের উপর ধিক্কার আসে তার, ঘেন্না হয়। মনে মনে বলে, এ শালার জীবন তো আর সইতে পারিনে। বলে আর হাতের মুঠোয় ঘেমে-ওঠা পয়সাগুলো কচলায়।

তার দিকে চোখ পড়তেই পশ্চিমা রাখাল ভাবে, গোরুচোট্টাটা দাঁড়াল কেন? সে অমনি সতর্ক হয়।

কিন্তু ফটিকের মনে জ্বলুনিটা এতই তীব্র যে, তাকে একেবারে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' করে দেয়। ছিল চটকলের মিস্তিরি, বাড়তি সংখ্যার গুণতিতে বেরিয়ে এল ছাঁটাই হয়ে। তা-ও আজ সাত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এ-সংসারে কাজ নেই কোথাও কাজের মানুষের জন্যে। উপরন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট। ফটিক মিস্তিরি কি না আজ গোরু-ভেড়া-ছাগল দেয় খোঁয়াড়ে।

মনের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতির জন্যই যেন সে হঠাৎ মোড় ফিরে ছুটতে আরম্ভ করে তাড়িখানার দিকে। অমনি কে যেন ডেকে ওঠে পিছন থেকে, 'বাবা গো'। চকিতে সে আবার ফেরে। মনই তার মেয়ে হয়ে ডাক দিয়েছে। ইস্! ছুঁড়ি যে খিদেয় মরছে এতক্ষণে। মাঠের পথ ছেড়ে দিয়ে জলার কাদা মাড়িয়ে আবার ঘরের পথে ছোটে। কথায় বলে, যেন একটা লম্বা গেছো ভূতের মতো।

সতর্ক রাখাল গোঁফ মুচড়ে মনে মনে হাসে আর ভাবে, ব্যাটার সাহসে কুলল না।

মাঠ পেরিয়ে পাড়ায় ঢোকবার ঝোপঝাড়ে ছাওয়া বাঁকের মুখে পড়তেই ফটিকের কানে এল মিহি মিষ্টি গলার ডাক, "আমার বাবা না কি গো।"

থমকে দাঁড়াল ফটিক। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বুলা, মুখভরা নীরব হাসি নিয়ে।

বুলা অন্ধ। ভুরু তলায় মস্ত বড় বড় দুটো চোখের গর্ত। টানা চোখের পাতা, কিন্তু সেই পাতার তলে চোখ নেই, গভীর অন্ধকার। মাজা রং, বসন্তের দাগ তার-ও মুখে। বোঁচা নাক। রূপসী না হলেও অন্ধ বুলার এক অপূর্ব শ্রী ফুটে রয়েছে তার শাদা ঝকঝকে অনুক্ষণ হাসি ও কালো টানা ভুরুতে। তা ছাড়া, পাড়ার কথায় বলি, কানি বুলার শরীলে যে লেগেছে বয়সের ধার। লেগেছে প্রথম যৌবনের মায়া।

সে এমনভাবে ফটিকের সামনে এসে দাঁড়াল যে, কে বলবে এ মেয়ে অন্ধ। হতোশে ফটিক চোখ বড় করে বলে, "ঘর থেকে কী করে এলি এত পথ?"

বুলা হাসে, "পথ যে আমার চেনা গো বাবা।"

"কী করে তুই বুইলী যে, তোর বাপ আসছে?"

বুলা বলে স্বাভাবিক মিষ্টি গলায়, "কী করে আবার, যেমন করে সবাই বোঝে," বলে সে চোখের পাতা খোলে। পাতার তলায় ঝাপ্‌সা অন্ধকারে হাসির মতো কী যেন কাঁপে তির তির করে। বলে, "আমি ঠিক বুঝি। তুমি ছুটে এযেছ, পায়ে তোমার কাদা।"

"পায়ে কাদা?" অবাক ফটিক নিজের কাদাভরা পায়ের দিকে দেখে বুলার চোখের অন্ধ কোলের দিকে তাকায়। বলে, "কী করে বুইলি?"

"প্যাঁকের বাস লাগছে যে নাকে?" বাপের হাত ধরে বলে, "চল, ঘরে যাই।"

ফটিকের ছ্যাচড়া জীবনের হট্টগোলের মধ্যে তাকে যেন ঠিক চেনা যায় না, তেমনি তার

এ-মেয়েটির কাছে এলে সেও ভুলে যায় বাইরের কথা।

বাগানের গাছগাছালির ছায়ায় যেতে যেতে বুলাকে একটু কাছে টেনে বলে, "হ্যাঁ রে, পেটের জ্বালায় বুঝিন ছুটে এযেছিলি, বাপ আসে কি না দেখতে?"

ভ্রূ টেনে বুলা বলে, 'না। তোমার দেবী দেখে মনটা ঘরে বইলনি, তাই।"

এমনি কথা বুলার। নিজেব খিদে বল, শখ বল, বল দুঃখ-জ্বালাব কথা, তাব 'হ্যাঁ' নেই।—কেবলি 'না'। কিন্তু ফটিক বুঝি কিছু বোঝে না? তার বুকটা মুচড়ে ওঠে, স্বর বন্ধ হয়ে আসে গলাব। এমন কবে মেযেটা সব লুকোয়। যেন সব দেখতে পেযেও ওব চোখ দুটো অন্ধ করে রাখাব মতো। বুঝি ফটিকেবই দাযিত্ব নিয়েছে এ-কানা মেযে। কানা মেযেব শুধু বাপেব ভাবনা।

এ-সংসারে ফটিকেব জন্য আবাব ভাবনা। মা-বাপেব কথা তো তাব মনে পড়ে না। যেটুকু পড়ে, সে তাব এক আবাগী পিসি, থাকত ফটিকেব বাপেব সংসাবে। সে মবে যেতে ফটিক এনেছিল বুলাব মাকে। বিযে দেবাব তো কেউ ছিল না, তাই বুলাব মাকে ফটিক কেড়ে এনেছিল এক মাতালেব কাছ থেকে। বুলা তখন ছ মাসেব অন্ধ শিশু। তাবপব সেও মবল, বইল বুলা। তখন মনে হত, এটা গেলেই বাঁচি। কিন্তু বুলা তার মনটা আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে জড়িযে ধবেছে যে, এখন পা বাড়াতেই ভাবনা লাগে, কেমন কবে ওব প্রাণটুকু ধবে বাখি।

এই ধবে বাখতে গিযে ফটিকের যে ছটফটানি, সেই ভাবনাতেই আবাব হাড়মাস কালি হচ্ছে বুলার। তার ভাবনা যে অনেক। এই যে চলেছে বাপেব সঙ্গে, এর জন্য পাড়াব সবাই কতই না মুখ বাঁকাচ্ছে, ঠোঁট উলটোচ্ছে, মনে মনে টিপে টিপে তাদেব গালাগাল দিচ্ছে। কেউই তাদেব ভালবাসে না। সে শুধু ফটিকেব ব্যবহাবেব জন্য নয়, তাদেব বাপ-বেটিব জীবনকে ওরা কুনজরে দেখে। বালাই-ছাড়া জীবনের সবই বুঝি এমনি হয।

তবু পাড়ার রোগে-শোকে লোক মবলে বুলা তাব বাপকে জোব কবে পাঠায। সকলেব বিপদে আছে ফটিক। তখন সবাই বুঝি ভুলেও একবাব ভাবে, ড্যাকবাটাব মাযাদযা খানিক আছে। কিন্তু কোন আনন্দেব উৎসবেব মধ্যে তাব ডাক পড়ে না। বাত দুপুবে চোব এলে ফটিক যায় আগে, পরদিন সকালে ফিসফিস গুলতানি হয়, চোব যে ফটকে হারামজাদা, তা কারুব বুঝতে বাকি নেই।

তা শুনে ফটিক ক্ষেপে ওঠে, লাঠি নিয়ে ছুটে যেতে চায, খিস্তি করে, গালাগাল দেয। তাড়াতাড়ি বুলা বাপের মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে বাখে। বলে, "বাবা, যেওনিকো। এ শুধু ওদেব ঝগড়ার ফিকিব। গেলে যে আরো বলবে।"

কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারে না যে, এক গোরু চুরিই যে সব বাজি মাত করেছে। এই বাজিমাতেব মধ্যে আর এক নিদারুণ জ্বালা আছে বুলাব মনে, কুণ্ডুবাবুব জন্যে। শুধু জ্বালা নয় অন্ধ মেযেব সে এক দারুণ বেদনাভবা লজ্জা ও অপমান। যে-অপমান রাখবাব ঠাঁই নেই, বুকটার মধ্যে শুধু অসহায় অভিশাপেব ঝড় বযে যায।

কোন-কোন সময়ে নিজের যৌবনকে সে অভিশাপ দিতে গিয়ে থেমে যায়। অদেখাব আড়ালে যে এসেছে তার শরীবে শিরায় শিবায় বক্তের ঢেউ তুলে, সে যে তাব দুটি চোখেব মতোই এসেছে তীব্র অনুভূতি নিয়ে। সে যেন না দেখাকে দেখার মতো, না ছোঁয়াকে ছোঁযাব মতো। তবু কি নেই একটুখানি কাঁটাব খচখচানি? আছে। সে-কাঁটা তো বিশ্ব-সংসার ছেয়ে আছে মনে মনে বুকে বুকে। সে-কাঁটা এ-জীবনেব বেড়াজাল, যে-বেড়াজাল সরাবার জন্য সে, তাব বাপফটিক, এ দুলেপাড়ার সবাই দিনেব পর দিন ধরে ভাবে, কাজ করে, বিবাদ করে, এক ফোঁটা আনন্দ পেলে ধরে রাখতে চায় চিরদিনের জন্য।

কুণ্ডুকে সে ভয় পায না, ঘেন্না কবে। সে কানা হোক, হোক বোবা, তবু মন বল, শরীর বল,

সবই তার নিজের। সেখানে বেঁকে যাবে না কুণ্ডুর শয়তানি।

বুলাকে দাওয়ায় বসিয়ে ফটিক বলে "এট্টুস বস, বাসুব দোকান থেকে দুটো চাল নিয়ে আসি", বলে ফটিক বেরিয়ে যায়।

বুলা ছাড়া ফটিকের সম্বল এই ভিটেটুকু। বেঁকে-পড়া একখানি ঘর। তার গায়ে মাথায় নারকেল-খেজুরপাতার অনেক গোঁজামিল দেওয়া। দাওয়ার এক কোণে উনুন। এ-ভিটেও যে কবেই কুণ্ডুর খতেনের অঙ্কে ডুবে গেছে, তা ফটিক জানে, তবু মুখে কিছু বলে না।

বুলা বসে বসে হাসে আর আপন মনে গুনগুন করে। ওই তার স্বভাব।

বেলা যায় মেঘে মেঘে। শিনচে-কলমীর শাকটুকু নিয়ে ভাত বেড়ে বসে বাপ বেটিতে একই পাতে। খেতে বসে একজন ভাবে, ছুঁড়িটার দিকে দুটো বেশী ঠেলে দি। আর একজন ভাবে যে জোয়ান বাপের এই কটা ভাত তো একলারই লাগে, সে আর কি খাবে। রোজই তারা এমনি ভাবে আর খায়। কেউই কাউকে ফাঁকি দিতে পারে না।

খাওয়ার পরে ফটিক কোন,কোন দিন বেরোয়। বেলার দিকে তাকিয়ে আজ আর বেরুল না। দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বুলা বাপের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আপন মনে বলে পালের গোরু ফিরছে। তারপর হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে, "ঘরের পেছন দে কে যায় গো। মোটন পিসি না কি ?"

জবাব আসে, "হ্যাঁ লো কানি।"

কানি। বড় অদ্ভুতভাবে হাসে বুলা। মনে পড়ে একদিন এক ভিখিরি এসে ভিক্ষে চাইতে বুলা তাড়াতাড়ি একমুঠো চাল দিতে গিয়েছিল। ভিখিরিটা-ও ছিল অন্ধ। সে যখন টের পেল বুলা অন্ধ, তখন সে হাত গুটিয়ে নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বলেছিল, "ধু র, কানির হাতে ভিক্ষে লোবনি।"

সেটা পাড়ায় আজও একটি হাসির গল্প হয়ে আছে। বুলা লজ্জায়, অপমানে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোত্থেকে একটা গোরু এসে তার প্রসারিত হাত থেকে চালগুলো খেয়ে গিয়েছিল। তখন চোখে জল থাকলেও 'ওমা' 'ওমা' করে হেসে সারা হয়েছিল বুলা।

হঠাৎ একটা চিৎকারে বুলার ভাবনা ভেঙে গেল, তন্দ্রা ভেঙে গেল ফটিকের। কী ব্যাপার ? কান পাতল ওরা।

চিৎকার করছে চরণ মিস্ত্রির প্রৌঢ়া স্ত্রী। নামহীন গালাগালি ও অভিশাপে ভরে উঠল দুলেপাড়ার আকাশ—"যে আমার পোয়াতি গাই পণ্ডে দিয়েছে, সে আঁটকুড়োর শরীল গলে গলে পড়বে, আর জন্মে সে গোরু হবে।"

শুধু ফটিক নয়, মুহূর্তে বুলাও বুঝতে পারল এ-গালাগাল কাদের উদ্দেশে।

চরণের বউয়ের গালাগালে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার শত্রুর চেহারা। "আঁটকুড়ো মেয়েমেগো, কানি ছুঁড় নিয়ে সোহাগ করে। ওর কানি যেন পোয়াতি হয়ে পেট খসে মরে পড়ে। ওকে পোড়াতে কাঠের দাম না জোটে, ও যেন মুখ দে রক্ত উঠে মরে। ভগবান যেন ওর দুচোখ কানা করে। কানি ষাঁড় নিয়ে যেন ওকে ভিক্ষে—"

ফটিক হঠাৎ ফুঁসে লাফিয়ে ওঠে, "হারামজাদীকে আজ—"

"বাবা !" কান্নাভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে বুলা, "বাবা গো।"

ফিরে দেখে ফটিক, বুলার অন্ধ চোখের গর্ত থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। "ছি ছি, বাবা, তুমি যেওনি কো।"

"ওরা আমায় গালাগাল দিক, তোকে কেন ?"

"দিক, আমি যে তোমার মেয়ে।" বলে সে ফটিকের পায়ের কাছে এসে মাটিতে মুখ বেখে ফুঁপিয়ে উঠল। উপোসে মরব, তবু এমন কাজ তুমি আর কর না বাবা। ওদের শাপে তুমি যদি অন্ধ হও ... তাহলে আমায় কে দেখবে?" ..

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফটিকের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, ফুলে উঠল গলার শিরাগুলো। বসে পড়ে বুলার মাথায় হাত বাখল সে। বলল ফিসফিস কবে, "আমি কী কবব বল! একটা কাজের জন্য কার কাছে না গেছি, বোজ হাজিরা দিচ্ছি কলে-কারখানায়। ঘুষ চায় একশো টাকা। একটা ঘবামির কাজও পাইনে। কাজ নেই এ-সংসাবে, তবে কেমন করে বাঁচি বল্?"

জবাব নেই বুলার। সত্যি কেমন করে বাঁচা যায় এ-সংসারে। ফটিকরা কেমন কবে বাঁচবে, এ-সংসারে সে-কথা বলে দেওয়াব কি কেউ নেই? লোকে পরামর্শ দিয়েছে বুলাকে নিয়ে ভিক্ষে করে খেতে। তার চেয়ে ফটিক ঠ্যাঙাড়ে বৃত্তি কবে খাবে, তবু ভিক্ষে কবতে পারবে না।

ইতিমধ্যে চবণেব বউযের সঙ্গে সারা দুলেপাড়া গলা মিলিয়েছে। সে এক অদ্ভুত হট্টগোল।

বেলা যায়, সন্ধ্যা নামে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ফটিকেব ঘবে। কিন্তু ওবা বাপবেটিতে বুঝি বাঁচার ভাবনাতেই অন্ধকারে বসে থাকে মুখ গুঁজে। অস্থিব চিন্তায় আড়ষ্ট, জীবনমরণের সংশয়ে যেন ভীত বিহ্বল দুটো পাতালগর্তেব অভিশপ্ত জীব।

হঠাৎ ফটিক বলে ওঠে, "না খেযে মবলে তো কোন শালা দুটো কথা বলতেও আসে না, তবে কিসের খাতিব ওদেব?"

অন্ধকারের দিকে মুখ তুলল বুলা। বুঝি জল লেগেই তাব চোখেব গর্ত দুটো চকচক কবে বলে, "বাবা, কে কাকে দেখবে? অভাব যে বড শত্তুর। ওদের যে-টুকু আছে, সে-টুকুই পুতুপুতু করে ধরে রাখতে পাবে না। আমাদেব মতো ওবাও কোনবকমে বেঁচে থাকতে চাইছে।"

গর্তে-ঢোকা হলদে চোখ দুটোতে ফটিকেব ব্যথিত স্নেহ ঝবে পড়ে। বলে, "চোখ দুটো নেই তবু এত কি করে বুঝিস তুই বুলি?"

"চোখ দুটো আমাব নেই বলেই।" বলে সে হাসে তেমনি করে। যেন কতদূব থেকে তাব গলা ভেসে আসে, "বাবা, আমাব চোখ দুটো নেই, তাই মনটা সব্বোখন যেন হাঁ কবে থাকে দেখবার জন্যে। সব বোঝা আমাব ঐখেনে। ভাবি, যাদের চোখ মন দুই-ই আছে, তাদের বুঝিন কোনটাই পুবো নয়; আমার যে একটাই সব", বলতে বলতে তাব চক্ষুহীন গর্ত থেকে আবার জল পড়ে, "তবু ভাবি, চোখ দুটো থাকলে চটকল বা চালকলে কোন কাজকর্ম কবতে পারতুম।"

ফটিক বোঝে, এ হল বুলার বাপের গঞ্জনা, অপমানের ব্যথা। সে চোয়াল উঁচিয়ে ছুঁচলো মুখে ঢোক গিলতে থাকে আর মনে মনে বলে, "তোকে যন্তন্না দিতে আব যাব না গোরু ধরতে, যাব না" ...

হঠাৎ পরিষ্কার গলায় বলে বুলা, "বাবা, চাঁদ উঠেছে বুঝিন?"

ফটিক চমকে উঠে দেখে, তাই তো, কখন তাব দাওযা পেবিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে অন্ধকার কাঁচা মেঝেয়। আলোভরা উঠোনে যেন কালো বঙে লেপে আছে পিপুলের ছায়া। মনে হয় যেন দু চোখ মেলে নির্বাক জ্যোৎস্না ঘবে এসে তাদেব বাপবেটিব কথা শুনছে। ফটিক বলে, "কী কবে বুইলি?"

বুলা বলে, "দ্যাখ না, সারাদিনের পব হাওয়া দিচ্ছে, কাগ্ ডেকে উঠছে, লক্ষীপ্যাঁচা ডাকছে। তা ছাড়া কাল যে একাদশী গেছে। ...চল বাবা, বাইবে যাই।"

"চল্।" বুলাকে নিয়ে ফটিক বাইরে এসে বসে।

শরতের রাতে কালো আকাশ। তাবা দেখা যায় না। আকাশে তিন পো চাঁদ। শরতেব এই

আলো-আঁধারির কুহেলিতে মনে হয় যেন কোন এক নির্বাক অশরীরী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই মুহূর্তটিতে তারা ভুলে যায় তাদের দৈন্য ও উৎপীড়নের কথা। বুলা বক বক করে আপন মনে। ফটিকের মনে পড়ে যায় বুলার মাকে। তারপরে চকিতে মনে আসে চরণের বউয়ের গালাগালি, "ওর কানি যেন পোয়াতি হয়ে পেট খসে মরে।" হঠাৎ সে বলে, "বুলা, তোর বে' বসতে মন চায় না?"

এক মুহূর্ত থমকে বুলা খিল খিল করে হেসে উঠে। অন্ধ মেয়ের সে হাসিতে সারা দুলেপাড়ায় যেন বিচিত্র স্বপ্ন নেমে আসে। সামনে বাপ হলেও শরীরের কাপড় গুছোয় সে। দশজনের চোখের মধ্যে যে সে নিজেকে দেখেছে। পরমুহূর্তেই হাসি থামিয়ে বিস্মিত মুগ্ধ মুখে চোখের পাতা মেলে ধরে আকাশের দিকে। যেন কান পেতে শুনছে কার পদধ্বনি। তারপর আস্তে যেন আপন মনেই বলে, "হ্যাঁ বাবা, মন চায়।" বলে ফেলেই মাটিতে মুখ লুকোয় দুরন্ত লজ্জায়। ফটিক হো-হো করে হেসে ওঠে হেঁড়ে গলায় আর তার চোখ ছাপিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।

এমন সময় একটা ছায়া পড়ে উঠোনে। চোখের জল মুছে ফটিক বলে, "কে গা?"

"এই আমি।" যেন খানিকটা ভয়ে ভয়েই বলে কুণ্ডু একটু হেসে হেসে।

"কুণ্ডুবাবু?" ফটিক বলে, "কী মনে করে?"

"কী মনে করে? আর কিছু না" বলে কুণ্ডু এক পা পা করে এগোয়— এই এলাম একটু তোকে দেখতে।' কুণ্ডুর গলায় কথা আটকে যায়। ফটিক মনে মনে দাঁত পেষে আর বুলা মনে মনে বলে, নচ্ছার এসেছে ওর মরণ দেখতে।

ফটিক বলে "তা এসেই যখন পড়েছ তখন বস।"

কথার হুলটুকু খেয়েও কুণ্ডু বলে, "না, এসেছিলাম তোকে বলতে যে, আর একটা পাক তো দিলিনে।"

বুলা কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ফটিক বলল, "শ'খানেক টাকা দেবে কুণ্ডুবাবু, ঘুষ দিয়ে একটা চাকরি পাই তবে।"

এবার কুণ্ডু হাসে একটু পরিষ্কার গলায়, "তোর চাকরি হলে আমার কাজ করবে কে?"

বুলা এবার তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, "তোমার অমনকাজের মুখে ছাই। কাজ না ছ্যাচড়ামো? ভ্যালা ধম্মের খোঁয়াড় খুলেছ।"

কুণ্ডুর রঙ যেন আর একটু চড়ে। বলে, পয়সার কাছে আবার ছ্যাচড়ামো কি! মা লক্ষ্মী যেমন দেবে। এই দ্যাখ না, ফটকেকে তোর জন্যে কতদিন জলপানির পয়সা দি, আনে না। আনলে তো একটা বেলা

কথার মাঝেই ধীর গলায় ফটিক বলে ওঠে, "রামদাটা কোথায় রে বুলা?"

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে হেসে জবাব দেয় বুলা, "ঘরে আছে। নিয়ে আসব?" হাসলে অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ফোটে বুলার গলায়।

কুণ্ডু তাড়াতাড়ি বলে, "আচ্ছা, তাহলে আসি ফটিকচাঁদ। কালকে যাস' বলেই সে চকিতে পিপুলের ঘন অন্ধকারে মিশে যায়।

অমনি তারা বাপ-বেটিতে এক সঙ্গে গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। তাদের ছন্নছাড়া জীবনের এ দরাজ হাসি শুনে সারা দুলেপাড়া যেন চমকে ওঠে। যেমন হঠাৎ হাসি, তেমন হঠাৎ তা থেমে যায়। এ-হাসি যে তাদের অভিশপ্ত জীবনের অন্ধকারকে উড়িয়ে নিতে পারবে না।

না, পারে না। অন্ধকার যেন আরো জমাট হয়ে আসে। কতবার ফটিক মনে মনে ভেবেছে

গোরু ধরতে আর যাবে না। কিন্তু কোথায় ভেসে গেছে সেই প্রতিজ্ঞা। কারখানায় ঘুষ ছাড়া কাজ হবে না। ঘুষেব টাকাও দেবে না কুণ্ডু। সারা গাঁয়ের সমস্ত এঁদো পুকুবেব কলমী-হিন্‌চে ঝেড়ে-মুছে বিক্রি করেছে ফটিক। তা-ও আব নেই।

মাঠে মাঠে পথে পথে ঘোবে। আকাশে শবতেব ঝিমঝাবা মাথাধবা বোদ! গায়ে কম্প দেয়। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে-পড়া মাথাটা দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে পথে পথে ঘোবে! কেবলি যেন কানে আসে, 'বাবা গো!' মবছে মরছে কানা মেয়েটা খিদেতে। নাকি বুঝি নিজেব পেটেব জ্বালাই বাববাব মনে কবিয়ে দেয় মেয়েটাব কথা। বারে বাবে সে ছুটে যায় কুণ্ডুব কাছে।

কুণ্ডু বলে, "দেনা তো তোব অনেক চড়েছে. নিজে না খাস, সেটা শুধবি তো?"

জ্বরের ঘোরে লাল চোখে একটু তাকিয়ে থেকে আবাব ছুটে যায় ফটিক।—না, আজকাল আব গোরুও নেই পথে। পশ্চিমা বাথালটা চোর্কবিব ভয়ে সব সময় সজাগ। সজাগ সকলে। শুধু ধমের ষাঁড ঘোবে পথে পথে। একটা জাদুশিঙেও যদি থাকত। যেন ফুঁক দিলেই সব গোব ভেড়া ছুটে আসত তাব কাছে। কিন্তু মেয়েটা? মেয়েটা কি খাবে? ভাবে আব নিজেব পেটে হাত দিয়ে বসে থাকে।

কুণ্ডু বলে, "দেনা তো তোব অনেক চড়েছে. নিজে না খাস. সেটা শুধবি তো!" তাবপব চোখ ঘুবিয়ে বলে, "আব, লোকের গোয়ালেও কি গোরু নেই?"

অর্থাৎ গোয়াল থেকে চুবি কবতে বলছে।

মেয়েটা উদ্বেগে মাঠেব ধাবে শুকনো মুখে বসে থাকে। কখন শুনবে মাঠেব মাঝে সেই পায়ের শব্দ। মনে মনে বলে, বাবা গো, আমি খাবনি, তুমি ফিরে এসো। তবু হু হু কবে কেঁদে ওঠে পেটেব ব্যথায়।

যদিও ফটিক ঘবে আসে, বেশিক্ষণ থাকতে পাবে না।

দিকে দিকে বাজে শাবদোৎসবেব বাজনা। পুজো এসে পড়েছে। চাবিদিকে কেনাকাটাব রব।

বিকালবেলা ফটিক নবগাঁ পেবিয়ে শ্যামপুবেব পথে পড়ে। একটা গোরু হা-হা কবে ছুটে আসে তাঁব সামনে। ফোঁস ফোঁস কবে। দিক ভুলেছে গোরুটা। থমকে দাঁড়ায় ফটিক। দেখে এদিক-ওদিক। তাবপবে হঠাৎ কী মনে কবে কষে এক ঘা লাগায় গোরুটাব পিঠে। বলে, "পালা, পালা হাবামজাদী, নইলে মববি গিয়ে কুণ্ডুব খোঁয়াড়ে।" বলে সে নিজেই পালায়। পালায় যেন সেধে-আসা পয়সা ফেলে।

তাবপব হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় একটা চালাব কাছে। চালাটা গাঁয়েব প্রান্তে। খেজুড় গুড় জ্বাল দেওয়াব উনুন ঘব—আব একটা খুঁটিব সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এক পাল গোরু। অদূবেই উঁচু পাড়-ঘেবা একটা নতুন-কাটানো ডোবায় জলেব ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল। ফটিক উঁকি মেবে দেখল, একটা মুনিষ চান কবছে, বোধ হয় ফেবাব পথে। চকিতে সে একবাব এদিক-ওদিক দেখে অসীম সাহসে ভব কবে খুঁটি থেকে খুলে ফেলে গোরুকটাকে। গাইবাছুব মিলিয়ে সাতটাকে এক দড়িতে বেঁধে লহমায় সে নেমে পড়ে পথে। একটা গাছ থেকে ছপটি ভেঙে, সপাং সপাং কবে মাবতে মারতে, ধুলোব ঝড় উড়িয়ে সে খোঁয়াড়েব পথ ধবে।

কুণ্ডুব খোঁয়াড়ে যখন এল, তখন ঘামে ধুলোয় তাকে আব চেনা যায় না। কিন্তু ফটিক জানে এ-ঘাম মবে গেলেই কম্প দিয়ে জ্বব এসে পড়বে। তাব আগেই সে পয়সা নিয়ে চলে যাবে। তিনদিন ধবে যে নির্জলা উপোস চলেছে।

কুণ্ডু মহা খুশি হয়ে চাবির গোছাটি বাজাতে বাজাতে বেবিয়ে এসেই চোখ ছানাবড়া কবে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত চুপ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ওবে শালা, এ যে আমাব গোরু সব

গোয়ালশুদ্ধ ধরে এনেছিস! শালা, কোত্থেকে এনেছিস?"

প্রথমটা একটু ভড়কে গেল ফটিকও। কিন্তু চকিতে নিজেকে শক্ত করে ফটিক বলল, "গোয়াল-টোয়াল নয়, রাস্তা থেকে ধরে এনেছি। আইনের ব্যাপার। সে তোমারই হোক, আর যারই হোক। একটা টাকা ফেল, নয় তো বল আমাদের পাউন্ডে দে' আসি।"

অর্থাৎ মিউনিসিপালিটির আওতায়।

ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কুণ্ডু কেমন করে ছেড়ে দেয় নিজের গরুগুলো। অথচ ফটিকের সঙ্গে তার বিলক্ষণ চেনা আছে। তাড়াতাড়ি সে একটা টাকা এনে দিয়ে গোরুগুলোকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

ফটিক বলে, "রাগ করবেন না কুণ্ডুবাবু, খেতে তো হবে।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটে চলে ঘরের পথে। না, ঘরের পথে নয়, বাজারের দিকে। মনে মনে বলে, একটু থাক মা, এলুম বলে।

কুণ্ডুও তখনি চাকরের উপর সব ভার দিয়ে চাবির গোছা কোমরে বেঁধে থানার পথ ধরে।

সে যখন দারোগাবাবু আর সেপাইয়ের সঙ্গে বাজারের কাছাকাছি এসেছে, সেই সময়টিতেই ফটিক বেরোয় বাজার থেকে, কোঁচড়ে চাল নিয়ে।

কুণ্ডু চেঁচিয়ে উঠল, "দারোগাবাবু, ওই যে শালা গোরু চোর।"

বলতে না বলতেই যমদূতের মতো সেপাই একটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটিকের উপর। এ আচমকা আক্রমণে কোঁচড়ের চালগুলো ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

দারোগাবাবু বললেন, "যাক, আর অদ্দুর যেতে হল না।"

সেপাই বলল, "চল শালা।"

চালগুলোর সঙ্গে যেন ফটিকের প্রাণটাই ছড়িয়ে পড়েছে। দিশেহারা হয়ে সে বলল, "কোথায়?"

কুণ্ডু বলল দাঁতে দাঁত পিষে, "শালা, সরকারের খোঁয়াড়ে।"

হঠাৎ সে বেঁকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু, আমার কানা মেয়ে যে একলা রয়েছে।"

কুণ্ডু ফোলা গালে হাসি ফুটিয়ে বলল, "সেটা যাবে আমার ধর্মের খোঁয়াড়ে।"

এতক্ষণে যেন সব হৃদয়ঙ্গম করে সে ভাঙা ভেঙে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, "বু—লা-রে ।"

ততক্ষণে তার মুখটা উল্টো মুখে থানার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর বুলা তার নিস্তেজ শরীরটা নিয়ে টুক টুক করে চলেছে মাঠের পথে। দিনেও যেন, রাতেও তেমন চলেছে চেনা পথে, বাগানের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আকাশের দিক মুখ করে বলে, "চাঁদ উঠেছে বুঝিন?"

সত্যি, চাঁদ উঠেছে আকাশে। বিষণ্ণ জ্যোৎস্না যেন অবাক হয়ে চেয়ে আছে অন্ধ মেয়েটার দিকে। গাছের ভেজা পাতায় কাজলের চকচকানি। সেখান থেকে বুকভরা নিশ্বাসের মতো হঠাৎ হাওয়া বয়ে যায় বুলার মাথার উপর দিয়ে।

বুলা থমকে দাঁড়ায় খস্-খস্ আওয়াজে। নিজেই বলে, "দূর—দূর শেয়ালগুলো।" সত্যি একপাল শেয়াল চলে গেল। কিন্তু বেঁকে পড়ে বুলা। পেটটা পিঠে ঠেকে যেন দুমড়ে পড়তে চায় মুখ থুবড়ে।

কোত্থেকে ডাল-সম্বরার মিঠে ঝাঁজের গন্ধ আসে হালকা। গলা ভিজে ফুলে ফুলে ওঠে বুলার নাসারন্ধ্র। তাতে যেন নির্বাক জ্যোৎস্নারই গোঙানি উঠল হঠাৎ ঝিঁঝির ডাকে।

মাঠের ধারে এসে বসে পড়ল বুলা। যেদিক থেকে তার বাবা আসবে, সেদিকে মুখ করে তুলে রাখল চোখের পাতা। চোখের সেই অন্ধ গর্তে যেখানে দলা পাকিয়ে আছে কতকগুলো

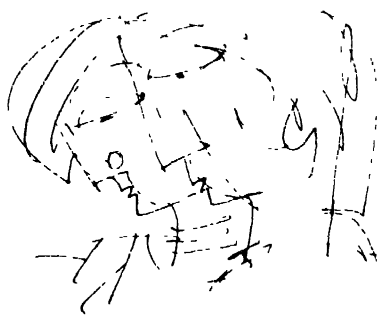
শিরা-উপশিরা, সেখানটা কাঁপতে থাকে থরথর করে, আর ফিস ফিস করে বলে, "বাবা গো, খেপলে যে তোমার মাথার ঠিক থাকে না। তোমার বুলা খেতে চায়নি, তুমি ফিরে এস—"

কিন্তু পেটের মধ্যে কারা যেন ব্যথার ধাক্কা দিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে। শেষটায় অনেকক্ষণ বসে থেকে যখন সে শুনল থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, তখন সে ভাবল, বাবা তো তার এত দেরি কোনদিন করে না! তবে কি বাবা মাঠের ওপারে তাড়িখানায় পড়ে আছে? তার অন্ধ চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল। গলা ফাটিয়ে ডাক দিল "আমার বাবা গো"। লাইনের উঁচু জমিতে তার প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

আর আশ্চর্য, যে চরণের বউ ওদের বাপবেটিকে এত গালাগালি করেছিল, সে নিজের অন্ধকার ঘরে শুয়ে বুলার ডাক শুনে আপন মনে বক্ বক্ করে উঠল, "বাপ না, সে হারামজাদা কশাই। নইলে অমন সোমথ কানি মেয়েটাকে কেউ এমনি ফেলে রেখে যায়।" বলে সে চরণকে বলল, "মনটা খারাপ গাইছে চল তো এট্টুস দেখে আসি।" বলে সে মাঠের পথ ধরল।

আর মাঠের উপর তখন দেখা যায়, অন্ধকারে কুণ্ডু এদিকে আসছে দ্রুত পদে—নিঃশব্দে।





পেলে লেগে যা

'হেই শালা আবশোলাব বাচ্চা।' কান্ত কুণ্ডুব ক্রুদ্ধ হুংকাব বা গর্জন না, চিৎকাবেব হাঁক শোনা গেল। হাঁকেব মধ্যে হুকুমেব থেকে, এক ধবনেব মত্ততাব ঝাঁজ বেশি। বৃন্দাবন-বৃন্দা-বেন্দাব পক্ষে এই চিৎকারের হাঁকই যথেষ্ট। কিন্তু ও শুনতে পেল না। ওব দশ বছব বযস থেকে, দশ-এগাবো-বারো তিন বছবেব জীবনে এবকম একটা ঘটনা এই প্রথম। দশ বছবে পডতেই কান্ত কুণ্ডুব মস্ত দোকানে ও কাজে এসেছিল। এখন বাবো পাব হব হব করছে। এই তিন বছবেব মধ্যে এমন একদিনও হযনি, কান্ত কুণ্ডুব নামহীন ডাক ও শুনতে পাযনি। কান্ত কুণ্ডু কখনই ওব নাম ধবে ডাকে না। দবকাবও হয না! হযতো বেন্দাকে সে মানুষেব বাচ্চা বলে মনে কবে না, বা কখনো তা ভাববাব অবকাশ হযনি। সে, বা তাব দুই শালা যাদেব একজন দোকানেব স্টেশনাবি বিভাগ, আব একজন পাশেব ব্যাশন শপেব দাযিত্বে আছে, তাবা এবং বাডিতে তাব দ্বিতীয পক্ষেব বউ, আব হেঁশেল ঠেলে যে মাসী, কেউ ই ওব নাম ধবে ডাকে না। ডাকলে, সেটা ওব আশ্চর্যেব ব্যাপাব হত; এমন কি ওব মা-ও ওব নাম ধবে ডাকলে, তাতে ওব পক্ষে সাডা দেওয়া সম্ভব হত না। ওব অনভ্যস্ত কান নিশ্চযই ভুল কবত। বা ভুল শুনেছে ভেবেই নির্বিকাবভাবে চুপ কবে থাকত।

কান্ত কুণ্ডুব এখন এই চিৎকাবেব হাঁক না শোনাটাও, আবো আশ্চয আব অস্বাভাবিক ব্যাপার। বেন্দা ডাক শুনতে পেল না, ববং বেশ খানিকটা উঁচুতে শূন্যে লাফিযে উঠেও গলা ফাটিযে চিৎকার কবল, 'পেলে লেগে যা।'

'পেলে লেগে যা'। কতগুলো অসম স্বর মত্ত চিৎকাবে প্রতিধ্বনি কবলো।

কথাগুলোব অর্থ কী, বেন্দা জানে না। অথচ একটা উল্লাস আব উত্তেজনা বোধ কবছে। কথাগুলো ও কান তৈবি হবার পব থেকেই শুনে আসছে। আজও শুনেছে। যাদেব মুখ থেকে শুনেছে, তাদের স্ববেও উল্লাস-উত্তেজনা। এমনই এক আশ্চর্য কথা, উল্লাস আব উত্তেজনার মধ্যে একটা মত্ততাও থাকে-—যা আছে এখন বেন্দাব গলা ফাটানো চিৎকাবেও। এতকাল শুনেই এসেছে,এরকম ভাবে কখনো বলেনি। কথাটাব অর্থ আগে জানত না, এখনো জানে না।

কথাটার পিছনে যেন অনেক অবাক কথা আব রহস্য লুকিযে রয়েছে। আব সেই জন্যই, কথাগুলো যতবাব চিৎকার করে বলল, প্রত্যেকবারই কেউ যেন ওব ে ভিতর থেকে অবাক নিচু স্বরে ফিসফিস করে উচ্চাবণ করল, 'পেলে লেগে যা'। তাবপরেই হঠাৎ হাহা কবে হেসে উঠতে লাগল। আবার হাত পা ছুঁড়ে নেচে চিৎকাব করে সেই একই ধ্বনি কবতে লাগল. কিন্তু কান্ত কুণ্ডুর ডাকও শুনতে পেল না।

এখন অবিশ্যি দোকান খোলা নেই। বেন্দা দোকানেব বাইরে, খানিকটাব দূবে বাস্তাব ওপবে, একটু আগে এসে হাজির হয়েছে। আশেপাশের দোকানে বা বাজাবে কাজ কবে, এবকম তাবো কয়েকজন ওর সঙ্গে ছিল। যারা সকলেই ওব থেকে বয়সে কিছু বড়। তাবাও সবাই বোকাব মতোই হাত পা ছুঁড়ে নাচছে, আর উত্তেজিত উল্লাসে ধ্বনি প্রতিধ্বনি কবছে, 'পেলে লেগে যা'।

আজকেব দিনটা সকাল থেকেই অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। আজ দুর্গা পূজার দশমী। এখন পুরোপুরি বিজয়াদশমীব উৎসবেব আবহাওয়া। বাত্রি প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। কিন্তু এখনো বাস্তায় বেশ ভিড। কল-কাবখানা, বিশেষ কবে চটকলে আজ ছুটি। অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ, কেবল মিষ্টিব দোকান ছাডা। এখন এই ভিড উৎসবেব, কেনাবেচা নেই। কান্ত কুণ্ডু ওব মুদিখানা স্টেশনারি র‍্যাশনশপেব সামনে বাস্তাব ধারে বেঞ্চি পেতে বসে আছে। তাব দুই পাশে দুই শালা। প্রথম পক্ষের বউ মাবা গিযেছে, কোনো ছেলেপিলে হযনি। দ্বিতীয় পক্ষের বউটিব বযস অল্প, সুন্দবী। চাব বছবে কোনো ছেলেপিলে হযনি। আগেব পক্ষেব শালা, স্টেশনাবি বিভাগ দেখা শোনা কবে। দ্বিতীয় পক্ষেব শালা র‍্যাশনশপ চালায। কান্ত কুণ্ডু নিজে তার বাবাব আদি ব্যবসা মুদিখানায বসে। সকলেব মাথাব ওপবে সে। তাব কর্মচাবীদেব মধ্যে সব থেকে বযসে ছোট বেন্দা।

মিষ্টিব দোকান, আর মুসলমানদেব কযেকটা দোকান ছাডা সবই বন্ধ। কান্ত কুণ্ডুব পাশাপাশি দোকানগুলোও বন্ধ। মুদিখানা আব স্টেশনারি, একই লম্বা ঘবেব দুই প্রান্তে। র‍্যাশনশপটা আলাদা। বেন্দাব কাজ মুদিখানা আব স্টেশনাবিতে। স্টেশনাবি বিভাগেব টফি লজেন্স আব চানাচুর বোযেম থেকে বেব কবে ও বিক্রি কবতে পাবে। আব কিছু না। মুদিখানাব ওজনদারেব কাছে বিভিন্ন মালের বস্তা বা টিন এগিযে দেওযা একটি বড কাজ। অনেক দিনেব পুবনো আব ব্যস্ত দোকান।

বেন্দা সব থেকে খুশি হয, যখন ওব বযসী কোনো ছেলে টফি লজেন্স চানাচুব নিতে আসে। ও তাদেব কাছ থেকে জেনে নেয ইস্কুলেব বা শহবেব মাঠে কবে কোন্ দিন কী খেলা হয। স্পোর্টসেব প্রস্তুতি কেমন চলছে। ওব কাছে সেই সংবাদগুলো অনেকটা স্বপ্নেব মতো। অথচ মাঠে গিযে খেলা দূরেব কথা, খেলা দেখতে যাবাবও সময নেই। কেবল কল্পনাই কবতে পাবে, যার ফলে অন্যমনস্ক হযে পড়ে। কাজেব কথা ভুলে যায়। তখন কান্ত কুণ্ডু ওকে চিৎকাব কবে ডাকে, 'এই শুযোরেব বাচ্চা' কিংবা 'কুত্তাব বাচ্চা', আব তা শুনেই ও সচকিত হয়ে ওঠে। কারণ ও জানে, এই সব নামেই ওকে ডাকা হযে থাকে। স্টেশনাবি বিভাগে, কান্ত কুণ্ডুব আগেব পক্ষে শালা ওকে 'কাকেব বাচ্চা' বা 'ফডিং-এব বাচ্চা' ইত্যাদি বলে ডাকে। লোকটা প্রায সময়েই বসে বসে ঝিমোয আর পাখি পতঙ্গের বাচ্চা বলে ডাকে। কান্ত কুণ্ডুব বাড়িতে ও খেতে যায দু বেলা। সেখানে কান্ত কুণ্ডুর বউ তাকে 'ওল কচু' বলে ডাকে। ওব মুখটা নাকি সেইরকম। আব হেঁশেলে থাকে, খেতে দেয যে-মাসী, সে বলে 'বোঁটকা পাঁটা'। ওব গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ।

বেন্দাব বযসী কোনো খবিদ্দার বালক অবাক হযে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে এবা কেউ তোকে নাম ধরে ডাকে না কেন?' বেন্দা হেসে জবাব দেয, 'ওহ, ওরা তো সব ইঁদুরের বাচ্চা।'

তথাপি মানতেই হবে, বেন্দার তিন বছরের জীবনে, এরকম ঘটনা এই প্রথম, ও কান্ত কুণ্ডুর ডাক শুনতে পেল না। সকাল থেকেই আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। কাটছেও একেবারে অন্যভাবে। গত দু বছরে এই দিনটাতে, কাঁচরাপাড়ার কলোনিতে ওকে ওর মায়ের কাছে যেতে হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন বেস্পতিবার আর বছরে চৈত্রসংক্রান্তি আর বিজয়াদশমীর দিন কাঁচরাপাড়ার কলোনিতে মায়ের কাছে ওকে যেতেই হত। ওর মাসের মাইনেটা মা এসে নিয়ে যেত। তাতেও ওর কিছু আসত যেত না। কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়াটা, ওর কাছে নরকে যাবার থেকেও খারাপ ছিল। ওর বাবা অনেক দিন আগেই মরে গিয়েছে। এখন ওর মা অন্য একটি লোকের সঙ্গে থাকে। প্রত্যেক বছরই মায়ের একটা করে ছেলে মেয়ে হয়। ওর মা আর লোকটা ওকে খুব খাটিয়ে মারে। ওর মা ওকে, 'খ্যাংরামুখো, বৈঁড়ো, মড়া ভাতারের ছাঁ' ইত্যাদি বলে ডাকে।

কিন্তু তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম, আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। বেন্দা এই ব্যতিক্রমে খুশিই হয়েছিল। কান্ত কুণ্ডুর আগের পক্ষের শালা গোপাল, দোকানের তালা খুলে বেন্দাকে বের করেছিল। মুদিখানা আর স্টেশনারি দোকানের পেছনে, দেওয়াল দিয়ে আড়াল করা, তিন ফুট চওড়া, লম্বা ফালি একটা গুদামঘর আছে। দোকান থেকে গুদামঘরে যাবার একটি মাত্র দরজায় তালা মারা থাকে। গুদামের পিছনে একফালি লম্বা জায়গা, তার পশ্চিম প্রান্তে একটা খাটা পায়খানা। পায়খানায় যাবার জন্য গুদামঘরে একটি দরজা আছে। বেন্দা রাত্রে কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে খেয়ে এসে, সেই গুদামঘরে শোয়।

আজ সকালে গোপাল দোকানের সামনের দরজাগুলোর তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গুদামঘরের দরজার তালা খুলেছিল। বেন্দা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ও জানত, ওকে যেতে হবে কাঁচরাপাড়া কলোনিতে মায়ের কাছে। কান্ত কুণ্ডুর দেওয়া নতুন হাফপ্যান্ট আর ছিটের শার্ট গায়ে দিয়ে ও তৈরি ছিল। গতকাল রাত্রে খেয়ে ফেরার পথে, প্রতিমা দেখবার জন্য ওর আধ ঘণ্টা ছুটি ছিল। ফিরে এসে, গুদামঘরের অন্ধকারে ও মাত্র দুটো নেংটি ইঁদুর মারতে পেরেছিল। একটা নেংটি ইঁদুরের রেট পাঁচ পয়সা, একটা ধাড়ি ইঁদুর দশ পয়সা। কান্ত কুণ্ডু ওকে দেয়।

বেন্দা মাঠে ঘাটে খেলতে যেতে পারে না। এই একটি মাত্র খেলাই ওর জীবনে ছিল। সারা দিন পরে, গুদামঘরের অন্ধকারে জোড়া জোড়া লাল বিন্দু জ্বলে ওঠে। একটা বিড়ি খাবার পরেও লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। ওর শরীরে জেগে ওঠে একটা আশ্চর্য শক্তি। যেন মন্ত্রের সাধনে শক্ত-হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। আর জোড়া জোড়া অঙ্গারের বিন্দুগুলো, কাছে দূরে উঁচুতে নিচুতে ছোটাছুটি করতে করতে, যেন সম্মোহিতের মতো ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। সাপের ফণার থেকেও ভয়ংকর উদ্যত হয়ে ওঠে ওর লাঠি। বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে জোড়া জোড়া লাল অঙ্গার বিন্দুগুলোর ওপর। কয়েক বার এই খেলার পরে, মোমবাতি জ্বালিয়ে ও খেলার ফলাফলগুলো লম্বা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নেয়। ক'টা নেংটি, ক'টা ধাড়ি। তারপরেই কয়েকটা বস্তার ওপরে ও শুয়ে পড়ে। নামহীন জীবনের সারাদিনের প্রচণ্ড খাটুনি আর পেটপুরে না খেতে পাওয়ার মধ্যে, এই একটি মাত্র খেলা, যেন গভীর সুখের আর একমাত্র জীবনধারণের জন্য।

আজ সকালবেলা গোপাল গুদামঘরের দরজা খুলে বেন্দার দিকে তাকিয়ে, বাঁকা ঠোঁট ছুঁচলো করে হেসেছিল। নিশ্চয় নতুন ঢলঢলে সস্তা জামা প্যান্ট দেখেই হেসেছিল। বেন্দার চাকরির এটাও একটা সর্ত, বছরে একটি জামা আর প্যান্ট। গোপাল বলেছিল, 'গুয়ো শালিকের বাচ্চা। সাজগোজ করে বসে আছিস?'

বেন্দার জবাব দেবাব কিছু ছিল না। ও দোকানের বাইবে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। আজ দোকান বন্ধ। গোপাল জিজ্ঞেস করেছিল, 'যাচ্ছিস কোথায় বে উচ্চিংড়ের বাচ্চা?'

'কাঁচরাপাড়া' বেন্দা জবাব দিয়েছিল।

গোপাল বলেছিল, 'উঁহু। আজ তোকে কর্তা তার বাড়িতে যেতে বলেছে। দশেরার দিন, মেলাই কাজ। কাজের লোকের অভাব।'

অথচ কান্ত কুণ্ডুরই কড়া হুকুম, ছুটিব দিনে বাড়িতে মায়ের কাছে যেতে হবে। বেন্দা যাতে কোনোরকমেই এদিকে-ওদিকে যেতে না পারে সেইবকম ব্যবস্থা ওব মা-ই কবে রেখেছিল মনিবের সঙ্গে। সকালে গোপালেব কথা শুনে ও খুশি হযে উঠেছিল। আজকের এই দিনটিতে মায়েব কাছে ছাড়া যে কোনো জাযগাতেই যেতে হোক, ও তাতেই খুশি। বলতে গেলে ও তিড়িং তিড়িং কবে লাফিযে ছুটেছিল।

কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে আজ অনেক কাজ। নারকেল দিযে নিরামিষ ঘুগনি, নাবকেলেব ছাঁচ তৈবি হযেছিল। বোজকাব বান্নাবান্না তো ছিলই। কলাপাতা কাটা, মাটির ভাঁড় ধোয়া ছিল। দুপুবের খাবার পেতে বেলা তিনটা বেজেছিল। কিন্তু তাবপব থেকে বলতে গেলে কোনো কাজই করতে হযনি। একটানা সন্ধে পর্যন্ত ছুটি পাওযা গিয়েছিল। কাঁচবাপাড়ায গেলে এ ছুটি কখনোই পাওযা যেত না। মাযেব আব তাব লোকটার ফাইফবমাস খাটতে হত। মাযেব ছেলেমেযেগুলোকে কোলে কাঁধে কবে রাখতে হত। তাব বদলে পূজামণ্ডপে যেতে পেবেছিল। ঢাকের বাদ্যির তালে তালে নাচতে পেবেছিল, আব সকলের সঙ্গে গলা মিলিযে বলতে পেরেছিল, 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন।' ..তারপর ভাসানেব সময সেই ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, 'পেলে লেগে যা।'

কোনো সন্দেহ নেই আজকেব দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। বেন্দা ওব জীবনে এই প্রথম একটা ভাসানেব দলের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে অনেক দূব গিযেছিল। অনেক ছেলেব সঙ্গে ওব বন্ধুত্ব হযেছিল। কিন্তু একটা সময ওকে কান্ত কুণ্ডুব বাড়ি ফিরে যেতেই হযেছিল। সেখানে ওব অনেক কাজ ছিল। যদিও সত্যি কাজ তেমন ছিল না। বাড়িতে তখন নমস্কাব আব কোলাকুলিব ব্যস্ততা। তাব মধ্যেই উটকো ফাইফরমাযেস। কাবোকে এক ভাঁড় জল দেওযা কাবোব জন্য কলাপাতা এনে দেওযা।

বেন্দার খুব ভালো লেগেছিল। হাসি খুশি উৎসবে মুখব ছিল মনিবেব বাড়ি। সবাই সিদ্ধি খেযেছিল। বেন্দাকে দেওযা হযেছিল। একবাব নয কযেকবাব। কান্ত কুণ্ডুব এই পক্ষেব ভাযরাভাই নিজে ভাঙ তৈবি করে সবাইকে খাইয়েছিল। বেন্দাকে খাওযাতেও সে কুণ্ঠিত হযনি। আর লোকটা তাকে নাম ধবেই ডেকেছিল। এ সবই অভাবিত আব বিস্ময়কব! মনিবেব ভায়বাভাই ওকে নাম ধবে ডেকেছিল। ওর খেয়ালই ছিল না, কখন থেকে ও মেতে উঠে বাবে বাবে চিৎকার করেছিল, 'পেলে লেগে যা।'

ওর কথা শুনে সবাই হেসেছিল। আর ও কান্ত কুণ্ডুব বউ থেকে শুরু কবে বড়দের সবাইকে বাবে বাবে পাযে হাত দিয়ে নমস্কাব কবেছিল। ওব নমস্কারেব ঘটা দেখে কেউ ওব চুল ধবে টেনে দিয়েছিল, ঘাড়ে মাথায় চাটি লাগিয়ে দিযেছিল। কিন্তু তা মাববার বা পীড়নের উদ্দেশে নয়। এবং সবাই খুব হেসেছিল। সবাই ওকে নিযে মজা পেয়ে গিযেছিল। এমনকি, যাকে বাণীর মতো সবাই খাতিব কবছিল, সেই কান্ত কুণ্ডুব বউ পর্যন্ত ওব মুখে মিষ্টি আব ঘুগনি গুঁজে দিয়েছিল। এরকম ঘটনার কথাও কল্পনাও করতে পারে না। আজকেব দিনটাই অন্যভাবে শুরু হয়েছিল।

আজ কান্ত কুণ্ডুব হেঁশেলেব মাসীও বেন্দাকে নিয়ে মজা কবেছিল। ও গাঁজেব নেশার ঝোঁকেই ও বারে বাবে ভাত চেয়েছিল। মাসীও দিয়েছিল। আব ও মাসীব পা জড়িয়ে ধবে চিৎকাব কবে উঠেছিল, 'পেলে লেগে যা'। সাবা গায়ে খাবাব মাখিয়ে ও যত হাত পা ছুঁড়ে নাচছিল, সবাই ওকে তত ক্ষেপিয়ে তুলে ছিল। বলিব মহিষ বৎসকে মদ খাইয়ে, অণ্ডকোষে খোঁচা দিয়ে যেমন ক্ষেপিযে তোলা হয ওকেও সেইবকমই নাচিয়ে কুঁদিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। আব সবাই হাততালি দিযে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল।

বেন্দা নিজেকেই ভুলে গিয়েছিল। এখনো ভুলে আছে। ওব পক্ষে এখন কান্ত কুণ্ডুব চিৎকাবেব হাঁক শোনা সম্ভব নয। আজকের দিনটাই শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। ওব জীবনে আজকেব দিনটা একটা ব্যতিক্রম এ কথা ওব এখন মনে নেই। ভাঙেব প্রকোপে ও এমন মত্ত, কাদেব সঙ্গে নাচতে নাচতে দোকানেব কাছে চলে এসেছে বুঝতে পাবছে না। এখন ওব খালি গা, জামাটা গলায জড়ানো। সাবা গায়ে মাথায মুখে খাবাবেব দাগ আব মিষ্টিব বস লাগানো। কিন্তু ওব নাচন-কোঁদনে এখন আব তেমন জোব নেই। চোখেব পাতা সীসাব মতো ভাবি হয়ে এসেছে। কী ভাবে কোমবেব প্যান্টটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল, ও জানে না। সেটা এক হাতে চেপে ধবে আছে। এখন ওব জিভটাও সীসাব মতোই ভাব। তবু থেকে থেকে উঠে হাঁকল 'পেলে লেগে যা।'

দোকানেব সামনে কান্ত কুণ্ডু মদেব গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'গোপাল, এবাব বাড়ি যেতে হয়। ঘাউবাব বাচ্চাটাকে গুদামেব মধ্যে ঢুকিয়ে দোকান বন্ধ কব। ওকে বোধ হয় বাড়ি থেকে গুচ্ছেব ভাঙ গিলিযে দিয়েছে।' বলে সে হাসল এবং আবাব বলল, 'বা! যেন ছাগল বাচ্চাব মতন লাফাচ্ছে।'

গোপাল উঠে গেল বেন্দাব কাছে। ওব গলায় জড়ানো শার্টটা চেপে ধবে বলল, 'এই গোদো পিঁপড়েব বাচ্চা, এবাব শুয়ে পড়বি চল।' বলে টেনে নিয়ে চলল।

বেন্দা কোনো আপত্তিই কবল না। এক হাতে খসে পড়া প্যান্টটা ধবে টানতে টানতে এগিয়ে এল। দোকানের দবজা খুলে, ওকে ভেতবে ঢোকানো হল। তাবপবে গুদামেব অন্ধকাবে ঠেলে দিয়ে, গোপাল দরজায তালা লাগিযে দিল।

বেন্দা অন্ধকাবে কিছুই দেখতে পেল না। কোনো শব্দও ওব কানে আসছে না। কোমবেব প্যান্ট ধরা হাতেব মুঠি আলগা হতেই সেটা খুলে গেল। ও টানতে লাগল। আব জিভ তো ভেতবে জড়িয়ে জড়িযে বলল, 'পেলে লেগে যা।'

লাফাতে গিয়ে কযেকটা বস্তাব ওপব গড়িয়ে পড়ল। এখনো ও হাসছে আব সবাব মতো কথাটাই মনে মনে বলছে, 'পেলে লেগে যা।'

অন্যান্য দিন গুদামঘবেব অন্ধকাবে ও যে খেলা কবে আজ আব ওব সে উপায নেই। জীবনেব একটি মাত্র খেলাব কথা আজ ওব মনে নেই। কিন্তু সেই লাল অঙ্গাব বিন্দুগুলো কাছে দূবে উঁচুতে নিচুতে জ্বলে উঠতে লাগল। তাবপবে এক সময়ে অনেকগুলো, প্রায অগুণিত লাল অঙ্গার বিন্দুগুলো, সম্মোহিতেব মতো ওব সামনে এগিয়ে এল। সম্ভবত ওব আঘাতেব জন্যই তাবা অপেক্ষা কবল। কিন্তু ওকে একেবাবে স্থিব নিশ্চল দেখে ওবা ওব গাযেব ওপব উঠল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আব ওব গায়ে ঠোঁটে কানে চুলে, গলায বুকে পেটে বস্তিদেশে, যত জায়গায় যত খাবার লেগেছিল সেগুলো খেতে আবম্ভ কবল।

পবেব দিন সকালবেলা গোপালই গুদামঘবেব দবজা খুলল। বেন্দাব কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকাবের দৃষ্টিটা সবে আসতে বেন্দাব নগ্ন শবীবটা চোখে পড়ল।

গোপাল ডাকল, 'এই টিকিটিকিব বাচ্চা।'

বেন্দা নড়ল না, কোনো জবাব দিল না। কেবল ওব গাযেব কাছ থেকে কয়েকটা ইঁদুব ছুটে পালাল। গোপাল ঝুঁকে মাথা নিচু কবে দেখল। দেখা গেল বেন্দার সারা গায়ে মুখে লাল ঘাযেব মতো দাগ। কোথাও কোথাও ঘাযের থেকে যেন টাটকা রক্ত চুইযে পডছে। গোপালের গা-টা কেমন শিবশিব করে উঠল। সে ডাকল, 'বনুই একবার এদিকে এসো।'

কান্ত কুণ্ডু এগিযে এল। দোকানঘব থেকে আগেই গুদামেব আলোব সুইচটা টিপে দিল। গুদামেব ভিতরে এসে সে বেন্দাকে দেখল। খানিকক্ষণ দেখে অবাক হযে বলল, 'এই শুয়োবেব বাচ্চাটার চোখের মণি, নাকেব ডগা শুদ্ধ খেযে ফেলেছে। বানচোৎ কি বেঁচে আছে এখনো?'

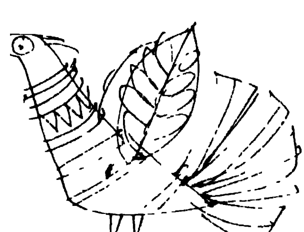
গোপাল, আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিসে খেয়েছে?'

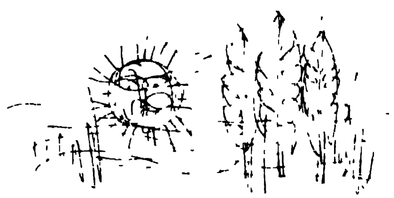
'ওরই পাঁচ দশ পয়সাব রেটের মালেবা।' কান্ত কুণ্ডু বলল, 'নেংটি আব ধেড়েগুলো।' বলে সে দোকানেব অন্যান্য কর্মচারীদেব চিৎকাব কবে ডাক দিল। বলল, 'এই ইঁদুবেব বাচ্চাটাকে বেব করে বাস্তায় নিযে যাও। গোপাল,তুমি তারাপদ ডাক্তাবকে ডেকে নিযে এসো।'

কযেকজন নগ্ন বেন্দাকে ধরাধবি কবে রাস্তায় এনে শুইযে দিল। দেখলেই বোঝা যায়, ওব সাবা শবীবটা একটা কাপড়ের মতোই কুটিকুটি কবে খাওযাব চেষ্টা হযেছে। শবীবেব অস্থিহীন সব অংশই খেয়ে নিযেছে। ও নিশ্চযই অচেতন অবস্থায হাঁ কবে ছিল। জিভটা পর্যন্ত কিছুটা কুরে খাওয়া হযেছে।

ভিড বাডতে আবম্ভ কবেছিল। তাবপব ডাক্তাব এলেন। দেখে বললেন, 'বেশিক্ষণ মবেনি। যে ভাবে খেযেছে, বাঁচানো যেতো না। গোটা শবীব বিষিযে গেছে। ওকে একটা ঢাকা দিযে দাও।'

সকালেব বোদ পডেছে বেন্দাব গাযে। চোখের বক্তাক্ত কোটব দুটোতে বোদ চিকচিক করছে। একটা খুশিব দিনেব ব্যতিক্রম কতখানি সুদূবপ্রসাবী হতে পারে, ও কি তা জানত? বোধহয় না।





বিহিত

নিঝুম-দুপুবেব স্তব্ধতাকে আচমকা ছিন্নভিন্ন কবে দিয়ে, সেই ভয়ংকব জান্তব শব্দটা পাড়াব ভিতব দিয়ে নিমেষে বেবিয়ে গেল। পাড়াব দু'পাশেরবাড়িগুলোব দেওয়াল কেঁপে উঠলো। ঠকঠকিয়ে ঝনঝনিয়ে উঠলো দবজা জানালা। কোথা থেকে ভেসে এলো একটি শিশুব আর্ত চিৎকাব। কোনো বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাব হঠাৎ ঘুম ভাঙা চাপা গোঙানি শব্দও কি শোনা গেল? শান্ত পাড়াটা মুহূর্তেই যেন অশান্ত হযে উঠলো, দবজা জানালা খোলাব শব্দ। একটা কুকুব হঠাৎ ভয পেযে ডেকে উঠেই চুপ কবে গেল।

চৈত্রেব দুপুব। আমি লিখছিলুম। এখন আমি দু কামবাব এই ফ্ল্যাটটিতে একা আছি। এ সময়ে দবজা বন্ধ বাখি। পাখা খুলে দিয়ে, কাজে ডুবে থাকি। আমাব কাজেব ছেলে, অনন্ত এ সময়ে আমার আবাসগৃহে খেতে যায। এখন বেলা আড়াইটে। অনন্ত আসবে ঘড়িব কাঁটা মিলিযে বিকেল তিনটেয। এসে আমাকে চা দেবে।

আজ নিয়ে তিন চাব দিন ধবে ঠিক এ সময়ে, এ ঘটনা ঘটছে। আমাব এই ফ্ল্যাট তিন তলায়। পুব-দক্ষিণে দুটি ব্যালকনি আছে। আমাব উল্টো দিকেব চাবতলা বাড়িটিব, চাবতলায থাকেন সীতেশ সেন, বিশিষ্ট আইনজীবী। দোতলায় থাকেন তাঁব ছোট ভাই ডাক্তাব বীবেশ সেন। একজন চিকিৎসক এবং সমাজসেবী। পাড়ায এঁবা ছাড়াও দু-একটি পবিবাবেব সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎ পবিচয আছে।.সকলেই সজ্জন প্রতিবেশী। পাড়াটি যাকে বলা যায কসমোপলিটান, সেইরকম। খ্রীষ্টান, পাবসী, মুসলমান, হিন্দু, সববকমেব অধিবাসীই আছেন। অবিশ্যি হিন্দুই বেশি। বাঙালী অবাঙালী মিলিযে।

গতকাল সকালে ডাক্তার বীবেশ সেন আমাকে চেক আপ কবতে এসেছিলেন। আমাব হৃদযন্ত্রটি কিছু বিকল হওয়ায, ডাঃ সেন অনুগ্রহ কবে আমাকে মাঝে মাঝে চেক আপ কবেন। গতকাল তিনি যখন এসেছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস কবেছিলুম, "কী ব্যাপাব বলুন তো? কে এই মোটববাইক আরোহী-চালক, যে সাইলেনসিযাব পাইপেব পুবোটাই খুলে দেয। বোজ দুপুবে ওবকম বীভৎস শব্দ করে এ পাড়া দিয়েই বিশেষ কবে কযেকবাব চক্কব দেয?"

"আর বলবেন না।" ডাঃ সেন গম্ভীব বিষণ্ণ স্ববে বলেছিলেন, "শব্দটা বীভৎসেব চেয়েও আরো ভয়ংকর কিছু। আমার শবীবও তো তেমন ভালো নয। বোজ দুপুরে এই সময আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কবি। আব এই ক'দিন ধবে ওই শব্দে হঠাৎ যে কেবল ঘুমেব চটকা ভেঙে যায়, তা নয়। ওই শব্দে মনে হয, হার্টবিট্‌স বন্ধ হয়ে যাবে। আমাব শিশু নাতিটি যে-ঘবে থাকে,

সে-ঘরের দরজা জানালা খুব ভালো করে বন্ধ করা সত্ত্বেও, শব্দটা যেন দেয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢোকে, আর নাতিটি ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। আমি বুঝি, পাড়ার শিশু, বৃদ্ধ আর অসুস্থদের এই শব্দের ধাক্কা সামলাতে কী অসহ্য কষ্ট হয়। কিন্তু কি করবেন বলুন। এই সব জীবদের আপনি কী করে দমাবেন?"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "কেন, জীবটি কি এতোই ক্ষমতাশালী, তাকে দমানো যাবে না? অন্তত তাকে অনুরোধ করা যেতে পারে, সে যেন তার মোটরবাইকের সাইলেনসিয়ার পাইপটি পুরোটা জুড়ে দেয়।"

"তাই যদি দেবে তা হলে ওর মজাটাই মাঠে মারা যাবে।" ডাঃ সেন হতাশ হেসে মাথা নেড়েছিলেন।

আমি ব্যাপারটা কিছু না বুঝে, ডাঃ সেনের মুখের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলুম। তিনি খোলা দরজা দিয়ে একবার বাইরের দিকে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, "এ পাড়ার চৌত্রিশ নম্বর বাড়ির-মানে, আমি সরখেলদের বাড়ির কথা বলছি। সরখেলদের বাড়ির এক মেয়েকে নাকি ও প্রেম নিবেদন করেছিল। কিন্তু মেয়েটি একটু ভিন্ন ধাতুর। কোনোরকম সাড়া তো দেয়নি মোটেই বরং সরাসরি নাকচ করে দিয়ে নাকি ওকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রেম ব্যাপারটা কিছু বাজারের বেচা-কেনার জিনিস নয়। ইচ্ছে করলেই দর দেওয়ার মতো, প্রেম নিবেদন করা যায় না। হঠাৎ কী হল? কিসের প্রেম নিবেদন? কথাবার্তা, পরিচয় থাক বা না থাক, প্রেম নিবেদন করলেই হলো? মেয়েটির কাছ থেকে ওরকম জবাব পাবার পরেও নাকি বারকয়েক চেষ্টা করেছিল। কিছুতেই যখন ওর আশা ফললো না, তখন থেকেই এই ভর দুপুরের ওই শুয়োর ডাকা চিৎকারের অভিযান শুরু হয়েছে। এটা হলো প্রতিশোধ নেবার শুরু। তারপরে কোন দিকে ব্যাপারটা মোড় নেবে, কেউ বলতে পারে না।"

"ও বা ওর বলতে আপনি কাকে বোঝাতে চাইছেন? এই মোটরবাইকের চালককে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু ওর কী অধিকার আছে, একটি অপরিচিত মেয়েকে প্রেম নিবেদন করবে?"

"অপরিচিত নয়। মেয়েটিকে ও চেনে। কিন্তু পরিচয় বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না।"

"ওটাকে তাহলে অপরিচিতই বলে।"

"তা বলে। কিন্তু ও যে জানে, ও যখন মেয়েটিকে চেয়েছে, তখন ওকে পেতেই হবে।" ডাঃ সেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ হেসেছিলেন।

আমি ডাঃ সেনের চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম। তাঁর কথার অন্তর্নিহিত অর্থটি যে ধরতে পারিনি, তা না। তবু আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, "একটা প্রবাদ আছে, খুঁটির জোরে ম্যাড়া নড়ে। ওর খুঁটিটা কী? কোথায়?"

"ওর খুঁটি দু জায়গায়।" ডাঃ সেনের মুখ ও চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠেছিল। এবং কণ্ঠস্বরও, "লোকাল থানা আর রাজনৈতিক দল।"

ওইরকম কিছু শোনবার আশঙ্কা আমার ছিল।

"ও কে? কোথায় থাকে?" আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলুম ডাঃ সেন বলেছিলেন, "এ পাড়ারই কাছে-পিঠের ভট্টাচার্য বাড়ির ছেলে। মোটামুটি লেখাপড়াও এক সময়ে শিখেছে। দেখছিলুম, কিছুদিন এক রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছে। তারপর তো দেখছি, ওর হাত রক্তে মাখামাখি। ও এ এলাকার মুকুটহীন রাজা এখন।"

মনে মনে বলেছিলুম, সত্যি, কঠিন সমস্যা। কী এর সমাধান? ওই জাতীয় জীব বর্তমানে

সারাদেশেই ছড়িয়ে আছে। আর ওরা জানে, ওদের সবরকমের অধিকার আছে। ওরা যা চাইবে, তা ওদের পেতেই হবে। অতএব, মধ্য কলকাতার, শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের একটি পাড়ার সমস্ত লোককে কষ্ট দেবার অধিকার ওর আছে। এটা হচ্ছে ওদের এক ধরনের নিজের শক্তি পরীক্ষা। শুধু সরখেলদের নয়, গোটা পাড়ার বাসিন্দাদের ও জানিয়ে দিতে চায়, ওর শিকারের দিকে ও হাত বাড়াচ্ছে। কারোর যদি বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে, থানায় গিয়ে পাড়ার শান্তি রক্ষা করতে চায়, তারা সেই চেষ্টা করতে পারে। ডাঃ সেন ঠিকই বলেছেন, প্রতিশোধ নেবার এটা হলো শুরু। যখন দেখবে, পাড়াটাকে ও ওর বিভীষিকার দ্বারা কবজা করতে পেরেছে তখন সকলের চোখের ওপর দিয়েই ও শিকার মুখে করে নিয়ে যাবে।

ডাঃ সেন বিদায় নেবার আগে আমাকে ধরে বলেছিলেন "জানিনে এর কী বিহিত হতে পারে।"

দরজা জানালা বন্ধ করে টেবিলে, লেখা থামিয়ে বসে এই সব ভাবছি এখন মোটরবাইকের সেই দেওয়াল কাঁপানো, কানের পর্দা ফাটানো, জান্তব শব্দটা দ্বিতীয় বারের পরিক্রমায় এগিয়ে আসছে। আমি কলমটা রেখে পুবের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। ও দক্ষিণ থেকে ঝড়ের বেগে মোটরবাইক চালিয়ে এগিয়ে আসছে। ওর দৃষ্টি সামনে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, 'বুলেট' নামে সাড়ে তিন অশ্বশক্তির দ্বিচক্রযানটির আরোহীর পরনে জিনস্। গায়ে বোতাম খোলা একটা পাঞ্জাবি। গলায় চিকচিক করছে সোনার চেন। বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি। ডান হাতে একটা স্টেনলেস স্টিলের বা রুপোর মোটা চেন। চুল উড়ছে। দেখলেই বোঝা যায়, দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান। মুখ-চোখও খারাপ না। মাথায় হেলমেট না থাকার আইনভঙ্গটার কোনো মূল্যই নেই ওর কাছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ও আমার কাছাকাছি হতেই, গলার স্বর যতোটা সম্ভব চড়িয়ে ডাকলুম, "এই যে, শুনছেন?"

ও আমার কথার মধ্যেই বেশ খানিকটা এগিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু দশ মোটরেও পেছন ফিরে একবার আমাকে তাকিয়ে দেখলো। দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। আদৌ কোনো পাত্তাই দিল না। সেই জান্তব শব্দ তুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। আমি ধোঁয়া ওপরের দিকে না গিয়ে রাস্তাটার দিকে দেখলাম। আশেপাশের কয়েকটি বাড়ির খোলা জানালায় দু চারটি মহিলা পুরুষের মুখ। দোতলায়, পাশের খোলা জানালায় ডাঃ সেনও দাঁড়িয়ে আছেন। অবাক বিস্ময় চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্যান্যদের চোখও আমার দিকেই ছিল।

ও সাধারণত তিন থেকে চারবার এই রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। গত তিন চার দিনের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই বোঝা গিয়েছে। আমি মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হতেই, দক্ষিণ থেকে বীভৎস জান্তব শব্দটা আবার এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি পেছন ফিরালুম। দেখলুম ও দ্রুত, ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। আমি টেবিল থেকে জল ভরা গেলাসটা তুলে নিলুম। ব্যালকনিতে গেলুম। ও আমাকে পেরিয়ে যাবার আগেই, আমি গেলাসের জল ছুঁড়ে দিলুম। অব্যর্থভাবেই জলটাও ওর গায়ে মাথায় পড়লো। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই, বেশ খানিকটা এগিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু ও দাঁড়ালো। পিছন ফিরে দেখলো না। আগে গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে নিল। তারপর মোটরবাইক ঘুরিয়ে, আমার ব্যালকনির নিচে এসে দাঁড়ালো। মোটরবাইকের এঞ্জিন বন্ধ করলো। চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। দুটি জ্বলন্ত বাঘের চোখ। আর বাঘের চাপা গর্জনের মতোই শোনালো, "আপনি আমার গায়ে জল দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ," আমি ঘাড় ঝাঁকালুম।

"কেন?"

"নইলে যে আপনি শুনতে পেতেন না।"

"তাই জল ছুঁড়লেন গায়ে?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলতে চান আপনি?"

"আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। আপনি দয়া করে আপনার মোটরবাইকের সাইলেনসিয়ার পাইপটা ঠিক করে নিন। শব্দটা বড় যন্ত্রণাদায়ক।"

"সেইজন্য জল ছুঁড়লেন?"

"হ্যাঁ।"

তিনতলা থেকে স্পষ্ট দেখলুম, ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠলো। মোটরবাইকের হ্যান্ডেলে রাখা হাতের মুঠো দুটো মুঠি পাকিয়ে উঠছে। দু চোখ হিংস্র জ্বলন্ত দেখাচ্ছে। গলার স্বরের চাপা গর্জন শোনা গেল, "একবার নিচে নেমে আসবেন?"

"আপনি বরং আমার ঘরে আসুন।" আমি ডাকলুম।

ও কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে অপলক জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলো। বললো, 'আসছি।' বলে, মোটরবাইকের এঞ্জিন চালু করে, সেই জান্তব শব্দে গোটা পাড়া কাঁপিয়ে, দক্ষিণে চলে গেল।

আমি দেখলুম অনন্ত আসছে। তার মানে তিনটে বাজলো। ঘরে ঢোকার আগে দেখি, ডাঃ সেন ছাড়াও আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ির দরজা জানালায় কিছু মুখ উঁকি দিচ্ছে। তাঁদের সকলের চোখই আমার ওপর। কারোর মুখে বিস্ময়। কারোর মুখে উদ্বেগের ছায়া। আমি ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।

আমার মধ্যেও কি অস্বস্তি বা উদ্বেগ একটুও ছিল না? ছিল বই কি। কিন্তু কোনো কোনো সময় আমি যে নিরুপায় বোধ করি। এটা যেন একটা অনিবার্য দায়বদ্ধতার মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। অনন্ত কলিং বেল টেপার আগেই আমি ভিতরের বারান্দায় গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিলুম। অনন্ত কলিং বেল-এ হাত দিতে যাচ্ছিল। আমি ডাকলাম, "আয়।"

অনন্ত ভিতরে ঢুকলো। আমি পাশের ঘরে ঢুকলুম। অনন্ত দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরে এলো। দেখছি ওর চোখে-মুখে উদ্বেগ ও উত্তেজনা, "আপনি কি ওই লোকটাকে কিছু বলেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। আমি ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছিলুম।" বলে আমি কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে, একটা চাবির গোছা বের করলুম।

অনন্ত উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠলো, "সর্বনাশ! ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছেন? ও আপনাকে কী বলে গেল?"

"ও আমাকে নিচে ডাকছিল।" আমি আলমারির ভিতরের একটা চোরা খোপের চাবির মুখে চাবি গলিয়ে, খোপের ঢাকনা খুললাম। "আমি ওকে আমার ঘরে আসতে বললুম।"

অনন্তর গলার স্বর রুদ্ধ, উদ্বিগ্ন "ও কী বললে?"

"ও আসছে।" আমি খোপের মধ্যে হাত ঢোকালুম।

অনন্ত আমার দিকে দু পা এগিয়ে এলো। ওর গলার স্বর উদ্বেগ-ব্যাকুল, "বাবা, আপনি এখুনি ও বাড়ি ফিরে যান। একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে। ও আসবার আগেই আপনি বাড়ি চলে যান।"

"অনন্ত, আর তা হয় না।" আমি সিকস রাউণ্ডারটা খোপ থেকে বের করলুম। কেউটে

সাপেব মতোই আগ্নেযাস্ত্রটি চকচক কবছে। আনলক কবে খুলে দেখলুম। ছটি গুলি ভরা আছে। দু সপ্তাহ আগেও এটা পবিষ্কাব করেছি। অনন্তেব উদ্বিগ্ন মুখেব দিকে চোখ তুলে তাকালুম। "ও যখন আসছে বলে গেল, এখন আব আমি ঘব ছেড়ে যেতে পারিনে। কারণ আমি ওকে আসতে বলেছি।"

আমি আলমাবিব ভিতবেব চাবিব গোছা বেখে, পাল্লা বন্ধ কবলুম। অনন্ত ভাঙা স্বরে বললো, "বাবু আমার পা কাঁপছে। আমি এ দবজা খুলে দেবো না।"

"তুই না দিলে আমাকেই দবজা খুলে দিতে হবে।" আমি একটা চেযার তুলে, ঘবেব এক কোণে নিযে গেলুম, "তোকে আমি বলছি, ভয পাসনে। ভয জিনিসটা ময়ালেব মতো। কেবলই পাকে পাকে জড়ায। জ্যান্তকে মবা কবে দেয। তোকে ও কিছু বলবে না। তুই কেবল দবজা খুলে দিবি।"

আমি চেযাবে বসতে না বসতেই সেই বীভৎস শব্দ দক্ষিণ থেকে ভেসে এলো। অনন্ত ছুটে আমাব লেখাব ঘবে চলে গেল। পুব দিকেব ব্যালকনিব দবজা খোলাব শব্দ পেলুম। অনন্ত ব্যালকনিতে যাচ্ছে। মোটববাইকেব জান্তব শব্দটা আমাব তিনতলাব নিচে এসে দাড়ালো। জানি, সিঁড়ি ওঠাব নিচেব দবজা খোলা আছে। অনন্ত দৌড়ে এলো পাশেব ঘবে। ওব কালো মুখ ফ্যাকাশে। দু চোখে আতঙ্ক। প্রায ফিসফিস কবে বললো, "বাবা, ডাক্তাববাবু, আরো অনেক লোক দবজা জানালা খুলে দাঁড়িযে দেখছেন।"

"দেখতে দে ।" আমি ডান হাতে বিভলবাবটি নিযে, দবজাব দিকে মুখ কবে বসলুম।

অনন্ত আবাব বোধ হয লেখাব ঘবে চলে গেল। মোটববাইকেব শব্দ থেমেছে। ও বোধ হয এখন সিঁড়ি ভাঙছে। সমস্ত পাড়াটায এখন নিঝুম দুপুবেব সেই স্তব্ধতা নেমে এসেছে। কিন্তু সেই স্তব্ধতাও যেন গভীর উৎকণ্ঠায কান পেতে আছে। কলিং বেল বাজলো টিং টুং। শব্দটা শোনালো যেন দুটো গুলিব শব্দেব মতো।

বাইবে দবজা খোলাব শব্দ হলো। এক সেকেণ্ড । ও দবজাব ভিতবে পা দিতে গিযেই থমকে দাড়িযে পড়লো। জ্বলন্ত চোখে আমাব ডান হাতেব দিকে দেখলো। ওব মুখে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে গেল। বাজ ডাকাব মতো ওব গলাব স্বব শোনা গেল, "ও! তৈরি হযে বসে আছেন দেখছি!"

"হ্যাঁ, আপনাকে রিসিভ কবাব জন্য। আমি ওব চোখে স্থিব চোখ বেখে উঠে দাঁড়ালুম। ' কোমরেব কাছ থেকে হাত সবান। আব বলুন কেন আমাকে নিচে ডাকছিলেন?"

ও নিজেও আমাব চোখে চোখ বেখে কোমবেব কাছ থেকে হাত সবালো। একটু হাসলো, "এখন তো আব বলা যাবে না, কেন আপনাকে ডেকেছিলাম। পবে এক সমযে বলবো।" ও ওব তীক্ষ্ণ চোখ নামিয়ে আমাব সিক্স বাউণ্ডাবেব দিকে দেখলো। চোখে এক ঝলকেব জন্য সন্দেহ ফুটলো। কেটেও গেল মুহূর্তেই। ওব নিচেব ঠোঁট দাঁত দিযে কামড়ে ধবলো।

বোঝা যাচ্ছে, পাবলে ও আমাকে ছিঁড়ে খায। এবং সম্ভবত ওব জীবনে আমাদেব মতো শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদেব কাছে এবকম অভ্যর্থনা এই প্রথম কপালে জুটলো। ও সামান্য মাথা ঝাঁকালো। "আচ্ছা, আজ চলি। আবাব দেখা হবে।"

"আসবেন।" আমি ওব চোখে চোখ বেখে বললুম, "আব যদি আমাব অনুরোধটা বাখেন, খুশি হবো।"

ওর ভুরু কুঁচকে উঠলো, "কোন অনুবোধ?" "মোটববাইকেব সাইলেনসিযাব পাইপটা ঠিক করে লাগিযে নেবেন।"

ওর চোয়াল নড়া দেখে মনে হলো, দাঁতে দাঁত ঘষছে, "নইলে কি আবার জল ছুঁড়বেন ?"

"ছুঁড়তে পারি।"

"আমিও তৈরি থাকবো।" ও পিছন ফিরতে উদ্যত হলো, "তবে আমি নিজের মর্জিতে চলি, কারোর অনুরোধের ধার ধারি না।"

"পেছন ফেরার সময় হাত দুটো মাথার ওপরে তুলবেন।" আমি এগিয়ে গেলুম।

ও পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখলো। তারপর দু হাত মাথার ওপর তুলে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার পাশে অনন্ত দাঁড়িয়েছিল। ওর দু চোখে ঘৃণা আর ভয়। আমি অটোমেটিক লক দরজার পাল্লাটা ঠেলে দিলুম। লেখার ঘরে গিয়ে, অস্ত্রটি টেবিলের ওপর রেখে বাইরের ব্যালকনিতে গেলুম। ও ইতিমধ্যেই নিচে নেমে গিয়েছে। চেপে বসেছে মোটরবাইকের সিটে। আমি অবাক হয়ে দেখলুম, আশেপাশের অন্তত দশটা বাড়ির খোলা জানালায়, ব্যালকনিতে, গলিতে, দোতলা, তিনতলা, চারতলায়, মহিলা-পুরুষরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সকলের দৃষ্টি এখন আমার দিক থেকে সরে নিচের ওর দিকে পড়েছে। ও রাস্তার দু ধারের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপরে আর উত্তরে না গিয়ে দক্ষিণে ফিরে গেল। তখন আবার সবাই আমার দিকে তাকালেন। ডাঃ সেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধূ, সবাই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখাচোখি হতে হাসলেন।

আমি ফিরে গিয়ে লেখার টেবিলে বসলুম। অস্ত্রটা কী বিশ্রী বেমানান দেখাচ্ছে লেখার টেবিলে। ওটার সেফটি ক্যাচ লক করে টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলুম। কলম তুলে নিলেও, তখনই কাজে মনোনিবেশ করতে পারলুম না। ওর গায়ে জল দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত একবার ভেবে নিলুম। অস্বীকার করার উপায় নেই, বেশ খানিকক্ষণ সময় একটা টেনশনে কেটেছে। এখনো তার ভাইব্রেশন রয়েছে। ভেবেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো, আমার বাসগৃহে যাবার সময় অস্ত্রটি নিয়েই আমাকে নিচে নামতে হবে। অবিশ্যি গাড়িতে ওঠার সময় দূর থেকে বোমা ছোঁড়াটা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নাও হতে পারে। আমাকে সাবধানে থাকতেই হবে। আর আজ থেকে আমার স্ত্রীর উদ্বেগ শুরু হবে।

টেলিফোনটা বেজে উঠলো অনন্ত পাশের ঘর থেকে লাইন ধরলো। অবাক হবো না, যদি আমার স্ত্রী ও বাড়ি থেকে টেলিফোন করে থাকেন। কিন্তু অনন্ত এসে বললো, "ডাক্তারবাবু আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন।"

আমি টেবিলের বাঁ দিকে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলুম। "বলুন ডাঃ সেন, আমি বলছি।"

"আমি সমস্ত ঘটনাটা এখুনি থানার ও· সি· কে জানিয়ে দিলুম।" ডঃ সেনের স্বরে উদ্বেগ ও উত্তেজনা স্পষ্ট, 'আপনি ঠিক আছেন তো ?'

হেসে বললুম, "ঠিক আছি। আমি জানতুম, ও প্রস্তুত হয়ে আসবে। আমিও প্রস্তুত ছিলুম।"

"ও সি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রিভলভারটির লাইসেন্স আছে কি না।" ডাঃ সেনের স্বরে ঝাঁজ ফুটলো, "আমি বললুম, কার সম্পর্কে কী বলছেন ? উনি বেআইনী অস্ত্র রাখবেন, এরকম কথা আপনি ভাবলেন কী করে ? তারপরে অবিশ্যি ক্ষমা চাইলেন। বললেন, আমাদের পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসাবেন।"

আমি হেসে বললুম, "থানাও তো ওর একটা খুঁটি। পুলিশ পিকেটে কি ওর ঔদ্ধত্য, অসভ্যতা বন্ধ করা যাবে ? দেখুন কী হয় ?"

"ঘটনা যা ঘটলো আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।" ডাঃসেনের স্বরে অকৃত্রিম অনুরোধ।

আমি বললুম, "তা থাকবো।"

রিসিভাব নামিযে রাখলুম। অনন্ত ধুমায়িত চাযেব কাপ টেবিলে রাখলো। বললো "বাবা, আমার খুব ভয লাগছে।"

"ভয কবলে তো সব সময চলে না।" আমি কলম নামিযে রাখলুম, "তুই যেন বাড়ি গিয়ে, আবাব মা'কে এতো বড করে লাগাসনি। যা বলবাব তা আমিই বলবো।"

অনন্ত এতক্ষণে একটু হাসলো, "না, আমি আব মাকে কী বলবো। ওকে ভয পায না, এ এলাকায এমন লোক একজনও নেই। ওব দলেব কযেকজনকে আমি চিনি।"

আমি মাথা ঝাঁকালুম। কিছু না বলে, চাযেব কাপে চুমুক দিযে কাজে মন দেবাব চেষ্টা কবলুম। কতোক্ষণ কেটেছে খেযাল কবিনি। মোটববাইকেব সেই জান্তব শব্দটা দক্ষিণ দিক থেকে আবাব এগিযে আসতে লাগলো। আমি অন্যমনস্ক হযে পড়লুম। এখন পাডাব বাস্তায কিছু ছেলে খেলা কবছে। শব্দটা ঘববাড়ি বাস্তা কাঁপিযে ঝড়েব বেগে বেবিযে গেল। অনন্ত পুবো ব্যালকনিব খোলা দরজা দিযে ঢুকলো। ওব ফ্যাকাসে মুখে ও চোখে উদ্বেগ "বাবা, মোটরসাইকেলেব পেছনে ওব দলেব একজন বসেছিল। ও হাতে হাত দিযে আমাদেব তেতলাব দিকে দেখালো।"

"দেখাক" আমি বাঁ হাতেব কবজিব ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে চাবটে বাজে। আমাকে কযেকখানেক কাজ কবতেই হবে। নইলে সামলাতে পাববো না।

পবেব দিন।

আজ ববিবাব। চাকবিতে ছুটি মেলে। নিজেব পেশায ছুটি মেলে না। অতএব অন্যান্য দিনেব মতো, আজও আমি কাজে বসেছি। গতকাল সন্ধ্যায আমি নির্বিঘ্নেই বাড়ি ফিবে গিযেছিলুম। এবং যা, ভেবেছিলুম তাই হযেছে। আমাব স্ত্রী উদ্বেগে গত বাতে ঘুমোতে পাবেননি। আমার আশ্বস্ত কবাব চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি চেযেছেন, এখনকাব দুপুবে তিনি এ ফ্ল্যাটে চলে আসবেন। অনেক বলে কযে ওঁকে নিবৃত্ত করেছি। তবে দুপুব থেকেই টেলিফোন শুরু হবে, এটা বুঝেছি।

অনন্ত বেলা একটায আমাকে দুপুবেব খাবাব খাইযে চলে গিযেছে। আমি কাজ কবছিলুম। হঠাৎ এক সমযে ববিবাবেব ক্লান্ত ঘুমন্ত নিঝুম দুপুবকে কাঁপিযে দিযে মোটববাইকেব সেই জান্তব বীভৎস শব্দ দবজা জানালা খটখটিযে দিযে ঝড়েব বেগে বেবিযে গেল। আমাব কাজ থেমে গেল। প্রথম পবিক্রমা। ও তা হলে কথা বাখেনি। ওব সাইলেন্সিযাব পাইপেব যেটুকু অবশিষ্ট বেখেছিল, সেটুকুও খুলে দিযেছে। সেই শিশুব ভযে ডুকবে কেঁদে ওঠা কান্নাব শব্দ। ভয পাওযা কুকুবটাব ডেকে উঠেই চুপ কবে যাওযা।

কী কবা যায়? এ অন্যায ঔদ্ধত্যেব কী জবাব আছে? সকালে আসবাব সময দেখেছি, দক্ষিণেব মোডে, ফুটপাথে দু'জন সশস্ত্র সেপাই টুলে বসে আছে। পুলিশ পিকেট। কিন্তু ওকে কে থামাবে। আব আমি বোজ একটা লোকেব গাযে জল ছিটিযে দিতে পাবি? অসম্ভব। গতকাল ওর দৃষ্টি আকর্ষণেব জন্য জল ছুঁডেছিলুম। বোজ বোজ আমি তা পাবি না। মানাযও না।

আমাব চিন্তার মধ্যেই, আবাব শব্দটা ধেযে এলো। যেন একটা ক্ষ্যাপা জানোযাব প্রচণ্ড গর্জনে অন্ধ মত্ত হযে ছুটে চলেছে। ওব শিকাব চাই। আব নিশ্চযই ও ঠোঁট বাঁকিযে আমাব ব্যালকনিব দিকে তাকিযে দেখে যাচ্ছে। কিন্তু আমি ওব হাতেব ক্রীড়নক হতে পাবি না। ও আমাকে উস্‌কে দেবাব হাজাব চেষ্টা কবলেও না। অথচ এ ঔদ্ধত্য সহ্য কবাও কঠিন। পুলিশ

পিকেট কেন বসানো হয়েছে, কে জানে।

দ্বিতীয় পরিক্রমাব পব জন্তুব সেই বীভৎস জান্তব চিৎকার পাড়া কাঁপিয়ে তৃতীয় পবিক্রমায় ঝড়েব বেগে এগিয়ে এলো। আসতে আসতে, হঠাৎ আমাব ফ্ল্যাট ছাড়িয়েই যেন শব্দটা থেমে গেল। তাব মানে ও মোটববাইকেব এঞ্জিন বন্ধ করেছে? ও দাঁড়িয়ে পড়েছে? পুলিশ তা হলে ওকে বাধা দিয়েছে?

ব্যাপারটা কী দেখাব জন্য আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলুম। পুবেব ব্যালকনিব দবজা খুলে বাইবে গেলুম। আমাব চোখেব সামনে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আমাব সামনে এবং উত্তব-দক্ষিণে যতোগুলো বাড়ি আছে, সব বাড়িব সব তলায়, ব্যালকনিতে, জানালায় মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে ভিড় কবেছেন। তাঁদেব অধিকাংশেব হাতে জলেব গেলাস। চওড়া পিচেব বাস্তাটা দেখে মনে হচ্ছে, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আব ও মোটববাইক থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওব মাথার চুল থেকে টুপিয়ে জল পড়ছে। সিলকেব বোতাম খোলা পাঞ্জাবিটা জলে ভিজে গায়েব সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। আমাব প্রতিবেশী মহিলা পুরুষ সবাই হাসছেন। সবাই একবাব আমাব দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আব ও যেন চূড়ান্ত ভূতগ্রস্থ অসাব অবাক চোখে পাড়াব এই চেহারা দেখছে। ঠিক যেন বিশ্বাস কবে উঠতে পাবছে না।

ববিবাব ছুটিব দিনে আমাদেব পাড়ায়, দুপুবে এমন একটা ছবি অকল্পনীয়। ববিবাব বলেই আজ প্রত্যেক বাড়িতে ভিড়ও বেশি।

ও মোটববাইক থেকে নেমে, যান্ত্রিক [illegible] দাঁড় কবালো। দাঁড়িয়ে ডান দিকে বাঁ দিকে, উত্তব দক্ষিণে মুখ তুলে তাকালো [illegible] ডান হাত পাঞ্জাবিব নিচে, কোমবেব কাছে। ও কি রিভালভাব বেব করে হঠাৎ কোনো[illegible] গুলি চালাতে আবম্ভ কববে?

আব একটি নতুন ঘটনা ঘটলো। ও মোটববাইক থেকে নেমে দাঁড়াতেই, যে কুকুবটা ভয়ে একবার ডেকেই থেমে যায়, সে আজ ফুটপাথ থেকে ওব দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ঘেউ ঘেউ কবে উঠল। কেবল ঘেউ ঘেউ কবলো না, তাড়া কবাব ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে গেল। ও কুকুবটা দিকে দেখলো। কুকুবটাব আবো দু পা এগিয়ে এলো। ও কোমবেব কাছ থেকে, হাত বেব কবলো। হাতে একটা রিভলভার। হাত তুলে কুকুবটাব দিকে তাগ্ কবলো।

কুকুবটাব আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ও সমানে ঘেউ ঘেউ কবে চললো। আমি ঝটিতি একবাব দক্ষিণে মুখ ফিবিয়ে পুলিশ পিকেট দেখাব চেষ্টা কবলুম। কিন্তু কিছু চোখে পড়লো না। পাড়া কাঁপিয়ে একটা শব্দ হলো, গুড়ুম। কুকুরটা শেষ বাবেব মতো একবার কঁকিয়ে উঠেই খানিকটা ছিটকে গিয়ে ফুটপাথে লুটিয়ে পড়লো। এবং মুহূর্তেই চারদিকে থেকে যেন বৃষ্টিপাত শুরু হলো।

ও রিভালভাব তুলে ধবলো। তৎক্ষণাৎ একটি জলভবা কাঁচেব গেলাস ওর মাথাব পিছনে এসে পড়লো। গেলাসটা বাস্তায় পড়ে চৌচিব হলো। ওব মাথা কাটেনি, ফাটেওনি। এখন আব শুধু জল না। জলভবা কাঁচেব গেলাস বৃষ্টি শুরু হলো চাবদিক থেকে। ও নিজেকে বাঁচাবাব জন্য বিভলভাব সহ দু হাত দিয়ে মাথা ঢাকলো। আমি দেখছি, আমাব প্রতিবেশীবা ব্যালকনি ছেড়ে কেউ কেউ বাস্তায় নেমে আসতে শুরু কবেছেন। ও দেখলো, বেগতিক। জানি না, ওব বিভলভাবে কতকগুলো গুলি আছে। তবে ও বুঝতে পেবেছে, একটা বিভলভাব দিয়ে এই মারমুখো বাহিনীব সঙ্গে লড়তে পারবে না। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওর মানসিক শক্তিও নিঃশেষ। ও বিভলভাবটা পকেটে ঢুকিয়ে, দ্রুত মোটববাইকটা কেবিয়াব থেকে নামিয়ে, লাফ দিয়ে ঘোড়াচড়াব মতো সিটে বসলো। এঞ্জিন স্টার্ট কবতেই সেই জান্তব বীভৎস শব্দ। ও উত্তবে

না গিয়ে, চোখের পলকে মোড় ফিরে দক্ষিণে চলে গেল ঝড়ের বেগে।

জল ভরা কাঁচের গেলাস বৃষ্টি থেমে গেল। রাস্তার অনেকখানি জলে ধুয়ে গিয়েছে। কয়েকজন মহিলা পুরুষ নারকেল কাঠির ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কাঁচের টুকরো থেকে রাস্তাটাকে পরিষ্কার করতে হবে।

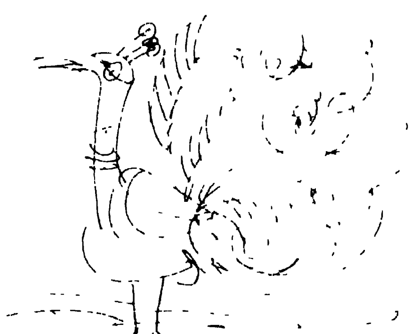
আমি আমার প্রতিবেশীদের দেখছি। চোখ ভরে দেখছি। জয় ও গৌরবের আনন্দে দেখছি।

লেখক মহাশয়,

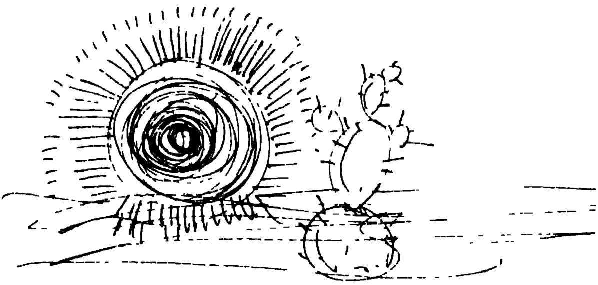
আপনার 'বিহিত' নামে কাল্পনিক গল্পটি পড়লুম। পড়ে ভাবলুম, বাস্তবে যদি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ঐ রকম ঐক্যবোধ থাকতো, যদি তাঁরা ঐরকম সাহসী হতেন, তা হলে অনেক সমস্যা, ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি হওয়া যেতো।

ইতি

সমরেশ বসু



বনমালী



বনমালীকে যে ঠিক কী ধবনেব চবিত্রেব সঙ্গে তুলনা কবা যায়, তেমন কোনো সিদ্ধান্তে আসা খুব কঠিন। বস্তুতপক্ষে সেবকম কোনো তুলনাই বোধহয কবা যায না। অথচ তা'ব চবিত্রেব মধ্যে যে একটা অসাধাবণ, অবিস্মবণীয ঘটনা ঘটাবাব মতো দুবন্ত ধাবালো, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বাইবে থেকে খুবই নিবীহ, কোনো ক্ষমতা আছে, তা বেশ কযেকবাব সে প্রমাণ কবেছে।

'কানভাঙানি দেওযা' বলে একটা কথা আমাদেব সমাজে খুবই প্রচলিত আছে। এই মুহূর্তে আমাদেব কোনো প্রাচীন কাব্য বা নাটকেব চবিত্রেব কথা মনে কবতে পাবছি না, কানভাঙানি দিযেই সে বিষম অঘটন ঘটিযেছে। কিন্তু 'কানভাঙানি দেওযা' সেই ভযংকব কুখ্যাত অবিস্মবণীয 'ইযাগো'-ব কথা মনে পড়ছে। যে ইযাগো খুব ঠাণ্ডা মাথায, ঈর্ষাব জ্বালায, ওথেলোকে কান ভাঙানি দিয়ে, প্রাণে সন্দেহেব বিষ ঢুকিয়ে, ডেসডেমোনিযাকে হত্যা কবিয়েছিল। কানভাঙানি দেওযা মানেই, তাব মূল বীজটি মিথ্যা দিযে তৈবি কবতে হয। আব তা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় কার্যকবীও কবতে হয। ইযাগো চবিত্র যেমন কুখ্যাত ও অবিস্মরণীয, তেমনি চিরকালীন' সেক্সপীযবেব নাটকে ইযাগোকে আমবা পুরুষ চবিত্র হিসাবে পেযেছি। কিন্তু অভিজ্ঞরা কে না জানে, ঐ ভয়ংকব প্রবৃত্তিটি নাবীদেব মধ্যেও আছে। এবং এ যুগেও, আমাদেব আশেপাশেই অনেক মেয়ে পুরুষ ইযাগো নানান ছদ্মবেশে ঘুবে বেড়াচ্ছে। সেক্সপীযবেব যুগেব তুলনায এ যুগে তাবা নিশ্চয অনেক বেশি সতর্ক, সাবধান আব চতুব। নিবীহ, অমাযিক, ভদ্র বা অতি সজ্জন বিদুষী মহিলা। এমন কি তাদের মধ্যে থাকতে পারেন সমাজেব নামী দামী পুরুষ মহিলা। কোনো প্রতিভাও যদি তাঁদের স্পর্শ করে থাকে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই।

এ প্রবৃত্তিটিব নাম যদি আপাতত ইযাগো বলে অভিহিত করা যায তা হলেও কেবল কি ঈর্ষাই এব মূল কাবণ? এক নিশ্বাসেই 'হ্যাঁ' বলা বোধহয ঠিক হবে না। কাম ক্রোধ ঈর্ষা ইত্যাদি রিপুগুলো সমস্ত জীবেই আশ্রয করে আছে। কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ যখন সেই সব রিপুগুলোব দ্বাবা তাড়িত হয, তখন প্রবৃত্তিব সঙ্গে হাত মেলায বুদ্ধি, চিন্তা, পবিকল্পনা, ষড়যন্ত্রের কূট কৌশল। বুকে হাঁটা বিষধর সাপেব মতোই তাব গতিপ্রকৃতি। আর তারপরেই ঘটে যায ভযংকব বীভৎস মর্মন্তুদ কোনো ঘটনা।

ইয়াগো'র নামোল্লেখ করলেও, বনমালী চরিত্রের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া যায় বলে মনে হয় না। অথচ এই দুই চরিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যটা যে যথার্থ কোথায়, সেই সূক্ষ্ম সূত্রটির সন্ধান মেলা কঠিন। তবে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, তাদের চরিত্রগত মিল কিন্তু কিঞ্চিৎ মেলে।

স্থান, উত্তর চব্বিশ পরগনা। কলকাতা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূর। সময়, গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যা সাতটা বাজতে বেশি দেরি নেই। রেলওয়ে জংশন স্টেশনে আলো জ্বলেছে অনেক আগেই। ট্রেনের যাতায়াত, যাত্রীর ভিড়, প্ল্যাটফরম থেকে ওভারব্রিজের ওপর, সবই উপচে পড়ছে, ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে, যাত্রীর ভিড় চলেছে পুবে ও পশ্চিমে। পুব দিকে রেল কলোনি ছাড়াও, দেশবিভাগের পর থেকেই গড়ে উঠেছে আরও অনেক বড় বিশাল জনপদ আর বাস্তুহারা কলোনি। বাজার অবিশ্যি পশ্চিম দিকে। বাজার আর আশেপাশে বড় বড় নানা দোকানপাট, যার মধ্যে স্টেশনারি আর শাড়িজামা কাপড়ই বেশি, এবং রাস্তার দুপাশে হকারদের স্টল, সব মিলিয়ে একটা জমজমাট ভিড়বহুল গঞ্জের রূপ নিয়েছে। স্টেশন থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটা আসলে একটা গঞ্জ বিশেষই। এই গঞ্জে কী যে নেই, তাও ভাববার বিষয়। মানুষের ভিড়ে একাধিক ধর্মের ষাঁড় মিলবেই। তা ছাড়া মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার আর খাদ্য, মদ্য গাঁজা অহিফেন, এবং বাজারে মাছ তরিতরকারি তো মেলেই। স্টেশন, ওভারব্রিজ থেকে বাজারের গোটা রাস্তার ভিড়ে, নারীর সংখ্যা বেশি, না পুরুষের তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। এই ভিড়ের চলাচলের ব্যস্ততা যেমন আছে, তেমনিই আছে মেয়ে পুরুষের মন্থর গতি, হাসি আড্ডা জটলা। এবং আর যা অনিবার্য, এ রাস্তা কখনোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না।

গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যাটি, দুটি কারণে রমণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভিড়ের জনতার সেদিকে লক্ষ করার সময় আছে বলে মনে হয় না। এক, দক্ষিণের বাতাস। দুই, আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ।

বনমালী ওভারব্রিজের পুব দিকের একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ঠিক বলা যায় না। তবে পশ্চিমের তুলনায়, পুব দিকে কিঞ্চিৎ ফাঁকা। আর বনমালী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে ওভারব্রিজের মাথায় শেড নেই। অতএব, সে রেল লাইনের উত্তর দক্ষিণে যেমন প্রায়ই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল, তেমনিই আকাশের চাঁদের দিকেও। এবং অবিশ্যিই তার পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী প্রায় প্রত্যেকটি স্ত্রী পুরুষের দিকেও তার চোখ পড়ছিল। কেউ কেউ তার চেনা। অচেনাই বেশি।

ছিপছিপে রোগা বনমালী-উচ্চতায় প্রায় ছ ফুট। গায়ের রঙ কালোই বলতে হয়। তার মাথার তেলতেলে ঘন চুলে বাঁ দিক ঘেঁষে সরু সিঁথি। কিন্তু অনেকটাই উল্টে, খুবই যত্নের সঙ্গে পাট করে আঁচড়ানো। লম্বাটে গড়নের মুখ। লম্বা নাক তেমন উঁচু বা চোখা নয়। বরং নাকের পাটা দুটো একটু মোটা হওয়ায়, কেউ কেউ যে তাকে ঠাট্টা করে ঘোড়ামুখো বলে সেটা নেহাতই ঠাট্টা বলা চলে না। তার এক জোড়া সরু লম্বা গোঁফ আছে। চোখ দুটো বাঁশিমতো বড়। বনমালীর নিরীহ মুখের সঙ্গে এ চোখ জোড়াই কেমন একটা খটোমটো বাধিয়েছে। কারণ তার বড় চোখ দুটোর তুলনায়, চোখের তারা দুটো ছোট দেখায়। ফলে, অনেক সময়েই মনে হয়, সে যেন অকারণেই, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। অন্যথায় তার মুখে আছে একটা নিরীহ ভাব, আর একটা নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি এঁটে বসে আছে। যা কিছুই সে দেখছে, কোনো কিছুতেই যেন তার তেমন কৌতূহল নেই। অথচ তার দৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই বাদ যায় না।

বনমালীর গায়ে বে-পাট, কিন্তু কাচা খাদির পাতলা কাপড়ের পাজামা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির

ভিতরে গেঞ্জি নেই। পাজামাটিও একটু খাটো। তার লম্বা পায়ে, শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া, অনেক দিনেব পুবনো, চামড়ার স্যাণ্ডেল। বাঁ হাতের কব্জির ঘড়িটা সাবেকি ছোট মাপের। ডান হাতে দেশলাই আর ভাজা তামাকের সস্তা একটি সিগারেট। সিগারেটটি ধবাবাব মতো উপযুক্ত সময় যেন এখনও হয নি। আসলে, এখন বনমালী ওভাবব্রিজের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে-স্থানটিই তাব একমাত্র পছন্দসই নয। কোন্ দিন কোন্ জাযগায দাঁড়ালে, ঠিক জুতসই হবে, ওভাবব্রিজেব এ মুড়ো থেকে ওমুড়ো হেঁটে সে ঠিক করে নেয। একমাত্র তখনই সে সিগারেটটা ধরায়।

বনমালী পনেরো বছব আগে পাশ কোর্সে বি এ পাশ করেছিল। চৌত্রিশ বছর বযসেব তুলনায় তাকে কম বয়েসী দেখায। দু বছর হলো সে চাকরি পেয়েছে। এখান থেকে মাইল খানেক দূবে, একটি চটকলেব লেবাব অফিসে সে কনিষ্ঠ কেবানী। অথচ তাব অবসবপ্রাপ্ত বাবা ছিলেন রেলেব কর্মচাবী। দুই দাদাও বেলেই চাকবি পেয়েছে অনেক আগে এবং দুজনেই বিবাহিত। তাদেব ছেলে মেয়ে আছে। দুজনেই আলাদা থাকে। বনমালীর পবেও আছে তিন বোন। বযসে তাবা বনমালীব থেকে বেশ ছোট। কাবোরই বিয়ে হয় নি। তাদেব প্রত্যেকেবই স্বাস্থ্য ভালো। দেখতেও কেউ খাবাপ না। তিনজনেই বেশ হাসি খুশি, যেন তিনটি সখী সাবাদিন বক বক কবে। খিল খিল হাসে। তিন জনেবই বযস তিবিশের নিচে, বিশেব ওপবে। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়েছে। তাবপব থেকে চলেছে অপেক্ষা, যাকে বলে প্রজাপতিব নির্বন্ধ। প্রজাপতিব নির্বন্ধ ব্যতিরেকে তো বিয়ে হতে পাবে না। তবে, বনমালীব মতে, তিন সখী বলাটা বোধহয ঠিক না। বলা উচিত চাব সখী। মাযেব বযস এখনও ষাটেব কম। চুল পেকেছে বলে ধবা যায না। স্বাস্থ্য এখনও আশ্চর্যবকম ভালো ও নিটুট। মা দেখতেও ভালো। বোনেবা সবাই মায়েব মতো দেখতে হযেছে। মাও তাঁব মেয়েদেব সঙ্গে বক বক কবেন, এবং গলা মিলিয়ে খিল খিল কবে হাসেন। বাবা বিবক্ত বোধ কবেন। কিন্তু কিছুই বলেন না। এখনও দোকানেব খাতা লিখে কিছু বোজগাব কবেন। দুই দাদাব কাছ থেকে মাসেব শেষে ববাদ্দেব টাকা চেয়ে আনেন।

বাবা কথা না বলে নির্বিকাবই থাকতে চান। কিন্তু মা তা থাকতে দেন না। বোনেদের বিয়েব জন্য বাবাকে প্রাযই নানাবকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কবেন। বাবাও তখন বেগে গিযে বলেন, "বিকেল হলেই তো পাড়াব যতো আইবুড়ো ছোঁড়াদেব ভিড় লেগে যায। তাদেব সঙ্গে এত হাসি মসকবা ভাব, তাদেব বলতে পাবো না? তাবা কি কেবল কাকিমাব হাতেব চা খেযে, ভগিনীদেব সঙ্গে বঙ্গ তামাশা কবেই চলে যাবে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সবই পুবনো কথা। মা-ও বাবাকে কম কিছু শোনাতে ছাড়েন না। বাবা সব থেকে বেগে ওঠেন যখন মা হাত-ঝাড়া দিযে বলেন, "তুমি একটা বদ্ধ পাগল। পাগলেব সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই নে।"

পাল্টা বাবা মাকে পাগলী বলেন না। বলেন, "বায়ুগ্রস্ত মেয়েমানুষ।"

একমাত্র বনমালীকেই কেউ কিছু বলেন না। আসলে বলবার দবকাব মনে করেন না। বোনেরাও কেউ তার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। রেযাতও কবে না। তাব অস্তিত্ব নিযে কাবোবই তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। পাড়াব যে-সব ছেলেরা বাড়িতে মা বোনদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসে, তাবা কেউ তাব বন্ধু নয়। তাকে পাত্তাও দেয না। বস্তুতপক্ষে, বনমালীব আজকাল কোনো বন্ধু নেই। এককালে ছিল, যখন সে স্কুল কলেজে পড়তো। তখন সে ছিল হাসি খুশি। আর নানান মজাব মজার কাণ্ড ঘটিয়ে সে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের হাসিয়ে মারতো। অবিশ্যি পরিণামে, দু একবাব মাবামাবি প্রলয কাণ্ডও ঘটে যেতো। এবং অতি নিরীহ বনমালী যে নিবীহ মুখেই হাসতে হাসতে প্রলয়ঙ্কব কাণ্ড ঘটিয়ে দিতো, তাতে সকলেই খুব অবাক হযে

যেতো। কারণ কেউ বিশ্বাস করতো না, বনমালী ইচ্ছা করে, ঐরকম অঘটন কিছু ঘটাতে পারে। বনমালী নিজেও কি অবাক হতো? যদি হবেই, তবে তারপরেও বেশ কয়েকটি অবিস্মরণীয় অঘটন সে ঘটিয়েছে কেমন করে?

বনমালীর ধারণা, সে নিজে কিছু বুঝতে পারে না। কোনো অঘটন ঘটবার আগে, তার মাথায় যেন কিছু ভর করে। আর সেটা যদি কোনো অশুভ আত্মা হয় সে তাকে চেনেও না।

সন্ধ্যার দিকে স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর এসে দাঁড়ানো বনমালীর একটা পুরনো অভ্যাস। বিশেষ করে তার বেকার জীবনের শুরু থেকে। বর্ষা বাদলা বা খুব শীতের উৎপাত না থাকলে, এখনও প্রায় দিনই ওভারব্রিজের ওপর এসে দাঁড়ায়। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে, তারপর নেমে যায় বাজারের রাস্তায়। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েদের দেখতে তার ভালো লাগে। ভালো লাগে তাদের খুশির হাসি আর চলার সুন্দর ভঙ্গি দেখতে। অবিশ্যি কষ্টও বোধ করে, তাদের পাশে স্বামী বা পুরুষ বন্ধুদের দেখলে। তখন তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এবং কোনো সুন্দরী মেয়ের দিকেই সে আদৌ নির্লজ্জ হ্যাংলার মতো তাকায় না। অথচ নায়িকার যৌন আবেদন ভরা হিন্দি ছবি সে দেখতে যায় না। এমন কি রাস্তায় কোনো মেয়ে ঐ ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে হাসলে বা হাঁটলে, তার একটুও ভালো লাগে না। তারপর রাস্তা যখন আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে, তখন সে কোনো দিন তেলেভাজার দোকান থেকে আলুর চপ, বেগুনি কিনে খায়। কোনোদিন দেড় দু ডজন ফুচকা, বা ময়রার দোকানের হিঙের কচুরি আর মিষ্টি খেয়ে, রেল লাইনের ওপারে পূব দিকে, বাড়ি ফিরে যায়। শনিবার ছাড়া বেশি রাত্রি অবধি সে বাইরে থাকতে পারে না। রোজ ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে, তাকে কাজে বেরোবার উদ্যোগ করতে হয়।

বনমালী আকাশের চাঁদের দিকে একবার মুখ তুলে দেখলো। তারপরে চোখ নামালো। স্টেশনের আশেপাশের উজ্জ্বল আলোয়, জ্যোৎস্না তেমন ফোটে না। দূরের দিকে তাকালে তার চোখে সবই কেমন যেন অলৌকিক মায়াময় লাগে। এই সময়ে একটি তরুণী, এক যুবকের গা ঘেঁষে পশ্চিমের দিকে চলে গেল। বনমালীর ঘ্রাণে লাগলো সুগন্ধ। তরুণীটির খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। বনমালীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এবং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই ওভারব্রিজের সময়টা কাটানো স্থির করে, **সিগারেট**টা ধরালো।

বাতাসের সঙ্গে, সময় বহে যায়। শুক্লা একাদশীর চাঁদ পশ্চিমে সরতে থাকে। শুধু ট্রেনের যাত্রীর কী প্রচণ্ড ভিড়। যতো ভিড়, ততো ব্যস্ততা।

বনমালী কব্জি তুলে ঘড়ি দেখলো। সাড়ে সাতটা। ওভারব্রিজে এক ঘণ্টা কেটে গেল। সিগারেট অনেক আগেই শেষ হয়েছে। সে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেল। কলকাতা থেকে যাত্রী বোঝাই একটা আপ ট্রেন এলো। শুরু হয়ে গেল ঠ্যালাঠেলি দৌড়োদৌড়ি। ওভারব্রিজে ওঠার সিঁড়িতে ঠাসাঠাসি চাপাচাপি ভিড়। বনমালী চেষ্টা করলো, ওভারব্রিজটা যাতে দ্রুত পেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তার লম্বা পায়ে, পশ্চিমের সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই, যাত্রীদের ভিড়টা ছুটে এসে পড়লো।

বনমালী পা চালিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে এলো। সাইকেল রিক্সা আর মানুষের ভিড় চারপাশে। বনমালী বাজারের দিকে রাস্তায় কয়েক পা গিয়েই, থমকে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, "উহুঁ!" আর সঙ্গে সঙ্গেই নিচু হয়ে, ডান পায়ের রক্তাক্ত কড়ে আঙুলটার দিকে তাকালো।

বনমালীর পাশে, আর একজনও তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। বনমালীর থেকে মাথায় সামান্য খাটো, কিন্তু দোহারা বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স বোধহয় বছর চল্লিশ হবে। সাদা ট্রাউজারের ওপর

সাদা হাফ শার্ট গায়ে। রঙ মোটামুটি ফরসা। চোখে মুখে মানুষটি যে সুপুরুষ, দেখলেই বোঝা যায়। ভদ্র ও শালীন মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। চোখে চশমা। মাথার চুলের অবিন্যস্ততায় প্রমাণ করে, মানুষটি সারাদিন কাজের ব্যস্ততায় কাটিয়েছে। তার ডান হাতে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ। বাঁহাতের চওড়া কব্জিতে, কালো ব্যাণ্ডের ওপর ঝকঝকে মসৃণ ইস্পাতের ও কাঁচের ঝিলিক। শরীরের অনুপাতে তার, ঘোড়ার রঙের বড় পায়ের জুতো জোড়াও বেশ ভারি। কিন্তু তার সমস্ত চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিব্রত অপ্রস্তুত লজ্জার অভিব্যক্তি। সেই সঙ্গে অস্বস্তি আর অনুতাপও। কারণ তার জুতোর তলাতেই বনমালীর ডান পা চেপটে গিয়েছে। অথচ তা আদৌ কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। ভিড়ের রাস্তায়, ব্যস্ত চলা ফেরায় এরকম ঘটতেই পারে। তবে জুতোর চাপটা হয়তো একটু বেশিই লেগেছে। বনমালীর ডান পায়ের কড়ে আঙুলের নখের কোণ ফেটে রক্ত পড়ছে।

লোকটি বাঁ হাত দিয়ে বনমালীর পিঠ স্পর্শ করলো। মুখে বিব্রত অপ্রস্তুত হাসি। গলার স্বরে অনুতাপ, "সরি দাদা—সত্যি, খুব দুঃখিত---মানে তাড়াহুড়ো---কিন্তু এতটা লেগে যাবে বুঝতে পারি নি। খুবই খারাপ লাগছে।" বনমালীর আর লোকটির দিকে, চলমান জনতার কোনো লক্ষ্য নেই। তাদের দুপাশ দিয়ে জোয়ার ভাটার স্রোতের মতো লোকজন চলে যাচ্ছে। বনমালী আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার মুখে ফুটে উঠেছে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। সে চোখের পাতা নিবিড় করে, লোকটির মুখের দিকে তাকালো। চোখের পাতা নিবিড় করার কারণ, যাতে তার ছোট তারা দুটোয় সেই দৃষ্টি ধরা না পড়ে। লোকটির মুখের দিকে সে তীব্র অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখলো। গলার স্বর শোনালো করুণ, যন্ত্রণাকাতর সানুনাসিক, 'হ্যাঁ, তা বুঝেছি। আমার খুব জোর লেগেছে।"

"কিন্তু ইচ্ছে করে কেউ কারোকে ওরকম লাগিয়ে দেয় না। তাই না?" লোকটির মুখে সেই লজ্জিত বিব্রত হাসি, গলার স্বরে তেমনি অনুতাপের সুর,' খুব খারাপ লাগছে আমার। রাস্তায় এত ভিড়। এদিকে আমাকে আটটার লঞ্চটা ধরতেই হবে।' সে বনমালীর পিঠ থেকে হাত সরিয়ে, কব্জি তুলে ঘড়ি দেখলো।

বনমালীর মুখের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন হলো না। তার সেই যন্ত্রণাকাতর করুণ সানুনাসিক স্বর অনেকটা বাচ্চা ছেলের ঘ্যানঘ্যাননির মতো শোনালো, "তা তো ঠিকই। আমার সত্যি খুব লেগেছে।'

"তা কি আর জানি নে?" লোকটি বিব্রত অপ্রস্তুত হাসি মুখে, বনমালীর মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখলো, "আমার খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু আটটার লঞ্চটা আমাকে ধরতেই হবে। আপনি বরং বাড়ি গিয়ে কড়ে আঙুলটা ধুয়ে, মারকিউরোক্রোম লাগিয়ে জড়িয়ে রাখবেন। চলি ভাই কিছু মনে করবেন না।" সে বাজারের রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

বনমালীর চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠলো। দৃষ্টি কঠিন। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে, সেই লোকটির একেবারে গা ঘেঁষে চলতে লাগলো। মুখ তার যন্ত্রণাকাতর। এবং সেই যন্ত্রণাকাতর মুখে নেমে এসেছে অতি নিরীহ করুণ অভিব্যক্তি। গলার স্বর তেমনই ঘ্যানঘেনে, "দেখুন, সত্যি বলছি, আমার কিন্তু খুব লেগেছে। কড়ে আঙুলের নখের কোণটা ফেটে গেছে।"

"জানি তো!" লোকটির লজ্জিত অপ্রস্তুত হাসিতে এবার একটু বিস্ময় ফুটে উঠলো। সে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে, আবার আস্তে আস্তে চলতে লাগলো, "কী করবো ভাই। ইচ্ছে করে তো কেউ এরকম করে না। আমি সত্যিই দুঃখিত। চলি, আমাকে আটটার লঞ্চটা ধরতেই

হবে।" সে আবার দ্রুত এগিয়ে গেল।

বনমালীব আজ আব সুন্দবী মেয়েদেব দিকেও লক্ষ্য নেই। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, দশ পনেবো পায়েব মধ্যেই লোকটিকে ধরে ফেললো, আব তার সেই ঘ্যানঘেনে স্বব শোনা গেল, আপনি দুঃখিত,অথচ আপনাব এত তাড়া। আমাব কষ্টেব কথাটা একটুও ভাবছেন না।"

"কী আশ্চর্য!" লোকটির মুখেব হাসিতে এখন বিস্মিত অনুসন্ধিৎসা। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু তাব গলাব স্ববে এখন আব সেই অনুতাপেব সুব নেই, "কেন ভাববো না আপনাব কষ্টেব কথা? আমাব সত্যি খুব খাবাপ লেগেছে। আপনাকে তো বললামই। আমি ভাই দুঃখিত। আব সত্যি, আমাব একটা জরুবি কাজ আছে বলেই, আটটাব লঞ্চটা ধববাব জন্য ছুটছি। চলি, কেমন?" সে আগেব থেকেও দ্রুত ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল।

বনমালী খোঁড়ালেও, দ্রুততব গতিতে লোকটিব প্রায় গায়ে গিয়ে পড়লো। আব তাব সেই মুখ, সেই ঘ্যানঘেনে স্বব, 'দেখুন, কষ্ট পাওয়া দুঃখিত, এসব তো লোকে বলেই থাকে। কিন্তু আমাব যে কতোটা লেগেছে, তা যদি বুঝতেন।"

'কে বললো বুঝি নি'? লোকটি ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়েও, হেসে ফেললো, এক মুহূর্ত থমকে দাড়ালেও, সে না থেমে চলতে লাগলো, "লোকেবা কী বলে আমি জানি নে। কিন্তু সত্যি বলছি আপনাব কষ্টে আমি দুঃখিত, লজ্জিত। তবে আপনাব সঙ্গে এভাবে আস্তে আস্তে চললে আমি লঞ্চটা ফেল কববো। চলি ভাই।" সে আগেব মতোই দ্রুত এগিয়ে চললো। বনমালী এ বাস্তাব ভিড় কাটিয়ে চলতে অভ্যস্ত। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই কয়েক পায়েব মধ্যে লোকটিকে ধরে ফেললো। আব তাব সেই করুণ যন্ত্রণাকাতব ঘ্যানঘেনে স্বব, "দুঃখ, কষ্ট, সবই কথাব কথা। আপনাব প্রাণে একটু মায়া দয়া নেই। নিজেব কাজেব তাড়াতে ছুটে চলেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাব সত্যি খুব লেগেছে।"

"আশ্চর্য। কেন এবকম ভাবছেন, আপনাব লাগাতে আমি বিশ্বাস কবি নি?" লোকটি না থেমে গিয়ে দেখলো, বনমালী প্রায় তাব পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। তাব মুখেব হাসিতে আব সেই লজ্জিত অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি নেই। যদিও তাব অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে ও মুখে একটা অর্থহীন হাসি লেগে আছে, "আপনাকে আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, আমি সত্যি দুঃখিত। কেনই বা ভাবছেন, আমাব প্রাণে কোনো দয়া মায়া নেই? কিন্তু আপনিও বিশ্বাস করুন, গঙ্গাব ওপাবে আমাব সত্যি একটা জরুরি কাজ আছে। নইলে, এ বাস্তাব কোনো ওষুধেব দোকানে ঢুকে, আমিই আপনাব পায়ে ওষুধ লাগাবাব ব্যবস্থা কবতাম। আপনাব আঙুল বা নখ কেটে যায় নি, আমি দেখেছি। নখেব ওপর চাপ পড়ায়, নখেব কোণ থেকে একটু বক্ত বেবিয়েছে। অনেক সময় নখ কাটতে গেলেও আমাদেব ওবকম হয়। কিন্তু ভাই, আমাকে আব দেবি কবাবেন না। আটটাব লঞ্চটা আমাকে ধরতেই হবে।" সে বনমালীব পাশ কাটিয়ে আবও দ্রুত গতিতে, পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললো।

লোকটাব চোখ মুখের অভিব্যক্তি ও কথাবার্তায় স্পষ্টত ই ব্যস্ততা ও অকপটতা বর্তমান। কিন্তু বনমালীকে যেন একটা অদৃশ্য শক্তি লোকটিব দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। সত্যি তাব এতোটা খুঁড়িয়ে চলবাব মতো অবস্থা কি না, তা-ই বা কে জানে! তবু সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই, ছুটে লোকটাব প্রায় গায়ে গিয়ে পড়লো, মুখেব ভাবে তাব কোনো পবিবর্তন নেই। গলাব স্বব সেই বকম যন্ত্রণাকাতর করুণ ঘ্যানঘেনে, 'আপনি বলতে পাবলেন, আমাব আঙুল বা নখ কেটে যায় নি? আপনাব শবীরের ওজন আব জুতোব তলাটা কী রকম, তা বোধহয় আপনি জানেন না এখন বুঝতে পাবছি, এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। আমাব যে সত্যি খুব লেগেছে, আপনি তা

বিশ্বাস করেন নি। একবাব দেখুন, আমাব আঙুলটাব দিকে, বলতে গেলে থেঁতলে গেছে। এবপরেও বলছেন, আপনার প্রাণে মায়াদযা আছে? আমার এত কষ্ট, আপনি বিশ্বাস পর্যন্ত করছেন না।'

"কে বললে, আপনার কষ্টেব কথা আমি বিশ্বাস কবি নি?" লোকটি এবাব এক মুহূর্তেব জন্য থমকে দাঁড়ালো। তার অধৈর্য গলাব স্বরে ঈষৎ ক্ষোভেব ঝাঁঝ থাকা সত্ত্বেও, প্রায় অসহায় হয়েই সে হেসে ফেললো। যে অসহায়তার মধ্যে কোনো সমবেদনাই থাকা সম্ভব না। ববং একটা বিবক্তিই প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, "কেনই বা আপনাকে অবিশ্বাস কববো? আমি তো দেখেইছি, আপনার পাযের কড়ে আঙুলে আমার জুতোব চাপ লেগেছিল। আমি শুধ্ বলেছি, আপনি যতোটা বলছেন, হয়তো ততোটা লাগে নি। তাতে যদি আপনি ভুল বুঝে থাকেন, তাহলে ভাই জোড হাতে ক্ষমা চাইছি। এ ছাড়া তো আমাব আব কিছু কবাব নেই। না জেনে যা করেছি, তাব জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। বাট বিলিভ মী ভাই, এ লঞ্চটা ধবে যদি আমি ওপাবে যেতে না পাবি, দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে। প্লিজ, আব আমাকে আটকাবেন না।" সে না থেমে, আস্তে আস্তে চলছিল। কথা শেষ কবেই, আবাব হনহনিয়ে নিজেব পথে চলতে লাগলো। বনমালীব সেই বড চোখ আর ছোট তাবা দুটোব উদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে একটা অলৌকিকতাব ঘোব নেমে এসেছে। তাকে টেনে নিয়ে চললো, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি। অথচ তাব যন্ত্রণাকাতব মুখ করুণ আব নিরীহ। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ভিড় কাটিয়ে লোকটিকে ধবে ফেললো, আব তাব সেই অসহ্য ঘ্যানঘেনে স্বব শোনা গেল, "দেখুন, সব মানুষ যা কবে আপনি তাই কবলেন। ক্ষমা চাইলেন। তাতেই যেন আমাব পায়েব চোটটা সেবে যাবে। দিব্যি গেলে বলছি, আমাব খুব লেগেছে।"

লোকটি এবাব থম্কে দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে বনমালীব পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো। চোখ ফিবিয়ে, বাঁ হাতেব কব্জি তুলে, ঝটিতি ঘড়িটা দেখে নিল। তাবপব আশেপাশে তাকিয়ে, দুটো হকাব স্টলেব মাঝখানে, সামান্য সরু এক ফালি জাযগা তাব চোখে পড়লো। সে বনমালীব হাত ধবে, সেখানে টেনে নিয়ে গেল। ভিড়েব ব্যস্ত বাস্তায়, কেউ তাদেব লক্ষ্যও কবলো না। বনমালীরও আজ লক্ষ্য নেই, যাদেব সে দেখতে ভালবাসে, সেই স্বাস্থ্যবতী সুন্দবী মেযেবা কতো জন তার সামনে দিযে চলে গেল। লোকটার ঐবকম বাস্তাব ধাবে টেনে নেওয়া সত্ত্বেও, তাব চোখ মুখের কোনো পবিবর্তন দেখা গেল না। লোকটি গলাব স্বব নামিয়ে বেশ ভদ্রভাবেই, দ্রুত স্ববে জিজ্ঞেস করলো, "আপনাব নামটা জানতে পাবি ভাই?"

বনমালী তাব আচ্ছন্নতার মধ্যেই যেন উচ্চাবণ কবলো, "বনমালী হাজবা।" "ভাই বনমালী বাবু, আমি বুঝতে পাবছি, আপনি একজন ভদ্রলোক।" লোকটিব মুখে অমাযিক হাসি ফুটে উঠেছে। সে তাব চামড়াব ব্যাগটা দুই উরুতেব মাঝখানে চেপে ধবে, ট্রাউজাবেব হিপ পকেটে হাত ঢোকালো, "হযতো গোড়া থেকেই আমাব একটা কথা বোঝা উচিত ছিল। তাতেও যদি আমাব ভুল হয, তাহলে আমাকে ক্ষমা কববেন। আপনি ভালোই জানেন, আমি সত্যি ইচ্ছে কবে আপনাব পাযে লাগিয়ে দিই নি। আমাব মনে হয়, প্রিকশান নেবাব জন্য আপনার বোধহয় একটা অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশান নেওযা দরকাব। আব কিছু ওষুধ খেতে হবে।"

কথাগুলো শেষ না কবতেই, হিপ পকেট থেকে সে তাব মোটা পার্সটা বেব কবলো। পার্স খুলে বেব কবে, একটা দশ টাকাব নোট বেব কবে, বনমালীব দিকে এগিয়ে দিল। "কিছু মনে কববেন না বনমালীবাবু! এটা বাখুন। আপনাব কাজে লাগবে।"

"এটা আব একটা চোট দিলেন আপনি।"

বনমালীব সেই একই যন্ত্রণাকাতব করুণ ঘ্যানঘেনে গলাব স্বব, অথচ খুবই নিবীহ, "খুব কষ্ট

পেলাম। ছি ছি আমার চিকিৎসাব জন্য আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন? আব আমি তা হাত পেতে নেবো? শেষ পর্যন্ত আমাব সম্পর্কে এই আপনাব ধাবণা হলো?"

লোকটি নতুন কবে আবাব অপ্রস্তুত ও বিব্রত হলো। পার্সেব মধ্যে নোটটা ঢুকিয়ে, হিপ পকেটে ঢুকিয়ে দিল। দুই উরুব মাঝখান থেকে চামডাব ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে, বনমালীব মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রায় ক্ষমা চাওযাব ভঙ্গিতে হাসলো, "মাফ করবেন বনমালীবাবু। আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম, যদি আমার ভুল হয, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আব এক মিনিটও আমাব দাঁড়াবাব সময নেই। চলি।" সে পিছন ফিরে, প্রায ছিটকে বাস্তাব মাঝখানে চলে গেল। ভিড কাটিয়ে, এক বকম উর্ধ্বশ্বাসেই অতি দ্রুত পা চালালো।

বনমালীও খোঁড়াতে খোঁড়াতেই ছিটকে পডলো বাস্তাব মাঝখানে। আব সেই ভাবেই আট দশ পদক্ষেপেব মধ্যেই লোকটিকে ধবে ফেললো। লঙ্কাঘাটটা আব বেশি দূবে নেই। কিন্তু বনমালীব ওপব তখন যে কোন এক দুবাত্মাব অলৌকিক শক্তি ভব করেছে, তা সে নিজেই জানে না। লোকটাব গা ঘেঁষে, খুঁড়িযে চলতে চলতে, তাব সেই করুণ নিবীহ ঘ্যান ঘেনে স্বব শোনা গেল, "যা খুশি অপমান কবতে পাবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাব সত্যি খুব লেগেছে।'

'জানি। কিন্তু কিছু কবাব নেই।' লোকটিব মুখ শাস্ত। গলাব স্বব কঠিন শোনালো। সে না থেমে দ্রুত পা চালালো।

বনমালী বলতে গেলে, একবকম লোকটিব পায়ে পা ঠেকিয়ে খুঁড়িয়ে চললো আব একই স্ববে বললো, "কী আব কববেন? কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমাব সত্যি খুব লেগেছে।'

"কী বলতে চান আপনি, অ্যাঁ?' লোকটি এবাব স্বব চড়িয়ে ঝেঁজে উঠলো, অনেকক্ষণ ধবে আপনাব ভাঁডামি সহ্য করেছি। মনে বাখবেন, সব কিছুর একটা সীমা আছে।"

লোকটিব চড়া স্বব যেন রাস্তাব ভিডেব স্রোতকে একটু থমকে দিল। দু একজন এগিয়েও এলো। বনমালীব কোনো পবিবর্তন নেই। সে এগিয়ে মুখ কযেকটিব দিকে একবাব তাকিয়ে দেখলো। সে তাব বুকে দ্রুত স্পন্দন অনুভব কবছে। একটা সার্থকতাব প্রত্যাশা তাব আচ্ছন্নতাকে যেন আলোকিত কবে তুলছে। তাব সেই যন্ত্রণাকাতব নিবীহ মুখ, আব শোনা গেল সেই দুঃসহ ঘ্যানঘেনে স্বব, "আমাব আঙুল কেটে বক্ত পডছে, আব আপনি আমাকে শাস্ত বলছেন?"

"তা ছাড়া আপনাকে কী বলবো মশাই?" লোকটিব স্বব যেন আবও চড়া তপ্ত সুবে ফেটে পড়লো, "সেই কখন থেকে আপনি আমাকে জ্বালাতন কবছেন। ইচ্ছে করে আমি আপনাব পা মাড়িয়ে দিইনি। তবু ক্ষমা চেয়েছি, আবার কী! এব পরেও, আপনাকে কি মাথায় করে নাচতে হবে নাকি? কী ভেবেছেন আপনি, অ্যাঁ?"

লোকটিব ঝাঁঝানো স্ববের চিৎকাবে, জনস্রোত প্রায একেবাবেই থমকে গেল। আবও কযেকজন লোক, লোকটিকে আব বনমালীকে ঘিবে এগিয়ে এলো। একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক জিজ্ঞেসও করলো,"কী হযেছে?"

বনমালীব সেই যন্ত্রণাকাতব নিরীহ মুখ। সে ঝুঁকে পড়ে, ডান দিকেব কড়ে আঙুলটা দেখালো। কেউ কেউ সেদিকে ঝুঁকে পড়লো। বনমালীব সেই করুণ ঘ্যানঘেনে স্বব শোনা গেল, 'আমি কী বলেছি আপনাকে? আমি তো খালি বলেছি, আমাব সত্যি খুব লেগেছে। তা ছাড়া আর কিছু বলেছি? আপনি আমাব পা মাড়িয়ে দিয়েছেন, তা কী আব করা যাবে। তা বলে, আমার লাগাব কথাটাও বলতে পাববো না?"

"হুঁ, আঙুলটায় বক্ত জমে গেছে।" একজন প্যান্ট শার্ট পবা, তাগড়া জোয়ান বলে উঠল।

লোকটি কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাব আগেই ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবকটি বলে উঠলো, "আহা, ভদ্রলোক তো বলছেন, সেজন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। ব্যাপারটা তো তাতেই মিটে যাওযা উচিত।"

'ওরকম বোয়াবি মারা গলায যে কেউ ক্ষমা চায়, তা জানতাম না।' তাগড়া জোয়ানের স্ববে বিদ্রূপ মেশানো, ঝাঁঝ।

আশেপাশে তখন নানারকম মন্তব্যেব গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকটি তবু গলা চড়িয়েই বললো "বোয়াবি মারা টাবা কী বলছেন, আমি বুঝি না। আপনি কী করে জানবেন মশাই, কতক্ষণ ধরে ভদ্রলোক আমাকে জ্বালাতন কবে মাবছেন? ভিড়ের বাস্তায ওবকম লাগতেই পাবে, তা বলে বাবে বাবে আমাকে শুনতে হবে, ওঁব খুব লেগেছে? কে সে অস্বীকার করেছে?"

"শুনুন মশাই, আপনি চুপ করুন।" ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক লোকটিকে থামিযে, ভিড়েব উদ্দেশ্যে মুখ তুলে কিছু বলতে চাইলো।

বনমালী তার আগেই ঘ্যানঘেনিযে উঠলো, "আপনি মশাই শুধু তখন থেকে আমাকে ধমকাচ্ছেন। আবাব বাস্তায ধাপে টেনে নিযে গিযে, আমাকে টাকা দিতে চাইলেন। যেন ঘুষ দিতে চাইছিলেন। আমি কি আপনাব কাছে টাকা চেয়েছি? কী অপমান। আমি শুধু বলেছি, আমাব খুব লেগেছে। আবার আমাকে ভাঁড়ও বলছেন। আমি ভাঁড়?"

"তা ছাড়া আপনি কী?" লোকটি এতক্ষণে তাব নিজেব আযত্তেব বাইরে চলে এসেছে। সে আগেব মতোই গলা চড়িযে চিৎকাবে ঝেঝে উঠলো, "হ্যাঁ, টাকা আপনাকে দিতে চেযেছিলাম, কিন্তু ঘুষ নয। আপনার আঙুলের চিকিৎসাব জন্য। আপনাব যে মানসম্মান বোধ থাকতে পাবে, তা আমি বিশ্বাস কবি না। আপনাব ঘ্যানঘ্যানানিব জন্যই আমি আটটাব লঞ্চটা ফেল কবলাম।"

ভিড়েব গুঞ্জন শুনে বোঝা গেল, বনমালী আব লোকটি, দুজনেব পক্ষে, দুই শিবিবে লোক ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এ সমযে ভিড ঠেলে আব একজন এগিযে এলো। চেহারাটা ফিল্মের লড়িযে নাযকেব মতো। তাব চোস্ত আব পাঞ্জাবি পবা চেহারাটি বেশ লম্বা। সোজা এসে দাঁড়ালো লোকটির মুখোমুখি। বলতে গেলে, বনমালী তাব পিছনেই পড়ে গেল। তাব বুকেব রক্তে তখন তোলপাড় শুরু হযে গিযেছে। তাব প্রত্যাশিত সেই যুদ্ধ যেন আসন্ন হযে উঠেছে, যে-যুদ্ধ সে অনেক আগেই শুরু কবেছিল। এবং সে যেন দেখতে পেলো, জযধ্বজা উড়ছে, তার হাতে। ফিল্মের লড়িযে নায়কের মতো যুবক, লোকটিব দিকে ঠাণ্ডা কিন্তু কঠিন চোখে তাকালো। তাব গলার স্বরও সেই রকম শোনালো, "দেখছি, লোকের পা মাড়িযে রক্ত বের করে ডেঁটে ছাড়া কথা বলতে পারেন না। এত মেজাজ কিসের মশাই?"

ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক এগিয়ে এলো, "ভদ্রলোক তো ক্ষমা চেযেছেন, বলছেন, তবে আব—।"

"আরে দূব তোর ক্ষমা চাওয়ার নিকুচি কবেছে।" ফিল্মের লড়িয়ে নায়ক তার বাঁ হাতের থাবা দিয়ে পাঞ্জাবি পরা যুবকের মুখের ওপব চাপা দিয়ে, জোরে ঠেলে দিল।

মুহূর্তের মধ্যেই, জনতার থমকানো স্রোত নড়ে উঠলো। ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক পড়তে পড়তে, লোকজনের গায়ে ঠেকে গেল। অন্য দু'চারজন সেদিক থেকে এগিয়ে এলো। ফিল্মেব লড়িযে নাযক লোকটির মুখেব কাছে তর্জনী তুলে, চাপা গর্জন করলো, "একটা নিরীহ লোকের পা মাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য ভদ্রলোকের মতো ক্ষমা চাইতে হয। ওরকম ডেঁটে মেজাজ দেখিয়ে ক্ষমা চায় না লোকে।"

"আপনি তো মশাই কিছুই জানেন না, তবে কেন আগ বাড়িয়ে বলতে আসছেন?" লোকটি

পরিস্থিতি বুঝতে অক্ষম। নিজেব আযত্ত হাবিযে, বেশ ঝেঁজেই গলা চড়ালো, "পা মাড়িযে দিয়েছি ঠিকই। কিন্তু আপনারা জানেন না, ও লোকটা অত্যন্ত অভদ্র, ছোটলোক। ওব কাছে আমার ক্ষমা চাওয়াও উচিত হয় নি।"

ফিল্মের লড়িযে নাযকেব স্ববে ক্রুদ্ধ বিদ্রূপ ঝল্সে উঠলো, "তাই নাকি। এই হলো ক্ষমা চাওয়ার বহর ? যান, চলে যান।" বলেই, বাঁ হাতে লোকটিব ঘাড়ে আঘাত করলো।

লোকটি তার পিছনেব ভিড়ে ছিটকে পডলো। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে লাফিয়ে নায়কটিব ওপর ঝাঁপিযে পড়লো। যাব পরিণামে, মুহূর্তেব মধ্যে, ভিড়েব রাস্তা একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পবিণত হলো। বেশ কিছু লোক, মহিলা আব শিশুদেব নিযে যে যেদিকে পাবলো, ছুটলো।

বনমালী জনস্রোত কোন্ দিকে টেনে নিযে চলেছে, সে প্রথমটা বুঝে উঠতেই পাবলো না। সে কেবল লোকটির আহত বক্তাক্ত চেহাবাটা দেখতে পাচ্ছে। আব সে যেন এক বিবাট যুদ্ধে জযলাভ কবে, জযধ্বজা নিযে চলেছে। এবং হঠাৎ সে দেখলো লঞ্চঘাটের সামনে, সাইকেল বিকশাগুলোব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কোনো দিকে না তাকিয়ে, একটা বিকশায় উঠে বললো,'গঙ্গার ধাবেব বাস্তা দিযে চলো।'

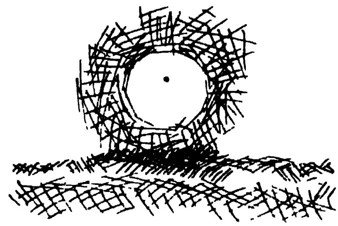
"কিসেব'যে মারামাবি লেগে গেল কে জানে?" বিকশাওযালা বিকশা চালাতে চালাতে নিরুত্তেজ স্ববে বললো, "এব পবেই শালাবা বোমবাজি শুরু কববে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে আব আমাদেব কাববাবেও চিত্তিব।"

বনমালীর কানে বিকশাওযালাব কথাগুলো তেমন ঢুকলো না। গঙ্গাব ধাবেব রাস্তা ফাকা। বাতাস বইছে, আব আকাশে শুক্লা একাদশীব চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চলকানো গঙ্গাকে দেখাচ্ছে মাযাময বিশাল নদীব মতো। বনমালী পাযে একটুও ব্যথা বোধ কবছে না। লোকটিব চেহাবা তাব চোখে ভাসছে। নিশ্চযই লোকটা তাব তুলনায অনেক শিক্ষিত, টাকা পযসাওযালা সুখী। বাড়িতে যে সুন্দরী বউ আছে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। গোটাব স্বাস্থ্য চেহাবাও তাব চেযে অনেক অনেক সুন্দব। আর লোকটা সত্যি ভদ্র, অমাযিক স্বীকাব না কবে উপায নেই। কিন্তু বনমালী কী কববে ? ও অসহায। কী একটা অশুভ আত্মা যে ওব মধ্যে ভব কবে, ও জানে না। সে একবাব যুদ্ধ ঘোষণা কবলে, শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ না ঘটিযে কিছুতেই নিবস্ত হতে পাবে না।

হ্যাঁ বনমালী জযী, এবং সুখী বোধ কবছে। কিন্তু তাব ভিতরে যেন দলা দলা অন্ধকাবও জমে উঠেছে। এ দুটোই এখন তাব কাছে অনিবার্য, অন্যথায়, সে তো বছবেব পব বছব মাসেব পব মাস, ঘবে বাইবে অবজ্ঞা অবহেলাব মধ্যে, নির্বিকাব জীবন যাপন কবে। তবু মাঝে মধ্যে কেন যে এবকম অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়, বনমালী জানেও না।



মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা



আজ ছুটি। আজ উৎসবের দিন। আজপনেরোই আগস্ট। আজ ভারতবর্ষেব স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পূর্তি দিবস। আজ ভাবতের নযা প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। (মরেছে প্যাল্‌গা ফবসা, দে হরিবোল।) লক্কা পাযরা ওড়াবার খবব পাওয়া যায় নি, তবে একুশবাব তোপধ্বনির খবর সারা দেশের লোক জেনে গিয়েছে। কাবণ এখন বেলা প্রায সাড়ে এগারোটা।

আজ যে-যাই বলুক বা বলুন, গণতন্ত্রের আসন্ন বিপদেব সংকেত দেখা দিয়েছে' 'দেশ জুড়ে বাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে' কিন্তু আজ আনন্দেব দিন। আজ পতাকা ওড়বাব দিন, গৃহস্থেরাও সন্ধ্যা পর্যন্ত পতাকা ওড়াতে পাবে, আজ রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবীদের বিশেষ ব্যস্ততার দিন, কারণ আজকেব এই ঐতিহাসিক দিনে, জনসাধাবণকে তাদেব মহান কর্তব্যের কথা স্মবণ করিয়ে দেবার দিন, বিশাল বোঝা বহন কববার দাযিত্বেব কবা স্মবণ কবিযে দেবার দিন, তথাপি আজ বড আনন্দের দিন,(মরেছে প্যাল্‌গা ফবসা, দে হবিবোল।) কাবণ এই বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, অতএব আজ আলিপুবের চিড়িযাখানা শিশু উদ্যানে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খোকাখুকুদেব বিনা পয়সায ঢুকতে পাবা থেকে শহরেব গ্রামে গঞ্জে তাবৎ বাচ্চাদেব মিষ্টি খাওয়াবার দিন, নানা বকম খেলাধুলা, ছবি আঁকা ইত্যাদির হাবজিতের দিন, নানা রকম কুচকাওযাজেব দিন, ভবিষ্যতে তাবা কি হবে বা হতে যাচ্ছে, সে-কথা ওদের মনে কবিয়ে উপদেশ দেবাব দিন, কারণ, ওবা কারা? ('বাচ্ছালোগ, এক দফে হাততালি লাগাও, ইয়ে হ্যায় মাদারিকা খেল' রাস্তায আজ এখন খেলোযাড খেলা দেখাচ্ছে, কেননা আজ ছুটিব দিন, খুশির দিন। চটপট হাততালি পডছে, এবং সেই সঙ্গে 'লে হালুযা লে হালুযা!' খুশিব চিৎকাব শোনা যাচ্ছে।) ওবা দেশেব ভবিষ্যৎ।

আজ এই উৎসবেব দিনে তাই দিকে দিকে মাইকেব চডা আওয়াজে গান বাজছে, কে কত আওয়াজ বাড়াতে পারে, তার জন্য রেষাবেষি চলছে। সব অবশ্য দেশাত্মবোধক গান না, কেননা আজ ফুর্তিব দিনও তো বটে। যাদেব যেমন ইচ্ছা, হিন্দি, বাংলা, সিনেমার গান, পপ্ সং সব বকমই শোনা যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা? বৃষ্টি পডছে? বাজার চডা? তা হোক, আজ ছুটি আজ উৎসব, আজ পনেরোই আগষ্ট। আজ এই উত্তর শহরতলির পথে পথেও লোকজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, জটলা করছে, আর হাসিখুশিব মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করছে। কেননা প্রতিবাদও তো কবতে হবে। খুশি উৎসব ছুটির প্রতিবাদ, সব মিলিযেই আনন্দ। সেই কত কালের দুর্ভাগিনী দেশমাতাকে ডাস্টবিনেব পাশ থেকে তুলে এনে, খড়মাটি দিয়ে নতুন করে বানানো হয়েছে। মায়ের আজ বত্রিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তার সঙ্গেই এ বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পড়ে গিযেছে।মায়ের জন্মদিনে আজ শিশুদেব তো সব থেকে বেশি কদব করতে হবে।

'মরেছে প্যাল্‌গা ফবসা, দে হরিবোল!' ···আট দশ থেকে পনেরো বছরের, খালি গায়ে ধুলা

কাদা মাখা বেশে সব ছেঁড়া ঝোল ঝাপ্‌পা পাতলুন ইত্যাদি পরে আধ ন্যাংটার দল। একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, একটা ছেলের মড়া কাঁধে বয়ে, রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে, আর চেঁচাচ্ছে, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল।'—মড়া ছেলেটার ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা ঝুলে পড়েছে, আর বাঁশ কাঁধে ছেলেদের নাচের তালে তালে, ছেলেটার মাথাও নাচছে।

খুশির দিনে অবাক জলপান। কি মজা। হা-ঘরে ভিখিরি, শহরের আপদগুলোর ধ্বনি আর নাচের তালে, অনেকেরই শরীরে তাল লেগে যাচ্ছে। হাসছে কেউ, অবাক কেউ। শহরের যত খুদে আপদ, নেংটি ইঁদুরের বাচ্ছাগুলো এ আবার কি সঙ বের করেছে? সত্যি মড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি মজা মারছে। বাঁশে বাঁধা ছেলেটি আজ মরেছে নাকি? বড় ভাল দিনে মরেছে তো।

কিন্তু আজকের ভাল দিনটিতে প্যালগা ফরসা মরে নি। সে সৌভাগ্য ও করে আসে নি। ও মরেছে গতকাল দুপুরের একটু পরে। শহরের যে খাল নর্দমাটা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, যার দুপাশে ঘিঞ্জি শহরের খাটা পায়খানা বাড়ি-বাজারের পিছন দিকে, যত নোংরা জল আবর্জনা ভেসে যায়, তারই ধারে কোন এক কালের একটা পুরানো ধসে পড়া বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে, লোক চোখের আড়ালে, ওদের একটা আস্তানা আছে। শহরের বাজারের পাশে একটা গলি দিয়ে ঢুকলে, খোলা খাল নর্দমাটার ধার দিয়ে সেই পোড়োর চাতালে যাওয়া যায়। ডানদিকে ঘিঞ্জি পাকা বাড়ি, নিচে সবই দোকান-পাট, দোতলা তেতলায় মানুষ থাকে। সামনের দিকে শহরের বাজার দোকানের রাস্তা। পিছন দিকে খোলা খাল নর্দমাটা, যত নোংরা ফেলার পক্ষে বড় সুবিধা।

বাঁদিকে, খাল নর্দমাটার পাড় বাঁচিয়ে, বেশ্যাপল্লী, জুয়ার আড্ডা বেআইনি মদ চোলাইয়ের কারখানা। যেটুকু পাড় বাঁচিয়ে রেখে শহরের এই অংশ মৌমাছির চাকের মত জমে উঠেছে, সেই পাড়টুকুতে যে কোন বয়সের মেয়ে পুরুষই প্রস্রাব পায়খানা করে। নোংরা জঞ্জাল তাদেরও কিছু কম না। সবই খাল নর্দমার ধারে ধারে জমা হয়। তারই পাশ কাটিয়ে, ময়লা নোংরা মাড়িয়ে, প্যাল্‌গা ফরসাদের পোড়োয় যাবার রাস্তা। আর গঙ্গার ধারের বাগ্‌ওলাপাড়ার যত ধাড়ি শুয়োরের দল, সেই খাল দিয়ে, বাজারের গলির মোড় অবাধ যাতায়াত করে। বাড়ি বাজারের যত নোংরা, জঞ্জাল, বিষ্ঠায় আর খালের পাঁকে, ধারে ধরে জঙ্গলের শিকড় মূলে খাবারের বড় মোচ্ছব তাদের।

গতকাল দুপুরে প্যাল্‌গা ফরসার বন্ধুরা, পোড়া বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে গিয়ে দেখতে পায়, ও একটা ভাঙা দেওয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে শুয়ে আছে। সাধারণত, ঘোর দুপুরে বাজার যখন ফাঁকা থাকে, দোকানপাটগুলো ঝিমোয়, রাস্তা-ঘাটে লোকজনের ভিড় কমে যায়, এমনি কি রেল ইষ্টিশনেও যাত্রীদের আনাগোনা কম, আর সিনেমার ম্যাটিনি শো শুরু হয়ে যায়, তখন ওরা যে যেখানে থাকুক, ওদের নিরালা আস্তানায় এসে জড়ো হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যার যা আয় সব ওরা নিজেদের সামনে ঢেলে দেয়। আয়ের সব থেকে মূল্যবান বস্তু হল পয়সা। সবই ভিক্ষের পয়সা। চুরি, পকেটমারি, রাহাজানি করে পয়সা রোজগারের পথে এখনও ওরা যায় নি। অথবা যাবার সাহস হয় নি। তার জন্যে শহরের আলাদা দল আছে। তারা ওদের সঙ্গে মেশে না, বরং কাছে পিঠে দেখলেই তাড়া করে। চেহারা আলাদা, ভাবভঙ্গি আলাদা আর তাদের আস্তানাও অন্য জায়গায়। সেখানে অনেক বড় বয়সের লোকেরা আছে। সেই সব লোকেরা আবার শহরের পুলিশদের, বাবুদের কপালে হাত ঠুকে সেলাম করে, হেসে কথা বলে হাবভাব অনেকটা বাবুদের মত। তাদের আস্তানাটাও প্যালগা ফরসার বন্ধুরা চেনে। পাড়ায় ঢোকবার বাঁ পাশেই দিদি, মাসীদের (বয়স অনুপাতে, বেশ্যাদের ওরা এই রকম সম্বোধন করে, এমন কি খুড়ি

জেঠি দিদিমাও আছে) পাড়ার ভিতরে তাদের আস্তানা। সেই আস্তানায় এদের যাওয়া নিষেধ। ওদের যাবার কোন দরকারও হয় না। পাড়াব ভিতর দিয়ে চলাফেরা করলেই সব জানা যায়।

বরং সেই আস্তানার অনেকেই হঠাৎ হঠাৎ ওদের জঙ্গল ঘেবা পোড়োর চাতালে হানা দেয়। চোখ পাকিয়ে মুখ শক্ত কবে ওদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, আশেপাশে নজর করে, জিজ্ঞেস কবে, 'কি রে ছুঁচো হাবামীর দল, কি করছিস ? ছিঁচকেমির মালগুলো কোথায় গাপ্ করে রেখেছিস ?'

প্যাল্‌গা ফবসাদের মধ্যে সব থেকে যার বয়স বেশি, ওব নাম চটা। চটা শব্দের মানে নাকি চড়ুই পাখি, এটা ও নিজেই বলে। কিন্তু দলপতি হিসাবে ওর সাহস সব থেকে বেশি। ও ওব ছেঁড়া পাতলুনের গিঁট খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িযে বলে, 'দ্যাখ কোথায বেখেছি।'

চটার কান্ড দেখে, ওব বন্ধুরা হেসে ওঠে, আর 'আস্তানা'র চোখ পাকানোব দল তেড়ে মারতে আসে। চটারা তখন ছুটোছুটি করে, কিন্তু হাসে, আর জবাব দেয. 'আমরা চোব চোট্টা নই, বুইলে বাবা ? আমরা মেগে নেই, চেযে চিন্তে খাই।'

'আর রোজ ভিখ্ মেগে যে নগদ পয়সা নিয়ে আসিস, সেগুলো কোথায যায় ?' আস্তানাব ওস্তাদরা জিজ্ঞেস করে, চোখে তাদের কুটিল সন্দেহ। অবিশ্যি এই সব ওস্তাদবা কেউই বযসে খুব বড় না। চটাদের থেকে দু-চাব বছবের বড়, দলের হযে কাজ কবে। ওবাই মাঝে মাঝে চটাদের ওপর খবরদাবি কবতে আসে। এটাই নিয়ম। একদল, আর এক দলেব উপব সর্দাবি করে। চটাবাও সর্দারি কবে। শহরেব একেবাবে পুঁচকে মাগার দলগুলো, নাকে শিক্নি, চোখে পিচুটি, পেটে চাপ পড়লে বাস্তার যেখানে-সেখানেই বসে যায়, অনেকেব মুখেব বুলি এখনও পরিষ্কার ফোটে নি, চটাবা তাদেব উপর সর্দারি করে।

চটারা জবাব দেয, 'নগদ পয়সা ? বাবুদেব হাতে ঘা, নগদ কে দেবে ? যা দু এক পযসা পাই, তখুনি কিছু কিনে খেযে ফেলি। যাবে আবাব কোথায ? ওই যে, দেখছ না ? ওখেনে সব আছে।' বলে চারপাশে বিষ্ঠা দেখিয়ে দেয় আর হাসে।

আস্তানাব ওস্তাদেবা গবগরিযে তেড়ে আসে। যাকে ধবতে পাবে, চাটি গাট্টা মেরে সারা গাযে মাথায় হাতড়ায। হযতো কারো ছেঁড়া ঝোল-ঝাপ্পার ভিতর থেকে বেবিয়ে পড়ে দু একটা দুই পাঁচ দশ পযসা। তাই নিয়েই কেটে পড়ে। যাবার আগে হেঁকে যায়, আবার আসবে।

আসে ওরা, পায ওই রকমই, তাব বেশি না। কিন্তু চটাদেব সকাল থেকে দুপুবেব নগদ আয়, সাত আট জনেব মিলিয়ে, কোন দিনই এক দেড় টাকাব কম হয় না। অবিশ্যি সব দিন না। কোন কোন দিন আরও অনেক কম হয়। তবে, কোন সকালে বেরিয়ে, ঝিমনো দুপুরে ফিরে আগে ওরা যে যাব নগদ পয়সা এক সঙ্গে হিসাব করে। তখন একজনকে চাতালের থেকে এগিযে, জঙ্গলের ধারে লুকিয়ে পাহাবা দিতে হয়, কেউ আসছে কি না। নিজেদের মধ্যে নিয়মটা কেমন করে গড়ে উঠেছে, ওরা নিজেরাই জানে না। আসলে, এদের সাত আট জনের দলটা যখন কয়েক বছর থেকে গড়ে উঠেছে, তখন থেকেই, ওরা যে যার মেগে পেতে পাওয়া যা কিছু একসঙ্গে জড়ো করে। হিসেব নিযে ঝগড়া মারামারিও আছে। কেননা, কেউ হযতো যা পেয়েছে, তা থেকে খরচ কবে খেয়ে ফেলেছে বেশি। হিসাব তো কেউ দেয় না। একজন আব একজনের চোখে পড়ে যায়। ইষ্টিশান আর বাজার আর সিনেমা হল ঘিরে, শহরের মেগে বেড়াবার চৌহদ্দি খুব বড না।

পয়সার হিসাবের পরে, আগেই সেগুলো চালান হযে যায়, পোড়োব পিছনের জঙ্গলে একটা ইট, চুন, সুরকি চাংড়ার নিচে। পাহারাদারকে ডেকে এনে, তারপর যে যার ভিক্ষের ঝুলি ঝোলকৌটা খোলে। একটা খবরের কাগজ পেতে, তার ওপর সব ঢালে। মুড়ি, চিঁড়ে, ভাঙা

বিস্কুটের টুকরো, পাঁউরুটির টুকবো, বাবুদেব মুখেব থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সিঙাড়া, নিমকি, জিলিপি, গজা, এমন কি বসগোল্লা সন্দেশেব কুচিও তাব মধ্যে থাকে। সব মিলিযে মাখিযে, এক একজনের এক আধ মুঠো কবে হযে যায। তাবপব যে যাব ঝোল-ঝাপপাব কষি কোমব খুঁজে বেব করে পোড়া সিগারেটেব টুকবো। আগেই বডগুলো বাছাই কবে, যে যাব মত তুলে নেয়। দেশলাইও একটা থাকে। আগে একজন ধবায, বাকিবা তাব কাছ থেকে ধবায। শুরু হয় ধূমপানেব মজলিস আব খ্যাকব খ্যাকব কাশি। প্যাল্‌গা ফবসা বা কোড়ে, ওদেব বযস আট-নযের বেশি না। লুকা, চেনো, বামেব দশ বাবোব মধ্যে। চটা টোনা তেব-চোদ্দব কাছাকাছি। বগ্‌গিবও তাই, তবে ও প্রাযই দলছুট হযে হঠাৎ হাওযা হযে যায। দলেব মধ্যে বগ্‌গিই একমাত্র বেশি দিন এক জাযগায থাকতে পাবে না। প্রাযই ভবঘুবেব মত এদিক ওদিকে চলে যায়, আবার ফিবে আসে।

প্যাল্‌গা ফরসা, কোড়ে, লুকা, চেনো, বাম—ওবা এখনও পাকা সিগারেটখোব হযে উঠতে পাবে নি। টানতে টানতে কাশে, কাশতে কাশতে লালা ঝবে, চোখগুলো লাল হযে ঠিকবে বেবিযে আসে, হাঁপায, তবু টানতে ছাড়ে না। ওবা এ শহবেব ছেলে না, নানা জাযগা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে। কাব বাপ মা কোথায কেউ জানে না। কাবো কাবো বাপ মাযেব কথা একটু আধটু মনে আছে, কোথায কবে যেন ছিল। এখন আব কেউ তা নিযে মাথা ঘামায না। কাকে কাব বাপ মা এ শহবে ছেড়ে গিযেছে, মনে কবতে পাবে না। কতটুকু বযসে কে এই শহবে এসেছিল, মনে নেই। বাজাবেব ধাবে, ইষ্টিশানে, বাস্তাব ধাবেব দোকানেব ঝাঁপেব তলায থাকতে থাকতে ওবা এ বযসে পৌঁছেছে। আস্তে আস্তে মিলেছে এ শহবে খুঁজলে এ বকম আবও দু চাবটে দল পাওযা যাবে।

কে বা কাবা ওদেব নামগুলো বেখেছে? তাও ওবা জানে না। ওবা নিজেবা নিজেদেব নাম বাখে নি, অথচ যে যাব একটা নাম নিযেই এসেছিল। এব থেকে বোঝা যায, একদা কেউ ওদেব ছিল, বোধ হয় যাবা জন্ম দিযেছিল, আব তাবাই নামগুলো দিযেছিল। পাগলাব প্যাল্‌গাব নাম পাগলা কি না এটা ওবা কোন দিন ভেবে দেখে নি। ও নিজেব থেকেই বলে, ওব নাম প্যাল্‌গা। আর ফরসা কথাটা জুড়ে দিযেছে দলেব সবাই মিলে। কাবণ ওব বড বেশ ফবসা। সেই কেউ শুধু ফবসা বলেই ডাকে। পুবো নাম প্যাল্‌গা ফবসা।

দুপুবে শহর যখন ঝিমোয, সে সমযটা ওদেবও আড্ডা বিশ্রাম গল্পেব সময। কেউ চিত হযে শুযে পড়ে, তার ঘাড়ে আব একজন। কেউ কাবও পিঠে তাল ঠুকে গান গায। কেউ কোমবেব ঝাল-ঝোপ্‌পা খুলে, বসে যায খাল নর্দমাব ধাবে, আব দবকাবে নর্দমাব জলই ব্যবহাব কবে। ধাড়ি শুয়োবেব দল সাধাবণত গন্ধেব ঝোঁকে আসে। দুপুবে এসে গেলেই ওবা ইট ছুঁড়তে শুরু করে। খাল নর্দমায শুযোবেব দাপাদাপি, চিৎকাব, তাব সঙ্গে ওদেবও শিকাবেব হৈ হল্লা উন্মাদনা। কে ঠিক তাগ্‌ কষে মাবতে পেবেছে, তাই নিযে বাদানুবাদ। বাদানুবাদ থেকে মারামারি। মাবামাবিটা আসলে খেলা।

ওদেব সব থেকে মজাব গল্প হয় দোকানদাব, রাস্তাব, সিনেমাব আব ইষ্টিশানেব বাবুদেব নিয়ে। অধিকাংশ দোকানদাবের হাতেব কাছেই ছপ্‌টি থাকে, বিশেষ কবে ওদেব তাডাবাব জন্যই। একবাবের বেশি দুবাব হাত বাড়ালেই, 'তবে বে হাবামিব বাচ্চা!'—কোন দোকানদাবেব ভাবভঙ্গি ভাষা কেমন, সব ওদেব মুখস্থ, নকল কবে দেখায। ওবা তবিতবকাবী মাছেব বাজাবে ঢোকে না। কিন্তু খৈ মুড়ি চিঁড়ের বাজাবে ওরা ছোঁক ছোঁক কবে বেড়ায। দড়ি ছেঁড়া গরু ছাগলের সামনে, শাকেব খেতেব মত, খৈ মুড়ি চিঁড়ের বাজাবটা। বড বড বস্তাব মুখগুলোও

দোকানের সামনে খোলা থাকে। খদ্দের এসে হাতে করে ভাল মন্দ পরখ করে। খদ্দেরের ভিড়ের মধ্যে গরু ছাগল যে আসে না, তা না। বিশেষ করে গোটা দুয়েক ষাঁড়, তাদের জন্যে দোকানীরা সব সময়েই ডাণ্ডা উঁচিয়ে আছে। ওরাও সেই ফাঁকে এক আধ মুঠো, ঝটিতি তুলে মুখে পুরে দেয়, না তো ঝোলায় ঢোকায়। দোকানীর চোখে পড়লেই ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া। মাঝে মধ্যে দু-চার ঘা পিঠে পড়েই। আর খিস্তি খেউড়?

গালাগালগুলো ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আর হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। শহরের দোকানদাররা সবাই ওদের চেনা। কিন্তু বাবুরা না। বাবুদের এক একজনের এক একরকম ভাব। খিটখিটে মেজাজের বাবুদের চেনা যায়। 'বাবু সারাদিন খাই নি বাবু, বাবু—' কথা শেষ হবার আগেই তারা খেঁকিয়ে ওঠে, 'ভাগ, পালা। যততো এঁটুলির দল।'

ওরা মনে মনে বলে, 'তোর বাবা এঁটুলি।' কিন্তু মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কোন বাবু আছে, তাকায়ও না, কথাও বলে না। যেন দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। কিন্তু রাগও করে না, বড় জোর অন্য দিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। কোন কোন বাবু কেবল হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে, গায়ের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কোন কোন বাবু বলে, 'মাপ কর বাবা।' আবার এমন বাবুও আছে, কাছে গিয়ে হাত বাড়ালে, কথা বলে না, কপালে একটা আঙুল ছোঁয়ায়। যেমন অনেক বাবু রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে, বা ঠাকুর-দেবতার মন্দির পড়ে গেলে, ঠিক একটি আঙুল কপালে ছোঁয়ায় সেই রকম।

এক এক বাবুর এক এক রকম চাল। মা-দিদিমণিদেরও সেই রকম। সবাইকেই ওরা নিখুঁত নকল করে, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। এখন সেই সব বাবু মা-দিদিমণি দোকানদারের কাছ থেকেই ওদের যা জোটবার জোটে। কে কেমন দেয়, কি ভাবে দেয়, কি বলে দেয়, সে-সবও ওরা নিজেদের নকল করে দেখায়।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পরেই আবার ওরা বেরিয়ে পড়ে। যাবার আগে, চাতালের পিছনে ইট-চুন-সুরকির চাংড়ার নিচে থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে যায়। রাত্রের ভিড়টা কমে আসতে আসতেই, ওরা গিয়ে জড়ো হয় ইষ্টিশান থেকে দূরে, রেললাইনে। সারাদিনের মেগে পেতে পাওয়া পয়সা নিয়ে, খাল নর্দমার ধারে পোড়োর চাতালে ফিরে যাওয়া মানে, সব হাপিস। ও পাড়ার হাস্তানার মস্তানরা এসে সব কেড়ে নেবে। এ রকম কয়েকবার হয়েছে। সেই থেকে রেললাইনের নিরালায় বসে ওরা আগের পয়সার হিসাব করে। জমাবার কোন প্রশ্ন নেই। রেললাইন থেকে চলে যায় শহরের হোটেলগুলোর দরজায় দরজায়। গরম টাটকা ভাত-তরকারি নিয়ে ওদের জন্যে কেউ বসে থাকে না। বাসি, বাড়ন্ত, নষ্ট সব মিলিয়ে যা জোটে, পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। কাগজে শালপাতায় মুড়ে খাবার নিয়ে ফিরে যায় আবার রেললাইনে। একপাল কুকুরও সঙ্গে জুটে যায়। একদিকে কুকুর তাড়ানো, আর একদিকে ভাগবাটরা। সারাদিনে সেটাই ওদের আসল খাওয়া। সব মিলিয়ে সাত-আটজনের পক্ষে অবিশ্যি সেই খাবার পেট ভরবার মত না।

তারপরে ইষ্টিশনের কলের জলে. পেট ঢাক করে, আবার খাল নর্দমার ধারে, জঙ্গলে ঘেরা পোড়োয়। আস্ত ঘর বলতে কিছু নেই, দু-একটা ঘরের মাথায় এখনও দু-চার হাত ছাদ ঝুলে আছে। তার সঙ্গে গাছপালার আড়াল। সেখানে গিয়ে যে যার ঘাড়ে-ঠ্যাঙে-মাথায়-পায়ে দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাঁদিকের পাড়াটা তখন, মেয়ে-পুরুষ মাতালের চিৎকারে হল্লায় সরগরম। ওদের তাতে কিছু যায় আসে না। নেহাত খুন-টুন হয়ে গেলে, পুলিস এলে, ওরা খাল-নর্দমার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যায়।

পিছনে কিছু নেই, সামনেও কিছু নেই। দিন আসে, বাত যায়, ওদেব জীবনটাও কাটে। জীবন? তাই বলতে হবে। সব জীবেবই জীবন বলে একটা বস্তু আছে। জীবন তো নিববধি। মানুষ অমব, কোন সন্দেহ নেই। না হলে নিববধি জীবন মিথ্যা হয়ে যায়। সেই নিববধি জীবনেব ছোট একটা গুচ্ছ, গতকাল দুপুবে, খাল-নর্দমাব ধাবে পোড়োব চাতালে এসে দেখল প্যাল্গা ফরসা একটা ভাঙা দেওযালেব কোণে ঘাড় গুঁজে আছে। ফবসাটা তখন সাদা প্যাংলা। মুখেব কষে বক্ত, ঠোঁটের ফাঁকে কযেকটা মুড়ি লালায জড়ানো। চোখ দুটো মবা মাছেব মত, তাবা দুটো নড়ছে না। ঘাড় আব কানেব কাছে দু-তিনটে বড় পটলেব মত ফুলে উঠেছে।

প্রথম এলো টোনা আব কোড়ে। কোড়ে বলল, ফবসা শালা কাদিন্দা পাদানি খেযে এসেছে।

টোনা কাছে এসে বল্ল, 'কি বে প্যালগা ফবসা, কেউ মেবেছে?'

প্যাল্গা ফবসাব গলা দিযে গোঙানো শব্দ বেবুল, 'অঁ অ-অ।'

'কে মেবেছে?' টোনা জিজ্ঞেস কবল।

প্যাল্গা ফবসা তখনই জবাব দিতে পাবল না। একে একে ওদেব সবাই প্যাল্গা ফবসাকে ঘিবে বসল। চটা প্যাল্গা ফবসাব ঘাড় আব কানেব কাছে হাত দিয়ে বলল, 'শালা খুব মেবেছে। কে মেবেছে বে?'

প্যাল্গা ফবসা গোঙানো স্ববে যা অস্পষ্ট উচ্চাবণ কবল, তা বোঝা গেল না, শোনা গেল: 'কঁ-অঁ-সা।'

সবাই মুখ তুলে সকলেব মুখেব দিকে তাকাল। বগ্গি বলল, 'কাদম সা, মুড়িওযালা'।

'শালা নিজে যেমন মোটা, ওব ঠ্যাঙাবাব ডাণ্ডাটাও তেমনি।' বাম বলল।

লুকা বলল, 'ওব মুখে মুড়ি লেগে বযেছে।'

চেনো জিজ্ঞেস কবল, 'বস্তা থেকে মুড়ি খেতে গেছিলি, না?'

প্যাল্গাব গলা দিযে শব্দ বেরুল, 'অঁ-অঁ-অঁ।'

'ওব মুখেব থেকে বক্ত বেরুচ্ছে!' বাম বলল।

জটা প্যাল্গাকে টেনে চিৎ কবল। প্যালগাব হাত দুটো ল্যাতপ্যাতিযে ছড়িযে পড়ল। গা ঠান্ডা। জটা জিজ্ঞেস কবল, 'কি বে, যন্ত্রনা হচ্ছে?'

প্যাল্গাব গোঙানো স্ববটা আবও ঝিমিযে গেল, চোখেব কোণ বেযে জল পড়ল। আব ও কাবোর দিকে তাকিয়ে নেই। চোখেব তাবা দুটো স্থিব। মুখটা একটু হাঁ কবা, কযেকটা মুড়ি বাইবে ভিতবে লালায জড়িয়ে এখন শুকনো, আব কষে বক্ত। বোগা ফবসা গাযেব নানা জাযগায ধুলো কাদা। কোমবে একটা ঢলঢলে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট দড়ি দিযে বাঁধা। একপাশেব অর্দ্ধেক নেই, আর একপাশেবটা ছিঁড়ে সুতো ঝুলে পড়েছে।

বগগি জিজ্ঞেস করল, 'কখন মেবেছে? কখন এখানে এইচিস?'

প্যাল্গা ফবসাব ঠোঁট নড়ল, কথা বেরুল না। ওব ঠোঁটে মাছি বসছে দেখে, বাম হাত নাড়ল। কোড়ে ডাকল, 'প্যাল্গা ফবসা! এই প্যাল্গা!'

প্যালগাব ঠোঁট নড়ল না। টোনা বলে উঠল, 'ও মবে যাচ্ছে বে!'

চটা ঝুঁকে পড়ে দু হাত দিযে প্যাল্গাকে জড়িযে ধবে নাড়া দিল, ডাকল, 'এই ফবসা! ফরসা!'

বগ্গি প্যাল্গার বুকে হাত দিল, বল্ল, 'ধুকধুকি নেই। নিশ্বেসও পড়ছে না।'

'কি হবে এখন?' লুকা লাফ দিয়ে দাঁড়াল, ওব চোখে-মুখে ভয়।

ওব দেখাদেখি চেনো আর রামও উঠে দাঁড়াল, টোনা বল্‌ল, 'ভয পাচ্ছিস কেন? আমবা কি মেবেছি?'

বাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পুলিসে ধবে নিযে যায় যদি?'

স্বাভাবিক। এ পাড়ায কেউ মবলে, খুন হলে, আগেই পুলিস আসে, আব লোকজনকে পাকডাও কবে থানায নিয়ে যায।

এ সব চোখে দেখা ঘটনা। কেবল কোডেটাই চটা টোনা বগ্‌গিব সঙ্গে বসে, প্যাল্‌গা ফবসার মুখেব দিকে তাকিযে আছে।

চটা বলল, 'কিন্তু মবেছে কি না, কি কবে বুঝব? মাব খেযে তো অনেকে অজ্ঞান হযে পড়ে থাকে। প্যাল্‌গাও সেই বকম রযেছে কি না, কে বলবে?'

বগ্‌গি বলল, 'চল তালে ডাক্তাবেব কাছে নিযে যাই।'

'এই দুপুরে কোন ডাক্তাববাবু থাকে না।' টোনা বলল, 'এখন বাবুবা বাড়িতে খেতে গেছে। তবু দ্যাখ তো আবাব ডেকে, কথা বলে কি না।'

কোডে প্রায চিৎকাব কবে ডেকে উঠল, 'প্যাল্‌গা। প্যাল্‌গা, এই প্যাল্‌গা!'

প্যাল্‌গা যেমন ছিল তেমনি পড়ে বইল। এখন দেখা গেল, ওব কানেব ভিতব থেকে গালেব পাশ দিযে কযেক ফোঁটা বক্ত চুঁইযে পড়ল। বগ্‌গি বলল, 'মবেই গেছে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে লুকা চেনো বাম সবে পড়েছিল। একটু পবেই দেখা গেল, পাড়াব মেযে পুরুযবা কেউ কেউ চাতালে এসে উঁকি মেবে দেখে যাচ্ছে। একজন এগিযে এলো। পাতলুন আব শার্ট পবা, চোখ টকটকে লাল, ষণ্ডামার্কা। সবাই জানে, ওব নাম 'টাড়ু'। মদ চোলাই, জুযা আব বেশ্যাপাড়াব সব থেকে বড় মস্তান। হাতে লোহার বালা, গলায সোনাব হাব। চুবি-ডাকাতি, ছিনতাইযেব মধ্যে থাকে না। পাড়াব সবাই ভয পায। সে এ পাড়াব যম। টাড়ু এসে চাতালে দাঁড়াল, দেখল, তাবপবে আস্তে আস্তেই বলল, 'এ তল্লাট থেকে নিযে চলে যা। তোল।'

লুকা চেনো বাম টাড়ুব পিছনেই দাঁড়িযে ছিল। তাছাড়া টাড়ুব সাঙ্গপাঙ্গবা তো ছিলই। একমাত্র কোডে জিজ্ঞেস কবল, 'কোথায নিযে যাব? এখন তো ডাক্তাব পাওযা যাবে না।'

'আব ডাক্তাব দেখাতে হবে না।' টাড়ু মেজাজ না দেখিযেই বলল, 'বাস্তাব ওপবে নিযে যা। এখান থেকে ঝামেলা হটিযে ফ্যাল।'

চটা, টোনা, বগ্‌গি নিজেদেব মধ্যে একবাব চোখাচোখি কবল। জানতো এব ওপবে কথা চলবে না। ইচ্ছা কবলে ওবা দৌড়ে পালাতে পাবে। কিন্তু প্যাল্‌গাকে ফেলে পালাবাব মতলব ওদেব ছিল না।প্যালগাকে সবাই তুলে, হাত পা ধবে ঝুলিযে বাজাবেব বাস্তাব সামনে এসে দাঁড়াল। শুইযে দিল বাস্তাব ধাবে। লুকা, চেনো বাম অবিশ্যি পিছনে পিছনেই এল, বইল কিছু দূবে। বিকাল হতে না হতেই বাস্তায ভিড় জমতে আরম্ভ কবল। তাবপবে এল একজন লাঠিধাবী সেপাই। সেপাই এসে জিজ্ঞেস কবল, 'কি হয়েছে?'

ওবা সবাইকে যা জবাব দিযেছে, সেপাইকেও তাই বলল, 'কদম সা মেবেছে।

সেপাই ডাণ্ডা তুলে বলল, 'বাজে কথা বলিস না। কদমবাবুব খেযেদেয়ে আর কাজ নেই। চল থানায নিযে চল। বাস্তায ভিড় কবা চলবে না।'

চটা, টোনা, বগ্‌গি আর কোডে প্যাল্‌গাকে বযে নিযে গেল থানায়। সঙ্গে সেপাই। তাব পিছনে লুকা, বাম, চেনো ছাড়াও আরও কিছু ওদেরই মত ছেলের দল। দারোগা বাবু সব শুনলেন, দেখলেন। সেপাইকে কি বললেন। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ কদম সা প্রায দশ-বারোজন লোক নিযে থানায এল। আব থানাব উঠোনের অন্ধকারে, প্যাল্‌গার মড়া নিযে

ঘিরে বসে বইল ওব সঙ্গীবা। ঘবেব ভিতবেব কথা ওরা কিছুই জানতে বা শুনতে পেল না।

এক সময় কদম সা সদলবলে থানা থেকে বেবিয়ে চলে গেল। সেই সেপাইটা এসে চটাদেব বলল, 'মডা তোল। আজ নিয়ে গিয়ে বেলগুদামেব ধাবে বাখ, কাল সকালে আমি যাব। বৃষ্টি হলে গুদামের চালার নিচে থাকবি।'

চটারা ব্যাপাবটা কিছুই বুঝল না। থানায কোন কথা বলতেও সাহস হল না। প্যালগাব মডা বয়ে নিয়ে চলে গেল বেলগুদামেব ধারে, লাইনেব পাশে খোলা জাযগায। লুকা, চেনো, রাম দূরে এসে দাঁডাল। খোলা জাযগাটা থেকে দূবে একটা মাত্র আলো। সেই আলোয চটাবা যে যাব সকলেব পযসা বেব করে হিসাব কবল। টোনা শহরে চলে গেল পযসা নিয়ে। হোটেলেব দবজায দরজায় ঘুবে যা পাওযা গেল, বাসি-বাডন্ত সাবাদিনেব ভ্যাপসা নষ্ট খাবাব নিয়ে এল। প্যাল্‌গার মডা ঘিরে বসে গেল। বাস্তাব ধাবেই টিউবওয়েল। জল খেয়ে যে যাব কোমবেব কসি থেকে সিগাবেটেব পোড়া টুকবো বেব কবে, ধবিয়ে টানল।

বগ্‌গি বলল, 'প্যালগাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে, নইলে কুকুবে টেনে নিয়ে যাবে।'

ওবা সবই জানে। বিশেষ করে ভবঘুরে বগগি। কিন্তু সেপাইটা প্যালগাকে এখানে নিয়ে আসতে বলল কেন? থানায কদম সার দল এসে কি কবল? কি কথা হল? থানাব দাবোগাবাবু কি বললেন? শুভদিনেব আগে মেঘলা বাত্রে, ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবাব কেউ ছিল না। বাতাসহীন গুমোটে জিজ্ঞাসাগুলো ওদেবই ঘিবে ভাসতে লাগল। কেবল দেখা গেল, লুকা, চেনো, রাম আস্তে আস্তে বন্ধুদের কাছে এগিয়ে এল, আব প্যাল্‌গাকে ঘিবে সকলে একসঙ্গে দলা পাকিয়ে শুয়ে রইল। বগ্‌গি মিথ্যা বলেনি। কয়েকটা কুকুব সাবা বাত্রিই ওদেব চাবপাশে ঘোবাঘুবি কবল।

বাত্রে চটা আব বগ্‌গি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেঘলা সকালে সবাই থানাব সেপাইযেব জন্যে অপেক্ষা কবতে লাগল। তোড়ে বৃষ্টি ঝবছে না, কিন্তু ঝিপঝিপ ঝবছেই। কিন্তু প্যাল্‌গাব মডা আগলানো বন্ধুদেব এ বৃষ্টিতে কিছু যায় আসে না। ওবা সেপাইয়েব অপেক্ষা কবছে। কেন অপেক্ষা করছে, কি কবতে হবে, কিছুই জানে না। এদিকে ঝিপঝিপ বৃষ্টি শহবেব মেঘলা আকাশে, একটা একটা করে মাইকেব গান বাজতে শুরু করেছে। বাদলা দিনেও শহরটা ক্রমেই যেন খুশি আব ব্যস্ততায মেতে উঠছে। কেন? আজ কি? চটাবা কিছুই জানে না। ওবা সেপাইয়ের অপেক্ষা কবছে। কিছু কিছু ভিখিরি ভবঘুবে এসে ভিড জমাচ্ছে। আব নানা রকম কথা বলছে। চটাদেব মত আব যে সব ছেলেবা শহবে ঘুবে বেড়ায, ওবাও আসছে। কেবল প্যাল্‌গা ফবসার গাযে হাত বেখে, কোডেটা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। কাঁদতে বারণ কবলেই দাঁত কিডমিড কবে বলছে, 'কদম সার ভুঁড়িটা শালা কামড়ে খেয়ে দেব।'

অবশেষে সেপাইটি এল। সে একলা না, সঙ্গে আব একজন, মাথায ঢাকা বিকশায চেপে। গত দিনের সেপাইটি বিক্‌শা থেকে নেমেই একটা গালাগাল দিল, 'কুত্তাব বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আর পারা যায না।' তারপবে চাবদিকের ভিড়ে একবাব শাসানো নজর বুলিয়ে চটাকে হাত তুলে ডাকল, 'এই ছোঁড়া, এদিকে আয।'

চটা উঠে তার কাছে গেল। সেপাই একটু সবে গিয়ে বলল, 'ওই মডাটাকে পোড়াতে হবে বুঝলি? পোড়াবাব খবচ আমি দেব, কিন্তু তোদেব হাতে তো টাকা দেব না, মেরে দিয়ে কেটে পড়বি। একটা বাঁশ-টাঁশে ঝুলিযে মবাটাকে নিয়ে শ্মশানে যা, আমি সেখানে থাকব। পোড়াবাব কাঠ কিনে দিয়ে, ডোমের খবচা দিযে চলে আসব। বুঝলি?'

চটা ঘাড় কাত করে জানালে, বুঝেছে। সেপাইটি আব কোন কথা না বলে, বিকশায চেপে

চলে গেল। তাব পরে চটার মুখ থেকে খবরটা শুনে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। জীবনে এ রকম একটা ঘটনাব কথা ওরা ভাবতেই পারে নি। শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাবার কথা শুনে, সকলেই কেমন খুশি আব ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা বাঁশ জোগাড়ের অসুবিধা হল না। বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেল। তাবপব কাঁধে ঝুলিয়ে যাত্রা। কে যেন প্রথমে বলে উঠল, 'মবেছে প্যাল্‌গা ফবসা, দে হরিবোল!'

ঝরুক ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি, তবু আজ উৎসব। প্যাল্‌গা ফবসার শববাহীদেব দলটা বাডতে বাডতে একটা বড মিছিলেব মত হয়ে উঠেছে। শহরেব লোকেরা নেংটি ইঁদুবের বাচ্চাগুলোর নতুন সঙ দেখে খুব মজা পাচ্ছিল। কিন্তু একটা সিনেমা হলেব সামনে যেতেই, কযেকজন নানা বয়সের বাবু ছুটে এসে হাঁকল, 'এই চুপ! এখানে তোবা ও সব হাঁক ডাক বাচলামো কববি না। মুখ বুজে চলে যা। এগিয়ে গিযে যত খুশি হরিবোল দে।'

প্যাল্‌গাব শববাহী বন্ধুবা, আবও অনেকে চুপ কবে গেল, আব নিঃশব্দে সিনেমা হলটা পেবিযে গেল। দেখল, হলেব সামনে কযেকটা গাডি দাঁড়িযে আছে। একপাশে একটা পুলিস ভ্যান। আশেপাশে বাবু মা আব খোকা খুকুদেব ভিড়। হলেব মধ্যে ঢোকবাব জন্যে আঁকুপাঁকু কবছে। শুধু হলেব মাথায লাল কাপডেব ওপব সোনালী অক্ষবেব লেখাগুলো ওবা পড়তে পাবল না। সেখানে লেখা ছিল,

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ
'শিশুবাই জাতিব ভবিষ্যৎ'
'সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হযে উঠুক ওদেব জীবন'

প্যাল্‌গা ফরসাব শবযাত্রীরা সিনেমা হলটা পেরিযে আবাব হাঁক দিল, 'মবেছে প্যাল্‌গা ফরসা।' কেবল কোডেটাই কাঁদছে, আব দুধেব দাঁতগুলো চিবিযে বলছে, 'কদম সাব ভুঁডিব মাংস একদিন কামড়ে ছিঁড়ে খাব।'

